বাণী

অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়, এম্-এ

মানুষের তরে রেখে গেল যারা কিছু নয় শুধু আঁখিজল,
হৃদয়ের কথা ভাষায় ফোটেনি মরিল ব্যথায় অবিরল,
জীবনেব বুকে ছিন্ন পাত্র ধরিয়া
মরণের কোল দিল অমৃতে ভরিয়া
লক্ষ আঘাত বেদনায় তবু করেনিক কোন কোলাহল,
তাহাদের সেই বাণী হোক আমাদের চির সম্বল।

সংসার মাঝে সবাই যখন অভিশাপ দিল বিধাতায়,
সমূহ সৃষ্টি ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার অরাজকতায়,
তখনো যাহারা বিশ্বাস লয়ে হৃদয়ে
নীরব হাসিতে জেগে ছিল সারা নিশি এ
তখনো যাদের অটুট শ্রদ্ধা রহে মঙ্গল ক্ষমতায়,
মোবা চাই আজ তাহাদেব সেই নীবব বাণীর বারতাই॥

জীবনেব যত দুঃখ ও গ্লানি বিপুল দ্বন্দ্ব হাহাকার,
যাবা দেখে গেল নয়ন ভরিয়া তবুও রহিল অবিকার;
ভালো ও মন্দ নিল দুই হাতে সমানে
পাপ ও পুণ্যে টেনে নিল বিনা প্রমাণে
সবাব লক্ষ দাবিরে ছাড়ায়ে উঠেছে প্রেমের দাবি যার,
আজিকে আমরা লইব সকলে বিশ্বপ্লাবী সে বাণী তার॥

পুরী নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

স্বামী জগন্নাথানন্দ

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

শ্রীজগন্নাথমহাপ্রভুর যত উৎসব আছে, তন্মধ্যে রথযাত্রাই সর্বাপেক্ষা প্রধান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে নরনারীরা আসিয়া রথে বিরাজিত প্রভুকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিয়া থাকেন। রথে বামনদেবকে দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না,— হিন্দুদের এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় অশেষ দুঃখকষ্ট

বরণ করিয়া দর্শনলালসায় আকুল প্রাণে তাঁহারা ছুটিয়া আসেন। রথযাত্রার সময় সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ হইয়া থাকে।

প্রভু ও ভৃত্য

কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে—এই দেহ রথ, আত্মা রথী, ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব, মন লাগাম, বুদ্ধি সারথি।

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥"

যেমন দেহরথে বিরাজিত পরমাত্মাকে ভৃত্য-স্থানীয় ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে চালাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ জগতের নিয়ন্তা, জগতের পালক প্রভুকে রথে অবস্থিত আছেন জানিয়া রথের রজ্জু ধরিয়া সেবকেরা টানিয়া আনন্দিত ও পুলকিত হইয়া থাকেন। পুরীতে অবস্থানকালে চৈতন্য মহাপ্রভু এই ভাবের উড়িয়া ভাষায় রচিত একটি গান করিতেন 'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ'; পরিমুণ্ডা অর্থাৎ দীনতা প্রকাশ করা, নমস্কার ও প্রশংসা করা। জগবিমোহনকারী জগন্নাথ মহাপ্রভু যাইতেছেন। তাঁহাকে নমস্কার ও নিজেদের আর্তি জানাইবার জন্য চল। এই গান সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না।

চৈতন্যদেবের পার্ষদেরা সাত দলে বিভক্ত হইয়া রথাগ্রে নৃত্য করিতেন। এক এক দলে একজন করিয়া প্রধান গায়ক থাকিতেন; যথা অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, শ্রীবাস, সত্যরাজ খান ও হরিদাস। চৈতন্যমহাপ্রভু সকলের দলে যোগ দিয়া নৃত্য করিতেন, তাঁহার দেবদুর্লভ অপূর্ব উদ্দাম নৃত্য, গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠ আজানুলম্বিত বাহুযুগল, গৌরকান্তি সকলের মন হরণ করিয়া নিত। পূর্বোক্ত গানটি করিয়া চৈতন্যদেব কখনও অন্তর্দশা, কখনও অন্তর্বাহ্যদশা, কখনও বা সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। পুনরায় একটু বাহ্যজ্ঞান আসিলে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন। তাঁহার দেহের রোমাবলি কখনও কণ্টকিত হইত; কখনও তিনি প্রফুল্ল, কখনও বা কাষ্ঠের মত নিশ্চল হইয়া থাকিতেন। জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলা তাঁহার মধ্যে সঞ্চার হইত। ভাবপূর্ণ অবস্থায় জজ···গগ পরি··পরি · (জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ) ইহাই বলিতেন। সম্পূর্ণ বলিতে পারিতেন না। ঈশ্বরীয় প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে প্রেমঘন মূর্তিটি যেন তরঙ্গায়িত ও হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। ইহা যে হাড়মাংসের শরীর দর্শকেরা মনে করিতে পারিত না। নয়নপ্রাণহরণকারী অপূর্ব নৃত্য দর্শন করিয়া দর্শকেরা বুঝিতে পারিতেন না যে, তাঁহারা পৃথিবীতে আছেন—না অন্য কোথাও আছেন। প্রভুর প্রেমের তরঙ্গে সেই সময় প্লাবিত হইয়া তাঁহারা দেশকাল ভুলিয়া যাইতেন। প্রভুর অবস্থানকালে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মহিমা শতগুণে বর্ধিত হইয়াছিল। বর্তমানে তাঁহার স্মৃতি পুরীর সর্বত্র বিজড়িত রহিয়াছে।

এই রথযাত্রার সময় গোপীগীতা পাঠ করিবার কালে প্রতাপরুদ্রকে ভাবাবস্থায় মহাপ্রভু আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। ওড়িশার রাজারা নিজেদের জগন্নাথ-দেবের সেবক বলিয়া ভাবিতেন; প্রভুই এই রাজ্যের মালিক, আমরা তাঁহার ভৃত্যমাত্র এবং তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী। ভোগনিবেদনের পর জগন্নাথদেবকে রাজারা পানের ডিবা লইয়া দিতেন। যথাযথভাবে পূজা হইল কিনা, কোন ত্রুটি হইল কিনা, ইহার সবিশেষ তত্ত্ব লইতেন।

ভোগ-নিবেদনের সময় দর্পণে প্রভুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত না হইলে বুঝা যাইত কোন ত্রুটি বা অপরাধ হইয়াছে। তজ্জন্য নাটমন্দিরাস্থিত গরুড়-স্তম্ভের নিকট রাজাকে হত্যা দিয়া থাকিতে হইত। স্বপ্নাদেশে প্রভু তাঁহাকে যেরূপ বলিতেন, তদনুযায়ী রাজা ব্যবস্থা করিতেন। কোন ভক্ত হয়ত ব্যাকুল হইয়া ডাকিতেছে, কেহ বা জগন্নাথদেবের ভক্তকে অপমান করিয়াছে, কোন ভক্ত হয়ত গ্রাসাচ্ছাদন

পাইতেছেন না—তজ্জন্য রাজাকে স্বপ্নাদেশের পর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইত। কখনও কখনও প্রভু নিজে আপদবিপদ হইতে ভক্তকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন। পূর্বোক্ত জাগ্রতদেবতার লীলা উৎকল-সাহিত্যে, কাব্যে, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই প্রাচীন গল্পকথা লোকের মুখে গীত ও অভিনীত হইয়া থাকে। ওড়িয়া ভাষায় পদ্যে রচিত 'দার্ঢ্যতা ভক্তি' গ্রন্থ হইতে রঘু অরক্ষিতের একটি সংবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

ভক্ত রঘুনাথ

রঘুনাথ ছিলেন মাতাপিতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণ মহাপাত্র, মাতার নাম কমলা। তাঁহাদের অগাধ সম্পত্তি ছিল। তাঁহারা প্রভুর ভক্ত ও অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন, কালক্রমে তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। মাতাপিতার মৃত্যুর পূবে এক ধনী কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ হইয়াছিল। কন্যাটি অতি সুলক্ষণা ও সতীসাধ্বী, নাম অন্নপূর্ণা।

ঐশ্বর্য নষ্ট ও মাতাপিতার মৃত্যু হওয়ায় রঘুনাথ অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘরে অন্নসংস্থান না থাকায় তাঁহাকে দরিদ্রাবস্থায় কালাতিপাত এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। এককালে যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য ও সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, তিনি কোনমুখে সেই গ্রামেই ভিক্ষা করিবেন? রঘুনাথ দেশে না থাকিয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিতে থাকেন, সেখানে তিনি নিত্য জগন্নাথদেবকে দর্শন ও স্তবস্তুতি করিতেন এবং সাধনভজনে অধিকাংশ সময় মগ্ন হইয়া থাকিতেন। মঠে মঠে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য সেকালে সর্বসাধারণের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা ছিল।

এদিকে কন্যার পিতামাতা ভাবিলেন, রঘু এখন পথের ভিখারী—তাঁহার কুলশীলের কোন মর্যাদা নাই। এরূপ অবস্থায় কোন বড়লোকের পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করাই ভাল। মেয়েটি সুখে থাকিবে। বাসুদেব মহাপাত্র নামে সেইদেশে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্রের সঙ্গেই বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হইল। সতীসাধ্বী অন্নপূর্ণা ঐরূপ প্রস্তাব শুনিয়া মর্মাহত হইলেন। ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"প্রভু, আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা কর, আমার পতি থাকিতে অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না। আমি আত্মহত্যা করিয়া জীবনের অবসান ঘটাইব"। তিনি আকুলকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন—"হে প্রভু, আমার কাছে আমার পতিকে আনিয়া দাও, নচেৎ তাঁর কাছেই আমাকে লইয়া যাও।" সেই গ্রাম হইতে কয়েকজন নীলাচলে যাইতেছিলেন। অন্নপূর্ণা একখানি চিঠি লিখিয়া তাঁহাদের হাতে দিলেন এবং স্বামীকে দিবার জন্য খুব অনুরোধ করিলেন।

গ্রামের লোকেরা নীলাচলে আসিয়া অনেক খুঁজিয়া রঘুনাথের সন্ধান পাইলেন এবং তাঁহার হস্তে তাঁহারা পত্নীপ্রদত্ত পত্রখানিও অর্পণ করিলেন। দশদিন পরেই অন্নপূর্ণার পুনর্বিবাহ। পদব্রজে দেশে ফিরিতে হইলে একমাস লাগিবে। অথচ না গেলেও পত্নীর আত্মহত্যা-দোষ লাগিবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া রঘুনাথ জগন্নাথ মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলেন এবং কাতরকণ্ঠে স্বীয় মর্মবেদনা জানাইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভু, আমার কোন সহায় নাই, তুমিই আমার সর্বস্ব, একমাত্র সহায়, তোমার নাম বিপদ্‌মোচন" ইত্যাদি প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহদ্বারের নিকট ধরনা দিয়া নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু জগন্নাথদেব বেতাল নামক অনুচরকে রাত্রি থাকিতেই রঘু অরক্ষিতকে তাঁহার শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। বেতাল তদনুযায়ী প্রভাত হইবার পূর্বে তথায় তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিল। রঘু

অরক্ষিতের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা প্রভুর লীলা।

কন্যার পিতামাতা ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত কাঙাল জামাতা রঘুকে তাঁহাদের দ্বারের সম্মুখে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা কিন্তু অপ্রত্যাশিত-ভাবে স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া মহা আনন্দিত ও পুলকিত হইলেন। রঘুকে মারিয়া ফেলিলে কন্যা অন্যকে বিবাহ করিতে রাজী হইবে, ইহা ভাবিয়া পিতামাতা বিষমিশ্রিত খাদ্য তাঁহাকে খাইতে দিলেন। কিন্তু তিনি প্রভুকে সমস্ত অন্ন নিবেদন করিলেন। পত্নী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। নিবেদিত অন্ন ফেলিয়া দিলে অপরাধ হইবে ভাবিয়া বিষমিশ্রিত সমস্ত প্রসাদ তিনি গ্রহণ করিলেন। বিষক্রিয়া আরম্ভ হইল। তিনি ঢলিয়া পড়িলেন। প্রাণবায়ু নির্গত হইলে রঘুনাথকে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইল। প্রচারিত হইল সর্পাঘাতে রঘু অরক্ষিতের মৃত্যু হইয়াছে। পতির নিধনের কথা শুনিয়া অন্নপূর্ণা স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন এবং জ্বলন্ত চিতায় পতির সহগামিনী হইবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিলেন।

সতীর আর্তনাদে প্রভুর আসন টলিল—তিনি আসিয়া করস্পর্শে রঘু অরক্ষিতকে বাঁচাইলেন। পত্নীকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে যাইবার পথে অন্য এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্বোক্ত যে রাজপুত্রের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, তিনি সসৈন্যে আসিতেছেন জানিয়া পতি-পত্নী বিচলিত হইলেন। ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহারা ব্যাকুল ভাবে প্রভুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ছদ্মবেশে জগন্নাথ বলভদ্র সৈন্যসহ উপস্থিত হইয়া বিপদ লইতে ভক্তকে উদ্ধার করিলেন। এইরূপে সমস্ত দুঃখবিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া উভয়ে নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। দেহান্তে এই দিব্যদম্পতী বাঞ্ছিতলোকে গমন করেন।

জগন্নাথদেবকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ ভূরি ভূরি আখ্যায়িকা ভক্তদের চরিত্র ও জাগ্রত দেবতার লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে।

রথত্রয়

আমরা এখন রথযাত্রার প্রসঙ্গ আলোচনা করিব। আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা আরম্ভ হয়। জগন্নাথদেবের রথের চাকার সংখ্যা ষোল, বলভদ্রের রথের চাকা চৌদ্দ এবং সুভদ্রা দেবীর বার। যথাক্রমে রথত্রয়ের নাম নন্দিঘোষ, তালধ্বজ ও দর্পদলন। তিনটি রথ বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। নন্দিঘোষের বর্ণ রক্ত ও পীত, তালধ্বজের নীল ও রক্ত, দর্পদলনের রক্ত ও কৃষ্ণ। শাস্ত্রানুসারে বিবিধ পতাকা ও বিবিধ কারুকার্যে রথত্রয় মণ্ডিত হইয়া থাকে। জগন্নাথদেবের রথে গরুড়ধ্বজ, বলভদ্রের রথে লাঙ্গুলধ্বজ, সুভদ্রার রথে পদ্মধ্বজ থাকে। রথের বেদী হইতে জগন্নাথের রথের উচ্চতা তেইশ হাত, বলদেবের বাইশ হাত, সুভদ্রার রথের একুশ হাত। আষাঢ় শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে রথগুলির প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠার পর হইতে কোন জীবজন্তু, পক্ষী, মার্জার, এমন কি মনুষ্য পর্যন্ত রথের উপর যেন না বসে, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়।

আষাঢ় শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়ার দিনে সেবকেরা প্রভাতে প্রভুকে অর্চনা করিয়া খিচুড়ি ভোগ দিয়া থাকে। তাহার পরে প্রার্থনার সুমধুর স্বর ভক্তকণ্ঠে জাগিয়া উঠে। প্রার্থনান্তে মহাপ্রভু রথে আরোহণ করিবার জন্য যাত্রা করিয়া থাকেন। ইহাকে 'পহন্তি বিজে' বলা হয়। 'পহন্তি বিজে'র অর্থ—ধীরে ধীরে বসিয়া বসিয়া চলা। পহন্তির সময় বিবিধ বাদ্য, নানাবিধ মাঙ্গলিক সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। এই সময় প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। প্রথমে সুদর্শন চক্র, তাহার পরে বলরাম, তাহার পরে সুভদ্রা, শেষে জগন্নাথদেব রথে আসেন

পহন্তি বিজে করিবার পূর্বে স্বয়ং রাজা ঝাড়ু হস্তে রথত্রয় ও পথ মার্জনা করেন।

এক কিংবদন্তী আছে ওড়িশার রাজা পুরুষোত্তম-দেব (প্রতাপরুদ্রের পিতা) রথের সময় ঝাড়ু হস্তে মার্জনা করিয়া থাকেন শুনিয়া কাঞ্চি কাবেরীর রাজা ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং পূর্ব প্রস্তাবমত তাঁহার কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। সেজন্য পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চি রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। প্রথমে তিনি সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া জগন্নাথদেবের শরণাপন্ন হন। রাজার প্রার্থনায় জগন্নাথদেব ও বলভদ্র সৈন্যসহ দুইটি অশ্বপৃষ্ঠে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা পুরুষোত্তম জয়লাভ করিলেন।

জগন্নাথ, বলভদ্র সৈন্যবেশে নিজেদের রত্ন অঙ্গুরীয় বাঁধা দিয়া মানিক নাম্নী গোয়ালিনীর নিকট হইতে দই দুধ খাইয়াছিলেন। পরে সেই গোয়ালিনীর সঙ্গে রাজার দেখা হইলে রত্ন অঙ্গুরীয় দেখাইয়া তিনি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাহাকে যে একখানি গ্রাম দিয়াছিলেন, উহা মানিক পাটনা গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ রথযাত্রার সময় প্রভুর যাহাতে কষ্ট না হয়, সেই জন্য পথের স্থানে স্থানে ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে এবং দর্পণে তাঁহাকে কর্পূরমিশ্রিত শীতল জলে অভিষিক্ত করা হয়।

অপরাহ্নে রথ টানা হয়। রথগুলি গুণ্ডিচা বাড়ীতে পৌছিবার পর মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত বেদিতে দেবতাদিগকে স্থাপন করা হয়। এখানে তাঁহারা থাকেন সাতদিন, বড় মন্দিরে থাকাকালীন যেরূপ ভোগরাগ দেওয়া হয়, সেইরূপ এখানেও হইয়া থাকে। এখানে মহাপ্রসাদও হয়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের নিকট ঠাকুররা সাতদিন থাকেন। গুণ্ডিচা মণ্ডপে দেবতারা গেলেও প্রতিদিন রথস্থ ধ্বজগুলির পূজা হয়। আকস্মিক কোনও দুর্ঘটনা দ্বারা রথের কোন ক্ষতি না হয়, সেইজন্য ভূতপ্রেতাদি ও দিক্‌পালদিগকে যথাবিধি বলি (পূজা) দেওয়া হয়।

অষ্টমীর দিন তিনটি রথকে দক্ষিণাভিমুখী করিয়া মাল্য, পতাকা ও চামর দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। নবমীতে সকালবেলা মন্দির হইতে ঠাকুরদের আনিয়া রথে স্থাপন করা হয়। সেইদিন রথ টানিয়া বড় মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকট রথগুলি রাখা হয়। ঠাকুর আসিলেও সহজে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন না। লক্ষ্মীঠাকুরানী রাগ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া থাকেন। জগন্নাথদেবের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বচনিকা আরম্ভ হয়, তারপর লক্ষ্মী দ্বার খুলিয়া দিলে ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করেন।

গুণ্ডিচা বাড়ী

বড় মন্দিরের দেড় মাইল উত্তর দিকে গুণ্ডিচা মন্দির অবস্থিত। এই গুণ্ডিচা মন্দিরকে মহাবেদী, যজ্ঞমণ্ডপ, জন্মস্থান, জনকপুরী ও গুণ্ডিচা মণ্ডপ বলা হয়। প্রাচীন কালে ইন্দ্রদ্যুম্ন এইখানে নৃসিংহ-মূর্তি স্থাপন করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া গুণ্ডিচাবাড়ী, বেদী রচনা করিয়া উহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞমণ্ডপ এবং ঠাকুরদের এখানে উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া জন্মস্থান বা জনকপুরী বলা হয়। স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকল-খণ্ডে বর্ণিত আছে—

গুণ্ডিচামণ্ডপং নাম যত্রাহমজনং পুরা।
অশ্বমেধসহস্রস্য মহাবেদী তদাভবৎ॥

আমি যেখানে পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলাম, সেখানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই গুণ্ডিচা-মণ্ডপে আমাকে লইয়া যাইবে, উহা আমার জন্মস্থান ও অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। আমি সেখানে অনেকদিন অধিষ্ঠিত ছিলাম বলিয়া আমার ঐ স্থানের প্রতি অসীম প্রীতি রহিয়াছে।

মমোৎপত্তেশ্চ নিলয়ং প্রীতিকৃন্মম শাশ্বতম্।
বহুকালং স্থিতশ্চাহং মমাস্মিন্ প্রীতিরুত্তমা॥

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন গুড়িচা শব্দ দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে। তেলেগুতে

গুড়িচার অর্থ কুটীর। আদিম অধিবাসীরা জগন্নাথ-দেবকে ঐদিন মন্দির হইতে বাহির করিয়া কুটীরে রাখিতেন বলিয়া কালক্রমে উহার গুণ্ডিচা নাম হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রীর নাম গুণ্ডিচাদেবী ছিল, তদনুসারে গুণ্ডিচা হইতে পারে।

রথ-নির্মাণ-বিধি

প্রত্যেক বৎসর ঠাকুরদের রথ নূতন ভাবে নির্মাণ করা হইয়া থাকে। পূর্ব বৎসরের রথ ব্যবহার হয় না। উহা নিলাম হইয়া যায়। বৈশাখ মাসের রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে রাজা সংকল্প করিয়া আচার্য ও তিনজন সূত্রধরকে বরণ করিয়া থাকেন, অরণ্যে যেখানে ভাল কাঠ পাওয়া যায়, সেখানে পুরোহিত যাইয়া অরণ্যে অগ্নি স্থাপন করিয়া সুপ্র-শস্ত পাঠ ও ১০৮ আহুতি প্রদান করেন। প্রত্যেক বৃক্ষের মূলে ঘৃতের দাগ দেওয়া হয় এবং দিক্‌পাল ও ক্ষেত্রপালদের জন্য পৃথক পৃথক বলি দেওয়া হয়। বনস্পতির প্রীতির জন্য পায়সান্ন দ্বারা ১০০টি আহুতি দেওয়া হয়; তারপর আচার্য ভগবানকে স্মরণ করিয়া দাগদেওয়া বৃক্ষগুলিতে কুঠার দ্বারা আঘাত করেন। এইরূপে আচার্য সূত্রধরদের ছেদনকার্যে নিযুক্ত করেন। প্রত্যেক বৎসরের রথনির্মাণের পূর্বে যথোক্ত বিধি পালিত হয়।

নব-কলেবর

অবতার বা মহাপুরুষদের যেমন ভৌতিক দেহ জরাজীর্ণ হইয়া যায় সেইরূপ অবতারমধ্যে পরি-গণিত জগন্নাথ প্রভু কলেবর-পরিবর্তন করেন। যে বৎসরে আষাঢ়ে মলমাস পড়ে, অর্থাৎ দুইটা আষাঢ় মাস হয় সেই বৎসরে ঠাকুর কলেবর-পরি-বর্তন করিয়া নূতন কলেবর ধারণ করেন। কেহ কেহ বলেন, এই কলেবরপরিবর্তনপ্রথা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিশ্বাবসু-বংশীয় শবর জাতিরা জগন্নাথদেবকে পূজা করিয়া আসিতেছেন। কিংবদন্তী আছে বহুপূর্বে প্রাচীন-কালে জৈনেরা এই মূর্তি পূজা করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে শবরজাতিরা ছাড়াইয়া নিয়া আসে। তাঁহারা আনিয়া মূর্তির পরিবর্তন করিয়া নীলমাধব নাম দিয়া পূজা করেন। যে বৎসর মূর্তি উদ্ধার করা হইয়াছিল, সেই বৎসর দুইটি আষাঢ় মাস পড়িয়াছিল, সেই মাসে তাহারা মূর্তি পরিবর্তন করিযাছিল। উহা হইতেই নবকলেবর-প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

দুইটি আষাঢ় মাসে জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা ঘট পরিবর্তন করেন। ঠাকুরদের জীর্ণ কলেবর-গুলিকে মন্দিরের মধ্যে 'কুইলি বৈকুণ্ঠ' স্থানে প্রোথিত করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তীয় শবরেরা এই আষাঢ় মাসকে পবিত্র মনে করিয়া থাকেন। যখন ঠাকুরদের কলেবর প্রোথিত করা হয়, তখন হইতে 'দইতারা' (শবররাজ বিশ্বাবসুর কন্যা ফুলের বংশধর) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন করেন। উহারাই প্রভুর জ্ঞাতি-কুটুম্ব। নয়দিন যথাবিধি তাঁহারা অশৌচ পালন করিয়া থাকেন।

বিগ্রহনির্মাণ যে কোন কাষ্ঠে হয় না। উহা নিম্বকাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত হয়। যেকোন নিম্ব-বৃক্ষে হয় না। বহু প্রকার বিধি আছে, কোন নির্জন স্থানে সাধুর আশ্রমে নিম্ববৃক্ষ থাকিবে। উহা কীটদষ্ট হইলে হইবে না। সেই বৃক্ষমূলে ধূপ ধুনা প্রত্যহ দেওয়া চাই। উহাতে একটি বিষধর সর্পের বাস থাকিবে। গাছের উপর কোন পক্ষীর বাসা থাকিবে না। সে বৃক্ষের রং ধবল হইবে, শঙ্খের চিহ্ন থাকিবে এবং তাহাতে সাতটি শাখা থাকিবে।

এইরূপে বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শনের প্রত্যেকের একটি লক্ষণযুক্ত নিম্ববৃক্ষের প্রয়োজন হয়। পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত নিম্ববৃক্ষ সহজে পাওয়া যায় না। সেবকরা পুরী জেলার মধ্যে কাকটপুরস্থ সর্বমঙ্গলার নিকট হত্যা দিয়া থাকেন। কোন্

দিকে গেলে সেইরূপ বৃক্ষ পাওয়া যাইবে দেবী স্বপ্নে আদেশ করেন। তদনুসারে সেবকেরা উহার অন্বেষণে চলিয়া যান। সেই সেই নিম্ববৃক্ষের মূলে পূজা-অর্চনা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। তারপরে বৃক্ষ ছেদন করিয়া নূতন শকটে আনিয়া মন্দিরাভ্যন্তরস্থ কুইলি বৈকুণ্ঠে দারু নির্মিত হয়। জগন্নাথদেবের নাভিস্থলে যে কৌট আছে (আত্মারাম কৌট উহা বাহির করিয়া নূতন দারুমূর্তির নাভিস্থলে রাখা হয়। যে লোকটি বাহির করে তাহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়; ভূতাবিষ্টের মত উহা আনিয়া নূতন কলেবরে স্থাপন করে। সে কোটের মধ্যে কি আছে আজ পর্যন্ত কেহ দেখে নাই; কেহ কেহ বলেন বুদ্ধদেবের দন্ত আছে।

রথযাত্রার ইতিবৃত্ত

রথ-শব্দের ব্যবহার বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। আর্য অনার্য উভয়ে এই রথ যে ব্যবহার করিতেন উহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালের লোকেরা শোভাযাত্রার সহিত রথে চড়িয়া ভ্রমণ ও যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতেন। দেবতারাও রথযান অতিশয় ভালবাসিতেন। কোন্ দেবতার কোন্ রথ দ্রুতগামী ও মনোহর উহাও স্থানে স্থানে বর্ণিত আছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সূর্যদেব, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, কুবের, ইঁহারা সকলেই রথ ব্যবহার করিতেন। ইঁহাদের রথ অতি মনোহর ও অতি দ্রুতগামী ছিল। উপনিষদে ও সংহিতাভাগে ভূরি ভূরি রথের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। জনসমাজে যা বিশেষ প্রচলিত ছিল, উহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়া থাকে। রামায়ণে রঘুবংশীয় রাজাদের, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ভাস সম্ভবত পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের কবি, তিনিও তাঁহার স্বপ্নবাসবদত্ত-নামক নাটকে রথের বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস তাঁহার পরবর্তী কবি, এতদ্ব্যতীত সেকালে রোম ও গ্রীস-বাসীরা রথ ব্যবহার করিতেন। দশাশ্ববাহিত রথে চড়িয়া শোভাযাত্রা-সহকারে রাজা যাত্রা করিতেছেন। বর্ণনা আছে রথগুলি কাষ্ঠনির্মিত, কারুকার্যমণ্ডিত চাকাগুলি লোহার ও অন্য কোন ধাতুর পাত দিয়া মুড়া থাকিত। যেগুলি যুদ্ধে ব্যবহার করা হইত সেগুলির চক্র সুতীক্ষ্ণ ছিল।

সর্বজন-আদৃত পবিত্র রথে লোকে তাহাদের অভীষ্ট দেবতাকে যে বহন করিয়া লইবে তাহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? তাহা হইতে অনুমান করা যায় রথযাত্রা প্রাচীন কালেও ছিল।

নেপালে বৈশাখ মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে ভৈরব ও ভৈরবীর রথযাত্রা এবং বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে কুমারী রথযাত্রা প্রসিদ্ধ, জৈনদের মধ্যেও এই রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। পূর্বে উজ্জয়িনীতে জৈনেরা উচ্চ আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন তীর্থঙ্করকে রথে বসাইয়া নগর পরিভ্রমণ করাইতেন। অনেক বৌদ্ধক্ষেত্রেও বুদ্ধদেবের রথযাত্রা হইত। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ান ইহা দেখিয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা হিয়ান পাটলিপুত্রের রথযাত্রা-সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়াছেন।

ঐতিহাসিকদের মতে অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের পর সকলে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। শবররা পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। ত্রিরত্নের প্রতীক জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা। জগন্নাথ—বুদ্ধ, বলভদ্র—সংঘ, সুভদ্রা—ধর্ম। জগন্নাথ-নামের মূলে বুদ্ধ আছেন। বৌদ্ধেরা ধর্মকে নারামূর্তি বলিয়া অভিহিত করেন। ভাই-ভগিনীর মত সংঘের সম্পর্ক থাকায় বলভদ্র সংঘ। বৌদ্ধধর্মে যেমন জাতিভেদ নাই তেমনি জগন্নাথ-মহাপ্রসাদেও জাতিভেদ নাই। উহা যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হন্টর সাহেব বলেন, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা বৌদ্ধদের দ্বারা অনুষ্ঠিত দন্ত-উৎসবের নকল।

জাপানে ত্রিরত্নের রথযাত্রা প্রচলিত। ইহা উহার সাদৃশ্য বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ফগু`সন সাহেব বলেন, বুদ্ধদেবের জন্ম ও নির্বাণের দিন বৈশাখী পূর্ণিমা; বৌদ্ধেরা ঐ দিনে বুদ্ধের দেহাবশেষ রথে রাখিয়া রথযাত্রা করিয়া থাকেন। ইহা উহারই অনুকরণ। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ঐরূপ মতপোষণ করেন। যাহা হউক, দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের লীলা চলিতেছে, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সহস্র সহস্র লোক জীবন ধন্য করিয়াছে, কত ধর্মশাস্ত্র ও কাব্য রচিত হইয়াছে।

এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কত ধর্মের উত্থান-পতন হইয়াছে। কত রাজার রাজ্যশাসন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, পুনরায় লুপ্ত হইয়াছে, কত বড় বড় দিগবিজয়ী সম্রাট কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে উহার সমস্তই জগন্নাথদেব সাক্ষ্য দিতেছেন।

হে প্রভু, হে সাক্ষিন্, তুমি সকলের মঙ্গল কর, তুমি সকলকে ধর্মে মতি দাও।

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে—ইহাই প্রার্থনা।

ও তৎ সৎ।

বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মানুষের অন্তরের গভীরে রয়েছে অমৃতের জন্যে পিপাসা, অনন্তের জন্যে কান্না। হাসির ছটা—সে তো বাহিরের। 'অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কান্না ধন।' হাসি-ঠাট্টা, আমোদ প্রমোদ, নৃত্য-গীত, পান-ভোজন—সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়ে মানুষ নিঃশব্দে চলেছে মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি হতাশাকে বহন ক'রে। এই প্রচ্ছন্ন বেদনার কথা কোন স্বামী বলে না তার স্ত্রীকে, কোন স্ত্রী বলে না তার স্বামীকে। বন্ধু বন্ধুর কাছে উদ্ঘাটিত করে না তার নিঃসঙ্গ হৃদয়ের এই ব্যথাকে। সত্য সত্যই আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে দুটো মানুষ। একটা মানুষ বাহিরের জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে, মেনে চলেছে তার আইনকানুন। কায়দা-দুরস্ত তার মুখে লেগে আছে দেঁতো হাসি, তার পোষাক-পরিচ্ছদ নিখুঁত, চায়ের টেবিলে সে হাস্যময়, জর্জেট সাড়ীতে আর রিবনে সুসজ্জিতা সে মনোহারিণী। দ্বিতীয় মানুষটি কিন্তু নিঃসঙ্গ এবং মৌনী। কামনার মৃত্যুজালে আবদ্ধ সে কাঁদছে মুক্তির জন্যে। সে বল্‌ছেঃ দরকার নেই আমার কিছুতে। আমার দরকার শুধু তাঁকে যিনি আমাকে উত্তীর্ণ ক'রে দেবেন মৃত্যু থেকে অমৃতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, যা অধ্রুব তার মোহ থেকে যা ধ্রুব তারই শাশ্বত আনন্দের মধ্যে। মানুষের এই spiritual nature সকল সংশয়ের উর্ধ্বে।

ব্যথাতুর মানুষের কাছে এই চিরন্তন আনন্দ-লোকের বার্তা বহন ক'রে আনলেন রামকৃষ্ণ। পুরাকালের ঋষি অন্তরের মধ্যে জ্যোতির্ময় সেই পরমপুরুষকে দর্শন করে উল্লাসে ঘোষণা করেছেনঃ

'শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো—অন্য পথ নাহি।

তপোবনের সেই ঋষির মতোই রামকৃষ্ণ পরমহংস জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথকে বললেনঃ 'আমি ঈশ্বরদর্শন

করিয়াছি।' শুধু তাই নয়, তিনি আরও বললেন: 'আমি তোমাকে তাঁহার দর্শন লাভ করিবার পথ দেখাইযা দিব।' উত্তরকালে স্বীয় জীবনের এই অমূল্য অভিজ্ঞতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন:

> বালকবয়সে এ কলিকাতাশহরে আমি ধর্মান্বেষণে এখানে ওখানে ঘুরিতাম আর খুব বড় বড় বক্তৃতা শুনিবার পর বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিযাছেন? ঈশ্বরদর্শনের কথায় সে ব্যক্তি চমকিয়া উঠিত, আর একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছি।

ধর্ম বাহ্য অনুষ্ঠান নয়, ধর্ম কোন মতবিশেষে বিশ্বাসও নয়। ধর্মের অর্থ প্রত্যক্ষানুভূতি। বিবেকানন্দের ভাষায় 'তাহাই ধর্ম যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎকার করায়; আর এই ধর্ম সকলেরই জন্য।' ঈশ্বরলাভের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ধর্মশাস্ত্রের ও সাহিত্যের পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে। যাঁরা সেই বর্ণনার সঙ্গে পরিচিত তেমন পণ্ডিতেরও অভাব নেই। কিন্তু সুদুর্লভ সেই পুরুষ যিনি অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার করেছেন, সর্বভূতে তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

যাঁরা ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছেন—রামকৃষ্ণ সেই সুদুর্লভ পুরুষদেরই অন্যতম। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। ঠাকুর দুধ খেয়েছিলেন। কথামৃতের প্রত্যেক খণ্ডে এই দুধ খাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা আছে।

কি ক'রে তাঁকে দর্শন করা যায়? পাণ্ডিত্যের দ্বারা? বিচারের দ্বারা? ঠাকুর অকুণ্ঠভাষায় বললেন, তাঁকে পাণ্ডিত্যদ্বারা বিচার ক'রে জানা যায় না। বললেন, 'শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না—তাঁকে ডাকতে হয়।' আমাদের দেশের ঋষিরা অনেক আগেই বলেছিলেন: নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। অধিক বাক্যব্যয়ের দ্বারা অথবা কেবল বুদ্ধিবলে বা অনেক শাস্ত্রপাঠের দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না।

কিন্তু ব্যাকুল হয়ে যাঁকে ডাকবো—তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়? ঠাকুর বললেন: বিশ্বাস আর ভক্তি চাই। সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম তিনি আছেনই আছেন—এই জীবন্ত বিশ্বাস। এই যুগে—বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্যের এই বৈজ্ঞানিক যুগে আর একজন বিরাট মানুষ বিশ্বাসকে দিলেন তার প্রাপ্য মর্যাদা। আমি প্রথিতযশা মার্কিন্ দার্শনিক উইলিয়াম জেমসের (William James) কথা বলছি। জেম্সের The Will to Believe নামক যুগান্তকারী প্রবন্ধ বিংশশতাব্দীর দুনিয়াকে চলার পথে নূতন আলো দিয়েছে সন্দেহ নেই। এই প্রবন্ধে জেম্স্ বললেন: সত্যান্বেষণে বেরিয়েছে যারা তাদের দুটো নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। সত্যে বিশ্বাস করো, আর মিথ্যা থেকে দূরে থাকো। এ দুটোর মধ্যে আমরা সত্যান্বেষণকে প্রাধান্য দিতে পারি অথবা বলতে পারি: সত্য পাই আর না পাই ভুল করা কিছুতেই চলবে না। জেম্স্ বললেন: Better risk loss of truth than chance of error—অবিশ্বাসীর এই দৃষ্টিভঙ্গিমার মধ্যে আছে ভীরুমনের পরিচয়। বললেন, পাছে মিথ্যায় বিশ্বাস ক'রে ঠকি—এ ঠকার ভয় আমারও আছে। কিন্তু ঠকার চেয়েও বড়ো বিপদ পৃথিবীতে আছে। আমাদের ভুলগুলোকে এত ভয়াবহ ক'রে দেখবার দরকার কি? এ পৃথিবীতে যত সাবধানই আমরা হইনে কেন, ভুল করবোই। কোন সেনাপতি যদি তার বাহিনীকে বলে: আঘাতকে এড়িয়ে চলতেই হবে, তার জন্য যুদ্ধ থেকে যদি দূরে থাকতে হয় দূরে থাকতে হবে—তবে সেই সেনাপতিকে আমরা কি বলবো? বলবো: আঘাতের ভয়ে যুদ্ধকে যারা এড়িয়ে চলে তারা কখনও শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করতে পারে না। বিপদকে যারা ভয় করে তারা প্রকৃতিকেও কি জয় করতে

পারে? যারা বলছে বস্তুর অস্তিত্বের সঠিক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত পাদমেকং ন গচ্ছামি তারা কোন দিনই কোন বড় জিনিস আবিষ্কার করেনি; তারা তীরে বসে শুধু লাভক্ষতির হিসাব কষেছে, আর ঠকেছে। যারা বলেছে 'ফাল্গুনীর' বাউলের ভাষায় 'আমরা পথের বিচার করিনি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি' তারাই যুগে যুগে আবিষ্কার করেছে সত্যকে, ললাটে পরেছে জয়লক্ষ্মীর মালা। তাই জেমস্ বললেন: ভুল করার ভয়কে এতখানি প্রাধান্য দেওয়ার চাইতে মনের খানিকটা বে-পরোয়াভাব ভালো।

কোন্ শাপে কোন গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙ্গায় থাকবো বসে' —

এইবলে যারা অজানা সমুদ্রে তরী ভাসালো একটা জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রেরণায় সেই বে পরোয়া বে-হিসিবী কলম্বাসের দল আবিষ্কার করেছে নবনব সত্য। কলম্বাসের সামনে সেদিন ছিল কূলহীন পথহীন মহাসিন্ধুর ফেনিল ঊর্মিরাশি। জলপথে ঈপ্সিত দেশে পৌছানো যাবে—এমন কোন objective evidence ছিল না কলম্বাসের সামনে। কলম্বাস কিন্তু প্রমাণের অপেক্ষায় তীরে বসে থাকলেন না। তিনি যদি ভাবতে বসতেন ভাবনার কল-কিনারা পেতেন না। ভাবতে ভাবতেই তাঁর জীবন কেটে যেতো। ভিতর থেকে কে যেন বললে, বেরিয়ে পড় অজানা পথে আর সেই অন্তরের ডাক শুনে কলম্বাস বেরিয়ে পড়লেন। সর্বনাশের আশঙ্কা ষোলো আনা ছিল কিন্তু সে আশঙ্কায় তিনি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন না। বিশ্বাস ক'রে অজানার বুকে ঝাঁপ দিয়ে ঠকার ভয় নিশ্চয়ই আছে; জাহাজ খোয়ানোর, প্রাণ খোয়ানোর, সর্বস্ব খোয়ানোর ভয়। কিন্তু অজানাকে অবিশ্বাস ক'রে, ভয় ক'রে ঠকার আশঙ্কাও কি নেই? জেমস্ বললেন, Dupery for dupery, what proof is there that dupery through hope is so much worse than dupery through fear? অবিশ্বাস ক'রে ঠকা আর আশা ক'রে ঠকা, এ দুয়ের মধ্যে আশা ক'রে ঠকার বিড়ম্বনা যে বেশী এর প্রমাণ কোথায়? যাকে বিয়ে করে ঘরে আনবো সে গৃহলক্ষ্মী হবেই —এ নিশ্চয়তা ভিন্ন যে বিয়ে করতে রাজী নয় তার আইবুড়ো নাম ঘুচবার নয়।

ঈশ্বর আছেন বাইরে এর কোন প্রমাণ নেই। তর্কের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না। তিনি আছেনই এই বিশ্বাস নিয়ে তাঁর দিকে চলতে হবে। প্রমাণ না পেলে তাঁর দিকে যাবো না একথা বললে তাঁর আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। ঈশ্বরকে খুঁজতে যারা বেরিয়েছে তারা ডুবে থাকেনি পুঁথির মধ্যে, মেতে থাকেনি কামিনীকাঞ্চন নিয়ে। তারা সব পাওয়ার জন্যে সব ছেড়ে বেরিয়েছে মুক্ত পথের বুকে। তারা বলেছে —Sail forth—steer for the deep waters only. কূল আঁকড়ে থেকো না, অকূলে ভাসিয়ে দাও তোমার তরী।

ইংরেজী লেখাপড়া শিখে আমাদের মন যখন শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছিল, হারিয়ে ফেলছিল দেবদেবীতে বিশ্বাস, বিচারবুদ্ধিকে দিচ্ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাধান্য, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার এই সংশয়-দোলায় ক্রমাগত দুলছিল ঘড়ির দোলকের মত, তখন ঠাকুর বললেন: বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। বললেন, 'তিনি সাকার কি কি নিরাকার সে কথা ভাববারই বা কি দরকার? নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বল্লেই হয়,—'হে ঈশ্বর, তুমি যে কেমন তাই আমায় দেখিয়ে দাও। তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন।' বললেন মাষ্টার এবং তাঁর সগোত্রদের ব্যঙ্গ ক'রে, 'শালগ্রাম তোমরা বুঝি মান না—ইংলিশম্যানরা মানে না।' ইংরেজদের প্রতিধ্বনি ক'রে যারা

বলছিল প্রতিমা-পূজা ক'রেই দেশটা জাহান্নামে গেল, ঠাকুর তাদের চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলেন। পাণ্ডিত্যাভিমানী তৎকালীন ইংরেজী লেখাপড়া-জানা যুবকেরা দেখলে এক ন্যাংটা ব্রাহ্মণ। ইংরেজীর সঙ্গে পরিচয় নেই বল্লে হয়। রসিকের চূড়ামণি। আনন্দময় পুরুষ—শুট্‌কে সাধু নয়। মুখে হাসি লেগেই আছে। নম্র, নির্মল, সরলতার প্রতিমূর্তি। বৃন্দাবনে থেকে যাচ্ছিলেন ; মা কাঁদবে, তাই সেজোবাবুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। করুণায় মন কত নরম। ন্যাংটা ব্রাহ্মণের ব্যক্তিত্বের অনির্বচনীয় আকর্ষণ কলেজে পড়া যুবকদের মনকে জয় ক'রে ফেলালো। শ্রদ্ধাহীন মনে শ্রদ্ধা ফিরে এলো। 'সুলক্ষণ শালগ্রাম,—বেশ চক্র থাকবে,—গোমুখী, আর আর সব লক্ষণ থাক্‌বে—তা হ'লে ভগবানের পূজা হয়।' ঠাকুরের একথায় নরেন্দ্র আগে বিশ্বাস করতে পারতো না। ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জাগলো। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন: 'নরেন্দ্র আগে মনের ভুল বলতো ; এখন সব মানছে।' মেকলে এবং তাঁর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত পাদ্রীসাহেবেরা দেশময় স্কুলকলেজ খুলে ভেবেছিল, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মারফতে দেশটাকে আস্তে আস্তে খ্রীষ্টান বানিয়ে দেবে। ঠাকুর এসে তাদের পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিলেন। যুব-সমাজকে মেকলে ধরেছিল ঢোঁড়ায় যেমন ব্যাঙ ধরে। ঠাকুর ধরলেন যেমন ক'রে জাত সাপে ব্যাঙ ধরে। সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান তরুণ চিত্তগুলি নিঃসংশয় হয়ে গেল। ঘুচে গেল তাদের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার। সংসারবন্ধন তাদের কাটলো। সাকার-নিরাকারের বাদানুবাদে ঠাকুর কোন একটা বিশেষ পক্ষ নিলেন না। বললেন, একটাতে বিশ্বাস থাকলে হ'ল। জোর দিলেন বিশ্বাসের দৃঢ়তার উপরে। বললেন, 'বিশ্বাস করো, সব হয়ে যাবে।' বিচারবুদ্ধির প্রাবল্যের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্যে উইলিয়াম জেমসের যে অভিযান, প্রাচ্যে ঠাকুরেরও সেই ঐতিহাসিক অভিযান। এই অভিযানের দরকার ছিল সত্যান্বেষণের ব্যাপারে বিচারবুদ্ধির উদ্ধত দাবীকে একটা সীমার মধ্যে সংযত রাখবার জন্যে। এই অভিযানের প্রয়োজন ছিল সত্য আবিষ্কারের ব্যাপারে বিশ্বাসের বিপুল প্রয়োজনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে।

কিন্তু ঈশ্বর আছেন, তাঁকে পেলে হাঁড়ির মাছ যেন গঙ্গায় তলিয়ে যায়—এই জানাই তো সব নয়। 'সিদ্ধি খেলে নেশা হয়, আর আনন্দ হয়। তুমি খেলে না, কিছু করলে না। বসে বসে বলছো 'সিদ্ধি সিদ্ধি'। তা হলে কি নেশা হয়, আনন্দ হয়? ঠাকুর বললেন সাধনের কথা। কাঠে অগ্নি আছে, আগুনে ভাত রাঁধা হয়—এই বিশ্বাস ও জ্ঞান ভাত তৈরীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাঠে কাঠে ঘসতে হয়, তবে আগুন বেরোয়। ঠাকুর বললেন পুরুষকার চাই, খুব রোখ চাই। মিছরির রুটী সিধে ক'রে খাবো, না আড় ক'রে খাবো —এই নিয়ে মাথা ঘামাতে তিনি বারণ করলেন। বললেন, যেমন করেই খাও মিষ্ট লাগবে। দরকার পথে চলা। দরকার সাধন।

এইখানে আসে ব্যাকুলতার কথা। ঈশ্বরের মধ্যে জীবনের সমস্ত আনন্দ আছে, ঈশ্বর-দর্শন হ'লে রমণ-সুখের কোটীগুণ আনন্দ হয়। মগজের বুদ্ধির কাছে এ সবই সত্য। কিন্তু তাঁকে দেখবার জন্যে প্রাণ দুলে ওঠে কৈ? সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যে অন্তরের মধ্যে সে ব্যাকুলতা কই? ঈশ্বর না থাকলে, ঈশ্বরকে না পেলে প্রাণে বাঁচবো না—এ পাগলামি কই? ঠাকুর বললেন, 'ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হ'তে হয়।' তিনি বললেন, 'ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হোলো। তার পর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন।' 'মা যেমন ছেলেকে ভালোবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালোবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয়কে ভালোবাসে। এই তিন জনের ভালোবাসা,

এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয় ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শনলাভ হয়।' এই ভালোবাসা, এই টান, এই অনুরাগই হোলো সকলের বড়ো কথা। নারদীয়ভক্তি-সূত্রে আছে—ওঁ তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাম্। ভক্তিরই সাধনা কর। মগজ দিয়ে কোন কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করা এমন কিছু কঠিন হয়। কিন্তু মগজের জ্ঞান প্রাণকে যদি দোলাতে না পারে, হৃদয়কে যদি নাচাতে না পারে—মানুষ জোর পাবে না ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাবার। কর্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপে' কে কবে জীবনকে নিঃশেষে বলি দিতে পেরেছে সত্যের বেদীমূলে? কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী ঠিকই বলেছিলেন: 'বুদ্ধিবৃত্তি বিচারশক্তি খুব ভালো জিনিস হইতে পারে; কিন্তু উহা বেশীদূর যাইতে পারে না। ভাবের ভিতর দিয়াই গভীরতম রহস্যসম্পদ উদ্‌ঘাটিত হয়।' মীরাবেনকে চিঠিতে গান্ধীজী বল্‌লেন: Any truth received by the brain must immediately be sent down to the heart.'

কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে মরিয়া হওয়া যায় কেমন ক'রে? সব পাওয়ার জন্যে সব হারাবার পাগলামিকে রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার উপায় কি? মনের মধ্যে ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুলতা জাগানোর পথ কোথায়? 'কামিনীকাঞ্চনের জন্যে পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, তাঁর জন্য একটু পাগল হও।' হায়! ঈশ্বরের জন্যে এই পাগল হ'তে পারাটাই যে সব চেয়ে মুশকিল। আমাদের মূলব্যাধি তো বাতব্যাধি। আমরা spiritually rheumatic. আমাদের জড়তা আত্মার মজ্জায় মজ্জায়। আমরা তীরে তীরেই তরী বাইতে ভালোবাসি; অকূলের ডাকে তুফানের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ভরসা পাইনে। এ আড়ষ্টতা, এ আলস্য, এ আরামপ্রিয়তা—এদের জয় করবার উপায় কি? এ প্রশ্নের জবাবে Imitation of Christ এর লেখক বললেন: 'ঈশ্বরের দিকে মুখ ফেরালে সমস্ত জড়তাকে পরিহার ক'রে নব জন্ম লাভ করা যায়। লোহা আগুনে পুড়লে তবে তার মরচে চলে যায়। ঈশ্বরচিন্তার আগুনের মধ্যে মন-লোহাকে ফেলতে হবে। তবে জড়তা যাবে, তবে জীবনে রূপান্তর আস্‌বে।' ঠাকুর বললেন: অভ্যাসযোগ। রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। এক দিনে হয় না। রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে।'

ঈশ্বর-লাভের কোন সহজ পথ আমাদিগকে তিনি দেখিয়ে দেন নি। মন্দ বৈরাগ্য নয়, তীব্র বৈরাগ্যের কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন চিত্তশুদ্ধির কথা, তিনি বলেছেন নির্জন বাসের কথা, তিনি বলেছেন কামিনীকাঞ্চন-রসে মন ভিজে থাকলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় না। ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকবো, নির্জনে তাঁকে ডাকবো না, কম করবো না—এতে কখনো বস্তুলাভ হবে না। বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। আর এই ব্যাকুলতার জন্যে প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি, বিষয়াসক্তি থেকে মুক্তি। আর মন থেকে বিষয়রস শুকিয়ে ফেলবার উপায় নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা। মহিমাচরণকে ঠাকুর বলেছিলেন: 'ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ ক'রে বসে থাকবেন! মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো।' এই সাধনের কথাই আধ্যাত্মিকতার চরম কথা। রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গে' শচীশের মুখ দিয়ে বলেছেন: 'আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন, যদি তাঁহাকে পাই তো আমিই তাঁহাকে পাইবো, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ। মার্কিন কবি হুইটম্যানের কণ্ঠেও একই কথা:

> Not I, not any one else can travel
> that road for you,
> You must travel it for yourself.

শচীশের সেই কথা—'আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না।'

ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতির ব্যাপার, আর এই অনুভূতি সম্ভব পুরুষকারের রাস্তায়। সাধনকে এড়িয়ে গিয়ে ঈশ্বরলাভ অসম্ভব। আর এই সাধন বলতে ঠাকুর বারংবার বলেছেন নির্জনতা আর প্রার্থনা। নিজনতা আর প্রার্থনাকে বাদ দিয়ে আর সব হ'তে পারে কিন্তু ব্যাকুলতা আসবে না, আর ব্যাকুলতা ভিন্ন ঈশ্বর-দর্শন অসম্ভব।

আমরা বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বিশ্বাসকে উপেক্ষা করতে বসেছিলাম। ঠাকুর বিশ্বাসকে মূল্য দিলেন। আমরা বলছিলাম গুরুর কৃপা হ'লে ঈশ্বরকে সহজেই পাওয়া যায়। ঠাকুর বললেন, বৈরাগ্যের কঠিন পথেই ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব; ভোগের রাস্তায় যোগ সম্ভব নয়। যে ঘরে 'আচার তেঁতুল সে ঘরে বিকারের রোগী থাকলে রোগ কোন কালেই সারবে না।' আর একটা কথা ঠাকুর বললেন: 'সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছে সকলি আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।' তিনি শেখালেন প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে। ভেদ-বুদ্ধিতে দেশের আবহাওয়া ছিল বিষাক্ত। তিনি উচ্চারণ করলেন ঐক্যমন্ত্র। যেখানে ঘৃণা ছিল সেখানে এলো প্রেম; যেখানে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা ছিল সেখানে এলো হৃদয়ের উদারতা। ঐক্যের মতো বৈচিত্র্যও যে পরম সত্য—এ কথা ঠাকুর যেমন ক'রে বোঝালেন এমন ক'রে আর কে বোঝাতে পারতো? জীবন উপনিষদের জীবন্ত ভাষ্যরূপ ছিলো বলেই এমন ক'রে যুগকে প্রভাবিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

মাতৃমন্ত্র

শ্রীমতী আলোরাণী নাগ

শিশু যবে জন্ম লয় ধরাবক্ষ তলে
কাঁদে সে মায়েরে খুঁজি
ভীত অশ্রুজলে
জীবনে প্রথম বাণী তার
সেই মাতৃমন্ত্র নাম।
অসহায় শৈশবের একান্ত আশ্রয়
মধুক্ষরা আঁখিযুগ,
স্নেহমাখা করতলদ্বয়।
সন্তানের চিরশান্তি মাতৃ-অঙ্ক-পাশ
কোনো সন্দেহের সেথা নাহি অবকাশ।

তুমি চিরশিশু
মায়ে ছাড়িলে না কভু; জীবন ব্যাপিয়া
রহিলে সে স্নেহক্রোড়ে।
মনপ্রাণ দিয়া
মাতারে পূজিলে তুমি সমস্ত জীবন।
বিশ্বমায়ে মাতা বলি তুলি নিলে মাথে
আপন জননী, জায়া, স্নেহ-পরিজনে
জানিলে একত্রীভূত বিশ্বমাতা সাথে।
বিশ্বাস-উচ্ছ্বাসে
শ্যামারে আনিলে টানি ধরাবক্ষপাশে।
তুমি চিরপূজনীয় ভগবান রামকৃষ্ণদেব।

পুণ্য গয়াধামে ছাড়ি মৌন শিলাপট
মূর্ত হলে নররূপে, ধন্য করি বঙ্গভূমি তট।
স্নিগ্ধ করি পবিত্র সুন্দর!
পুণ্য তব কল্যাণ সৌরভে
নত নেত্রে এলো তব পাদপীঠ-তলে,
দশদিক হতে জন সবে।
সবাকারে দিলে মহামাতৃমন্ত্র নাম;
হয়ে সিদ্ধকাম
শান্তি পেলো আর্তজন তব পদযুগে
লভিল আশ্রয়।

পশ্চিম পৃথিবী এলো ছুটি।
হানাহানি, মারণাস্ত্র, দ্বন্দ্ব ফেলি উঠি
এলো তব পদতলে।
তব তরে তার আত্মনিবেদন রাজে
'নিবেদিতা' ভগিনীর মাঝে।

আজিও তোমারই দয়া মাতৃসঙ্কীর্তন
আঁকড়িয়া আছে কতজন,
ভরিতেছে বিশ্বলোক
মাতৃমন্ত্রে করিয়া সহায়।

বিশ্ব আজো গায়
তোমার মহিমাগাথা।

অসংখ্য মানবে তুমি তরিলে জীবনে
অগণিত কতজন শান্তি পেল মনে
তব মাতৃ-মন্ত্র নামে।

জগতের গুরু তুমি নব-অবতার
অপরূপ সুমহান কল্যাণ-আধার।

জানাইনু তোমারে প্রণতি
তুমি চিরবন্দনীয় ভগবান রামকৃষ্ণদেব !

স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, এম্-এ

শোপেনহাওয়ার নারীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেনঃ She pays the debt of life not by what she does, but by what she suffers.' স্বামী বিবেকানন্দ স্ত্রীজাতির উদ্দেশ্যে বলিয়াছেনঃ তোমাদের আদর্শ সীতা। সীতা সহনশীলতার অপূর্ব প্রতিমূর্তি। এই সহনশীলতা সীতার জীবনে যে অসামান্য শক্তি ও মাধুর্য আনিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। সীতার জীবন এক বেদনা-বিধুর, শুচি-শুভ্র অপরূপ আলেখ্য। ভারতের সকল শ্রুতি ও স্মৃতি যদি কোন দিন অবলুপ্ত হইয়া যায় তবুও শুধু সীতার পুণ্য জীবন-কাহিনী হইতে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করিবার অপরিমেয় ঐশ্বর্য থাকিবে। সীতার জীবনের প্রতিটি কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সত্য কিনা সে-প্রশ্ন বড় প্রশ্ন নয়। আসল কথা, সীতা আমাদের নারীজীবনের চরম আদর্শ। তিনি প্রেম ও শুচিতার অখণ্ড মূর্তি; জীবনে অশেষ দুঃখ সহ্য করিয়াও তিনি কাহারও দুঃখের কারণ হন নাই।

বিদেশে নারীজাতির আচার-ব্যবহার স্বামীজীকে অত্যন্ত ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। স্বামীজী মনে করিতেন পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীলোক আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সেখানে নারীর জীবন বহির্মুখী; পুরুষের সঙ্গে তাহাদের প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে অশোভন ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া দেখা দিয়াছে। আফিসে, বাজারে, স্কুলে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিতে গিয়া নারীর জীবনে যে ত্রুটি ঘটিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। এই অহিতকর প্রতিযোগিতার ফলে নারী তাহার মাধুর্য হারাইয়াছে, শালীনতা-বোধ ও জীবনের মূল্যবোধকে অনেক ক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়াছে।

পুরুষের তুলনায় নারী বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, কর্ম-শক্তিতে হীন এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রতিকূল পরিবেশের ফলেই আমরা এই ধারণা পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। স্বার্থান্বেষী পুরুষের চক্রান্তের ফলেই স্ত্রীজাতি কোন কোন যুগে অনাদরের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। স্বামীজী মালাবার পরিক্রমার

সময় দেখিয়াছেন যে সেখানে স্ত্রীজাতি পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী প্রগতিশীল, তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান সুগভীর, বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ এবং কর্মশক্তি অতুলনীয়। ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করিয়া স্বামীজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে অবনতির যুগে ভারতের কুচক্রী পুরোহিতগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণেতর জাতিকে বেদাধ্যয়ন হইতে বঞ্চিত করেন এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকের বেদপাঠে অধিকারও অস্বীকার করেন। অথচ আমাদেরই শাস্ত্রে আমরা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ও গার্গীর উপাখ্যান দেখি যাহারা ব্রহ্মবিদ্যায় পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

স্বামীজীর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা বা আত্মিক শক্তিকে বিকশিত করা। এই কথা পুরুষের সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য নারীর সম্বন্ধেও তেমনি। যিনি পরাবিদ্যা লাভ করিয়াছেন তাঁহার দৃষ্টিতে স্ত্রীপুরুষে কোন ভেদ নাই। শিক্ষার লক্ষ্য পরাবিদ্যা লাভ করা এবং স্ত্রী-পুরুষে বিভেদ কল্পনা করা এই লক্ষ্যের পরিপন্থী। শক্তিপূজার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য স্বামীজী জাতিকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং এই কথাই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যিনি ঈশ্বরের সর্বব্যাপী শক্তিকে নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন তাঁহার শক্তিপূজা সার্থক। ভারতের উন্নতি করিতে হইলে সর্বাগ্রে স্ত্রীজাতির উন্নতি করিতে হইবে। এবিষয়ে স্বামীজীর মত স্পষ্ট ও সুদৃঢ়। "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা:" এই শাস্ত্রবাক্য স্বামীজী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে বলিয়াছেন। স্ত্রী-লোকের জীবনের নানাবিধ সমস্যা তাঁহারা নিজেরাই সমাধান করিবেন ইহাই স্বামীজীর সুচিন্তিত অভিমত। স্বামীজীর প্রসিদ্ধ উক্তি, "আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই, স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী"—এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সোপান শুচিতা। শুচিতা ভারতীয় নারীর পরিপূর্ণ সত্তার মধ্যে নিহিত, অস্থিমজ্জার সঙ্গে বিজড়িত। কাজেই শুচিতার উদ্বোধন করিয়া শিক্ষার সূচনা করিতে হইবে। শুচিতা হইতে নারীর জীবনে আসিবে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় হইল শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। নারীর শিক্ষণীয় বিষয়গুলি, স্বামীজীর মতে হইল, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, চারুশিল্প, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, রন্ধন, সীবন ও স্বাস্থ্য। এই বিষয়গুলির মধ্যে উপন্যাসের স্থান নাই। পূজাপদ্ধতি অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় সত্য, কিন্তু অন্ধভাবে ধর্মানুষ্ঠান, পূজা পার্বণ অনুসরণ করিলে চলিবে না, এই সকল ক্রিয়াকর্মের অন্তর্নিহিত সত্যটিকে মোহমুক্ত মন লইয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। আত্মিক স্বাধীনতা ব্যতীত শিক্ষা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, কাজেই মানুষের মনে, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির মনে, এই স্বাধীনতাবোধ জাগাইবার জন্য স্বামীজী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ সেবা ও আত্মিক শক্তির মহিমা যাহাতে নারীজাতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারে সেইজন্য স্বামীজী শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরাবাঈ প্রভৃতির অমর জীবনকাহিনীকে স্থান দিয়াছেন। অমূর্ত ভাবধারা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ জীবনকাহিনীর মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্র অনেক বেশী, সেইজন্যই এই পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নারীকে অসহায় ও দুর্বল করিয়া রাখিবার মত পাপ আর কিছুই নাই। সেইজন্য স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল দৈহিক শক্তিতে নারীজাতিকে শক্তিশালী করিয়া তোলা। এই কথা মনে রাখিয়া তিনি স্ত্রীজাতির সামনে ঝাঁসির রানী, রানী দুর্গাবতী, অহল্যাবাঈ, রানী রাসমণি, রানী ভবানীর জীবনাদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন।

স্বামীজী জাতির কাছে চাহিয়াছেন আদর্শ জননী—যাঁহারা হইবেন দৈহিক ও আত্মিক শক্তিতে শক্তিমতী, যাঁহাদের জীবনের ভিত্তি

পবিত্রতা, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা। এইরূপ জননীর কাছেই আদর্শ সন্তান আশা করা যাইতে পারে।

উনিশ শতকের মধ্য ও শেষ ভাগে ভারতের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখিয়া স্বামীজী কয়েকজন ব্রহ্মচারিণীর প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন—যাঁহারা ত্যাগ ও সেবাকে জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবেন, যাঁহাদের ধমনীতে থাকিবে শুচিতা ও আত্মিক শক্তির প্রবাহ। তাঁহারা বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাসের বিভিন্ন প্রস্থানে শিক্ষিতা হইবেন সত্য, কিন্তু সেই শিক্ষা তাঁহাদের স্বার্থের জন্য নহে; সে শিক্ষার বীজ ছড়াইয়া দিতে হইবে সমগ্র জাতির মধ্যে। শিক্ষাকে তাঁহারা ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিবেন।

স্বামীজী একথা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিতেন যে, নারী প্রকৃতই জগজ্জননীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি, যাহার অন্তর্নিহিত জ্ঞান, ভক্তি ও সেবা মানুষের মনে পরাজ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে, তাহার জীবনে শক্তি ও মাধুর্য আনিতে পারে। সেইজন্য স্বামীজী চাহিয়াছিলেন নারীজাতির জন্য মঠপ্রতিষ্ঠা করিতে; সেই মঠের সংলগ্ন বিদ্যালয়ে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। সে বিদ্যালয়ে বেদ, উপনিষদ্, সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, কিছু ইংরেজী সাহিত্য শিখাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। সেই সঙ্গে থাকিবে সীবন, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, শিশুলালন প্রভৃতি বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা। জপ, পূজা ও ধ্যান, শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকেরাই সম্পূর্ণভাবে বিদ্যালয় ও মঠ-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। মঠে পাঁচ ছয় বৎসর শিক্ষান্তে বালিকার ভার তাহার অভিভাবক গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাকে বিবাহ দিতে পারেন। যদি কোন বালিকা আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার অভিভাবকের অনুমতি লইয়া তাহাকে ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে দীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ত্যাগ, সেবা ও সংযম হইবে এই মঠের মূলমন্ত্র।

আধুনিক শিক্ষাবিদগণের সঙ্গে বিবেকানন্দের তুলনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও জন ডিউই উভয়েই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর জোর দিয়াছেন। শিক্ষার্থীর মর্যাদা-সম্বন্ধে উভয়েই সচেতন। স্বামীজী বহু বৎসর পূর্বে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক জাতি একটি ভাব (idea)কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে; কাজে কাজেই সকল শিক্ষার্থীকে এক ছাঁচে ঢালাই করা চলে না। স্বামীজীর মতে একটি জাতিকে যদি সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি বিশেষ সুরের সঙ্গে তুলনা করিতে হয়। স্বামীজীর আদর্শ সেইজন্য বহুর মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান করা; বহুর বহুত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা নয়।

রাসেল ও ডিউই উভয়েই শিক্ষার্থীর মন হইতে ভয় দূর করিবার কথা বলিয়াছেন। রাসেলের মতে ধর্মের মূলে ভয়, স্বামীজীর মতে ধর্মের মন্ত্রই অভয়। রাসেল কুসংস্কারগুলিকেই ধর্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন, স্বামীজী কুসংস্কারকে দূর করিয়া ধর্মের আসল রূপটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মিক সত্যে উদ্বুদ্ধ হইলে সকল ভয় বিদূরিত হইবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশ জড়বাদের উপর যতদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ততদিন তাহার কল্যাণ নাই—স্বামীজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে। জড়বিজ্ঞানের ধ্বংসের শক্তি তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু তাই বলিয়া পাঠ্যতালিকা হইতে বিজ্ঞানকে বাদ দেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এই ধারার অনুসরণ করিয়াই বলিয়াছেন বিজ্ঞানকে উপায়রূপেই দেখিতে হইবে, উদ্দেশ্যরূপে নয়। বিজ্ঞানকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া হৃদয়হীন বীক্ষণাগারে নির্বাসন দেওয়ার ফল শুভ হইবে না; উপায়কে উদ্দেশ্যের স্থানে বসাইলে আমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

স্ত্রীশিক্ষার যে আদর্শ স্বামীজী আমাদের সামনে তুলিয়াছেন তাহার মূলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণা রহিয়াছে। এক তার্কিকের প্রতি ঠাকুরের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা কর্তব্য ঃ "যদি এক কথায় বুঝতে পার ত আমার কাছে এস, আর খুব তর্কযুক্তি করে যদি বুঝতে চাও, ত কেশবের (কেশবচন্দ্র সেন) কাছে যাও।" এই "এক কথা"কে যদি আক্ষরিক অর্থে নিতে পারি তাহা হইলে বলা যায় যে এই কথাটি "মা"। শ্রীরামকৃষ্ণ এই একাক্ষর মন্ত্রের সাহায্যে অপূর্ব দিব্য জীবনের সন্ধান দেখাইলেন। স্বামীজী এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নারী-জীবনের যে আদর্শ উপস্থাপিত করিলেন, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র আদর্শ। নারীর মর্যাদা, নারীর শিক্ষা ও নানাবিধ উন্নয়নের জন্য স্বামীজী যে কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার মূল্য আজিকার যুগসংক্রান্তির ক্ষণে অপরিসীম। স্বামীজির এই উক্তি অবিস্মরণীয় ঃ "সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, নারীভাব সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"

কবীরবাণী

("কবীর কব সে ভয়ে বৈরাগী"—বাণীর অনুবাদ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

প্রশ্ন

আজিকে তোমারে শুধাই কবীর
কবে হতে তুমি হ'লে বৈরাগী,
তোমার যে প্রেম বল মোরে বল
ছড়াল কোথায় কাহার লাগি ?

উত্তর

বিশ্ব প্রকাশ ছিল না যখন
যখন ছিল না গুরু ও চেলা,
কিছুই তখন লভেনি প্রসার
পুরুষ একাকী করিত খেলা—
সেই কাল হতে সন্ন্যাসী আমি
শুন ওহে সাধু গোরখনাথ,
আমার সে প্রেম হয়েছে ধন্য
পরশি ব্রহ্মে দিবস রাত !
ব্রহ্মা যখন পরেনি কিরীট
অথবা বিষ্ণু তিলক ভালে,
শিব ও শকতি লভেনি জনম
শিখিনু যোগ সে অতীত কালে।
প্রকট আমি তো হলেম কাশীতে
চেতনা দিলেন শ্রীরামানন্দ—
অসীমের তৃষা অন্তরে ধরি
বহিয়া এনেছি মিলনানন্দ !
সহজে সহজে হইবে মিলন
উছল ভকতি জাগিবে প্রাণে,
শুন হে গোরখ—চলো আগাইয়া
অসীমের সেই চির আহ্বানে।

বেদ ও বর্তমান জীবন

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ, এম্-এ, বি-এল্, পিএইচ্-ডি

দেবানাং ভদ্রা সুমতির্ঋজুয়তাম্।
দেবানাং রাতিরভি নো নি বর্ততাম্।
দেবানাং সখ্যমুপ সেদিমা বয়ম্
দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে॥

দেবতাদের শুভ কল্যাণবুদ্ধি, ভদ্র সুমতি ঋজু ও সরল হযে প্রবাহিত হোক ; দেবতাদের আশীর্বাদ ও প্রীতি আমাদিগের পরিবেশ পরিপুষ্ট করুক। আমরা যেন দেবগণের সখ্য যাজ্ঞা করি—দেবতাবা আমাদের আয়ু অভিবর্ধন করুন, আমরা যেন বাঁচবার মতন বাচি।

অনেকে হয়ত অবাক্ হবেন, ভাববেন যে প্রাচীন গত হয়ে গেছে তার এই উজ্জীবনের বৃথা প্রযাস কেন? বেদকে যতই সম্মান আমাদের পিতৃপুরুষেরা দিন না কেন, তার কাছে পুরাতাত্ত্বিক কৌতূহল ছাড়া অন্য কিছু আশা করা বিফল।

আমি বলব— জলদগম্ভীরস্বরে বলব— তা নয়। বর্তমান জীবনের কলকোলাহল ও সংঘষের মাঝেও বেদ আমাদের দেবে চলবাব পথের পাথেয়—দেবে প্রেরণা—দেবে উৎসাহ—দেবে বিশ্বাস—দেবে অতন্দ্র কর্মেব বাণী—অমৃতের আশ্বাস—দিব্যজীবনের ছন্দ ও দেবজীবনের সৌরভ। সুলেখক লেভি তাঁর 'আধুনিক মানুষেব দর্শন' পুস্তকে বেশ সুন্দর কথা লিখেছেন—

"If philosophy does not illuminate the practice of ordinary life, we maintion it fails in is function. It must be something drawn from the world of human affairs and guiding it. To lead a philosophy in this way from the barren wilderness of speculation into the rough and tumble of action is more than to violate the traditional meaning of philosophy. To suggest that its truth be consciously and deliberately tested by human beings in the fire of practice is to demand that, like science, it stand or fall by its active meaning for man."

আমিও সেই কথা বলব—বেদ যদি শুধু রহস্য-ভাণ্ডাব হ'ত—যদি তাহা সাধারণ মানুষের সাধাবণ প্রয়োজনে না লাগত—তাহলে আমরা তাব আলোচনা কবতাম না।

তাই সর্বপ্রথম বলছি—বেদের বলিষ্ঠ জীবনবাদই তার মহিমময় বিশেষত্ব। আমাদেব দেশে অনেক সময় নৈষ্কর্ম্যকে ধর্মেব স্বরূপ মনে কবি। ভাবি মাযাময় এই সংসারকে পরিত্যাগ কবে হৃদয়কে আমরা যতই পরলোকপ্রবণ করব ততই আমরা অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ লাভ করব।

আমাদের বৈদিক পিতামহেরা এই ধরনেব 'পলায়নবাদ'কে আমল দেননি—তাঁরা এই সুন্দর পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠ হয়ে বাচতে চেয়েছেন। সেই সঞ্জীবন প্রাণবত্তাব জয়গান আজ দেশে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠুক নূতন দিনের সুরে—নূতন যুগের ভাষায়।

ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি
চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাম্
স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্॥

পরমাত্মা দিন আমাদের পরম ধন। দিন আমাদের চিত্তের দক্ষতা, দিন আমাদের সৌভাগ্য। দিন আমাদের পরিপূর্ণ পুষ্টি—তাঁর আশীর্বাদে আমাদের তনু হোক নিরাময—আমাদের বাক্ হোক স্বাদু ও

মধুময়—আমাদের প্রাত্যহিক দিনগুলি হোক উজ্জ্বল, সুখময় ও সুন্দর।

দিনগত পাপক্ষয় করে বৈতরণী পার হওয়ার আশা এ নয়। এ শুধু প্রাণধারণের গ্লানি নয়। এ হল আশাতুর সুখাতুর কর্মচঞ্চল উৎসাহদীপ্ত আনন্দময় দিবসযাপনের আকাঙ্ক্ষা।

এই কর্মসুন্দর দীর্ঘজীবনের প্রার্থনা তিনবেদেই আছে। ঋগ্বেদ শুধু শত শরৎ বাঁচবার প্রার্থনা করেছেন—যজুর্বেদে সেই প্রার্থনা নবতর ও মধুবতর হয়েছে—একশত শরৎ যে বাঁচব সেই একশত বৎসর চোখ দিয়ে ভাল করে দেখব—নূতন নূতন বাণী শুনব—নূতন নূতন কথা বলব—অদীন হয়ে মাথা উঁচু করে বীরের জীবনযাপন করব। অথর্ববেদ বলছেন :—

পশ্যেম শরদঃ শতম্॥
জীবেম শরদঃ শতম্॥
বুধ্যেম শরদঃ শতম্॥
রোহেম শরদঃ শতম্॥
পুষেম শরদঃ শতম্॥
ভবেম শরদঃ শতম্॥
ভূয়েম শরদঃ শতম্॥
ভূয়সী শরদঃ শতাৎ॥

শতোত্তর জীবন হোক আমাদের—সেই এক-শতের অধিক বৎসর আমরা যেন জীবন্মৃত হয়ে শরীরের ভার বয়ে না বেড়াই—আমাদের চাক্ষুষ ও মানস দৃষ্টিশক্তি যেন অভিবর্ধিত হয় দিনে দিনে—আমরা যেন প্রাচুর্য ও মাধুর্যে বেড়ে চলি। যদি বসে থাকি তবে আর বাঁচা কিসের—রোজ রোজ নূতন কিছু জানব ও নূতন কিছু শিখব। দিনে দিনে উর্ধ্বাভিসারের পথে হোক আমার আরোহণ—প্রত্যহই হোক আমার পরম পুষ্টি—যে পুষ্টি নবতর সম্পদে দিনে দিনে সমৃদ্ধ ও দীপ্ত হয়ে উঠছে। আমার এই দীর্ঘজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকব ও শুধুই বেড়ে চলব—অগ্রগতির পথে হবে প্রাত্যহিক অভিযান।

অনুভূতির পথে অনন্ত অভ্যুদয়—এই ছিল তাঁহাদের কামনা, তাই আমাদের পিতামহেরা এমন এক চমৎকার কবিতা লিখেছেন যাহা ভাবের গভীরতায়, অভিব্যঞ্জনায় অতুলনীয়।

চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনূভ্যঃ।
সংবেদং বিচ পশ্যেম॥

হে জ্যোতির্ময় দেবতা, হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাদের ছুটি চোখে দাও দৃষ্টিশক্তি—তোমার এই বিপুল বিশ্বের অতি বিপুল মহিমা আনন্দ ও উল্লাসে দেখব। কিন্তু শুধু ছুটি চোখ ত তোমার বিশ্বজোড়া মাধুরী দেখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়—তাই দাও সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দৃষ্টিশক্তি—আমি দেখব, সমগ্রতার সম্যগ দর্শনও চাই, আবার বিশ্লেষণ চাই—যা কিছু দেখা তাকে তাই সমন্বয় ও বিশ্লেষণের মাঝে পরিপূর্ণ করে যেন দেখি।

বৈদিক জীবনবাদ কিন্তু শুধু বাঁচবার জন্য নয়, পৌরুষের আস্বাদনেও ঝঙ্কৃত। তাঁহারা বলদাতা ইন্দ্রের নিকট বল প্রার্থনা করতেন, বীর্যবান ও বলবান হয়ে লোকোত্তর জীবনযাপন করতে চাইতেন।

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।

আমি এই পৃথিবীতে সকলের শ্রেষ্ঠ হব—মর্যাদায় আমি চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকব। অকাল মৃত্যুকে তাঁরা ঘৃণা করতেন—শত শরৎ সবল ও আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু তাঁহাদের ঈপ্সিত ছিল। অজর হয়ে অতন্দ্র কর্ম করে মনুষ্যত্বকে ফোটাবার জন্যই ছিল তাঁহাদের সাধনা।

ভারতবর্ষ সব চেয়ে দরিদ্র দেশ। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের একান্ত অভাব। এই অভাবের মাঝে প্রাচুর্য আনতে পারে একমাত্র অদম্য অধ্যবসায়, শ্রান্তিবিহীন কর্ম। কিন্তু বৃটিশের হাতে গড়া অদ্ভুত আমলাতন্ত্র সাতবৎসরেই ধ্বংস হয়ে

গেছে বলা চলে। সর্বত্রই সরকারী ঔদাসীন্য ও অকর্মণ্যতার পরিচয়।

আমাদের জনপ্রিয় নেতৃগণের উচিত ছিল—সবাইকে আহ্বান করে মহাভারত গড়বার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে—আট ঘণ্টার স্থানে ১৬ ঘণ্টা খাটতে; কিন্তু তা হয়নি। দেশের সমূহ ক্ষতি করে ডাকঘরের কাজ একদিন বন্ধ করা হয়েছে—ফলে জাতীয় জীবনে বহুকোটী টাকার লোকসান ঘটছে। প্রত্যেক সরকারী কর্মচারী দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করবে এই ভরসার স্থলে দেখছি একজনের স্থলে তিনজন লোক এসেছে—কিন্তু কাজ আদৌ হচ্ছে না। সর্বত্রই অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা। তাসের প্রাসাদের মত আমাদের স্বাধীনতা যাতে ধূলিসাৎ না হয়, তার জন্য অনবসর কর্মের প্রয়োজন। বেদ তারস্বরে এই কথাই ঘোষণা করেছেন:

ত্রাতারো দেবা অধি বোচতা নো
মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ।
বয়ং সোমস্য বিশ্বহ প্রিয়াসঃ
সুবীরাসো বিদথমা বদেম॥

প্রগাথ কাণ্ব বলছেন:—হে পরিত্রাণকারী দেবগণ, তোমাদের গভীর আশীর্বাদে আমাদের ধন্য কর, আমরা যেন নিদ্রা ও গালগল্পে সময় না অপব্যয় করি। আমরা যেন সোমদেবতার প্রিয় হয়ে, সুবীর হয়ে সভাতে সুকর্ম আলোচনা করি, সুব্রতের পরিকল্পনা করি।

দেবতারা অলসকে ক্ষমা করেন না।

ইচ্ছন্তি দেবা সুন্বন্তম্
ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি।
যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ॥

দেবতারা যাজ্ঞিককে প্রীতি করেন—যাহার কর্ম লোকসেবায় ও জগৎসেবায় নিয়োজিত তাহাকেই তাঁহারা ইচ্ছা করেন, স্বপ্নালু ও তন্দ্রালুকে তাঁহারা ভালবাসেন না। দেবতারা অতন্দ্র, তাই যাহারা প্রমাদকারী তাহাদিগকে তাঁহারা শাসন করেন। গীতাতেও সর্বোত্তম বেদব্যাখ্যাতা পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা মানুষের মৃত্যুর কারণ।

বেদ মানুষকে ভ্রান্তি হতে জাগতে বলছেন। অনবধান হয়ে বিমূঢ় হয়ে থাকলে ধর্মলাভ হয় না—বলা যেতে পারে কিছুই লাভ হতে পারে না। শ্রান্তিহীন কর্ম, বিরামবিহীন উদ্যোগে ভারতবর্ষ আবার বেদধর্মে উদ্বুদ্ধ হোক, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।

ন ঋতে শ্রান্তস্য সখায় দেবাঃ—দেবতারা পথিকেরই বন্ধু, যাত্রীরই নিভরস্থল—কর্মে যে শ্রান্ত নয়, ঘর্মজলে যার দেহ সিক্ত নয়, সে দেবতাদের সখ্য আশা করতে পারে না।

তাই আজ তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে আহ্বান করি—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।—ওঠো, জাগো—তোমাদের পাওনা যে ঐশ্বর্য সেই মহান সম্পদে ধনী হয়ে ওঠো। অশ্রান্ত কর্ম ভগবান নিজেই করছেন—

পশ্য সূর্যস্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্ চরৈবেতি। চলার মন্ত্রে আজ দেশ সবল হোক। আকাশে সূর্যের গতি লক্ষ্য কর। সূর্যদেব কখনও ঘুমান না—সব সময়ই তিনি শ্রম করে চলেছেন—তাঁরই মত অতন্দ্র কর্ম কর—আর চল অগ্রসর হয়ে চল।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—তিনি নিজেও অতন্দ্রিত হয়ে কাজ করে চলেছেন, কারণ লোকসংগ্রহ তাঁহার কাম্য। তাই আমরা যারা আমাদের সাধের ভারতকে জগৎ-লোকসভায় বরণীয় ও মহনীয় আসনে বসাতে চাই, তারা যেন আলস্যহীন হয়ে অতন্দ্র কর্মের বন্যায় দেশকে পরিপ্লাবিত করি।

কিন্তু এই কর্ম যাতনার নিগড় নয়—ইহা আনন্দে ছন্দিত, উল্লাসে রঙীন, মধুরতায় মধুর,

অমৃতের স্পর্শে স্বাদুতম। স্বস্তিপন্থা যারা অনুসরণ করে, তারা ভগবানের নিকট তাই প্রার্থনা করে—

পরি মাগ্নে দুশ্চরিতাদ্ বাধস্বা
　　মা সুচরিতে ভজ।
উদ আয়ুষা স্বায়ুষোদস্থাম্
　　অমৃতাঁ অনু ॥

হে ভগবন্, দুশ্চরিত পাপ হতে আমায় প্রতিনিবৃত্ত কর, সদাচার ও পুণ্যে আমায় নিয়োজিত কর। আমি উঠব অমৃতলোকে—এই জীবনের সাথে সাথে শোভন কর্মে, শোভন চিন্তায় শুভ যে আয়ু সেই আয়ু যাপন করে—অমৃতময় দেবজীবনের পথে আমি পরমানন্দ লাভ করব।

মানুষের আনন্দে জন্ম, আনন্দেই জীবন এবং আনন্দেই তিরোধান, তাই কর্মসুন্দর বলিষ্ঠ জীবন তার চলার সুরে সুরে মানুষকে অনন্দলোকে জাগরিত করবেই করবে। আমিত্বের প্রসারে মানুষের দৃষ্টি যখন প্রসারিত তখন সকলই মধুময় হয়ে যায়। দ্যুলোক ও ভূলোক, বনস্পতি ও ওষধি, রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র, সকলই মধুরতায় মধুর হয়ে ওঠে। মধুশ্রীতে রমণীয় সাধক অনুভব করেন—পায়ের তলাকার ধূলিও সুধায় সুধাময়, দিকসকল আনন্দোৎসবে কোলাহলমুখর—সকলই অমৃতের প্রস্রবণে রসায়িত।

মানুষের বর্তমান জীবনে তাই বেদের একান্ত প্রয়োজন আছে। আণবিক অস্ত্রের ঝঞ্ঝনমুখর তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে দাঁড়িয়ে আমরা চারিদিকে দেখছি শুধু অশান্তি, কানে শুনছি অশ্রান্ত হাহাকার, দুঃখদুর্বহ এই জীবনে বেদ এনে দেবে পরম নির্ভয় আশ্রয়।

নিবেদিত জীবন যাপন করে আমরা কানে শুনব ভদ্র ও শোভন কথা, চোখে দেখব যাহা কিছু সুন্দর ও শোভন, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গকে করব দৃঢ় ও স্থির, তার পর জগৎহিতে উৎসর্গীকৃত ভাগবত জীবন যাপন করব।

অখিল ধর্মমূল বেদের এই শাশ্বত বাণীর আজও একান্ত প্রয়োজন আছে—এই জীবনপন্থা যদি অনুসরণ করতে পারি, তবেই বিদ্বেষ ও হিংসার শেষ হবে, মৈত্রী ও করুণার উদ্ভব হবে।

তখনই আমরা প্রার্থনা করতে পারব—শান্তির ও সমৃদ্ধির।

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ।
পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ
সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ
সা মা শান্তিরেধি।

ভাগবত ও দিব্যজীবনের পথযাত্রী সাধকদের সাধনায় বিশ্বে আনবে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব—তখন প্রতি মানুষ সকল প্রাণীকে মৈত্রীর চোখে দেখবে—সকল প্রাণী মানুষকে মৈত্রী দান করবে—এই মৈত্রীভাবনা-তৎপর মানুষ দেখবে দ্যুলোক শান্তিতে প্রফুল্ল, অন্তরিক্ষলোক শান্তির হিল্লোলে হিল্লোলিত। পৃথিবী শান্তির বাতাসে আবৃত হোক, জলধারা শান্তির ছন্দগান করুক; ওষধি ও বনস্পতি নিরুদ্বেগ স্বস্তিতে পূর্ণ হোক, সমস্ত দেবলোক শান্তির সৌরভে সুরভিত হোক, ব্রহ্ম তাঁর পরম উপশম দিয়ে জগৎ পরিতৃপ্ত করুন। সকলই বিঘ্নহীন হোক—শান্তিজলে সবাই পূত ও পবিত্র হোক। সেই পরমা শান্তি—সেই উদ্বেগহীন একান্তনির্ভর উপশম আমাতে আসুক।

বেদবাণী তাই বর্তমানে দেবে অমৃতের বার্তা, অভয়ের শিক্ষা, সংযম ও পবিত্রতার দীক্ষা। আসুন আমরা বিনম্র শরণাগতিতে সেই অমৃতবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর নারীভক্তদের সম্মেলন

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

(সভানেত্রী, অভ্যর্থনা সমিতি)

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতৃদেবী শ্রীসারদামণিদেবীর শুভ আবির্ভাব-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিগত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারাদমণিদেবীর নারীভক্তদের একটি অপূর্বসুন্দর, সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লী, পাটনা, শিলং, নাগপুর, মাদ্রাজ, কুর্গ, অন্ধ্র, ত্রিচুর, গোহাটী, কলিকাতা, রেঙ্গুন প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান এবং বাহির থেকেও পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নারী-ভক্তসমবায়ে এবং বর্তমান লেখিকার সভানেত্রীত্বে ও শ্রীযুক্তা সুভদ্রা হাক্‌সারের সম্পাদনায় একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি এই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

সম্মেলনের প্রথম দিনে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎস্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তিনি সভার শেষ পর্যন্ত থাকতে না পারায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বামী মাধবানন্দ অবশিষ্ট সময় সভার সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করেন। সেইদিন সুবৃহৎ অনুষ্ঠানগৃহটি ভক্তিব্যাকুল নরনারীগণে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এবং সভায় তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। কিন্তু সুদীর্ঘ তিনঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যেও এই বিশাল জনতা মুহূর্তের জন্যও বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'রে সভার সেই অনুপম
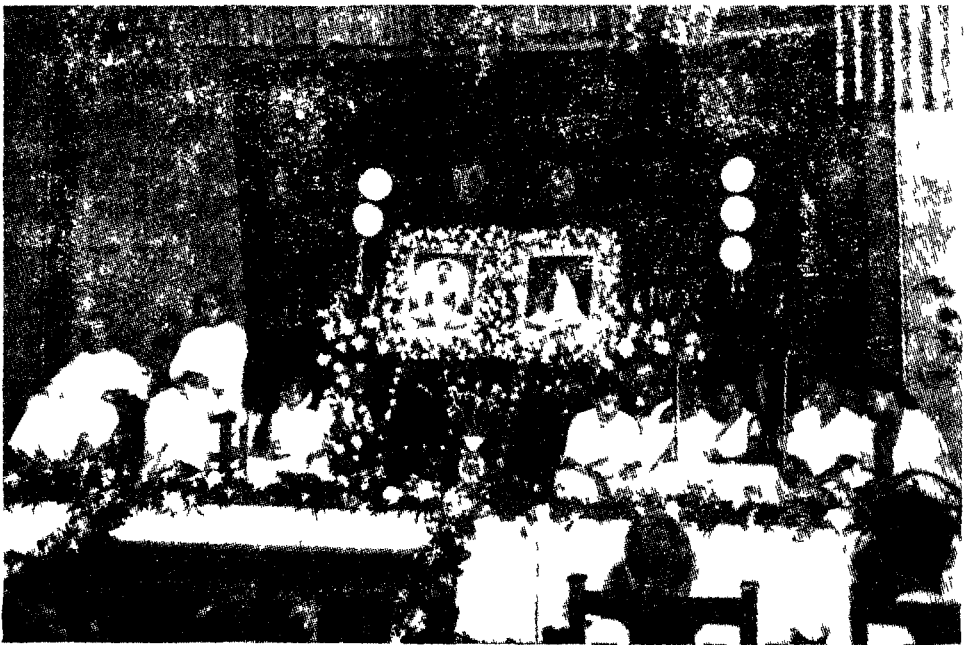
সজ্জিত মঞ্চের দৃশ্য

ভক্তিনম্র পরিবেশ নষ্ট করেননি। অপূর্ব ফুলসাজে সজ্জিত মঞ্চের উপরিস্থ বিশ্ববন্দ্য এই দিব্য দম্পতির যুগ্ম প্রতিকৃতির পরম স্নেহ ও করুণাবর্ষী দৃষ্টি সমবেত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণে এক সুমধুর ভাবাবেশের সৃষ্টি করে। সেই রসমধুর, আনন্দঘন, শ্রদ্ধাপ্লুত, শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে শ্রীমৎ স্বামীজী তাঁর চিত্তোন্মাদনকারী ভাষণে "পরমা জননীর কন্যাদের" তাঁরই পরমশুভ জীবনব্রত গ্রহণে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানান, এবং সেই মহাব্রত-উদ্‌যাপনের পন্থাও নির্দেশ করেন—প্রথমতঃ ও মুখ্যতঃ তাঁরই মূর্ত প্রতিচ্ছবিরূপে নিজেদের বিকশিত করা এবং দ্বিতীয়তঃ ও গৌণতঃ স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন সেই নূতন যুগের প্রবর্তক নূতন মানুষদের সৃষ্টি করা। তাঁর ভাষণের সমাপ্তিকালে শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় পুনরায় অতি সুন্দরভাবে বলেন—"যাঁরা এই সম্মেলনে যোগদান করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনব্রত হওয়া উচিত শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শে নিজেদের গঠিত করা এবং অন্যদেরও তাই করতে উদ্‌বুদ্ধ করা।" শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় সভাগৃহ ত্যাগ করে যাবার বহুক্ষণ পরেও তাঁর শেষ আশীর্বাণী যেন সমগ্র কক্ষে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, এবং উপস্থিত সকলকেই এক আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত করে: "তোমরা এই সম্মেলন থেকে যে শিক্ষালাভ করবে, তা প্রত্যেকে নিজেদের প্রদেশে বহন করে নিয়ে যাও, এবং অনুরূপ সম্মেলনের মাধ্যমে তা সকলের মধ্যে প্রকাশ কর। শ্রীশ্রীমাতৃদেবী তোমাদের সকলের জীবন মধুময় করুন; এবং তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য তোমাদের সকলকে শক্তি ও সাহস দিন।"

পরের চারদিন মহাবোধি সোসাইটী হলে "শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী"-সম্বন্ধে দু'টি এবং "সমাজসেবায় ভারতীয় নারী" ও "নারীশিক্ষা"-সম্বন্ধে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য আরো দুটি আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করা হয়। এইসব সভায় সভানেত্রীত্ব করেন যথাক্রমে মাদ্রাজের স্বনামখ্যাতা সমাজসেবিকা ভগিনী শুভলক্ষ্মী, কলিকাতা শ্রীসারদা আশ্রমের মায়ের মন্ত্রশিষ্যা শ্রীযুক্তা বাণীদেবী, কলিকাতা আনন্দাশ্রমের সুপ্রসিদ্ধা নারীশিক্ষাব্রতী ভগিনী চারুশীলা ও বিশিষ্টা শিশুশিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্তা মৃন্ময়ী রায়। প্রত্যেকদিনই বিভিন্ন প্রদেশের বহু প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং দেশে নবশিক্ষাপ্রণালী-প্রবর্তনের জন্য নানারূপ সুচিন্তা প্রসূত প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। সহধর্মিণী, সঙ্ঘনেত্রী, বিশ্বজননীরূপে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনের যে সব অপূর্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্বন্ধেও অতি প্রাণস্পর্শী আলোচনা হয়। করুণাবতার ভগবান বুদ্ধের পবিত্র মূর্তির উভয়পার্শ্বে স্থাপিত এই দুই যুগাবতারের পুণ্য প্রতিকৃতির পাদদেশে উপবিষ্ট মহিলাগণ শ্রদ্ধানম্রচিত্তে পুনরায় স্মরণ করেন পুণ্যভূমি ভারতের পরম দেবতাকে, যিনি জগদুদ্ধারের জন্য যুগে যুগে নিজেকে প্রকাশিত করেন জ্ঞান, প্রেম ও সেবার মূর্ত প্রতিচ্ছবিরূপে।

এই সকল সাধারণ সভা ব্যতীত প্রত্যেকদিন সকালে প্রতিনিধি-শিবিরে কেবলমাত্র প্রতিনিধিদের জন্য ঘরোয়া বৈঠক বসত। এই ক্ষুদ্র বৈঠকগুলিই হয়েছিল সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী ও শুভপ্রসূ। ধর্মশালার নিভৃত কক্ষে এই দিব্য দম্পতির পরমশিব ও পরমাশক্তির পুষ্পশোভিত, ধূপবাসিত প্রতিকৃতি-দ্বয়ের সম্মুখে ভক্তিনম্রচিত্তে উপবিষ্ট বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিগণ তাঁরা নিজেদের প্রদেশে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য আদর্শ কিরূপে জনশিক্ষায় ও মানবসেবায় সার্থক করে তুলতে প্রচেষ্টা করছেন—তারই বিবরণী প্রদান করেন। তাঁরা পূর্বে একে অপরের সম্পূর্ণ অপরিচিতা হলেও তাঁরা সকলেই যে একই পরমা জননীর কন্যা এই অপূর্ব বোধ তাঁদের সকলের মধ্যেই এক মধুর ভগিনী-সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং এই সব ঘরোয়া বৈঠকে নিকটতম প্রাণের আদানপ্রদানের

মাধ্যমে সেই সম্বন্ধ আরো দৃঢ় হয়। নীরবে, নিভৃতে, অনাড়ম্বরে, বিনাপ্রচার-বিজ্ঞাপনে ভারতের সাধারণ নারীরাও যে কি ভাবে অধ্যাত্ম-সাধনে অগ্রসর হচ্ছেন এবং সেইজন্যও সিদ্ধিকে নিষ্কাম কর্মে ও পরহিতৈষণায় পুষ্পিত করে তুলেছেন—তারই সুন্দর প্রমাণ আমরা পেয়েছি এই প্রাতঃকালীন ঘরোয়া আলোচনাদির মাধ্যমে।

প্রতিনিধিরা বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান, উদ্বোধন কার্যালয় ও মায়ের বাড়ী, কাশীপুর মঠ প্রভৃতি পুণ্য পীঠস্থান দর্শন ক'রে ধন্য হন। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় প্রতিনিধি ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানীয় গায়িকাদের কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর ভাবগম্ভীর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা লীলা-কীর্তন, নামগান, ভজন প্রভৃতিতে সমগ্র ধর্মশালাটি ধ্বনিত হযে উঠত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা দেবীর নারীভক্তদের এরূপ সম্মেলন পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়নি, এবং সর্বদিক থেকেই এই সুন্দর সম্মেলনটি অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এর প্রথম যে বৈশিষ্ট্য সকলকেই মুগ্ধ করেছিল তা হল এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চাবচ সকলেরই সুগভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা। সাধারণ ভৃত্য থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকেই যেন মায়ের পূজার অঞ্জলি প্রদান করছিলেন এই ভাবটিই ফুটে উঠেছিল সকলের মধ্যে। মায়ের আশীর্বাদে সমগ্র সম্মেলনটি এক অনির্বচনীয় মাধুর্য ও শান্তি-বিমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী তাঁর উদ্বোধন-ভাষণে এই সম্মেলনের যে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য বিবৃত করেন সে দুটিও সার্থকতম হয়েছিল। এরূপে দ্বিতীয়তঃ, এই সম্মেলন সত্যই হয়েছিল সকলের আত্মপরীক্ষার স্থল; সকলে কতদূর শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শে জীবন গঠন করতে সমর্থা হয়েছেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনার সুযোগ ছিল প্রচুর। তৃতীয়তঃ, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, বিভিন্ন স্থানের অপরিচিতা নারী-ভক্তদের মিলনক্ষেত্র হয়েছিল এই মহাসম্মেলন। এই উপলক্ষ্যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে নিগূঢ় প্রীতির, মধুর প্রাণের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তা কোনদিনই ছিন্ন হবার নয়। চতুর্থতঃ, এই ভক্তসম্মেলন সকলের হৃদয়ে নূতন উৎসাহ-দীপ প্রজ্বলিত করেছিল, সকলকে এক অভূতপূর্ব শান্তি ও আনন্দের সন্ধান দিয়েছিল।

মাত্র পাঁচটি দিন! কিন্তু নিরবধি কালের মধ্যেও এই স্বল্প পাঁচটি দিনের স্মৃতি পঞ্চপ্রদীপের মতই আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরদিন অনা- দীপ্তি বিকিরণ করবে। স্বপ্নের মতই কেটে গেল সেই পাঁচটি দিন যখন আমরা যেন এক পরমানন্দময় অমৃতলোকেই বিচরণ করছিলাম। এই পরম অমৃত ও রসের আস্বাদ সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন তাপ ও গ্লানির মধ্যেও আমাদের চিরদিন শান্তি ও তৃপ্তির পথ দেখাবে, নিঃসন্দেহ।

নারীভক্তদের এই মহাসম্মেলন এবং শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের অন্যান্য অনুষ্ঠান একটি কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত করেছে। সেটি হল এই যে, সভ্যতা-মদগর্বিত আধুনিক জগৎ তার সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও যান্ত্রিক শক্তি নিয়েও প্রকৃত আনন্দ ও সার্থকতার পথ অনুসন্ধানে হয়েছে শোচনীয়তম ভাবে ব্যর্থ। সেজন্য আসন্ন-যুদ্ধভীত নৈরাশ্যক্লিষ্ট, মোহগ্রস্ত মানবসমাজ কেবলমাত্র জাগতিক সুখসমৃদ্ধির লক্ষ্য ত্যাগ করে আজ সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করছে আধ্যাত্মিক সাধনায়। সেজন্যই শ্রীশ্রীমায়ের শুভজন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান-সমূহে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এরূপ সহস্র সহস্র মুমুক্ষু নরনারীর সমাবেশ দেখা যাচ্ছে, যাঁরা তাঁর পুণ্য জীবনগাথা থেকে নূতন আশার, নূতন পথের, নূতন জীবনের আভাস পাচ্ছেন, জ্বালিয়ে নিচ্ছেন এই পরমা জ্যোতিষ্মতীর চির অম্লান জীবনপ্রদীপ থেকে নিজেদের মনেরও ক্ষুদ্র দীপটি।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবের প্রকৃত সার্থকতা

এইখানেই, এবং এইখানেই আমাদের নারীভক্তদের সম্মেলনের একমাত্র সিদ্ধি ও ঋদ্ধি।

যিনি এই মরজগৎকে অমৃতলোকের সন্ধান দিয়েছেন, আপাতদৃষ্ট শোকদুঃখপূর্ণ সংসারের অন্তঃস্তলেও যে পরম সত্য, পরম শিব ও পরমসুন্দরের উৎসধারা নিরন্তর উদ্বেলিত হচ্ছে তাকে যিনি নিজের জীবনে পূর্ণতমভাবে প্রকাশিত করে অন্যদের জীবনেও করেছেন অকাতরে দান, সেই পরমানন্দময়ী, পরমমঙ্গলময়ী, পরমকরুণাময়ী মা আজ আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

নয়াদিল্লী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন—এই কেন্দ্রের ১৯৫৩ সালের কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রণালী প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত: (১) ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার (২) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিস্তার (৩) রোগীর সেবা ও চিকিৎসা (৪) প্রয়োজন সময়ে রিলিফ-কার্য। নিয়মিত বক্তৃতা, শাস্ত্রালোচনা, ধর্মসভা প্রভৃতির দ্বারা সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। রবিবারের ধর্মসভা শহরের বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। উহাতে সহস্রাধিক জনসমাগম হয়। শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশই শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান্। ছাত্রসমাজের মধ্যেও আশ্রমের ভাবধারা গ্রহণে আগ্রহ লক্ষিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 'ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান কি?' এবং 'কেন আমি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা গ্রহণ করিব?'—এই দুইটি বিষয়ে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুল কলেজের ১০৫৬ প্রতিযোগীর মধ্যে ১৩৬ জন পুরস্কার পাইয়াছে। মিশনের গ্রন্থাগারে আলোচ্যবর্ষে ৬৩৫৩ খানি পুস্তক ছিল এবং ৬০৯৩ খানি পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছে; গ্রন্থাগার-সংলগ্ন পাঠাগারে প্রতিদিন গড়ে ৭৫ জন পাঠক আগমন করেন। গ্রন্থাগারটির জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া গভর্নমেণ্ট ইহার উন্নতির জন্য ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৪৪,১৪১ (নূতন ৯,৯২৭) জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। ক্যাবলবাগ আর্যসমাজ রোডের উপর অবস্থিত যক্ষ্মা-চিকিৎসা-কেন্দ্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ৬০,৬৬৪ জন (নূতন ১৪২০) যক্ষ্মারোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন; ইহার অন্তর্বিভাগে ১২৭ জন রোগীকে বিশেষ পর্যবেক্ষণের জন্য কিছু কিছুকাল রাখা হইয়াছিল।

আলোচ্যবর্ষে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, খ্রীষ্টজন্মোৎসব বুদ্ধজয়ন্তী, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিপূজা ও উৎসবাদি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত আলোচনা-সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে উৎসাহী শিক্ষার্থিগণের জন্য একটি সংস্কৃতি শিক্ষার ক্লাস করা হয়।

সমাজ সেবা—পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (ছাত্রাবাস) পরিচালিত বিবেকানন্দ সমাজ-সেবাকেন্দ্রের দ্বিতীয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা, শ্রীশ্রীমার শতবর্ষ-জয়ন্তী ও বিবেকানন্দ জয়ন্তী-উৎসব গত ১৭ই বৈশাখ হইতে ২৩শে বৈশাখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন উদ্বোধনী সভার পরিচালনা করেন শিক্ষাবিভাগের কর্মসচিব শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্বামী সমুদ্ধানন্দ। বক্তৃতা দেন শ্রীঅমর নন্দী ও অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ। ১৮ই

বৈশাখ পূজা ও প্রসাদ বিতরণ এবং শ্রীশ্রীমায়ের লীলা প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ এবং বক্তৃতা করেন শ্রীতামস রঞ্জন রায়। অপরাহ্ণে কুটীরশিল্প-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা বস্তীর বয়স্ক ও শিশু শিল্পীদের একটি শিল্প ও চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। জনসভায় বস্তী-জীবন ও কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্ত্রী মহাশয় সরকারী সাহায্যের আশ্বাস দেন। ১৯শে বৈশাখ পুরস্কার-বিতরণী সভায় নেতৃত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন। শ্রীমতী সুভদ্রা হাক্সার পুরস্কার বিতরণ করেন। চতুর্থ দিন অপরাহ্ণে উপজাতি-কল্যাণ-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়ের সভাপতিত্বে বস্তীর জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন পৌরপ্রতিষ্ঠানের কমিশনার শ্রীবি, কে, সেন, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীহৃদয়রঞ্জন ঘোষাল এবং সমাজশিক্ষা-বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়। সভান্তে বালকবিভাগের ছাত্রেরা 'গুরু-দক্ষিণা' অভিনয় করে। ২১শে বৈশাখ সকালে দুইশতাধিক বস্তীবাসী শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা করিয়া সিমলা পল্লীতে স্বামিজীর পুণ্য জন্মস্থান প্রদক্ষিণ করে। অপরাহ্ণে স্বামী পুণ্যানন্দের সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ শ্রীসত্যচরণ পাল, অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ স্বামিজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। সভাশেষে বস্তীর কারিগরদের তৈরী বাজি পোড়ান সকলকে বিপুল আনন্দ দান করে। রাত্রি ৯টায় আশ্রম বাসী ছাত্রদের অভিনীত 'মুকুট' বস্তীবাসীর মনোরঞ্জন করে। শেষদিন নরনারায়ণ সেবা সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। এগার শতাধিক নরনারীকে পরিতোষ পূর্বক খাওয়ানো হয়। পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ছাত্রগণ উক্ত রামবাগান বস্তীতে গত দুই বৎসর যাবৎ নৈশ বিদ্যালয় দুগ্ধবিতরণ-কেন্দ্র, পাঠাগার কুটীরশিল্প-উন্নয়ন ও বস্তীর স্বাস্থ্যসমস্যাসমাধান প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীমা শতবর্ষজয়ন্তী—আমেরিকা যুক্ত রাজ্যের প্রভিডেন্স বিবেকানন্দ সোসাইটিতে বিগত ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩রা জানুয়ারী, ১৯৫৪ একটি সভার অনুষ্ঠানে স্বামী অখিলানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করিয়া ভারতে ও জগতে শ্রীমায়ের অবদানসম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ১০ই মে যে সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়, উহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রখ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ, ধর্মযাজক, চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, বিদ্যার্থী এবং ভক্ত নরনারী সমবেত হন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্রাউন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, মিসেস রাইসটন্ এবং রোড দ্বীপের গীর্জাসংঘের পরিচালকবৃন্দ অন্যতম। স্বামী অখিলানন্দজী এবং আমেরিকাস্থ ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত মেহ তা বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত মেহ তা শ্রীশ্রীমায়ের সার্বভৌম ভাবটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে বিদ্বজ্জনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে।

বোষ্টন শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি দিবসে পূজানুষ্ঠানের পর সমবেত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৩রা জানুয়ারী, ১৯৫৪ বহু ভক্তের সম্মিলিত এক সভায় স্বামী অখিলানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। ৭ই মে শুক্রবার সন্ধ্যায় বোষ্টনের ইউনিভার্সিটি হলে সাধারণ সভার অনুষ্ঠানটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎসক,

ধর্মবিদ্ এবং রাষ্ট্র-সচিবগণের উপস্থিতিতে সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর কেসি, নিউটন্ এ্যান্ডোভার থিয়োলজিক্যাল সেমিনারির অধ্যক্ষ ডক্টর হেরিক্, ডক্টর শ্যাপ্লি, ডক্টর অল্পোর্ট, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মিনার্ এবং ইন্‌ষ্টি-টিউট্ অফ্ টেক্‌নোলজির ডক্টর পেন্‌সন্। বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা দেন। বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী, আমেরিকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত মেহ্‌তা ও তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা মেহ্‌তা। প্রার্থনা ও স্বামী অখিলানন্দজীর আশীর্বাণীর পর সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

বিগত ১৪ই ফাল্গুন শুক্রবার হইতে ২৩ ফাল্গুন রবিবার পর্যন্ত দশ দিন ব্যাপী কাটিহার (পূর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী জয়ন্তী ও ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯তম জন্মতিথি-উৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, বিশেষ-পূজা, হোম, ভোগরাগ, কীর্তনভজনাদি উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। ১৪ই ফাল্গুন অপরাহ্নে স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। কলেজের সহাধ্যক্ষ এবং স্থানীয় কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সভাপতি মহোদয় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। রবিবার দিন বিশেষ পূজান্তে প্রায় ৪৫০০ নরনারী প্রসাদগ্রহণ করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে একটি বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। উহা পরিচালনা করেন মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দ—এই দিনের বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী বীতশোকানন্দ এবং ডাঃ রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। মধ্যে দুই দিন দুইটি মহিলাসভার অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবন আলোচিত হয় এবং একদিন আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণীসভাও অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের কয়দিনের মধ্যে শিবরাত্রি পড়ায় ঐ দিন সারারাত্রি পূজা পাঠ ভজনাদিতে বিশেষ আনন্দপূর্ণ পরিবেশে সমবেত ভক্তবৃন্দ রাত্রি জাগরণ করেন।

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩০শে চৈত্র হইতে ৩রা বৈশাখ পর্যন্ত ৪দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর শতবর্ষজয়ন্তী ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১১৯ তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৩০শে চৈত্র প্রভাতে একটি সুসজ্জিত মটরজীপে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতিকৃতি বহন করিয়া মাইকযুক্ত মটর ট্রাকে সঙ্গীত সহ শোভাযাত্রা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করে। বৈকাল ৫ ঘটিকায় পাকিস্থানস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার ডাঃ এম্ এস্ মেহ্‌তা, আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসেন এবং হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। আনন্দমুখরিত ১লা বৈশাখ পূজা, হোম, ভজন, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, উপনিষৎপাঠ, রামনাম-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অতিবাহিত হয়। অপরাহ্নে স্বামী যোগস্থানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। অর্কেষ্ট্রা পার্টি ঐকতান বাদন ও যন্ত্রসঙ্গীত-পরিবেশনে সকলকে আনন্দ দান করেন। ২রা বৈশাখ বৈকাল ৫॥টায় স্থানীয় প্রবীণ উকিল শ্রীমণিভূষণ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সত্যকামানন্দ, শ্রীমনোরঞ্জন ধর, এম্-এল্-এ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিবেকানন্দ ব্যায়াম-বিদ্যালয়ের সভ্যগণ চিত্তাকর্ষক ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। ৩রা

বৈশাখ প্রায় এগার হাজার ব্যক্তিকে বসাইয়া ও প্রায় তিন হাজার ব্যক্তিকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বালিয়াটী (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৫ই হইতে ১২ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত অষ্টাহব্যাপী শ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী ও আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ৫ই হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ হইত। ৭ই প্রাতে শ্রীসারদামণি বালিকা-বিদ্যালয়ের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়। ৮ই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমায়ের প্রতিকৃতিসহ সংকীর্তন করিতে করিতে ভক্তগণ গ্রাম-প্রদক্ষিণ করেন। ৯ই *বিশেষ পূজা, হোমাদি ও নারায়ণ-সেবা হয়।* সায়াহ্নে মানিকগঞ্জ মহকুমাশাসক শ্রীঅজিতকুমার দত্তের সভাপতিত্বে এক সভায় বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণের পর, বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রী-ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন। ১০ই প্রাতে শ্রীনিতাই পালের পদাবলী কীর্তন সকলকে প্রচুর আনন্দ দান করে। অপরাহ্ণে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকারের পরিচালনায় এক মহতী জনসভায় স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী সত্য-কামানন্দ ও শ্রীরাধাবল্লভ কাব্যতীর্থ বক্তৃতা করেন। ১১ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীমতী স্নেহলতা রায় চৌধুরানীর নেতৃত্বে একটি মহিলাসভা হয়। সন্ধ্যায় 'প্রগতি সংসদে'র উদ্যোগে বাজি পোড়ান হয়; রাত্রে ভক্তগণ 'রাজনন্দিনী' নাটক যাত্রাভিনয় করেন। ১২ই জ্যৈষ্ঠ সকাল হইতে বিকাল পর্যন্ত কবির গান হয়। উহাতে দূর দূর গ্রাম হইতে প্রায় দুই সহস্র হিন্দু-মুসলমান যোগদান করেন।

কুমিল্লায় শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ— বিগত ২৪শে বৈশাখ (৭ই মে) অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ কুমিল্লা ষ্টেশনে অবতরণ করিলে ভক্তবৃন্দের জয়ধ্বনির মধ্যে পর্যাপ্ত পুষ্প মাল্যে ভূষিত হন। তৎপর তিনি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গমন করেন। ৩০শে মে পর্যন্ত পূজ্যপা[illegible] মহারাজজী এখানে ছিলেন। ২৬শে বৈশাখ তি[illegible] আশ্রমের বার্ষিক সাধারণসভার অনুষ্ঠানে সভাপতি[illegible] করেন। প্রতিদিন অপরাহ্ণে দুই তিন ঘণ্টাব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনাদর্শ অবলম্বনে মহারাজের মুখনিঃসৃত বাণী শ্রোতৃবৃন্দে[illegible] চিত্তে এক অপূর্ব ধর্মভাব জাগাইয়া দিত। এ কয়[illegible] দিনে আশ্রমে প্রভূত আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা অনুভূত হইয়াছিল।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর প্রচারকার্য— বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বাম[illegible] সম্বুদ্ধানন্দজী গত ১০ই চৈত্র (১৩৬০) হইতে বর্তমানবর্ষের ১৭ই বৈশাখ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, বিহা[illegible] এবং আসামের নানাস্থানে সনাতন হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারকার্য ব্যপদেশে সফর করেন। তিনি কুলটি, বার্নপুর আসানসোল, বর্ধমান ও চিত্তরঞ্জনে ১০টি; মধুপুর মাইথন, সিন্ধ্রি, ধানবাদ, আদরা, রাঁচি ও পাটনায় ৭টি; শিলচর ও ইম্ফলে ৭টি এবং কলিকাতায় [illegible] বক্তৃতা দেন।

পরলোকে স্বামী ভাগবতানন্দ— বেলু[illegible] মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী ভাগবতানন্দজী (নরে[illegible] মহারাজ) গত ২৩শে বৈশাখ (৬ই মে) অপরাহ্ণ ৬টায় বারাণসীতে ৭০ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুর অভয়পাদপদ্মে চিরমিলিত হইয়াছেন ১৯১১ সালে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া মঠে যোগদা[illegible] এবং ১৯২৮ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নরে[illegible] মহারাজ প্রধানতঃ কাশী অদ্বৈত আশ্রমে ধ্যান ধারণাদি লইয়া জীবন কাটাইয়াছেন। তাঁহার শান্ত অমায়িক সপ্রেম ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত।

বিবিধ সংবাদ

কটকে অনুষ্ঠান—ওড়িষ্যার কটক জিলার অন্তর্গত রাজকণিকাস্থিত ঝরম্ গ্রামে গত ৩০শে চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সকাল হইতে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাগান ও সঙ্কীর্তনাদি হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় পাঁচ শত ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্থানীয় চাঁদবালী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীরবিনারায়ণ জেনার সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা হইয়াছিল।

বিকানীর শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীর—বিকানীর শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীরের কার্যবিবরণী সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। ইহাতে অক্টোবর, ১৯৪৯ হইতে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ সালের কার্যক্রম প্রদত্ত হইয়াছে। স্বামী জপানন্দের কয়েক বৎসরের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল এই শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীর। ইহার উদ্দেশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অসাম্প্রদায়িক ধর্মাদর্শে ও জীবসেবায় জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করা। ভারতসরকারের ১৮৬০ সালের সোসাইটি-রেজিষ্ট্রেসন্-এ্যাক্ট-অনুযায়ী গত আগষ্ট মাসে ইহা রেজিষ্টার্ড করা হইয়াছে। কুটীরের পুস্তকালয়ের পুস্তক সংখ্যা বর্তমানে ১৪১৪। নৈশ বিদ্যালয়টির কার্যও বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্তমানে উহার ছাত্রসংখ্যা—১৭৮। প্রকাশন-বিভাগ হইতে হিন্দীতে (১) শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস (২) মাতাজী (শ্রীসারদামণি দেবী) (৩) ভক্তি-তত্ত্ব (৪) কঠোপনিষদ্ প্রকাশ করা হইয়াছে। ভারতের বীরাগ্রগণ্য রাজস্থানবাসিগণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইতেছেন—ইহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়।

পল্লীবঙ্গে উৎসব—হরিশপুর (হাওড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে, গত ৫ই বৈশাখ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বেলুড়মঠের স্বামী অনিকেতানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও আরতি সম্পন্ন করেন। অপরাহ্নে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে একটি সভায় স্থানীয় সুধীবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময় জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। এই সভায় 'যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভাশেষে প্রায় পাঁচ শত দরিদ্র নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

২৪পরগণার নূতনপুকুরে গত ২০শে ও ২১শে চৈত্র (৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল) শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমদিনের কার্যসূচী নিম্নোক্তরূপে অনুসৃত হয়:—প্রাতে মঙ্গলারতির পর শোভাযাত্রা ও নগরকীর্তন, দ্বিপ্রহরে শ্রীবলরাম আচার্য কর্তৃক বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ ইত্যাদি, অপরাহ্নে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনকথা-আলোচনা, সন্ধ্যায় রঘুনাথপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের বালকগণ কর্তৃক 'দেশের ছেলে ও বিবেকানন্দ' অভিনয়। ৪ঠা এপ্রিল অপরাহ্নে বেলুড়মঠের স্বামী মনীষানন্দের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভা হয়। উহাতে শ্রীমোহিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমরকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস চৌধুরী ও সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা সম্বন্ধে আবেগময়ী ভাষায় আলোচনা করেন। কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বাউল সংঘ করেন কীর্তন পরিবেশন।

কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৪ঠা ও ৫ই বৈশাখ যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমদিন কাটোয়ার প্রধান

ও ধর্মপ্রাণ চিকিৎসক শ্রীগুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় দিন পৌর সভাপতি শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বেলুড়মঠের ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য বেদান্ত দর্শন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে অতি সুন্দর ভাষণ দেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাবলীল ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। উক্ত দুই দিনই প্রাতে নগরকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ এবং ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আশ্রমস্থ বালকগণ কর্তৃক নির্মিত তোরণ-গুলির উপর পরমহংসদেব ও স্বামীজীর উপদেশাবলী আশ্রম প্রাঙ্গণের শোভা বর্ধন করিতেছিল। অপরাহ্ণে আশ্রম-সংলগ্ন আম্রকাননে অতি সুন্দর পরিবেশের মধ্যে সভার কার্য সম্পন্ন হয়।

চৌধুরীহাট (কুচবিহার) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি এবং শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর শতবার্ষিকী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৫দিন ব্যাপী উৎসব হয়। ২০শে চৈত্র পূজাপাঠ হোমাদি, শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, রাত্রিতে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা এবং কালীকীর্তন হয়। ২১শে চৈত্র অপরাহ্ণে বেলুড়মঠ হইতে আগত স্বামী পূর্ণানন্দের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়, কুচবিহারের মহারাজা শ্রীযুত জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কুচবিহার এবং দিনহাটার সরকারী কর্মচারী এবং অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ প্রায় ছয় সহস্রাধিক ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

২২শে এবং ২৩শে চৈত্র ষোল প্রহরব্যাপী নাম-যজ্ঞ হয়। ২৪শে চৈত্র বুধবারে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে পাঁচ সহস্রের অধিক লোক পরিতোষ-সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রিতে রামলীলা-কীর্তনের পর উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

বহির্বঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব—২২শে ফাল্গুন, আরারিয়া (পূর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মতিথিতে পূজা, পাঠ, হোমাদি সম্পন্ন হইয়াছে। ৩০শে ফাল্গুন ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণসেবা হয় এবং স্থানীয় লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি ধর্মসভায় কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গদাধরানন্দ, শ্রীমাধুর্যময় মিত্র ও শ্রীঅমরেন্দ্র গাঙ্গুলী বক্তৃতা করেন।

দরং (তেজপুর, আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়াতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এক মহতী সভার অধিবেশন পরিচালনা করেন স্থানীয় মহা-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅজয়কুমার বসু। বাঙ্গালী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ এবং শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীমতী তৃপ্তি দত্ত, শ্রীমতী দীপ্তি দত্ত, শ্রীমতী হিরণ্ময় বরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে রচিত সঙ্গীতাদি দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। শিক্ষক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তার ঐতিহাসিক দিক সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন।

মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্ক-তীর্থের লোকান্তর—কিছুদিন পূর্বে বঙ্গদেশের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ মহাশয় ৮৯ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একজন অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে হারাইল। তিনি ১২৭২ বঙ্গাব্দে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিং জেলান্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গুরুদাস বিদ্যারত্নও একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অদম্য জ্ঞানস্পৃহা ছিল। বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তনি অবশেষে বঙ্গের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি জীবনে কোন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই। তিনি বিভিন্ন চতুষ্পাঠীতে দীর্ঘকাল অতিদক্ষতার সহিত ন্যায়দর্শনের অধ্যাপনা করেন। অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সরকার হইতে একটি বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার চিরশান্তি হউক এই আমাদের প্রার্থনা।

নানাস্থানে শ্রীমা সারদাদেবীর শত-বার্ষিকী-পালন—শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদা-দেবীর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বরোদায় একটি জয়ন্তী-সমিতি গঠিত হইয়াছে। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যা শ্রীমতী হংস মেহতা এই সমিতির পরিচালিকা। গত ২৭শে ডিসেম্বর পবিত্র ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে একটি মহতী জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী শ্রদ্ধাসহকারে বিশিষ্ট বক্তাগণ কর্তৃক আলোচিত হয়।

সম্প্রতি পুনায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদা দেবীর জয়ন্তী-উৎসবের উদ্বোধন বিপুল উদ্দীপনার সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যায় এক বিরাট সভায় বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী-অবলম্বনে বক্তৃতা করেন। মারাঠী ও হিন্দী ভজনগান এই উৎসবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

কোলাপুরে (বোম্বাইরাজ্য) এই উপলক্ষ্যে অনেকগুলি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৬ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে মহারানী শ্রীমতী বিজয়মালার সভানেত্রীত্বে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। উহাতে শ্রীমতী যমুনাবাঈ হীরলেকার মারাঠীতে এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ হিন্দীতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভানেত্রী মহোদয়া বলেন,—ভারতকে এখন জননী সারদাদেবীর আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। রোটারী ক্লাবে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। হিন্দু কন্যা-ছাত্রালয়ে হরিজন বালিকাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও শ্রীমতী হীরলেকার বালিকাদের শ্রীমায়ের আদর্শটি বুঝাইয়া দেন। স্থানীয় পৌরগৃহে আইন কলেজের অধ্যক্ষ ডাভোল-কারের সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়, উহাতেও মাতৃজীবনী হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় সম্যক্ আলোচিত হয়। স্থানীয় বিবেকানন্দ আশ্রম-পরিচালিত এক শ্রমিকসভায় সমাজের অধস্তন নরনারীবৃন্দের মধ্যেও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোক-সম্পাত করে।

হোজাই (নওগাঁও, আসাম) তে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৯ই চৈত্র হইতে তিন দিন। প্রথম দিন পূর্বাহ্নে মাঙ্গলিক এবং পূজাদির অনুষ্ঠান হয় এবং অপরাহ্নে বেলুড় মঠের স্বামী অবিনাশানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-বিষয়ক একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। জনসভায় বিভিন্ন ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনের নানাদিক আলোচিত হয়। অন্যান্য দিনের কর্মসূচী:— ছায়াচিত্রে বক্তৃতা (শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী প্রণবাত্মানন্দ কর্তৃক), ব্যায়াম প্রদর্শন, প্রায় সাত হাজার নরনারায়ণসেবা এবং সবুজ বালক সঙ্ঘ কর্তৃক একটি অসমীয়া নাটিকার অভিনয়।

দরং (তেজপুর, আসাম) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১৭ই চৈত্র হইতে তিন দিন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূজাকৃত্য (বেলুড় মঠের স্বামী কাশিকানন্দ কর্তৃক সম্পন্ন) ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা ব্যতীত উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল স্বামী প্রণবাত্মা-নন্দের ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা এবং বেলুড় মঠের স্বামী চণ্ডিকানন্দের পরিচালনায় জনসভা ও ভজনসঙ্গীত। এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেশকর্মী শ্রীমহাদেব শর্মাও ভাষণ দিয়াছিলেন।

সিঁথি (কলিকাতার উপকণ্ঠে) রামকৃষ্ণসঙ্ঘের উদ্যোগে ৫ই বৈশাখ হইতে শ্রীমা-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। প্রতিদিনই পূজাপাঠ, যজ্ঞ, কীর্তন ও প্রসাদবিতরণ উৎসবসূচীর অঙ্গীভূত ছিল।

দুইটি জনসভায় (একটি বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য) বক্তৃতা করেন বেলুড় মঠের স্বামী সাধনানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ ও স্বামী দেবানন্দ; 'শ্রীমা সারদামণি' গ্রন্থের যশস্বী লেখক শ্রীতামসরঞ্জন রায়, আনন্দ আশ্রমের সম্পাদিকা ভগিনী চারুশীলা দেবী এবং বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত।

কলিকাতা গৌরীবেড়েস্থিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুর-বাটীতে (২৬বি, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট) ৩রা বৈশাখ হইতে দিবসত্রয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা, পাঠ, মহাসপ্তশতী যজ্ঞ ও আলোচনা-সভায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (কলিকাতা বেতার-কথক), প্রচারব্রতী শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, সাহিত্য-রত্ন, বেলুড় মঠের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে এবং শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)। সঙ্গীত-শিল্পিগণের মাতৃনাম-গান এবং শ্রীগুরু-বালিকাসঙ্ঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'শ্রীকৃষ্ণসখা' গীতাভিনয় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে স্নিগ্ধ ভক্তি উদ্রিক্ত করিয়াছিল।

ছোট সরসা (হুগলি) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ ৪ঠা ও ৫ই বৈশাখ শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী ও শ্রীমা-শতবার্ষিকী যুক্তভাবে অনুষ্ঠান করেন। এতৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা-সভায় বক্তৃতা দেন বেলুড়মঠের স্বামী শর্মানন্দ, ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম, অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার (ইটাচুনা মহাবিদ্যালয়), অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী ও অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। গ্রামবাসিগণকে মনোমুগ্ধকর কালীকীর্তন দ্বারা পরিতৃপ্তি দেন ভাটপাড়ার 'নবীন সঙ্ঘ'।

জঙ্গিপুরবাসী যুবকবৃন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় জঙ্গিপুর শহরে (জেঃ মুর্শিদাবাদ, শ্রীশ্রীরঘুনাথজীউর নাটমন্দিরে গত ২রা ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৬ই ও ১৭ই মে যথাক্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শতবার্ষিকী-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমদিন প্রাতে অগণিত ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীস্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ সংকীর্তন করিয়া নগর-পরিক্রমা করেন। প্রত্যাবর্তনের পর ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে বিশেষ পূজা হোম, আরতি ও প্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। উভয়দিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও বাণীসম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য জনসভার আয়োজন করা হয়। এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীঅভয়চৈতন্য ও সারগাছি আশ্রমের স্বামী বিরজাত্মানন্দ যোগদান করায় অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

বারাসত শিবানন্দধামে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী-উপলক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে গত ফেব্রুয়ারী মাসে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মস্থান বারাসত শিবানন্দধামে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় "দেবী-মানবী শ্রীসারদামণি" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তৎপর জন্মজয়ন্তীর দ্বিতীয় পর্যায়ে গত ৯ই মে সারাদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ ও ভজন হয়; বৈকালে বেলুড়মঠের স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দের পরিচালিত এক জনসভায় স্বামী প্রেমরূপানন্দ, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত ও সভাপতি শ্রীসারদাদেবীর জীবনী ও উপদেশ-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন।

খড়দহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ১লা বৈশাখ হইতে ৫ই বৈশাখ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯তম জন্মোৎসব ও শ্রীমা সারদামণির শতবার্ষিকী-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমটি এই পাঁচদিন বিশেষ পূজা, কালীকীর্তন, কথামৃতপাঠ, ভাগবত-ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে মুখরিত ছিল। ৪ঠা বৈশাখ অপরাহ্নে একটি মহিলাসভার আয়োজন করা হয়, উহাতে সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী চারুশীলা দেবী। ৫ই প্রাতে শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি সহ একটি শোভাযাত্রা নগর-প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। দ্বিপ্রহরে পূজাবসানে ভক্তবৃন্দ প্রসাদগ্রহণ করেন। বৈকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বামী পুণ্যানন্দ অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

কৃষ্ণময় জীবন

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে
করৌ চ তৎকর্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাং স কর্ণঃ॥
শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত—১০।৮০।৩,৪

যে জিহ্বা দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লোকোত্তর গুণাবলী কীর্তন করা হয়, তাহাই সার্থক জিহ্বা। যে হাত দুটি শ্রীভগবানের প্রীতিকর কাজ করিয়া চলে, উহারাই সার্থক হাত। চর এবং অচর এই নিখিল বিশ্বসংসারে শ্রীহরি ওতপ্রোত রহিয়াছেন—যে মন ইহা ধারণা করিতে পারে, সর্বদা স্মরণ করিতে পারে তাহাকেই বলি সার্থক মন। নরদেহ স্বীকার করিয়া পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে যে সকল অদ্ভুত কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পবিত্র কাহিনী যে কান শ্রবণ করে তাহারই তো কর্ণেন্দ্রিয়ত্ব সার্থক।

ধন্য সেই মস্তক যাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উভয়মূর্তি—মন্দিরে পূজিত দেববিগ্রহ এবং মন্দিরের বাহিরে অখিল স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিরাট বিশ্ব-বিগ্রহকে প্রণাম করে, আর সফল সেই চক্ষু যাহা তাঁহাকে এই উভয়রূপেই দেখিতে পায়। ধন্য দেহের অঙ্গসমূহ যদি তাহারা বিষ্ণুর এবং বিষ্ণুভক্তগণের পাদোদক প্রতিদিন ভক্তিভরে ধারণ করে।

[আমাদিগের সমস্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মনকে নিয়োগ করিতে হইবে শ্রীভগবানের অনুভূতিতে, তাঁহার সেবায়, তাঁহার স্মরণে। আমাদিগের সত্তার এমন কোন অংশ থাকিবে না যাহা ভগবচ্চেতনায় তৎপর নহে। সমগ্র জীবন আমাদের হওয়া চাই কৃষ্ণময়।]

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্মমেঘ

ধর্ম কাহারও জীবনে কষ্টের সাধনা, কাহারও জীবনে দুদণ্ডের কৌতূহল বা বিলাসমাত্র, কিন্তু কাহারও নিকট উহা চরিত্রের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য—নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতো জীবনসত্তার অবিচ্ছেদ্য সহচর। এই শেষোক্ত সৌভাগ্যবান ধর্মের মূল উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই উৎসের নাম 'সমাধি'—পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ। শ্রীমৎ বিদ্যারণ্যস্বামী তাঁহার 'পঞ্চদশী' নামক গ্রন্থে বলিতেছেন—

ধর্মমেঘমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ।
বর্ষত্যেষ যতো ধর্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ॥

"চিত্তের সকল চাঞ্চল্য দূর হইয়া উহা যখন ধ্যেয় পরমাত্মাতে নিশ্চলরূপে অবস্থান করে, তখন চিত্তের ঐ অবস্থার নাম সমাধি। ব্রহ্মজ্ঞগণ এই সমাধিকে বলেন 'ধর্মমেঘ'—কেননা উহা হইতেই জীবনে সহস্র ধারায় নামিয়া আসে ধর্মামৃতের বন্যা।"

বন্যা আসিলে কেহ আর জলকষ্টের কথা ভাবে না—জলের হিসাবনিকাশ করে না। জল—জল, কেবলই জল, চারিধারে জল। যত খুশী যেভাবে খুশী, যখন খুশী জলের প্রয়োজন মিটাইয়া লও। সেইরূপ ধর্মামৃতধারা যখন জীবনে প্রবাহিত হয়, তখন আলাদা একটি থলিতে আর পুণ্যসঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয় না। যাহা কিছু চিন্তা করা যায়, যাহা কিছু কথা কওয়া যায়, যাহা কিছু কর্ম সম্পাদিত হয় সকলই তখন পুণ্যময়, ধর্মময়। চেষ্টা করিয়া তখন কেহ সত্য বলে না, কসরৎ করিয়া তখন কাহাকেও প্রলোভন জয় করিতে হয় না, নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া তখন কেহ মৈত্রী, করুণা, ক্ষমা সাধে না। লোহা যে তখন স্পর্শমণির ছোঁয়াচ লাগিয়া সোনা হইয়া গিয়াছে—লোহের মলিনতা, কাঠিন্য, ভঙ্গুরতা প্রভৃতির আর আশঙ্কা কোথায়? যে মানুষ মানুষের অন্তরতম সত্যের সান্নিধ্য লাভ করিয়া জীবনাকাশে ধর্মমেঘের সঞ্চার করিতে পারিয়াছে, সে-ই যথার্থ ধার্মিক। সে ধর্মাচরণ করে না—তাহারই আচরণ হয় ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় পিতা তাহার হাত ধরিয়াছেন, তাহার আর পড়িবার ভয় নাই।

'সমাধি' বা ভাগবতসত্তার অনুভূতি ব্যতীত যে ধর্মাচরণ—উহা বাঞ্ছিত সার্থকতা লাভ করে না। এই ধর্ম যেন একটি প্রাথমিক পাঠমাত্র। উহা আমাদিগকে বেশী দূর লইয়া যাইতে পারে না। উহার উপকারিতা অবশ্যই আছে—উহাকে ধরিয়াই আমাদের শ্রেয়ের সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে একথাও সত্য—কিন্তু ধর্মের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য উহা হইতে অনেক দূরে। কিছু স্নান, কিছু দান, কিছু আচারনিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, কিছু জপ পূজা—এইরূপ 'কিছু'-মূল্যে বৃহৎ বস্তু করাধিগত হইবার নয়। 'কিছু' কিছুকালের সঙ্গী হউক, চিরদিনের যেন না হয়। অতএব এমন দিনকে ব্যাকুলভাবে চাহিতে হইবে, যেদিন সমস্ত প্রাণ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে উৎসে যাইবার জন্য, জীবন-সত্যের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইবার জন্য; পৃথিবীর বিবিধ আকর্ষণের জন্য এতদিন যত চোখের জল ফেলিয়াছি, তাহার শতগুণ অশ্রু উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে অপার্থিব ভগবদাকর্ষণের জন্য।

এমন দিন শুধু দুচারজনেরই জীবনে আসিবার—এইরূপ যেন আমরা মনে না করি। সকলেরই ঐ দিনকে চাহিবার অধিকার আছে। উপনিষৎ ও

গীতাদি শাস্ত্র বার বার আমাদিগকে উৎসাহ দিয়া বলিতেছেন, যে চাহিবে সে-ই পাইবে, পাইয়া ধন্য হইবে; যে না চাহিবে, সে ঠকিয়া যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"তিনি আপনার বাপ, আপনার মা—তাঁর উপর জোর খাটে। * * তাঁর কৃপা পণ্ডিত মূর্খ সকল ছেলেরই উপর—যে তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়। বাপের সকলের উপর সমান স্নেহ। * * তাঁকে ঘরে আনতে হয়—আলাপ করতে হয়। * * কর্ম যে বরাবরই করতে হয় তা নয়। ঈশ্বরলাভ হলে আর কর্ম থাকে না। * * তাঁতে মগ্ন হলে অসৎবুদ্ধি, পাপবুদ্ধি থাকে না। * * আত্মার সাক্ষাৎকার হলে সব সন্দেহ ভঞ্জন হয়। ঈশ্বরের কৃপা হলে এক মুহূর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে, যেমন হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায়। * * জপ, আহ্নিক, উপবাস, পুরশ্চরণ ..শাস্ত্র অনেক কর্ম করতে বলে গেছে···এরূপ ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে। আর এক আছে, রাগভক্তি। সে ভক্তি যদি আসে, আর বৈধী কর্মের প্রয়োজন হয় না। * * প্রথম প্রথম কর্মের খুব হৈ চৈ থাকে। ঈশ্বরের পথে যত এগুবে ততই কর্ম কমবে। শেষে কর্মত্যাগ আর সমাধি। * * যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, ইন্দ্রিয়সংযম আর চেষ্টা করে করতে হয় না। রিপুবশ আপনা আপনি হয়ে যায়। * * যদি সমাধি হয়, আর মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়, তাহলে আর অহংকার থাকে না। কি রকম জানো? ঠিক দুপুর বেলা সূর্য ঠিক মাথার উপরে উঠে। তখন মানুষটা চারিদিকে চেয়ে দেখে আর ছায়া নাই। তাই ঠিক জ্ঞান হলে—সমাধিস্থ হলে অহংরূপ ছায়া থাকে না।"

'তাঁকে ঘরে আনা,' 'আত্মার সাক্ষাৎকার', 'ঈশ্বরের কৃপা হওয়া', 'ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি'— শ্রীরামকৃষ্ণকথিত এই বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির অর্থ একই—জীবনের পরম ও চরম সত্যের অনুভূতি। উহাই ধর্মমেঘ—ধর্মের অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের উৎস। যে জলধারাকে নিত্যসঞ্জীবিত করিবার মত কোন উৎস পশ্চাতে নাই, সে ধারা পথে শুকাইয়া যাইতে পারে—সে ধারার স্রোত-বেগ মন্দীভূত, এমন কি একেবারেই বিলুপ্ত হইতে পারে— সে ধারার উপর আমাদের আস্থা সংশয়াকুল। যে ধর্মকৃত্য বা ধর্মদৃষ্টি মাত্র সামাজিক নিয়মরক্ষা মাত্র তাহা শ্রেষ্ঠ কল্যাণশক্তি নয়। চরাচর বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে নিগূঢ় সাম্য ও শান্তি নিহিত আছে, তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই বলিয়া এই আনুষ্ঠানিক ধর্মাচার দ্বারা মানবসমাজে মহামিলন সম্পাদিত হইবার নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে সকল বিবাদ, নিপীড়ন প্রভৃতির কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলি ঘটা সম্ভবপর হইয়াছিল ধর্ম তাহার লক্ষ্যে পৌঁছায় নাই বলিয়াই, উহাকে সংসারের আর দশটা জিনিসের মতই বৈঠকখানা সাজাইবার সৌখীন একটা জাপানী ফুলদানিমাত্র করিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়াই। মানুষ যেখানে ভূমাকে আবিষ্কার করিয়াছে—ভূমা যেখানে জীবনে কল্যাণ-বন্যা প্রবাহিত করিয়াছে, সেখানে মানুষের ইতিহাস লিখিত হয় অন্যভাবে। সে ইতিহাস লইয়া উত্তর-কালীনরা কোন সংশয় তুলেনা, লজ্জিত হয় না। সে ইতিহাসে মানুষের আত্মিক মহিমা চিরদিন অপরিম্লান বিভায় জ্বল্ জ্বল্ করে।

আমরা যখন বলি, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ধর্মে—তখন আমরা ধর্মের গতানুগতিক আচার ও বিশ্বাসগুলির কথা বুঝাই না—বুঝাই ধর্মের মূলকেন্দ্র 'ধর্মমেঘের' কথা। কতকগুলি অন্ধ আচার ও বিশ্বাস জাতির সমগ্র জীবনীশক্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে না; খণ্ডিতভাবে পারে, কিছুকালের জন্য পারে। কিন্তু জাতির সমস্ত দেহে বিপুল আলোড়ন আনিয়া দেয় সামগ্রিক সত্যের বিজ্ঞান— 'ধর্মমেঘ'। ভারতীয় জাতির জীবনে ইহাই ঘটিয়াছিল। আজ যদি আবার আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক প্রকৃতি লইয়া গর্বপ্রকাশ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগেরও দায়িত্ব আধ্যাত্মিকতার উৎসকে বিস্মৃত না হওয়া, ঐ উৎস হইতে জাতীয় জীবনকে বিচ্ছিন্ন না করা, ঐ উৎসে পৌঁছিবার উৎসাহকে সজীব রাখা।

কেহ যদি বলে,—'আমি এই দুনিয়ার কোন

কিছু চাইনা ; অর্থ, মান, ভোগসুখ এ সকল আমার প্রয়োজন নাই, আমি চাই শুধু সত্যকে লাভ করিতে, ঈশ্বরদর্শন করিতে' তাহা হইলে আমরা যেন তাহাকে 'ইহকাল বিমুখ' বলিয়া উপহাস না করি। সকলেই কিছু এইরূপ পাগল হইবে না—কিন্তু যে হইতে পারে ভারতবর্ষে তাহাকে শ্রেষ্ঠ বীরের সম্মান দিয়া আসা হইয়াছে। অন্যান্য দেশ বা জাতির তুলনায় ভারতের মাটিতে এইরূপ 'পাগল' অনেক বেশী জন্মায়। ইহা ভারতবর্ষের লজ্জা নয়, শক্তি। যে যায় সে তো আবার ফিরিয়া আসিবার জন্যই যায়। বুদ্ধ গিয়াছিলেন, শঙ্কর গিযাছিলেন, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়াছিলেন,—কিন্তু প্রত্যেকেই যখন ফিরিয়া আসিলেন, জগৎকে কত সম্পদ দিয়া গেলেন—কত শক্তি, কত উৎসাহ, কত শান্তি, কত সামঞ্জস্য, কত যুগের জন্য কত ঐশ্বর্য রাখিয়া গেলেন। ধর্মমেঘ মানুষের জীবন-আকাশে নিষ্ফল শোভামাত্র নয়—উহা 'সহস্রশঃ' 'ধর্মামৃতধারা' বর্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। সেই অমৃতধারায় সমাজের যাহা কিছু কল্যাণজনক সকলই অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তি

জন্মাষ্টমী আসিতেছে।

জন্মিয়াই যিনি মানুষকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যত দিন পৃথিবীতে ছিলেন নানা-ভাবে নিকটের, দূরের আবালবৃদ্ধবনিতা শত্রু মিত্র সকলকে আকর্ষণ করিয়া গেলেন, আবার পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার পর সুচিরকালের জন্য বিশাল ভারতবর্ষের দিকে দিকে উত্তরকালীনদের হৃদয়ে হৃদয়ে এক দুরতিক্রম্য আকর্ষণ রাখিয়া গেলেন—তাঁহার জন্মের কথা, সর্বাকর্ষক কৃষ্ণের মর্ত্যজীবন-লীলার কথা মনে পড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অসাধারণ কীর্তির কথা। কত ভালবাসা, কত কোমলতা, আবার কত রোষ, কত কঠোরতা ; কত প্রচণ্ড কর্মব্যাপৃতি, সংগ্রাম, আবার কত শান্তি, ঔদাস্য। এই সবগুলিরই মধ্যে একটি জিনিস কিন্তু সাধারণ—তাঁহার দুর্বার আকর্ষণ। আকর্ষণই শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তি। সর্বভাবে সর্বকালে সর্বসংসারকে আকর্ষণ করেন বলিয়াই তিনি কৃষ্ণ।

শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের জীবন-মর্ম সংক্ষেপে এই ভাবে বর্ণনা করিযাছেন ঃ—

"ত্রিভুবনের যাহাকিছু রমণীয় তাহা তাঁহার মনোহর মূর্তির নিকট যেন ম্লান হইয়া যাইত, মানুষের চোখ তাঁহার দিকে একবার চাহিলে আর অপর বস্তুর দিকে চাহিতে পারিত না, তাঁহার মধু-নিস্যন্দী জ্ঞান-গর্ভ বাক্য শুনিলে, স্মরণ করিলে মানব-চিত্ত চিরকালের মতো আকৃষ্ট হইয়া থাকিত, তাঁহাব পদচিহ্ন অবলোকন করিলে মানুষ সকল কাজ ছাড়িয়া স্তব্ধ হইয়া যাইত। এমনই আকর্ষণে তিনি সকলকে আভিভূত করিয়া দিতেন। তাঁহার বহু-বিচিত্রময় জীবনে যে সকল কর্ম তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার লোকোত্তর মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাবীকালের নরনারী উহা অনুধ্যান করিয়া সহজেই হৃদযের মলিনতা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। এই কীর্তি রাখিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় ধামে প্রয়াণ করিলেন।*" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৬,৭)

সংসারে কত নয়নবিমোহন শিশু আসিয়াছে, খেলিয়াছে, কত প্রেমিক নির্মল ভালবাসার আদর্শ দেখাইয়া গিযাছে, কত রাজা, কত যোদ্ধা ইতিহাসে দাগ রাখিয়াছে, কত তপস্বী তপস্যা করিয়াছে, কত জ্ঞানী তত্ত্বসাক্ষাৎকার ও কত বক্তা বাক্যৈশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু সে সকল কীর্তি মানব-কীর্তিই। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তির প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু মানবতার মানদণ্ডে উহার প্রভাব নির্ণয় করা

* স্বমূর্ত্যা লোকলাবণ্যনির্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাং।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ॥
আচ্ছিদ্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্যহ্যঞ্জসা নু কৌ।
তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ॥

যায় না। মানবকীর্তি জাগায় বিস্ময়, শ্রদ্ধা; উদ্রিক্ত করে প্রশংসা; রচনা করে ইতিহাস, কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তি উন্মেষ করে নির্মল ভক্তি; আনে অতীন্দ্রিয় আবেশ; গড়ে সত্যদৃষ্টিদায়ী সংশাস্ত্র।

শ্রীকৃষ্ণ শিশু, প্রেমিক, রাজা, যোদ্ধা, তপস্বী, জ্ঞানী, শাস্ত্রব্যাখ্যাতা কিন্তু প্রত্যেক ভূমিকার পশ্চাতে তাঁহার ভগবত্তা ছাইয়া আছে। তাই এই সকল ভূমিকায় তাঁহাতে যে মাধুর্য, যে বীর্য প্রকট হইয়াছিল—মানুষ তাহা পরিমাপ করিতে পারে না, ভাষাতেও প্রকাশ করিতে পারে না। উহা চিরন্তন ধ্যানের বস্তু।

প্রশংসনীয়

'ইউ এস্ আই এস্' এর একটি সংবাদে প্রকাশ—এই জুলাই এবং আগষ্ট মাসে আমেরিকার 'ন্যাস্নাল কাউন্সিল্ অব্ চার্চেস্'-এর উদ্যোগে আমেরিকার অনুকূল এবং মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশযুক্ত কয়েকটি স্থানে একান্তভাবে ভগবৎচিন্তা এবং প্রার্থনাদিতে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাইতে সমুৎসুক ১৪০০ মার্কিন দেশবাসীর জন্য 'আশ্রমবাসের' ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক একটি স্থানে একসঙ্গে আন্দাজ দুই শত ব্যক্তি এক এক সপ্তাহ করিয়া থাকিবেন। আশ্রমজীবনের এই পরিকল্পনাটি হিন্দুধর্মাবলম্বীগণের অনুকরণে আমেরিকায় চালু করিয়াছেন ডাঃ ই স্ট্যান্লি জোন্স্। ইনি পূর্বে ভারতবর্ষে মিশনারী-রূপে ছিলেন।

শত প্রকারের উত্তেজনাময় কর্মব্যস্ত জীবনে এইরূপ অন্তর্মুখীনতা অভ্যাসের অল্পমাত্র সুযোগও সমধিক আদরণীয়। খ্রীষ্টধর্মের ঐতিহ্যে এইরূপ নির্জনে ঈশ্বরচিন্তার প্রথা সুপরিচিত। পশ্চিম ইয়োরোপের লাটিন দেশসমূহে ৬।৭ শতাব্দী পূর্বেকার মঠগুলির কথা স্মরণীয়। খ্রীষ্টধর্মের মূল সত্যগুলি জীবনে পরিণত করিবার আগ্রহ তখন খ্রীষ্টান সমাজে জাগ্রত ছিল। তাই নির্জনবাস, প্রার্থনা, ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, ভক্তি—এ সকল আধ্যাত্মিক সাধনগুলি ব্যক্তিগতভাবে অনেকের নিকট আদরণীয় ছিল।

পরবর্তীকালে প্রধানতঃ বিজ্ঞানের প্রসার এবং শিল্পবিপ্লবের ফলে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা উৎকট ভোগবাদ দ্বারা ব্যাপকভাবে যখন আচ্ছন্ন হইল, তখন ধর্মের অন্তরঙ্গসাধনার দিকে মানুষের হুঁশ ক্রমশঃই কমিয়া আসিতে থাকে এবং ধর্ম কেবল গীর্জা-সংক্রান্ত কতকগুলি বিধিব আনুগত্যে পর্যবসিত হয়। খ্রীষ্ট-ধর্মের ইহা যে দারুণ সঙ্কট তাহা স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীঃ হইতে প্রায় চার বৎসর আমেরিকা মহাদেশের নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নির্ভীক উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী-দিগকে 'হিন্দু' হইতে বলেন নাই, বলিয়াছিলেন যথার্থ খ্রীষ্টান হইতে। ধর্ম যদি এক ধরনের সামাজি-কতামাত্র রহিয়া যায়, তাহা হইলে ধর্মের প্রাণশক্তি শুকাইয়া যায়। ধর্ম তখনই সতেজ ও কল্যাণপ্রদ, যখন উহা ব্যষ্টিগত জীবনের একটি সত্যদৃষ্টি এবং ভগবদুন্মুখী বিশুদ্ধ অতীন্দ্রিয় আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুশীলিত হয়।

'ইউ এস্ আই এস' যে সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন, উহার বিশদ পূর্বপশ্চাৎ বিবরণ জানা নাই বলিয়া দূর হইতে আমেরিকান গীর্জার জাতীয় সংসদের উপরোক্ত উদ্যমের বিস্তারিত বিচার করা সম্ভবপর নয়—তবে মার্কিন ধর্মজীবনের পক্ষে পরিকল্পনাটির উপকারিতা সম্বন্ধে আস্থা হয় এবং এইজন্যই উহার প্রশংসা করি।

নিন্দনীয়

দৈনিক বসুমতী এই সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন—

(নিজস্ব সংবাদ)

মহিষবাথান (২৪ পরগণা), ২৭শে, জুন :—সম্প্রতি স্থানীয় কৃষ্ণপুর গীর্জায় এক সাধুর আবির্ভাব ঘটে। ইনি দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন বলিয়া জনরব প্রচারিত হইলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় উক্ত গীর্জায় বহু নরনারীর সমাবেশ হয়। সাধুবাবাজী

অন্ধের চক্ষু, বোবার বাকশক্তি এবং খঞ্জকে স্বাভাবিকভাবে হাঁটিবার শক্তি প্রদান করিতে পারেন বলিয়া প্রচার করা হয়। কোনও রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা এই সাধুবেশী ভদ্রলোকটিকে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক বলিয়া অনুমান করিতেছেন। গত ২১শে জুন তিনি উক্ত গীর্জা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জানা গেল।

এদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যাইতেছে এবং সরকারী ও বেসরকারী মহলে বহু আলোচনাও চলিতেছে। উপরোক্ত সংবাদটি মিশনারীদের 'নিঃস্বার্থ কল্যাণচেষ্টার' একটি নূতন নমুনা। কিছুকাল পূর্বে জনৈক খ্রীষ্টান ভদ্রলোক একটি সংবাদপত্রে মিশনারীদের ধর্মান্তরীকরণের চেষ্টাকে সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন 'অখ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টধর্মে আনয়ন' — খ্রীষ্টধর্মের একটি প্রধানতম কৃত্য। অতএব মিশনারীদের এই চেষ্টাকে নিন্দা কর কেন?' এ দেশ যখন খ্রীষ্টান রাজশক্তির অধীনে ছিল তখন 'খ্রীষ্টধর্মের এই প্রধান কৃত্যটির' কথা খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এমন নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন নাই। আজ 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতরাষ্ট্রে তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা কাটিয়া গিয়াছে। আজ তাঁহাদের অপকর্মকে তাঁহারা জোর গলায় সমর্থন করিতে শঙ্কিত হন না।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের কর্তব্য সুস্পষ্ট। বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুসমাজে যাঁহারা 'বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত' (privileged)—বিত্তায়, আভিজাত্যে, ধনসম্পদে—তাঁহাদিগকে নিজেদের অধিকার লইয়া নিরাপদ কোণে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যত শীঘ্র সম্ভব, যত দিকে সম্ভব 'বঞ্চিত গণকে তুলিয়া লইবার দায়িত্ব তাঁহাদিগকেই বেশি করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 'বঞ্চিত'গণ খ্রীষ্টান মিশনারীগণের ধর্মান্তরীকরণের লক্ষ্য। হিন্দুসমাজে যদি তাহাদের জন্য সহানুভূতি, সাম্য, উদার ব্যবহারের প্রাচুর্য থাকে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চিতই পরধর্ম গ্রহণ করিতে পা বাড়াইবে না। কি মর্মান্তিক দুঃখে তাহাদিগকে স্বধর্ম ত্যাগ করিতে হয়, তাহাই আজ সমাজশীর্ষগণের বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিবার।

জন্মাষ্টমী

শান্তশীল দাশ

গীতা-উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণ আজ তোমার জন্মদিনে,
ব্যাকুল চিত্তে তোমারে স্মরণ করি।
ঘন দুঃখের দুর্গম পথে আমরা পথিক সবে,
সমুখে মোদের অতন্দ্র বিভাবরী।

চলার মন্ত্র ভুলে গেছি মোরা, রুদ্ধ হয়েছে গতি,
সীমাহীন শুধু গভীর অন্ধকার।
সকল আলোর হে দিশারী! আজ জ্ঞান-বর্তিকা জ্বালো,
যুগ-সঞ্চিত শেষ হোক্ তমসার।

পার্থ আজিকে বড় অসহায়, মোহ-অঞ্জন চোখে,
সমর ক্ষেত্র নির্বাক, নিশ্চল;
হরণ করেছে কে যেন তাহার অতুলন বিক্রম,
গাণ্ডীব ধনু হতাশায় বিহ্বল।

হে চির সারথি। দূর করে দাও চিত্তের অবসাদ,
ক্ষাত্র তেজের কর হে উদ্বোধন;
কর্মযোগের দুরূহ মন্ত্রে দীক্ষা দাও আবার,
ঘুচে যাক্ তার ক্লীবতার আবরণ।

অন্ধ-দৃষ্টি মানুষ আজিকে, পৃথিবী বেদনা-ম্লান,
আঁখিজল ঝরে, ওগো চির-সুন্দর!
এস আর বার ধরিত্রী-বুকে কাতরে স্মরণ করি,
কর ধরণীরে পুন চির-ভাস্বর।

আমেরিকায় ভারতের অধ্যাত্মবাণী

স্বামী পবিত্রানন্দ

[১৮ই এপ্রিল ১৯৫৪, 'ভয়েস্ অব আমেরিকা'য় দূর প্রাচ্য দেশগুলির জন্য প্রদত্ত বেতারভাষণ হইতে সঙ্কলিত।]

আমি তিনবছর আগে এদেশে এসেছি। ঠিক ১৯৫১ খৃঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী আমি নিউইয়র্কে পা দিই। ভারত ত্যাগ করবার সময়, দেশের সেই-সময়কার অবস্থা দেখে খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের পর আমাদের দেশে এল উদ্বাস্তু, খাদ্য এবং অন্যান্য বিবিধ সমস্যা। বহু লোকের মনে হতাশা ও অসন্তোষ দেখা দিল। সত্য বলতে কি, এই অবস্থা আমার উপরও যে প্রতিক্রিয়া করেনি, তা নয়। কখনও কখনও আমিও বড় মনমরা হয়ে যেতাম। কিন্তু ভারতের বাহিরে আসার পর যখন পাশ্চাত্ত্য দেশ সম্বন্ধে জানলাম, তখন আমাকে মানতেই হল যে, মানুষ সর্বত্রই সেই মানুষ। সব খানেই সে পরিস্থিতি ও সংকটের সংগে সংগ্রাম করে চলেছে। তার জীবন উত্থান ও পতন, ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণে গঠিত। এখন এই দূর থেকে যখন ভারতের দিকে ফিরে চাই এবং অনেকটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখি যে, ভারত কিভাবে তার কঠিন সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছে, তখন প্রশংসায় হৃদয় ভরে উঠে। কোন কাজেই ফল সহসা আসে না, সময় লাগে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারত যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে, তা থেকে সে সফলকাম হয়ে বেরিয়ে আসবেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ, আমাকে নিউইয়র্কের বেদান্ত সমিতির কার্যভারের দায়িত্ব দিয়ে এদেশে পাঠিয়েছেন। এই সমিতি, ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন, ১৮৯৩ খ্রীঃ তিনি এদেশে এসে চিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগদান করেন। তিনি হিন্দুধর্ম, অর্থাৎ দার্শনিক সংজ্ঞায় বললে, 'বেদান্ত' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেই একটি বক্তৃতাই তাঁকে প্রসিদ্ধ করে তুললো, অপরিচিতির অন্ধকার থেকে তাঁকে নিয়ে এলো জগতের প্রচণ্ড দিবা-লোকের সামনে। সেই রাতে বিবেকানন্দ অশ্রুবর্ষণ করেছিলেন, কেননা ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ একজন সন্ন্যাসীর যেমন সাধারণের দৃষ্টির বাহিরে থাকা কাম্য তেমনি করে তিনি আর অপরিচিত ও অলক্ষিত থাকতে পারবেন না।

ভারতের তটভূমি ত্যাগ করে কোন হিন্দু সন্ন্যাসীর বিদেশে ভারতের বাণী প্রচার করতে যাওয়া স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে ঘটল অন্ততঃ হাজার বৎসর পরে। পুরাকালে বা বৌদ্ধযুগে ভারতীয় সন্ন্যাসীরা ভারতের সীমারেখা পার হয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর নানা কারণে আমাদের সমাজ হয়ে উঠেছিল কঠোর এবং এমনকি গৃহী ব্যক্তিও বিপুল সামাজিক বাধার সম্মুখীন না হয়ে তথাকথিত 'কালাপানি' বা সমুদ্র পার হতে সাহস করত না।

পৃথিবীর যাবতীয় দেশের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ যে আমেরিকাতেই গিয়ে প্রথম তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন এটা কি অদ্ভুত নয়? এমনি করে কি তিনি পৃথিবীর অতি প্রাচীনতম দেশ গুলোর একটির, ও তুলনায় একটি অতি আধুনিক জাতির মধ্যে সেতু-স্বরূপ হন নি? এর কি এই ইঙ্গিত নয় যে, ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ আমেরিকার যন্ত্রশক্তির সংগে সংযুক্ত হয়ে জগতে আনবে একটি উন্নততর অবস্থা? কারণ দুটোরই প্রয়োজন আছে।

কোন মানুষ বা জাতি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ ছাড়া পাশবিক স্তরে পতিত হয়। আবার কোন মানুষ বা জাতি যতদিন না তার জাগতিক প্রয়োজনের সমস্যা সমাধান করতে পারছে, ততদিন তার বাঁচার আশা থাকতে পারে না। ক্ষিদেয় যখন পেট জ্বলে, সে অবস্থায় ধর্ম এবং ঈশ্বরের চিন্তা করা যায় না। রাজনৈতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক বাধার ফলে দীর্ঘকাল স্থায়ী দারিদ্র্য ও হৃদয়-বিদারক দুঃখ থাকা সত্ত্বেও ভারত যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার আলোক-বর্তিকা প্রজ্বলিত রাখতে সক্ষম হয়েছে, এটা পৃথিবীর কাছে একটি বিরাট বিস্ময়। ভারতেতিহাসের প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে একজন মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে, যিনি মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি তা লোক সমক্ষে দেখিয়ে গেছেন ও জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সাম্যের পুনঃপ্রবর্তন করেছেন। কিন্তু শুধু অতীতের গৌরব করলে চলবে না। আমাদের উচিত বর্তমানকে নিয়ে থাকার চেষ্টা করা ও বেশি না পারলেও অন্ততঃ তাকে অতীতের মত গৌরবোজ্জ্বল করে তোলা। প্রত্যেক ভারত-বাসীর উপর এই বিরাট দায়িত্বভার ন্যস্ত আছে।

এখন দেখা যাক, পাশ্চাত্যে এবং এই দেশে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের কোন্ বাণী বহন করে এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অনবরত চেষ্টা করে নিখুঁত হতে হবে, দেবতা হতে হবে, ঈশ্বরকে পেতে ও দেখতে হবে, আর এই ঈশ্বরকে পাওয়া ও দেখা—স্বর্গীয় পিতা যেমন নির্দোষ তেমনি নির্দোষ হওয়াতেই আছে যথার্থ ধর্মের বীজ। মনুষ্যজীবনে মানুষের পক্ষে পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব। এ নয় যে, এই সম্পূর্ণতা লাভ করতে হলে মানুষকে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে। হিন্দুধর্ম বলে, এই জীবনেই ভগবানকে দেখা ও লাভ করা যায়। মানুষ সাক্ষাৎ সত্যদর্শন করে তার সমগ্র জীবনকে পরিবর্তিত করেছে, জগতের ইতিহাসে এই রকম অনেক নিদর্শন আছে।

আধ্যাত্মিক আদর্শের এই যদি মর্মকথা হয়, তবে তো ধর্মে ধর্মে ভেদ থাকে না। একটি ধর্ম যদি সত্য হয়, তাহলে অপরটিও সত্য। সেই একই পূর্ণতা লাভার্থে বিভিন্ন ধর্ম, যেন বিভিন্ন চেষ্টা মাত্র। তাই বেদান্ত কেবল ধর্ম বিষয়ে পরমতসহিষ্ণুতার কথা না ব'লে, বলে থাকে একই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য, সব ধর্মই স্বীকার্য।

আমেরিকায় বা পাশ্চাত্যের সবগুলি বেদান্ত কেন্দ্রে ধর্মের প্রতি আমাদের এই উদার দৃষ্টিভংগী দেখে অনেকে আকৃষ্ট হয়। ধর্মক্ষেত্রে গোঁড়ামি ও মতবাদসবস্ব আধুনিক পরিবেশে এমন লোকও আছেন, যাঁরা ঈশ্বরের নামে সংকীর্ণতা সহ্য করতে পাবেন না ও বেদান্তবাণার সংস্পর্শ পেয়ে অন্তরে শান্তি পান।

নিউইয়র্ক বেদান্তকেন্দ্রের উপাসনা মন্দিরের একটি দেওয়ালে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের প্রতীক খোদিত আছে; যথা ইসলামের 'অর্ধচন্দ্র,' বৌদ্ধদেব 'ধর্মচক্র,' বেদান্তের 'ওঁ,' ইহুদিদের 'তারকা' এবং খ্রীষ্টধর্মের 'ক্রুশ'। এ সবের নীচে লেখা আছে—"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি—।" "সত্য এক, জ্ঞানিগণ উহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।" এই ভাবই আমাদের অবলম্বন এবং আমাদের প্রাণপণে এইভাব গ্রহণ করিতে দেখে অনেকে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েন।

আমেরিকায় এখন আমাদের ১১টি কেন্দ্র আছে। দুটি নিউইয়র্কে, তিনটি ক্যালিফোর্ণিয়ায় এবং বোষ্টন, প্রভিডেন্স, সেণ্ট লুই, চিকাগো, সিয়েটল ও পোর্ট-ল্যাণ্ড এই সব স্থানে একটি করে। এই রাষ্ট্রে আমরা সবাই মিলে, রামকৃষ্ণ মিশনের ১০জন সন্ন্যাসী কর্মরত রয়েছি।

ভারত, সিংহল, ব্রহ্ম ও অন্যত্র রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের কাজ হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা ও ধর্ম বিষয়ক কর্মানুষ্ঠান-পরিচালনা। এখানে আমেরিকায় আমরা কেবল প্রচার-কাজই করি। বক্তৃতা এবং

পুস্তকাদির প্রকাশ ও বিতরণের মাধ্যমে সাধারণতঃ এদেশের গীর্জাগুলিতে যেমন হয়, আমরাও তেমনি রবিবার সকালে বক্তৃতা করে থাকি এবং সপ্তাহের মধ্যে দুদিন কিংবা একদিন সন্ধ্যায় শাস্ত্রালোচনা ও ধ্যান ধারণার শিক্ষাদান করি। আধ্যাত্মিক সমস্যা নিয়ে লোকেরা আমাদের সংগে আলোচনা করতে আসেন। এটা বাস্তবিকই খুব দরকারী কাজ। আমাদের নিজেদের পাঠালোচনা ছাড়াও, বাহিরের ধর্মসভায় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমরা প্রায়ই বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান পাই। বাহিরে এই ভাবের বক্তৃতায় ভারত সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণার অপসারণ হয়। জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যদিও নিকটবর্তী হতে চলেছে তবুও, এখনও এই ভ্রান্ত ধারণা অতিমাত্রায় বর্তমান।

আমাদের ধর্মসভায় যে খুব বেশী লোক হয় তা বলা যায় না। বাস্তবিক বলতে কি আমেরিকার কয়েকটি গীর্জায় যে জনসমাগম হয় সে তুলনায় আমাদের শ্রোতার সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু যে ঐকান্তিকতা ও অকপটতা নিয়ে আমাদের কেন্দ্রগুলিতে শ্রোতারা আসেন তা বিস্ময়কর। তাঁরা কোন সিদ্ধাই দেখবেন বলে আসেন না। যাঁরা ইন্দ্রজালপটু সন্ন্যাসী বা প্রাচ্য যোগীর কাছ থেকে কিছু সিদ্ধাই দেখবার আশায় আসেন, তাঁরা আপনা হতেই সরে পড়েন। আমাদের কাছে যাঁরা আসেন, তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য স্পষ্ট কিছু পেতে চান। সময়ে সময়ে ভাবি, এ আমাদের এক মহাদায়িত্ব। শ্রীভগবান—যাঁর নামে আমরা এখানে এসেছি, আমাদের যেন পূর্ণরূপে এ দায়িত্ব পালন করতে শক্তি দেন।

বিশেষ করে, যখন প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের এক দেশে কাজ করছি, তখন বেদান্ত সেই ধর্মকে কি চোখে দেখে এখন তাই দেখা যাক। পূর্বেই বলেছি, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সব ধর্ম মূলতঃ এক। অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে অনেক পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু সেগুলোকে তো সহজেই উপেক্ষা করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কথা ধরা যাক। ক্রীশ্চানরা জড় দেহের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী। আমরা বলি, এ দেহ কিছুই নয়, আধ্যাত্মিক শরীরই নিত্য বস্তু। জড় দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক দেহ অনন্তকাল থাকে। যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা জড় দেহ না দেখে আধ্যাত্মিক দেহ দেখেছিলেন। এই উক্তির সমর্থনে আমরা সেণ্ট পলের ভাষণ উদ্ধৃত করতে পারি: "মৃতের পুনরুত্থানও সেই রকম। পাপের মধ্যে পুনরুত্থানের বীজ উপ্ত হয়, নিষ্পাপ অবস্থায় ইহা উত্থিত হয়" · "প্রাকৃত দেহে ইহা উপ্ত হয়; আধ্যাত্মিক শরীরে ইহা উত্থিত হয়।"

আমাদেরও এই কথা। কিন্তু ব্যাখ্যার পার্থক্যে কি কিছু এসে যায়? যীশু বলেছিলেন:—

(১) মানুষ যদি তার আত্মাকে হারিয়ে ফেলে, তবে সারা পৃথিবীর অধীশ্বর হলেই বা লাভ কি?

(২) আগে ভগবানকে খোঁজ, আর সব এসে যাবে।

(৩) মন, প্রাণ, অন্তর দিয়ে তোমার প্রভুকে, তোমার ঈশ্বরকে ভালবাসবে।

(৪) প্রতিবেশীকে নিজের মতই ভালবাসবে।

ব্যাখ্যার কোন পার্থক্য কি যীশুর এই সব বাণীর গৌরবকে ছোট করতে পারে?

যীশু প্যালেস্টাইনের প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মের ঐটিই কি মূলকথা নয়? ঈশ্বর বিভিন্ন 'প্রেরিত পুরুষ' ও বিভিন্ন অবতারকে সহায় করে বিবিধ ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু আমরা যদি যত্ন করে তা অনুসরণ করি তবেই না বুঝব যে, তাঁরা একই সত্য প্রচার করেন।

আজ যীশুর পুনরুত্থানের দিন। ক্রীশ্চানরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষের উপকারার্থে এই দিনে তিনি সমাধি থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু

আমরা যদি তাঁর কথা অনুযায়ী কাজ করি, তবেই সেই উপকার সাধিত হয়। তাঁর বাণী হল মানবতার শাশ্বত বাণী, যা সদাই আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ।

আমরা জগতের এক সংকটময় কালে বাস করছি। এখন আবার এক যুদ্ধপ্রস্তুতির মহড়া চলেছে। সকলের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, আবার যদি যুদ্ধ বাধে, তাহলে সমগ্র বিশ্ব ও তার সঙ্গে মানুষের এত দিনের চেষ্টা ও শ্রম-নির্মিত সমগ্র সভ্যতা বিনষ্ট হইবে। লোক হতাশায় কেঁদে বলে—মানুষ মানুষের কি দশা করেছে। যা শাশ্বতবাণী বা যা জগতের প্রেরিত পুরুষদের কথা—তার দিকে আরও সক্রিয়ভাবে আমাদের দৃষ্টি ফেরাবার সময় কি আসেনি? ··· প্রাচীন ভারতের বৈদিক ঋষিদের বাণী হল—

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদীহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

এই পৃথিবীতেই যদি তুমি বেচে থাকতে থাকতে আধ্যাত্মিক সত্য লাভ কর, তবে ধন্য হবে। যদি তুমি আধ্যাত্মিক সত্যলাভ না করতে পার, তাহলে তোমার দুঃখের পর দুঃখ আসবে। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জাতি, বর্ণ বা ভৌগোলিক সীমা নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একই দৈবী শক্তি নিরীক্ষণ করেন তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।

অক্ষম

শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম্-এ

সবারে দিয়েছ কাজ তোমার সংসারে;
বরষ মাসের মত তারা বারে বারে—
আপনার কক্ষপথে হৃষ্ট শান্ত মনে
নিত্য আবর্তিয়া ফিরে। তারা অকারণে
হয় না উতলা কভু, হয় না অধীর।
আমারে করেছ হায় রিক্ত মুসাফির—
চলার এ' পথে! দিলে মোর ক্ষীণ হাতে
একখানি বীণা শুধু,—দাও নি সে সাথে
শক্তির গৌরব!

তাই অপটু অঙ্গুলি—
পদে পদে মরমের সুর যায় ভুলি।
জমে না রাগিনী রাগ লয়-তান-মীড়ে;
অর্ধপথে অতর্কিতে তন্ত্রী যায় ছিঁড়ে!
প্রকাশ-ব্যথায় তাই ক্ষুব্ধ শান্তি হীন—
আমার অতন্দ্র রাতি, মোর দীর্ঘ দিন!

লালন ফকির ও তাঁহার সঙ্গীত

শ্রীমতী মিনতি দেবী

সাধক ও সুললিত সঙ্গীতের রচয়িতা হিসাবে ফকির লালন সাহ (বা লালন ফকির) এদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের নিকটই সমান পরিচিত। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনী ও সাধনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না, যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা এইরূপ—সংসারাশ্রমে লালন ফকিরের নাম ছিল লালন দাস। কুষ্টিয়া মহকুমার ভাঁড়ারা গ্রামের এক কায়স্থ পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার জননীর নাম পদ্মাবতী। অল্প বয়সেই লালনের বিবাহ হইয়াছিল। বাল্যকালে একবার তিনি এক প্রতিবাসীর সহিত গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে শংরাকুলে যান। সেখানেই তিনি ভয়ানক বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। ক্রমে তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে থাকে ; এবং শেষে সংজ্ঞাহীন হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া শ্মশানে লইয়া যায় ; তথায় মুখাগ্নি ও যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করার পর তাহারা লালনকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। বাড়ীতে জননী পদ্মাবতী এই খবর শুনিয়া শোকে যে মুহ্যমান্ হইয়া পড়িলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা যথারীতি লালনের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীও বৈধব্যাচরণ আরম্ভ করেন। ওদিকে আত্মীয়-সজন ও সঙ্গীরা মৃত মনে করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলেও লালনের প্রাণবায়ু কিন্তু তখনো নিঃশেষ হয় নাই। সর্বপাপহারী গঙ্গার শীতল জলে ভাসিতে ভাসিতে তিনি এক স্নানের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে স্নানার্থিনী জোলা-জাতীয়া এক মুসলমান রমণী লালনকে দেখিতে পাইয়া মাতৃতুল্য স্নেহে তাঁহাকে নিজগৃহে লইযা আসেন। সেখানে মমতাময়ী এই রমণী ও আরো কয়েকজনের সেবাশুশ্রূষায় কিছুদিন পরেই লালন সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তারপর একদিন প্রাণরক্ষাকারিণী এই মুসলমান রমণীর নিকট বিদায় লইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন নিজ বাটীতে। 'মৃত' পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া পদ্মাবতী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্ত্রীও স্বামীকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিতা হইলেন। কিন্তু ইহার পরের ঘটনাই অত্যন্ত করুণ। যে পুত্র এতদিন মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করিয়াছে এবং আত্মীয়স্বজন কর্তৃক যথানিয়মে যাহার শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় গৃহে নওয়া চলে কি না, স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে সে বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করার তীব্র বিরোধী। জননী পদ্মাবতী দ্বিধায় পড়িলেন। একদিকে পুত্রস্নেহ অপরদিকে জাতিধর্ম, ইহার কোন্‌টিকে গ্রহণ করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। অপর পাঁচজনের পরামর্শে থালার পরিবর্তে কদলী-পত্রে ভাত দিয়া লালনকে তিনি বারান্দায় বসাইতে বাধ্য হইলেন। জননী হইয়া পুত্রকে এতদূর অযত্ন করিতে তাঁহার প্রাণ যে ফাটিয়া যাইতেছিল, তাহা বুঝিতে আমাদের আদৌ কষ্ট হয় না। অন্নগ্রহণ শেষ করিয়া লালন ভারাক্রান্ত চিত্তে গৃহে সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। জননীর ব্যথা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহারও দেরী হয় নাই। লালন আপন মনে চিন্তা করিতেছেন, ঠিক এই সময় সিরাজসাঁই নামক জনৈক দরবেশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি লালনের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া লালনকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। সূচীভেদ্য অন্ধকারে লালন যেন আলোর সন্ধান পাইলেন, সাঁইজীর উপদেশ লালনের হৃদয়কে এক অপূর্ব মধুর রসে পূর্ণ করিয়া দিল। তিনি তখনই গৃহত্যাগের সংকল্প করিলেন। তারপর জননী, স্ত্রী, গৃহ, অর্থ এবং পার্থিব সব কিছুর মায়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি

বাহির হইয়া পড়িলেন মহত্তর ও সার্থকতর জীবনের সন্ধানে। পরবর্তী কালে তিনি লালন ফকির নামেই বিখ্যাত হন। সিরাজসাইকেই তিনি জীবনে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লন এবং তাঁহার রচিত বহু গানে সাঁইজীর নামোল্লেখ দেখা যায়।

লালনের জাতি কী, তিনি কোন্ ধর্মাবলম্বী, যে বিষয়ে আজো সঠিক কিছু জানা যায় না। হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও মুসলমানের হস্তে তিনি অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য অনেকে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই সাব্যস্ত করেন। লালন কিন্তু কোনদিনই নিজের ধর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নে কোনই গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন

সব লোক বলে, লালন কি জাত সংসারে ?
লালন বলে, জাতির কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে।
কেউ মালা, কেউ তস্‌বী গলে,
তাই তো জাত ভিন্ন বলে,
যাওয়া কিংবা আসার বেলা জাতির চিহ্ন রয় কারে ?
জগৎ বেড়ে জাতির কথা—
লোকে গল্প করে যথা তথা,
লালন বলে, জাতির ফাৎনা ডুবিয়েছি সাধ বাজারে॥

লালনের মন তুচ্ছ জাতিধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না বলিয়াই, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকলের নিকট হইতেই তিনি সমান শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। লালনের শিষ্যদের মধ্যেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী একাধিক লোক দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে, সাঁই, বাউল প্রভৃতি সাধকদের নিকট সব ধর্মই সমান। তাঁহাদের উপদেশের মূল কথা, সেই অনাদি অনন্তকে জানাই যখন সব ধর্মের আসল উদ্দেশ্য, তখন প্রত্যেকটি ধর্মকে পৃথক্ চক্ষে দেখার কোনই প্রয়োজন নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই, বাউলদের সাধন-সঙ্গীতগুলির এক দিকে যেমন আছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির প্রকাশ, অপর দিকটি তেমনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে নবীর মহিমাকীর্তনে। সুতরাং একথা বিনা-দ্বিধায় বলা চলে, পরমহংসদেবের 'যত মত তত পথ' উপদেশটি ইঁহারা সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দিয়া। লালনের রচিত গানগুলিতেও হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের সব কিছুর প্রতিই সমান শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তি একজন প্রকৃত বৈষ্ণব অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। তাঁহার একটি গানে এই ব্রজের ভাব চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে—

সে ভাব কি সবাই জানে,
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর সনে ?
গোপী বিনে জানে কেবা,
শুদ্ধ রয় অমৃতসেবা ?
গোপীর পাপ-পুণ্য জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণদরশনে,
গোপীর অনুগত যারা, এদের সে ভাব জানে তারা,
নীর হেতু অধর ধরা গোপীর মনে।

টলে জীব, অটল ঈশ্বর, তাইতে কি হয় রসিক নাগর ?
লালন বলে, রসিক বিভোর রস-ভিয়ানে ॥

পৃথিবীর সকলেই যখন একই পিতার সন্তান, তখন সেই প্রেমময় ও রূপময়ের কৃপালাভ করার অধিকারও সকলেরই আছে ; যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অমূলক ও অবাস্তব। এই সব কাল্পনিক বাধার সৃষ্টি করিয়া যাহারা ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহারা কেবল ভণ্ডই নয়, মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার হইতেও তাহারা মানুষকে বঞ্চিত করিতেছে। ভক্তিই সাধনপথের শ্রেষ্ঠ পাথেয় ; আকুল হইয়া যিনি ডাকিতে পারিয়াছেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ বিনা দ্বিধায় তাঁহার নিকট ধরা দিয়াছেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, ধ্রুব ও প্রহ্লাদও যেমন সেই বিরাট পুরুষের করুণালাভে ধন্য হইয়াছেন, তেমনি রামদাস ও কবীরের মত নীচ জাতীয় ব্যক্তিরাও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হন নাই। যুগে যুগে মানুষের ইতিহাস এই কথারই সাক্ষ্য দেয়। লালনও তাঁহার একটি গানে এই কথাটিই চমৎকারভাবে বলিয়াছেন—

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই,
হিন্দু কি যবন বলে বিচার নাই।
শুদ্ধ ভক্তি মাতোয়ারা জাতিতে কবীর জোলা
ধরেছে সে ব্রজের কালা সর্বস্ব ধন তাই।
রামদাস মুচি ভবের মাঝে ভক্তির বল সদাই তার যে,
ও তার সেবায় স্বর্গে ঘণ্টা বাজে শুনি সাধুর ঠাঁই।
এক চাঁদে জগৎ আলো, এক বীজে সব জন্ম হল,
ফকির লালন বলে, মিছে কালা ভবে শুনতে পাই !

"কোঽহং", আমি কে, এই প্রাচীন প্রশ্ন প্রাচীন মুনি-ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানের বহু সাধককেও বিচলিত করিয়াছে। নিজেকে জানার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে সব কিছু জানার পরিসমাপ্তি। তাই আত্ম-পরিচয় পাওয়ার প্রেরণায় যুগে যুগে কত লোক যে অজানার পথে পাড়ি দিয়াছে, তাহার হিসাব কোনদিনই জানা সম্ভব হইবে না। সব সাধনার মূল, আত্মতত্ত্বলাভ, নিজেকে না চিনিয়া অপরকে জানিতে যাওয়া মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই নয়। লালনও ঠিক্ এই কথাই বলিয়াছেন—

আপন খবর আপনারে হয় না,
আপনারে চিনিলে পরে যায় অচেনারে চেনা।
আত্মরূপ কর্তা হরি,
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বি যত বাড়বে তত লখনা।
ধড়ের আত্মকর্তা কারে বলি,
কোন্ মোকাম তার, কোথায় গলি আওনা-যাওনা।
সেই মহলে লালন কোন্ জন, তাও লালনের ঠিক হল না ॥

আত্মতত্ত্বলাভের পথ-নির্দেশও তিনি করিয়া গিয়াছেন—

দিল-দরিয়ায় ডুবিলে সে দরের খবর পায়,
নইলে পুঁথি পড়ে পণ্ডিত হলে কি হয় ?
স্বয়ং রূপ দর্পণ ধরে মানব রূপ সৃষ্টি করে হে,
দিব্য জ্ঞানী যাঁরা ভাবে বোঝেন তাঁরা,
মানুষ ধরে কার্যসিদ্ধি করে লয়।

একেতে হয় তিনটি আকার অজনী সহজ সংস্কার হে,
যদি ভাব তরঙ্গে তর, মানুষ চিনে ধর,
দিনমণি গেলে কী হবে উপায়।
মূল হতে হয় ডালের সৃজন, ডাল হতে পায় মূল অন্বেষণ হে,
তেমনি রূপ হতে স্বরূপ, তারে ভেবে রূপ,
অধীন লালন সদা নিরূপ ধরতে চায় ॥

লালন জীবনে কোনদিনই পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, তাই বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠের কোন সুযোগও তাঁহার হয় নাই। কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞানী লালনের নিকট পার্থিব কোন তত্ত্বই অজ্ঞাত ছিল না, সেইজন্য তাঁহার গানগুলিতে বেদ ও উপনিষদের বহু জটিল বিষয়ের সুষ্ঠু ও সহজ প্রকাশ দেখা যায়। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনেই জীবনের পূর্ণতা। সেই আনন্দরসসাগরে নিজেকে যিনি বিলীন করিতে পারিয়াছেন, পার্থিব দুঃখ-বেদনার অকূল পাথারেও তাঁহার জীবন সার্থকতার শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। লালন নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্বটি উপমা ও অলঙ্কারের সাহায্যে অননুকরণীয় ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন—

আমি একদিন না দেখিলাম তারে,
বাড়ির কাছে আরসী নগর এক পড়শী বসত করে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি, তার নাই কিনারা, নাই তরণী পারে।
মনে বাঞ্ছা করি, দেখবো তারে, আমি কেমনে সেথায় যাই রে।
আমি কি কব পড়শীর কথা তার হস্ত, পদ, স্কন্ধ, মাথা নাই রে,
সে ক্ষণেক ভাসে শূন্য ভরে, আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।
সেই পড়শী যদি আমায় ছুঁতো, ভবের যম-যন্ত্রণা সব যেতো দূরে,
সে আর লালন একখানে রয়, আবার লক্ষ যোজন ফাঁক রে ॥

মানুষের দ্বিধাগ্রস্ত ভ্রান্ত মন একটু শান্তি, একটু সুখের আশায় বার বার ছুটিয়া যায় দেবালয়ের শান্ত ছায়ায়, কিন্তু তাহাতেও সে তৃপ্ত হয় না, যাহা সে চায় সেখানে তাহা মেলে না, তাই আকুল ক্রন্দনে কেবলি সে চীৎকার করিয়া উঠে, "কোথায় শান্তি, কোথায় মুক্তি!" অন্ধ মানুষ ঘরের ধনকে না চিনিয়া নিষ্ঠুর দেবালয়ের কঠিন পাষাণে বৃথাই মাথা কুটিয়া মরে শান্তির আশায়। সহজলভ্য রত্নকে অবহেলা করিয়া মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া বেড়ানোর এই যে বিড়ম্বনা, তাহা লক্ষ্য করিয়াই লালন বলিয়াছেন, "এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে, কত মুনিঋষি চারিযুগ যারে বেড়াচ্ছে খুঁজে।" লালনের এই উক্তি

আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমূল্য উপদেশ, 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' লালনের রচিত সম্পূর্ণ গানটি নীচে উদ্ধৃত করা হইল—

এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে
কত মুনিঋষি চারি যুগ যারে বেড়াচ্ছে খুঁজে।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়, সে চাঁদ ধরতে গেলে হাতে কে পায়?
ও যে আলেক মানুষ, তেমনি সদায় আছে আলেকে বাসা।
অচিন দলে বসতি তার, দ্বিদল পদ্মে আরাম তার,
আমার ভ্রান্ত হল মন, আমি বাইরে খুঁজি ঘরেরই ধন,
সিরাজ-সাঁই বলে, ঘুরবি লালন আত্মতত্ত্ব না বুঝে॥

লালন ছিলেন অতি উচ্চ শ্রেণীর সাধক, তাই তাঁহার গানগুলিতে জটিল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা যেমন দেখা যায়, তেমনি সেগুলির সর্বত্র একটি সহজ ও সরল ভাবের প্রকাশও চোখে পড়ে। তিনি ছিলেন গৃহী সাধক, নিজের আশ্রমেই তিনি সেই অসীমের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই সংসারের তাপদগ্ধ নরনারীর ব্যথাবেদনা, ভগবৎসাধনায় তাহাদেব বাধাবিপত্তির কথা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। একটি গানে সংসারের মায়া-আসক্ত জীবের এই বেদনার সার্থক রূপ দিয়াছেন—

বিষয়-বিষে চঞ্চল মন দিবা রজনী,
মন তো বুঝিলে বোঝে না ধর্ম কাহিনী।
বিষয় ছাড়িয়া কবে মন আমার শান্ত হবে হে,
আমি কবে সে চরণ করিব স্মরণ, যাতে শীতল হবে তাপিত পরাণী?
কোন্ দিন শ্মশানবাসী হবো, কী ধন সঙ্গে লয়ে যাবো হে,
আমি কী করি, কী হই, ভূতের বোঝা বই,
একদিনও ভাবলাম না শ্রীগুরুর বাণী।
অনিত্য দেহেতে বাসা, তাইতেই এত আশার আশা হে
অধীন লালন তাই বলে, নিত্য হইলে
আর কতই কি মনে করতেম না জানি।

এগুলি পাঠ করার পর মনে হয়, তিনি যেন আমাদেরই একজন। অত উচ্চ স্তরের সাধক হইয়াও কত সহজে তিনি সাধারণ মানুষের সহিত একাত্ম হইয়া মিশিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এই সরলতাই প্রকৃত সাধকের আসল পরিচয়। সেইজন্য মানুষ যতদিন এই পৃথিবীতে থাকিবে, লালন ফকিরের মত ভগবৎপ্রেমিকেরাও ততদিন মানুষের হৃদয়ে চির-জাগরুক হইয়া থাকিবেন।

জননী রোহিণী

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় শ্রীনন্দ ও যশোদা-রাণীর মত রোহিণী দেবীও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বাৎসল্য রসের ঘনীভূত মূর্তি ছিলেন তিনি; স্বয়ং সেই রস আস্বাদন করেছেন এবং শ্রীভগবানকেও আস্বাদন করিয়েছেন। যখন ভগবানের অবতরণের সময় হল, তখন এই চিদানন্দময়ী বাৎসল্যরসময়ীরও আবির্ভাব প্রয়োজন হল। ঈশ্বরকে তাঁর শক্তি ও ঐশ্বর্য থেকে বিযুক্ত করে যে অনুভূতি, তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই যেন যুগে যুগে রোহিণী-সদৃশা মহীয়সী জননীর আবির্ভাব হয়।

যখন মুনিবর কশ্যপ বসুদেবরূপে জন্মপরিগ্রহ করলেন, তখন মাতা কদ্রুদেবীও রোহিণীরূপে আবির্ভূতা হলেন। পুরাণে একটি মতান্তরও দৃষ্ট হয়—এই মতে কশ্যপপত্নী অদিতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই রূপে উৎপন্ন হন—এই দুইটি রূপ যথাক্রমে দেবী দেবকী ও দেবী রোহিণী।

যথা সময়ে বসুদেবের সহিত রোহিণীর পরিণয় হয়। নিষ্ঠুর কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করলে সাধ্বী রোহিণী নিরতিশয় ব্যাকুলা হন। কংসকে অনেক অনুরোধ করে পতির সেবা করবার জন্য কারাগারে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন তিনি। দেবকীর সপ্তম গর্ভের সময় রোহিণীরও গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। বসুদেবের চিন্তা—দুরাত্মা কংস একটির পর একটি করে দেবকীর সন্তান বিনাশ করছে, হয়তো বা রোহিণীর সন্তানকেও বিনাশ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। এই ভয়ে শ্রীবসুদেব তখন ভাই নন্দরাজের কাছে গোপনে রোহিণীকে পাঠিয়ে দিলেন। ব্রজপুরে আসার চারমাস পরে যোগমায়া তাঁর গর্ভকে অন্তর্ধান করে এবং দেবকীর গর্ভস্থ সন্তানকে আকর্ষণ করে তাঁর গর্ভে স্থাপন করলেন। এইরূপে রোহিণীর শ্রীবলরামের জননী হওয়ার সৌভাগ্য হল। যোগমায়া-কর্তৃক গর্ভস্থাপনার দশমাস পরে সব মিলিয়ে চৌদ্দমাস গর্ভধারণের পর রোহিণীদেবী শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মের আটদিন পূর্বে অনন্তকে সান্তরূপে প্রকাশ করলেন—অনন্ত ভগবান্ বলরামরূপে রোহিণীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হলেন।

যেদিন রোহিণীদেবী নন্দালয়ে শুভ পদার্পণ করলেন, সেইদিন থেকেই যশোদা এবং রোহিণীর মধ্যে এমন ভালবাসা হল যে, মনে হতে লাগল যেন দুইজনের দুইটি দেহ কিন্তু প্রাণ একই। প্রেমের গঙ্গাযমুনা যেন এক স্রোতে প্রবাহিত হতে লাগল। গভীর প্রেম পরস্পর পরস্পরকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করল। রোহিণীকে পেয়ে যশোদার আনন্দের সীমা রইল না। যশোদার আনন্দের কারণ এইজন্য যে, রোহিণী ছিলেন অত্যন্ত পতিপরায়ণা, তাঁর পাতিব্রত্যের যশোগানে চারিদিক মুখরিত—এই সতীর পাদস্পর্শে ব্রজরাণীর গৃহ পবিত্র হয়ে গেছে, তাঁর সতীত্বসৌরভে ব্রজপুরী আজ আমোদিত। নিশ্চয় নন্দরাণীর মনস্কামনা পূর্ণ হবে, পুত্রহীনা নন্দরাণীর কোল আলো-করা পুত্রলাভ হবে সতী রোহিণীর শুভাগমনে। হয়েছিলও তাই, রোহিণীদেবীর আগমনের পর মা যশোদার কোল আলো হয়েছিল—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে।

ব্রজরাণী যশোদা রোহিণীর গুণে এতদূর মুগ্ধ হলেন যে, গৃহস্থালীর সমুদয় কর্ম রোহিণীর উপর সমর্পণ করে দিলেন, একেবারে তাঁর সংসারের কর্ত্রী হয়ে গেলেন রোহিণী। আরও রোহিণীর পুত্র হওয়ার পর নন্দালয়ের সর্বত্র আনন্দের তরঙ্গ খেলে

যাচ্ছে—কিন্তু আনন্দের পূর্ণ প্রকাশ কই? কেননা, বসুদেব শ্রীনন্দকে আনন্দোৎসব করতে নিষেধ করেছেন—পাছে পুত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, কংসের কানে উঠলে আবার কোন্ বিপদপাত হবে কে জানে! যশোদারাণী তাইতো প্রাণভরে উৎসব করতে পারছেন না। রোহিণীর পুত্রলাভ সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হয়েছে। ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি পুত্রজন্ম-কথা। নন্দরাজ গোপনেই পুত্রের জাতকর্ম সম্পন্ন করালেন পবিত্র ব্রাহ্মণকে দিয়ে। রোহিণী প্রথম থেকেই নন্দরাজ ও যশোদার ব্যবহারে আশাতীত সন্তুষ্ট হয়েছেন, এখন পুত্রলাভের পর তাঁদের মধুর ব্যবহারে তাঁর প্রতিটি রোমকূপ যেন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। তাঁর চোখে প্রেমাশ্রু বইতে লাগল। পুত্রের মুখচ্ছবি দেখে আত্মবিস্মৃত হলেন তিনি। কী সুন্দর সেই ছবি—

শুভ্রাংশুবক্ত্রং তড়িদালিলোচনং
নবাব্দকেশং শরদভ্রবিগ্রহম্।
ভানুপ্রভাবং তমসূত রোহিণী
তত্তত্র যুক্তং স হি দিব্যবালকঃ॥

সমুদিত শুভ্রাংশু সদৃশ ঐ মুখচ্ছবি, বিদ্যুৎরেখার ন্যায় নয়নযুগলের শোভা, মাথায় নবজলধরকৃষ্ণ-কেশদাম, সমস্ত অঙ্গের আভা শারদীয় শুভ্র মেঘ সদৃশ। এই বালক সূর্যতুল্য তেজশালী। এমন সুন্দর পুত্রের প্রসূতি জননী রোহিণী! বালকের এইরূপ শোভাসম্পন্ন হওয়ায় আশ্চর্যের কিছুই নাই, কারণ এই শিশু অস্থিমজ্জামেদমাংসনির্মিত প্রাকৃত শিশু নয়—এ পরম রমণীয় দিব্য শিশু। শুধু শিশুর আকারমাত্র, প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ভগবানই যে এই শিশুশরীরে!

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং,
হলহতিভীতি মিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ,—জয় জগদীশ হরে॥

রোহিণীর একটি দুঃখ যেন যাবার নয়। এই দুঃখ পতির বিরহজনিত। আহা, পতিদেবতা কংসের কারাগারে কত কষ্টই না পাচ্ছেন! পুত্রমুখ-দর্শনে এই দুঃখভার কিঞ্চিৎ লাঘব হল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্তরের অন্তঃস্থলে ঐ স্মৃতি জেগে উঠে রোহিণীকে ব্যাকুল করে দেয়। যেদিন যশোদা-নন্দনের জন্ম হল, যেক্ষণে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখচ্ছবি অবলোকন করলেন, সেই মুহূর্তেই যেন তিনি সম্পূর্ণ বদলে গেলেন। একি অভাবনীয় পরিবর্তন! তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ব্যথাবেদনা দুঃখজ্বালা অন্তর্হিত হল। যশোদানন্দনের শ্রীমুখচন্দ্রমা তাঁর সমস্ত দুঃখ হরণ করে নিল, তাঁর প্রাণ শীতল হল। ব্রজপুরে আজ রোহিণীকে বসনভূষণে প্রথম সুসজ্জিত দেখা গেল।

*　　*　　*

সার্ধ একাদশ বৎসর বলরাম ও শ্যামসুন্দরের মধুর বিচিত্র বাল্যলীলার দিব্য রসমন্দাকিনী ব্রজপুরে প্রবাহিত হচ্ছে, তাতে নিরন্তর অবগাহন করে যশোদা ও রোহিণী ধন্য হচ্ছেন। কৃষ্ণবলরামের সাজসজ্জায়, পরিচর্যায়, রক্ষণে, শাসনে বাৎসল্যরসের অপূর্ব আস্বাদন!

এতদিন যে রূপমাধুরী যশোদাভবন আলোকিত করেছে, আজ সেই আলোক অন্তর্হিত হতে চলেছে। কৃষ্ণবলরামকে ব্রজপুরী থেকে মধুপুরী নিয়ে যাবার জন্যে অক্রূর এসে উপস্থিত হয়েছেন। রোহিণী-যশোদা পুত্রদ্বয়কে ছেড়ে দিতে চান না—কিভাবে তাঁরা প্রাণাধিকদের কংসের রঙ্গালয়ে যাবার অনুমতি দেবেন! নন্দরাজ কত বোঝালেন, কিন্তু সবই নিষ্ফল হল। অবশেষে যোগমায়ার বিস্তারে মধুপুরী যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। ফাল্গুনী দ্বাদশী সন্ধ্যায় ব্রজপুরী অন্ধকার করে ও মাতৃদ্বয়কে শোকসাগরে নিমগ্ন করে রামশ্যাম মধুপুরে চলে গেলেন। * * *

দুরাত্মা কংসের নিধন হল। বসুদেব কারাগার থেকে মুক্ত হলেন। পুত্রদ্বয়কে হৃদয়ে আলিঙ্গন করে তাঁর হৃদয়ের জ্বালা নির্বাপিত হল। এর পর বসুদেব রোহিণীকে আনবার জন্যে ব্রজপুরে দূত

প্রেরণ করলেন। পতির আহ্বান শুনে রোহিণীর সে এক অদ্ভুত অবস্থা! তিনি ভাববিহ্বল হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—

আজ্ঞা পত্যুর্দিদৃক্ষাপ্যথ নবসুতয়োর্জাতু হাতুং ন শক্যা
সেয়ং গোবিন্দমাতা বত কথমিব বা হেয়তামাশু যাতু।
তস্মাদেকৈকনেত্রাত্ত্ববয়বমপি চেদ্ধাগমেকং তনোর্মে
পুর্য্যা জীবে ন কুর্যাদপরমিহ বিধিস্তর্হ্যেহং নিস্তরেঽয়ম্॥

—হায়! এক দিকে পতির আজ্ঞা, অন্য দিকে যশোদাদেবীর প্রীতির বন্ধন! পুত্রদ্বয়কে দেখার ইচ্ছা ত্যাগ করাও আমার আয়ত্তাধীন নয়। শ্রীকৃষ্ণ-জননী যশোদাকে ত্যাগ করা যায় না। বিধাতা যদি আমার শরীরকে দুভাগ করে দেন—এক নেত্র অর্ধ অবয়বে অপর নেত্র অপরার্ধে। এক শরীর মধুপুরের জন্য, অপর শরীর যশোদার পরিচর্যার জন্য—তাহলে আমি এই বিপদসাগর উত্তীর্ণ হতে পারি, অন্যথা আর তো কোনও উপায় দেখি না।

রোহিণীকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখে ক্রন্দনরতা যশোদারাণী তাঁকে আশ্বাস দিতে লাগলেন, "ভগিনি, তোমার প্রাণ, আর আমার প্রাণ যে একই, এর প্রমাণ আমরা উভয়েই কখনও ক্ষণকালের জন্যও যে রামকৃষ্ণের মধ্যে ভেদ দেখিনি। আমার কথা শোন, আমার ভাগ্য মন্দ, তাই পুত্রদর্শনে যেতে পারছি না; তুমি যাও, রামশ্যামকে দেখে তোমার প্রাণ শীতল কর, পুত্রদের দেখে তুমি শান্তি পেলে, আমিও শান্তি পাব—আমারও প্রাণ বেঁচে যাবে, তোমাতে আমাতে যে অভিন্ন। এ ছাড়া আমার প্রাণ বাঁচাবার আর তো কোন উপায় নেই। রোহিণীদেবী তখন নন্দরাণীর এই কথা শুনে আশ্বস্তা হয়ে মধুপুর চলে গেলেন।

* * * *

মধুপুরী থেকে যখন পিতা বসুদেবকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকা গেলেন, তখন মাতা রোহিণীকেও সঙ্গে নিলেন। রোহিণীর মনে এই আনন্দ ছিল—তিনি রামকৃষ্ণের লীলা দর্শন করবেন, তাঁদের স্নেহ-মাখা কথা শুনবেন। কিন্তু যখন যশোদার কথা মনে হত, তখন তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠতেন, হায়! যশোদার কতই না কষ্ট হচ্ছে কৃষ্ণবলরামের বিরহে।

কুরুক্ষেত্রে রোহিণী ও যশোদার পুনর্মিলন হয়। যশোদাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে, তাঁর গুণাবলী কীর্তনে পঞ্চমুখ হলেন রোহিণী। কী অদ্ভুত ভালবাসা উভয়ের মধ্যে ছিল, তা চিন্তা করলে অবাক্ হতে হয়।

এক সময়ে রোহিণী আবার ব্রজপুরে আসেন। দন্তবক্রকে বিনাশ করে যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রজপুরে যান, তখন দাদা বলরামের সঙ্গে মাতা রোহিণীকে দর্শন করবার খুব ইচ্ছা হয়। রোহিণী-মা বলরামের সঙ্গে আসলেন। তাঁদের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব ভাব হল। ব্রজপুর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রোহিণী শ্রীকৃষ্ণের শেষ লীলাসমূহে যোগদান করতে থাকেন।

যদুকুল ধ্বংস হল। দারুক এই নিদারুণ দুঃসংবাদ নিয়ে দ্বারকায় পৌছুলেন, বসুদেব-দেবকীর সঙ্গে রোহিণীও কাঁদতে কাঁদতে আসলেন যেখানে যদুগণের মৃতদেহ পড়েছিল। চারিদিকে স্বজনবর্গের প্রাণহীন শরীরগুলি দেখে করুণাময়ীর হৃদয়ে শোক উথলে উঠল। সেখানে রামকৃষ্ণকে না দেখে তিনি মূর্ছিতা হলেন—এ মূর্ছা আর ভাঙল না। লীলা সাঙ্গ হল, শ্রীভগবানের নিত্যলীলাকে আশ্রয় করে যুগে যুগে যাঁর আবির্ভাব, সেই বাৎসল্যরসবিগ্রহরূপিণী রোহিণী শ্রীভগবানের চিন্তায় তন্ময় হয়ে তনুত্যাগ করে নিত্যধামে চলে গেলেন—পশ্চাতে রইল অনাগত কালের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য একটি আদর্শ, যাকে অনুসরণ করে শত শত সন্তানবৎসল জনক-জননী ধন্য হবেন।

জননী রোহিণীর সঙ্গে বসুদেব দেবকীরও একই দশা হল।

দেবকী রোহিণী চৈব বসুদেবস্তথা সুতৌ।
কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকার্তা বিজহুঃ স্মৃতিম্॥
প্রাণাংশ্চ বিজহুস্তত্র ভগবদ্বিরহাতুরাঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্—১১।৩১।১৮

বন্ধন ও মুক্তি*

স্বামী প্রভবানন্দ

"এই বিরাট বিশ্বকে বলা হয় ব্রহ্মচক্র। ইহা অনবরত ঘুরিতেছে। যতদিন জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ভাবে, ততদিন তাহাকে জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অধীন হইয়া উহাতে আবর্তিত হইতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মকৃপায় যদি একবার তাঁহার সহিত একাত্ম-বোধ জাগে তাহা হইলে আর ঘুরিতে হয় না। সে অমরত্ব লাভ করে।"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উপরোক্ত কথাগুলি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, মানুষের প্রকৃত স্বভাব হইল দিব্য—মুক্ত ও আনন্দময়। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সত্তাই মানুষের ভিতর রহিয়াছে। সে আসল স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে দেহ ও মনের সহিত জড়াইয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই কর্মফলের অধীন, জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আবদ্ধ। সেইজন্যই তো তাহাকে ভোগ করিতে হয় জীবনমরণ, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, আরাম এবং বেদনা। এই বন্ধনগুলি দূর না হওয়া পর্যন্ত অবিমিশ্র সুখলাভ অসম্ভব। দেহমনের সহিত নিজের তাদাত্ম্যবোধ দূর করিয়া মানুষ যখন অনুভব করে যে সে অন্তরতম চৈতন্যস্বরূপ—অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয় সত্তা—তখনই তাহার মিলে সকল প্রকার গণ্ডীর হাত হইতে মুক্তি।

কিভাবে এই মুক্তি আসিবে? জগতের সকল ধর্মেই ইহার উপায় বর্ণিত আছে। উপায় হইল মনকে ঈশ্বরে নিবদ্ধ রাখা, তাঁহার সহিত যুক্ত থাকা।

যোগ-দর্শন বলেন, মন তরল পদার্থের ন্যায়। উহা প্রত্যক্ষ বস্তুর আকার গ্রহণ করে। অর্থাৎ মন প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত তদাকার-কারিত হইলেই সেই বস্তুর জ্ঞান উপস্থিত হয়। এইভাবে মন যাহা কিছু চিন্তা করে, তাহা উহাতে একটি রং রাখিয়া যায়। আর মানুষের চরিত্র নির্ণীত হয়, তাহার মনের চিন্তাপ্রণালী দ্বারা, উহা ভালই হউক বা মন্দই হউক।

মনের মন্দ রঙ কি করিয়া দূর করা যায়? ঈশ্বরের দিকে চিন্তার মোড় ফিরাইয়া। তিনি শুচিতার প্রতিমূর্তি, দিব্যভাবের বিগ্রহ। পবিত্রতাই তাঁহার স্বরূপ। মন যদি ভগবানে নিবিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা নির্মল হইয়া উঠে। মনের উপর তখন ভগবানের দিব্যভাবের প্রতিবিম্ব পড়ে। হ্রদের জল যখন স্বচ্ছ ও শান্ত থাকে, তখন যেমন উহার উপর সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, ইহাও সেইরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমি সর্বব্যাপী ব্রহ্ম। তোমার মন শুদ্ধ করিয়া আমাতে নিবদ্ধ কর, শান্তি পাইবে।" ব্যাপারটি এই, ঈশ্বরের অনুভূতি মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে অতিক্রম করিয়া যায়। মনের নিজের সেই জ্ঞানে পৌঁছিবার ক্ষমতা নাই। তবুও বলা হইয়া থাকে যে, কেবল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারাই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ হয়। এই উক্তিদ্বয় পরস্পর বিরোধী নহে। অচেতন অশুদ্ধ মনই ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারে না, কেননা উহা জড়বস্তুর চিন্তায় এবং স্বার্থপরতায় ও অহংকারে আচ্ছন্ন। ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধিতে ও এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের প্রতি নিজেকে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াই মন ঐরূপ মলিন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই একই মন ঈশ্বরমুখী হইলে ভগবদ্ভাবে ভাবিত হয়। তখন তাহার ঘটে রূপান্তর। উহাই শুদ্ধ

* দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়া বেদান্ত-সমিতির মুখপত্র 'Vedanta and the West' (March-April, 1954) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।

মন। অতএব সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় হইতেছে, ঈশ্বরে মন রাখা অর্থাৎ আমরা যাহা প্রার্থনা, একাগ্রতা বা ধ্যান বলি তাহা।

ধ্যান করিতে হইলে ভগবানে ভক্তি একান্ত প্রয়োজন। কাহাকেও ভালবাসিলে তাহার চিন্তা করা সহজ হয়। ঠিক সেইরূপ, স্বাভাবিক ভাবে ভগবানের প্রতি মনের গতি ফিরাইতে হইলে তাঁহার প্রতি যাহাতে ভালবাসা বর্ধিত হয় তাহাই করণীয়। সেই ভালবাসা অবশ্য হঠাৎ হয় না। ভালবাসার স্বরূপ কি? অনুক্ষণ স্মরণ। ঈশ্বর-চিন্তায় লাগিয়া থাকিলে, ক্রমশঃ আমরা দেখিব অন্তরে প্রেমের উদয় হইতেছে, আরও বেশী বেশী ধ্যান করিতে ভাল লাগিতেছে। এই ভাবেই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়।

নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎ-স্মৃতির মধ্যেই ধর্মের গভীরতম সত্য নিহিত। ইহা শুনিতে খুব সহজ মনে হইলেও অভ্যাস করা কঠিন, এমন কি কতক লোকের পক্ষে এক প্রকার দুঃসাধ্যই। যাঁহারা ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের জানা আছে যে, যে মুহূর্তে আমরা মনকে একাগ্র করিতে যাই, অমনি যত প্রকারের বিক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ যখন আমরা ধ্যান করিবার চেষ্টা না করি, তখন বরং সেইরূপ হয় না। এমনই আমরা বেশ শান্ত, কিন্তু ধ্যান করিতে বসিলেই যত আজে বাজে চিন্তা! এ ক্ষেত্রে করণীয় কি? ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস চালাইয়া যাওয়া।

কিন্তু এমন লোকও আছেন যাঁহারা ধ্যানাভ্যাস করিতেই পারেন না। মন যখন বিষয়বাসনায় একেবারে ডুবিয়া থাকে, তখন উহা ভগবন্মুখী হইবে কি করিয়া? তাহা হইলে উপায়? ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে নিষ্কাম কর্ম কর। যাহা কিছু কর্মফল আমাতে সঁপিয়া দাও।" অর্থাৎ, ধ্যান করা খুব কষ্টসাধ্য হইলে আমরা নিঃস্বার্থ কর্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারি। কিন্তু তখন কোন আসক্তি রাখিলে চলিবে না। সকল কর্ম ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে। গীতাও এই শিক্ষা দেয়। ধ্যানাভ্যাস করিতে হইলে যেটুকু মনের পবিত্রতা ও সূক্ষ্মতা অত্যাবশ্যক তাহা অর্জন করিবার জন্য এই কর্মব্যাপৃতি প্রয়োজন।

কিন্তু কর্মবৃত্তি কি জীবনে জটিলতা ও বিক্ষেপ আনয়ন করে না? সত্য এই যে, কর্মের মধ্যে বন্ধন বা মুক্তি নাই। বন্ধন বা মুক্তি আসে মনের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে। শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য বলিতেছেন হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা। নিজেদের জন্য না করিয়া সব কিছু যেন আমরা ঈশ্বরের জন্য করিবার চেষ্টা করি। এখন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। আমাকে তো আহার করিতে হয়, কিছু কর্তব্য সাধন করিতে হয় এবং আমার কিছু বাধ্যবাধকতাও আছে। এই কর্মসমূহ কি নিজের জন্য করি না? এস্থলেও মনোগত ভাবের পরিবর্তন চাই। আমাদের অন্তরে ও বাহিরে ব্রহ্ম আছেন। ব্রহ্মের জন্যই সব কিছু করিতেছি। ধরুন খাইতেছি, তখন ভাবা উচিত—ব্রহ্মকে খাদ্য নিবেদন করিতেছি। সব কিছুই উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। আপাতদৃষ্টিতে আমরা হয়তো অপরের জন্য কাজ করিতেছি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু মনোভাব যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে উহাতে স্বার্থদৃষ্টি আসিতে পারে। যেমন, কতক লোক হয়তো জনসেবামূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করিতেছে। ইহারা প্রায়ই ভাবে যে তাহাদের অভাবে জগৎ চলিবে না। জনসেবামূলক কর্ম করিব না, ইহা বলিতেছি না। অপরকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু ইহার একমাত্র ভাব হইবে সর্বত্র ঈশ্বরকে দর্শন করা, সকল প্রাণীতে তাঁহারই সেবা করা। অধিকন্তু, সেবা করিবার সুযোগ দিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। নিঃস্বার্থ কর্মসমূহে আত্মনিয়োগ করিলে মন আরও পবিত্র হয়। তখন আপনা

হইতেই লোক ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ বুঝিতে সক্ষম হয়।

বহির্জগতের ও মনের গতি সর্বদাই বহির্মুখী। ঐ স্রোতের বিপরীত মুখে যাওয়াই আধ্যাত্মিক জীবন। সেইজন্য মানসিক শৃঙ্খলা আনিতে হইলে ধীর ও শান্ত ভাবে অগ্রসর হইতে হয়। একদিক দিয়া বলা যায়, ধর্মজীবন এক সংগ্রাম। জীবন অর্থেই সংগ্রাম। যাহা লাভ করিবার যোগ্য তাহা সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আসে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথেও ইহা সমভাবে সত্য। জনৈক মহাত্মা বলিতেন, —"যতক্ষণ তোমার মধ্যে সংগ্রাম নাই, ততক্ষণ তুমি স্থাণু। সংগ্রাম করিতে থাকিলেই তুমি চলিতে আরম্ভ করিবে।"

ব্রহ্মকে যাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে ধ্যান করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে একটি সহজতর ধ্যানের উপায় শিক্ষা দিতেছেন। "আমি বহু বার জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অবতার হইয়া আসিয়া বহু কর্ম করিয়াছি। সেগুলি চিন্তা করিলে জীব শুদ্ধ হয়। উহাতে সকলেরই মঙ্গল। শ্রদ্ধা সহকারে সে সব শ্রবণ কর। আমার দৈবী মহিমা কীর্তন কর।" অনেকের পক্ষেই নিরুপাধিক চিন্তা করা কষ্টকর। ব্রহ্ম অবতার হইয়া আসেন। তখন তিনি যে সব লীলা করিয়া যান, এখানে তাহারই ধ্যান করিতে বলা হইতেছে। "তিনি যুগে যুগে নব নব রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসেন, অবতার হইয়া আসেন মানুষকে প্রেমভক্তি শিখাইবার জন্য" —এই উক্তিটি জনৈক জগদ্‌গুরুর। ভগবান খ্রীষ্ট-রূপে, কৃষ্ণরূপে, বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণরূপে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের জীবনী-পাঠ, গুণ ও মহিমা কীর্তন দ্বারা আমরা জীবনে ভক্তি ও মাধুর্যের অধিকারী হইব। তখন মন স্বভাবতঃই ব্রহ্মাভিমুখী হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমাকে ধ্যান কর; আমাকেই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া, কেবল আমারই জন্য কর্তব্য কর, ন্যায্য বাসনা রাখ ও অর্থোপার্জন কর।" হিন্দুমতে জীবনের চারিটি অনুসরণীয় বস্তু আছে—ধর্ম, অর্থ, কাম ও শেষেরটি হইল মোক্ষ। এ কথা সত্য যে, সম্পূর্ণ নির্বাসনা না হইলে জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষে পৌঁছান যায় না। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমাদিগকে কতিপয় বাসনা মিটাইয়া লইতে হইবে। উপদেশগুলি পরস্পর বিরোধী মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে। নির্বাসনা চরম আদর্শ। কিন্তু সকলের পক্ষে উচ্চতম সত্য-নির্দিষ্ট পথে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। যদি বলি যে, সকলেই নির্বাসনার আদর্শ গ্রহণ করুক, তখন অবস্থা কি হইবে? অধিকাংশ লোক কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া জীবন-সংগ্রামে অতিমাত্রায় অলসতা প্রকাশ করিবে। উহা আধ্যাত্মিকতা নহে। শান্তি ও অলসতা এই দুটি চরম অবস্থা দেখিতে সমান। শান্তির স্তরে পৌঁছি-বার পূর্বে সাধককে অবশ্যই আত্মবিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। অতএব ন্যায্য প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করাতে কোন দোষ নাই। তাহা ছাড়া সংসারে আমাদের কতকগুলি কর্তব্যও সম্পন্ন করিতে হয়। এগুলি এড়াইলে চলিবে না। উহাদের অনুষ্ঠান দ্বারাই উহাদিগকে আমরা অতিক্রম করিতে পারি। কর্তব্য ও অভাব পূরণের জন্য, সকলেরই কিছু না কিছু আর্থিক নিরাপত্তা প্রয়োজন। এই যুগে বা অন্য কোন যুগেই হউক এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

ত্যাগের আদর্শ পুরোভাগে অবশ্যই থাকা চাই। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই জীবনের চরম লক্ষ্য লভ্য হয়। কিন্তু ত্যাগ কাহাকে বলে? বিত্তহীন হইলেই ত্যাগী হয় না। ধরুন, একজন গরীব। সে যদি অনবরত মনে ভাবে, 'আহা, আমার যদি সম্পদ থাকিত' তাহা হইলে তাহার নিঃস্বতা ধর্মের সহায়তা কি করিল? 'আমি' 'আমার' ত্যাগই আসল ত্যাগ। ধনসম্পত্তি থাকুক। কিন্তু উহারা যেন আমাদিগকে না অধিকার করিয়া বসে।

যাহাতে আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ভগবান লাভ ব্যাহত না হয়, তাহা করিতে হইলে কি ভাবে আমরা 'ন্যায্য বাসনা, কর্তব্য ও অর্থে'র অনুসরণ করিব ? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমাকেই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া, কেবল আমারই জন্য কর্তব্য কর, ন্যায্য বাসনা রাখ ও ধনার্জন কর।" যাহ ভগবানের পথে লইয়া যায়, তাহাই সৎ। যাহা ভগবান হইতে দূরে লইয়া যায়, তাহা অসৎ। যে কাজ ভগবানকে ভুলাইয়া দেয়, তাহা করিলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাই। আর যে কাজের ভিতর থাকিলে তাঁহাকে মনে রাখিতে পারি, উহাই ভগবান লাভের অনুকূল। অতএব যখন সৎ বাসনা পূরণ, কর্তব্য ও ধনার্জন করিব তখন যেন না ভাবি যে, উহা নিজেদের জন্য করিতেছি, ভাবিতে হইবে উহা ভগবানের জন্যই করিতেছি।

আদর্শ হইতেছে, ভগবানে মনঃসন্নিধান করিবার যতগুলি বিভিন্ন পন্থা আছে, সবগুলির সুসমঞ্জস সমন্বয়-সাধন। আমাদিগকে সাধিতে হইবে ধ্যানাভ্যাস এবং অবতারপুরুষদের জীবনীপাঠ, ভগবদ্ মহিমা ও গুণ কীর্তন আবার নিঃস্বার্থ কর্মও করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—"এই ভাবে চলিলে তোমাদের আমাতে অবিচলিত প্রীতি জন্মিবে। আমিই শাশ্বত সত্য। যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সহিত আমার ধ্যান করে, সে নিশ্চয়ই আমাকে লাভ করে।"

জন্মাষ্টমীর স্মৃতি

শ্রীমতী রেণুকণা দেবী

সে ঘোর দুর্যোগ রাতে মুখর বরষা সাথে
গগনে গরজে ঘন মেঘ,
আঁধার নিকষ-কালো অন্তরীক্ষ ভরি' ছিলো
খরতর চলে বায়ুবেগ।

ভাদরের ভরা জল ভাসায় পৃথিবীতল,
অবিরাম ঝরে ঝর ঝর,
কড় কড় নিঃস্বনে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
রুদ্ধ কারা-গৃহের ভিতর।
বন্দিনী খুঁজিছে কাকে হাহারবে দিকে দিকে,
পাষাণ-দুয়ারে ঠুকে মাথা,
শীর্ণ দুটি হাত মেলে সজল নয়ন বলে,
'কই ? কোথা সে ওগো ? সে কোথা ?'

* * *

সহসা আলোক ছায় আঁধার টুটিয়া যায়
হাসে শিশু মানবলীলায়,
যুগে যুগে সে যে আসে ধরণী-তিমির নাশে
আর্তের সঙ্কট-বেলায়।

পলকে মিলালো কোথা পাষাণ-চাপানো ব্যথা
যত শঙ্কা, দৈন্য হলো দূর,
বদ্ধ কারাগার মাঝ মুক্ত শিশু করে আজ
পরাণ আশায় ভরপুর।

দুখিনী জননী তারে বুকেতে চাপিয়া ধরে
উথল আবেগে হ'য়ে হারা,
ঝরে পড়ে গ'লে গ'লে আকুল আঁখির জলে
হৃদয়ের যত স্নেহধারা।

* * *

গভীর নিশীথ রাতে জীবন-সর্বস্ব-হাতে
সহসা খুলিয়া কারা-দ্বার,
বাহিরিয়া ও কে আসে পদদুটি কাঁপে ত্রাসে,
সচকিত দেখে চারিধার ?

সমুখে যমুনা বয় ভয়ঙ্কর স্রোতময়,
থমকিয়া থাকে সে যে চেয়ে,
নিমেষে দামিনী খেলে দেখিল শৃগাল চলে,
অনায়াসে যায় পার হ'য়ে।

'আমিও পারিব তবে	পারে যে যেতেই হবে
যতই থাকুক বাধা ঘিরে,'
এই বলি ছুটি করে	নয়ন-মণিরে ধ'রে
বসুদেব জলে নামে ধীরে।

*	*	*

যমুনা সরিয়া যায়	পথ যেন করে দেয়
ছত্র হয় বাসুকির ফণ,
স্নেহেতে বিবশ হ'য়ে	চলে পিতা ভয়ে ভয়ে
আপনার ভাবেতে মগন।

আসিলেন অবশেষে	নন্দপুর বিনা ক্লেশে
গোপরানী-সূতিকা-আগারে,
যশোদায় পুত্র দিয়ে	কন্যাটিরে বিনিময়ে
তুলিলেন নিজ বক্ষপরে।

তখনো রয়েছে নিশি	অচেতন দশ দিশি
জানিল না এ দিব্য ছলনা,
আকাশে দেবতাগণ	'জয় নর-নারায়ণ'
ঘোষিলেন শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা।

*	*	*

তোমার সুন্দর ধরা	আজ যে মাধুরী-হারা,
হে কৃষ্ণ দেখিছ কি চেয়ে ?
সত্য নাই, ত্যাগ নাই	শুধু স্বার্থদ্বেষ তাই
রহিয়াছে চারিদিক ছেয়ে।

হিংসা-বিষে জর্জরিত	নাহি বুঝে হিতাহিত
লালসায় চায় অধিকার,
শুধু কপটতা চলে	মিথ্যা স্তোকবাক্যচ্ছলে
বর্বরতা আর স্বেচ্ছাচার।

কোথা তুমি প্রেমময় ?	দূর কর দুঃসময়
জাগো পুনঃ সকল হৃদয়ে,
আসুক শান্তির বাণী	যাক্ অধর্মের গ্লানি
ভরি যাক্ বিশ্ব তব জয়ে।

শ্রীশ্রীবিঠ্ঠলদেবজী

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

জি, আই, পি, রেলওয়ে দিয়া বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ যাইবার পথে খুরদুয়ারী জংশনে গাড়ী বদল করিয়া ছোট লাইনের রেলগাড়ীতে পাণ্ডারপুর যাইতে হয়। মারাঠা দেশের ইহাই প্রধান ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ভারতের নানাদেশ হইতে এখানে যাত্রীরা শ্রীভগবানের দর্শনলাভমানসে আসে। এই পবিত্র তীর্থস্থানেও কাশী বৃন্দাবনের ন্যায় অনেকে তীর্থবাস করিয়া থাকে। পাণ্ডারপুর একটি ছোট শহর, চন্দ্রভাগানদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এ অঞ্চলে লোকে এই নদীকে নর্মদা বা গোদাবরীর সমতুল্য মনে করে। এই পবিত্র পুণ্য-সলিলা চন্দ্রভাগাতে মৃতদেহ সংকারের পর অস্থি বিসর্জন দিয়া থাকে। তীরে বসিয়া পূর্ব-পুরুষের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করে।

ষ্টেশন হইতে শ্রীশ্রীবিঠ্ঠলদেবের মন্দির প্রায় দুই মাইল। সদর ফটকের অতি নিকটেই চন্দ্রভাগা নদীর পাকা ঘাট। শীতকালে নদীর জল আরও কিছু দূরে সরিয়া যায়। যাত্রীরা ইহাতে নিত্য স্নান করিয়া মন্দিরে শ্রীভগবানের দর্শনলাভ করিয়া থাকে। নদীর মাঝে ছোট ছোট দুইটি মন্দির আছে। ঐ সময় নদীর জল কম হইলেও বেশ স্রোত বহিয়া যায়। অপর পারের গ্রামবাসীরা নৌকায়

পারাপার হয়। যাত্রীরাও নৌকাবিহার করিয়া থাকে। নদীবক্ষ হইতে শহরের দৃশ্যাদি অতীব মনোরম। কোথাও গাছপালা, গুল্মলতা, ফলফুলে পরিপূর্ণ বাগান, আবার মাঝে মাঝে আকাশভেদী মন্দিরাদি, তীর্থবাসীদের সৌধমালা, আবার কোথাও বা যাত্রীদের নিমিত্ত ধর্মশালা ও স্নানের ঘাটসমূহ শোভা পাইতেছে।

বহু শতাব্দী পূর্বে শ্রীভগবানের এই মন্দির স্থাপিত হয়। মন্দির ও নাটমন্দির কষ্টিপাথরে নির্মিত। বড় বড় থাম দিয়া নাটমন্দিরটি তৈরী। শ্রীমন্দির উত্তর ভারতীয় মন্দির সদৃশ। গর্ভ মন্দিরে কষ্টিপাথরের শ্রীভগবানের বিষ্ণুমূর্তি বিরাজ করিতেছে। মূর্তি বহু পুরাতন বলিয়া মনে হয়। উচ্চতাতে প্রায় তিন ফুট। শ্রীবিগ্রহের পোষাক পরিচ্ছদের বা অলঙ্কারের মোটেই কোনরকম আড়ম্বর নাই, সাধারণ ভাবে সুসজ্জিত। ইহা সত্ত্বেও মূর্তির বদনমণ্ডলে কি এক অপূর্ব লাবণ্যময় ভাব বিরাজ করিতেছে। যাত্রীরা একবার দর্শনে কেহই তৃপ্ত হয় না। বার বার দর্শনেও অতৃপ্ত মনে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। বেদীর সম্মুখে অপরিসর স্থান হইলেও সকলেই শ্রীভগবানের দর্শন স্পর্শন ও পূজাদি করিতে পারে। ভক্তদের জন্য অবারিত দ্বার। ইহাই এই তীর্থের বিশেষত্ব।

নিত্য ভগবানের তিন বার ভোগ হয়। ভোর ৪ টায় মঙ্গলারতির পর লাড্ডু ও মাখন ভোগ; দ্বিপ্রহরে—অন্ন, রুটী, পুরন পুরী, ডাল ও নানারকম ব্যঞ্জনাদি ভোগ এবং বৈকালে ৫টায়—লাড্ডু ভোগ হয়। রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্যন্ত আরতি হইয়া থাকে। রাত্রি ১০টায় শ্রীভগবানের শয়ন ও মন্দির বন্ধ হয়।

বৎসরে চারিবার পাণ্ডারপুরে উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী, কার্তিক শুক্লা একাদশী, শিব চতুর্দশী ও চৈত্র শুক্লা একাদশী —এই চার তিথিতে বিশেষ ভাবে উৎসবাদি হয়। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে এই মন্দির ও শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। এই তিথিতে আলান্দি হইতে জ্ঞানেশ্বর, নিবৃত্তিনাথ, সোপান, মুক্তাবাঈ; নাসিক হইতে ত্র্যম্বকেশ্বর; দেহু হইতে তুকারাম, একনাথ, রোহিতাশ প্রভৃতি ভক্তদের পাল্কি শোভা-যাত্রা সহ বহুযাত্রী আসিয়া থাকে। দ্বাদশীতে এক হাঁড়িতে খৈ, দৈ ও মিঠাই মিশ্রিত করিয়া শ্রীভগবানের ভোগ হয়। ঐ প্রসাদী হাঁড়ি উপরে ঝুলাইয়া পরে ভাঙ্গিয়া দেয়। যাত্রীরা লুট করিয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণ করে। ইহার নাম "কালা" প্রসাদ। কার্তিক শুক্লা একাদশীতে গোরা কুমার ও সাওতা মালীর পাল্কী শোভাযাত্রা সহ বহু যাত্রী আসে। এই উৎসবেও কালা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শিব চতুর্দশীতে যাত্রীরা শ্রীভগবানের দর্শন, স্পর্শন, পূজা ও ভজনাদি বিশেষ ভাবে করিয়া থাকে। চৈত্র শুক্লা একাদশীর দিন সন্ধ্যায় শ্রীবিঠ্ঠলদেবের চন্দন দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাকে। এই দিন সকল যাত্রীই শ্রীভগবানের অঙ্গে চন্দন লেপন করে। দ্বাদশীর দিন ভোর ৪টায় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গরম ও ঠাণ্ডা জলের দ্বারা ভগবানের স্নান ও অভিষেক হয়। ঐ প্রসাদী চন্দনের নাম "উটি"।

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশীতে জ্ঞানেশ্বরের উৎসবে পাণ্ডারপুর হইতে শ্রীবিঠ্ঠলদেব, নামদেব ও পুণ্ডলিক এই তিন বিগ্রহের পাল্কী শোভাযাত্রা সহ যাত্রীরা আলান্দি যাইয়া থাকে।

শ্রীবিঠ্ঠল দেবের মন্দিরের নিকটেই রুক্মিণীর মন্দির অবস্থিত। পাণ্ডারপুরের অনতিদূর গ্রাম সমূহে পুণ্ডলিক, নামদেব, গোরা কুমার, সাওতা মালী, চোখবা, কানু পাতরা, সেনাহাবি ও দামজী প্রভৃতি ভগবান বিঠ্ঠলদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তদের জন্মস্থান।

ভগবান্ শ্রীশ্রীবিঠ্ঠলদেব ও তাঁহার ভক্তদের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

এইগুলি স্মরণ করিয়া স্থানীয় জনসাধারণ ভজনে অনুপ্রেরণা পায়। এখন কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের জীবনীর সহিত কয়েকটি কিংবদন্তী উল্লেখ করিব। নামদেবের কথা স্বতন্ত্রভাবে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পুণ্ডলিক

পাণ্ডারপুরের আশী মাইল পশ্চিমে কাশীগাও গ্রামে পুণ্ডলিক নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার পিতা নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। একমাত্র ছেলে পুণ্ডলিক পিতামাতার অত্যন্ত আদরের ছিল। পিতামাতা মহাসমারোহের সহিত ছেলের বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করেন। বিবাহের পর হইতেই পুণ্ডলিকের ভাবধারা দিন দিন পরিবর্তিত হইতে থাকে। পুণ্ডলিক পিতামাতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া স্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হইল। আসক্তি ক্রমেই গভীরতর হইতে লাগিল। ফলে স্ত্রীই তাহার সর্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল। কোন বিশেষ পর্বো-পলক্ষ্যে সস্ত্রীক পুণ্ডলিক পিতামাতাসহ গঙ্গাস্নান ও বাবা বিশ্বনাথের দর্শন মানসে কাশী অভিমুখে যাত্রা করে। বৃদ্ধ পিতামাতা পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। পুণ্ডলিক ও তাহার প্রিয়তমা, দুইজনে দুইটি ঘোড়ায় চড়িয়া পিতামাতার পশ্চাদনুসরণ করিল। পথে নিম্বলকর রাজার রাজধানী পণ্টন গ্রামে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এই গ্রামে রোহিতাশ নামে জনৈক চামার বাস করিত। পরদিন সকাল বেলায় তাহারা যাত্রা করিল। রাস্তায় রোহিতাশকে দেখিয়া পুণ্ডলিক তাহার জুতা মেরামত করাইল। রোহিতাশ পারি-শ্রমিক গ্রহণ করিতে রাজী না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোথায় যাইতেছেন?" পুণ্ডলিক উত্তর করিল, "গঙ্গাস্নান ও বাবা বিশ্বনাথের দর্শন লাভে কাশী যাইতেছি।" রোহিতাশ বলিল, "যাহারা তীর্থ দর্শনে যায়, তাহাদের জুতা আমি বিনা মূল্যে মেরামত করিয়া থাকি।" এই বলিয়া সে গঙ্গায় নিবেদনার্থ একটি পয়সা পুণ্ডলিকের হাতে দিল। প্রায় ছয় মাস পরে তাহারা কাশীতে পৌছিল। গঙ্গা-স্নানান্তে রোহিতাশের পয়সাটি নিবেদন করায় পুণ্ডলিকের হাতে একটি সোনার বালা উঠিল। ইহা দেখিয়া সে খুবই আশ্চর্যান্বিত হইল। অতঃপর বাবা বিশ্বনাথের পূজা, দর্শন ও স্পর্শন করিল বটে, কিন্তু মনে আশানুরূপ শান্তি পাইল না। যাহা হউক কাশীতে তিন রাত্রি বাস করিয়া তাহারা গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

ছয়মাস পরে পণ্টন গ্রামে আসিয়া পুণ্ডলিক রোহিতাশের সঙ্গে দেখা করিল এবং সোনার বালাটি তাহার হাতে দিয়া ঘটনাটি সব খুলিয়া বলিল। রোহিতাশ বলিল, "মনমেঁ চঙ্গা তো কাঠত মেঁ গঙ্গা।" অর্থাৎ মন পবিত্র হলে কাঠের গামলাতেও গঙ্গা দর্শন হয়। পুণ্ডলিক অবাক হইয়া রোহিতাশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। রোহিতাশ একটি কাঠের গামলাতে জল ঢালিয়া একটি পয়সা তাহাতে ফেলিয়া করজোড়ে বলিল, "হে গঙ্গা মাঈ, এক হাতের জন্য একটি বালা দিয়াছ, অপর হাতের জন্য আরও একটি বালা দাও।" বলিবামাত্রই তাহার হাতে একটি বালা উঠিল। এই সব দেখিয়া পুণ্ডলিক বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিল। রোহিতাশ বলিল, "আপনারা কয়জন যাত্রায় গিয়াছিলেন?" পুণ্ডলিক বলিল, "দুইটি ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা স্বামী-স্ত্রী ও পদব্রজে পিতামাতা এই চারিজন যাত্রায় গিয়াছিলাম।" ইহা শুনিয়া রোহিতাশ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "গঙ্গা-স্নানে বা বাবা বিশ্বনাথের দর্শনে আপনার কোনই ফল হয় নাই, কারণ বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে খুবই কষ্ট দিয়াছেন এবং মহাপাতকের কাজ করিয়াছেন।" পুণ্ডলিক করজোড়ে রোহিতাশের নিকট প্রার্থনা করিল. "দয়া করিয়া আমাকে এই মহাপাতকের ফল হইতে উদ্ধার করুন।"

রোহিতাশের আদেশে সে প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করিল এবং পিতামাতার সেবায় তৎপর হইয়া সর্বতীর্থ-দর্শনমানসে পুনর্যাত্রা করিল।

একবৎসর পরে পুণ্ডলিক, আবার রোহিতাশের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনি আমার গুরু, আমায় কৃপা করুন।" রোহিতাশ বলিল, "সায়ংকালে আপনি আমার নিকট আসিবেন।" পুণ্ডলিক আসিলে রোহিতাশ তাহাকে পঞ্চগঙ্গা দেখাইয়া বলিল, "আমার ঘরেই পঞ্চগঙ্গা আছে। আমি পিতামাতার সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করি না।" এইসব দেখিয়া পুণ্ডলিক বলিল, "আপনি মহাপুরুষ, আমায় শিষ্যত্বে বরণ করুন।" রোহিতাশ পুণ্ডলিককে বলিল, "আপনি দণ্ডকারণ্যে যাইয়া পিতামাতার সেবা করুন। উহাতেই শ্রীভগবানের দর্শনলাভ হইবে। ভগবান আসিলে কোন কথা বলিবেন না এবং কোন জিনিসই চাইবেন না।"

বর্তমান পাণ্ডারপুরই দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত ছিল। তদবধি পুণ্ডলিক পাণ্ডারপুরের ঘোর জঙ্গলের মধ্যে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া পিতামাতাসহ বাস করিতে লাগিল। পার্শ্ববর্তী কুয়ার জলে নিত্য স্নান করিয়া পিতামাতার সেবায় দিন অতিবাহিত করিত। এইভাবে কিছুদিন চলিল। সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান দর্শন দিবার মানসে পুণ্ডলিকের কুটীরের দরজায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি চাও?" পুণ্ডলিক পিতামাতার সেবায় রত ছিল। সে পিছনের দিকে না তাকাইয়া একখানা ইট ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "ঠাকুর ইহার উপর দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। এইমাত্র আমার বৃদ্ধ পিতামাতা আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদের পদসেবা করিতেছি।" ভগবান সেই ইটের উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। এদিকে রুক্মিণী ভগবানকে খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া দেখিলেন, তিনি ইটের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, যিনি বিশ্বপতি রাজরাজেশ্বর তিনি কিনা, একখানা ইটের উপর দাঁড়াইয়া! রুক্মিণী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীভগবান বলিলেন, "পুণ্ডলিক আমার বিশেষ ভক্ত, তার আদেশে আমি এই ইটের উপর দাঁড়াইয়া আছি। তার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়াছি। সে আসিলে তাকে বর দিয়া চলিয়া যাইব।" পুণ্ডলিক পিতামাতার সেবায় এতই তন্ময় ছিল যে, বর চাওয়া তো দূরের কথা, এমনকি একবার দেখা করিতেও আসিল না। অতঃপর শ্রীভগবান ১০০ মাইল দূরবর্তী ভীমশঙ্কর পাহাড় হইতে চন্দ্রভাগা নদীকে আনয়ন করিলেন। শ্রীভগবান বলিলেন, "পুণ্ডলিক! আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি বর চাওয়া তো দূরের কথা একবার দেখা করিতেও আসিলে না, বরং আমায় একখানা ইটের উপর দাঁড় করাইয়া রাখিলে। আমি তোমার স্নানের সুবিধার জন্য এই নদী আনয়ন করিলাম। জগতের লোক এই নদীতে স্নান করিয়া আমার দর্শনে উদ্ধার হইবে।" যেস্থানে ভগবান ইটের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থানেই সাধু মহাত্মারা পাথরের সাহায্যে প্রভুর শ্রীমন্দির নির্মাণ করে। পরে ভক্ত ব্রাহ্মণ জ্ঞানদেব নাটমন্দির ও চারিদিকের দেওয়াল দিয়া দেন। নদীগর্ভে পুণ্ডলিকের মন্দির অদ্যাবধি বিদ্যমান। মহারাষ্ট্রী ভাষায় ইটকে "বিঠ" বলে। ইহা হইতেই শ্রীভগবানের নাম হয় "বিঠ্‌বা" বা "বিঠ্‌ঠলদেব।"

গোরাকুমার

পাণ্ডারপুরের অনতিদূরে আরনগাঁও গ্রামে গোরা নামে জনৈক কুম্ভকার সস্ত্রীক বাস করিত। তাহাদের 'সবেধন নীলমণি' এক পুত্র। স্বামী স্ত্রী উভয়েই হাঁড়ি তৈয়ার করিত। ইহাই তাহাদের একমাত্র জীবিকা ছিল। তাহারা এত গরীব ছিল যে, নিত্য যাহা রোজগার হইত তাহাতেই কোন

প্রকারে ভরণ-পোষণ হইত। এমনকি কোন কোন দিন উহাতে তাহাদের দৈনন্দিন ভোজনের সঙ্কুলানও হইতনা। এমতাবস্থাতেও নিত্য ভগবানের নাম কীর্তন করিতে ভুল হইত না। খুবই নিষ্ঠা ও নিয়ম পূর্বক ভজনাদি করিত। গোরা যখন হাঁড়ি তৈয়ার করিত, অধিকাংশ সময়েই ভগবানের নাম করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যাইত। একদিন ঐরূপভাবে আত্মহারা হইয়া ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে কাদা মাটীর সহিত ছেলেকে মিলাইয়া রাখে। ফলে ছেলের মৃত্যু হয়। গোরার কোনই হুঁশ নাই। স্ত্রী কাদা মাটির সহিত ছেলেকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল, "তুমি কিরকম ভগবানের ভজন করিতেছ? ছেলে যে মারা-গিয়াছে।" গোরা চোখ খুলিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে মৃত ছেলে পড়িয়া রহিয়াছে। নিজের দোষেই ছেলের মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিল। অনুতপ্ত হইয়া গোরা নিজের হাত কুঠার দ্বারা কাটিয়া ফেলিল। তাহার রোজগার বন্ধ হইল। উপবাসে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তবুও নিত্য ভগবানের ভজনের ব্যাঘাত হইল না।

একদিন ভগবান ছদ্মবেশে গোরার নিকট আসিযা বলিলেন, "আমি নানা রকমের ভাল ভাল হাঁড়ি তৈয়ার করিতে পারি। তোমার সঙ্গে কাজ করিতে আমার বড়ই সাধ হইয়াছে।" গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" ভগবান উত্তর করিলেন, "আমি দ্বারকা হইতে আসিয়াছি।" গোরার সম্মতিতে ভগবান হাঁড়ি তৈয়ার করিতে লাগিলেন, উহাতেই গোরার নিত্য ভরণ-পোষণের অভাব মিটিয়া গেল। এইভাবে কিছুদিন বেশ চলিল। গোরা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। ইতোমধ্যে নামদেব বিঠ্ঠলদেবকে মন্দিরে দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে গোরার বাড়ীতে আসিল। প্রভু হাঁড়ি তৈয়ার করিতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কেন, প্রভো?" ভগবান বলিলেন, "গোরা আমার পরম ভক্ত। সে বিভোর হইয়া আমার নাম কীর্তন করিতে করিতে তার ছেলেকে বধ করে। তাহার পর অভিমানভরে গোরা নিজের হাত কাটিয়া ফেলে। এই কারণে তাহারা উপবাসে মৃতপ্রায়। তাই তাদের জন্য হাঁড়ি তৈয়ার করিতেছি।"

আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে সমবেত ভক্তেরা ভগবানের ভজন করিতেছে। নামদেবের অনুরোধে গোরাও যোগদান করিল। সকলেই হাতে তালি দিয়া ভজন করিতেছে। গোরা কেবল মাথা নাড়িতেছে। নামদেব বলিল, "গোরা! তুমিও হাততালি দাও।" গোরা কোন জবাব না দিয়া মাথা নিচু করিয়া আপন মনে ভজন করিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ নামদেবের অনুরোধে গোরা হাত তুলিতেই দেখিল, তাহার হাত হইয়াছে। অমনি সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নামদেবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "ভাই নামদেব। তাহলে কি আবার আমার ছেলেও বাঁচিয়া উঠিবে?" নামদেব বলিল, "হ্যাঁ ভাই! মনপ্রাণ দিয়া ভগবানের ভজন করিলেই তোমার ছেলে বাঁচিয়া উঠিবে।" গোরা বিভোর হইয়া একমনে ভজন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দেখিল ছেলে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। গোরা ভক্তিতে গদগদ হইয়া বিঠ্ঠল ভগবানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করজোড়ে বলিল, "প্রভো! তোমার অপূর্ব লীলা। জীবের সাধ্য কি তোমাকে চিনিতে পারে? তুমি দীনের দীননাথ।"

সাঁওতা মালী

সাওতা নামে একজন মালী সেঁওগা গ্রামে বাস করিত। তাহার বাগানে নানা রকমের সুগন্ধি ফুলের গাছ ছিল। ফুল-বিক্রয়ই ছিল তাহার একমাত্র

জীবিকা। নিত্য সকালে ফুল তুলিয়া মালা গাথে, আর ভগবানকে নিবেদন করিয়া বিভোর হইয়া ভজন করে। পরে বাজারে ফুলবিক্রয়লব্ধ অর্থে আহার্য দ্রব্য কিনিয়া আনিয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে। বৈকালে বাগানে কাজ করে ও ভগবানের নামকীর্তন করে। অহর্নিশিই তাঁর ভাবে সে মাতোয়ারা। এইভাবে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। বিঠ্ঠলদেব সাঁওতার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন্ দিলেন। একদিন সাঁওতা বাগানে কাজ করিতেছে ও আপন মনে ভজন করিতেছে। ভগবান ছদ্মবেশে তাহাকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে সাঁওতার নিকট আসিয়া বলিলেন, "আমাকে চোরে তাড়া করিয়াছে, কোথায় লুকাইব, লুকাইবার স্থান নাই।" সাঁওতা চীৎকার শুনিয়া সবই বুঝিতে পারিল। তৎক্ষণাৎ নিজের পেট চিরিয়া বলিল, "প্রভো! এই যে লুকাইবার স্থান।" স্বস্বরূপে বিঠ্ঠলদেব দর্শন দিয়া সাঁওতার পেটের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সাঁওতার পেটও জুড়িয়া গেল।

চোখবা

পাণ্ডারপুরের কিয়দ্দূরে মঙ্গলবেড়য়া নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে চোখবা বাস করিত। সে জাতিতে মহার। ইহারা গ্রামের মৃত জানোয়ার সব ফেলিয়া থাকে। চোখবা অবিবাহিত। বাড়ীতে তাহার একমাত্র ভাই আছে। তাহার শৈশবাবস্থাতেই পিতামাতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চোখবা অধিকাংশ সময়েই ভগবানের ভজনে দিন অতিবাহিত করে। একদিন গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণের একটি ঘোড়া মারা যায়; ঘোড়া ফেলিবার জন্য ব্রাহ্মণ চোখবাকে ডাকিল। তখন চোখবা ভাইয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিল। ভাই বলিল, "আমাকে কেন? তোমার ভগবানকে ডাকনা, সেই তোমার সঙ্গে যাবে।" চোখবা ভাইয়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ব্রাহ্মণের বাড়ী যাত্রা করিল। পথে ছদ্মবেশী ভগবান বিঠবার সহিত দেখা হয়। ভগবান চোখবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছ?" চোখবা উত্তর করিল, "ব্রাহ্মণের ঘোড়া মারা গিয়াছে, তাহা ফেলিতে হইবে।" ভগবান বলিলেন, "চল আমিও যাইব, তোমায় সাহায্য করিব।" উভয়ে মিলিয়া ঘোড়াকে ফেলিয়া দেয়। তারপর চোখবা সঙ্গের লোকটিকে আর দেখিতে পাইল না। পারিশ্রমিক বাবদ চোখবা সামান্য গম পাইয়াছিল।

উক্ত গম ভগবানের নিমিত্ত মস্তকে ধারণ করিয়া পাণ্ডারপুরাভিমুখে সে যাত্রা করিল। পথ চলিতে চলিতে অনেক রাত্রি হইল। পাণ্ডারপুরে আসিয়া দেখিতে পাইল, মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া পূজারী বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। চোখবা মন্দিরের পাশে বাহিরে বসিয়া ভগবানের ভজন করিতেছিল। সেই সময় ভগবান স্বয়ংই মন্দিরের ভিতরে তাহার বিশ্রামের ও খাবারের ব্যবস্থা করিলেন। পরদিন সকালে পূজারী মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেখিতে পাইল, একজন লোক ভিতরে বসিয়া আছে। পূজারী ক্রোধান্বিত হইয়া চোখবাকে প্রহার করিল এবং মন্দিরের বাহিরে তাড়াইয়া দিল। পূজারী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ভগবানের বগলে একটি গরুর হাড়। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পূজারী হাড়টি টানিয়া বাহির করিতে পারিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া পাণ্ডারপুরের ব্রাহ্মণদের ডাকিয়া আনিল। তাহাদের সকলের চেষ্টাতেও হাড় বাহির করিতে অকৃতকার্য হইল। নিরুপায় হইয়া পূজারী গলবস্ত্রে ও করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল, "প্রভো! এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।" ভগবান আদেশ করিলেন, "যাও, চোখবাকে ডাকিয়া লইয়া এস। সে আমার পরম ভক্ত। তাহাকে তুমি অযথা মারিয়াছ। তাহার নিকট ক্ষমা চাও। তাহার হাত লাগিলেই এই হাড় খুলিয়া যাইবে।"

পূজারী চোখবার অনুসন্ধানে বাহির হইল। কিছুক্ষণ পরে অনতিদূরে দেখিতে পাইল, চোখবা চন্দ্রভাগা নদীর তীরে বসিয়া রুটি খাইতেছে। লোকজনের যে জায়গায় যাতায়াত নাই, এমন জায়গায় বসিয়া চোখবা রুটি খাইতেছিল। ঘাটে বসিলে হয়তো আবার কোন বিপদ হইতে পারে, তাই দূরে বসিয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাহার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। চোখবা ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র প্রাণের দায়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণও পিছু পিছু ছুটিতেছে। কিছুক্ষণ পরে চোখবাকে আলিঙ্গন করিয়া সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। চোখবা ভগবানের আদেশ জানিয়া ব্রাহ্মণের সহিত মন্দিরে আসিল। চোখবার হাত লাগিবামাত্রই ভগবানের বগল হইতে গরুর হাড় বাহির হইয়া গেল। বিঠ্ঠলদেব বলিলেন, "যার যা কাজ, সে তাই করবে।" চোখবা আপন গ্রামে চলিয়া আসিল এবং পূর্ববৎ ভগবানের ভজনে দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন চোখবার ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িল। উহাতেই চাপা পড়িয়া চোখবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিঠ্ঠলদেবের আদেশে নামদেব চোখবার মৃতদেহ পাণ্ডারপুরে আনয়ন করিয়া মন্দিরের সম্মুখেই তাহার সমাধি স্থাপন করিলেন। অদ্যাবধি মহারগণ প্রথমে চোখবার পূজা করিয়া পরে বিঠ্ঠলদেবকে দর্শন পূজাদি করিয়া থাকে।

কানু পাত্তরা

মঙ্গলবেড়য়া গ্রামে জনৈকা নর্তকী বাস করিত। নৃত্যগীতই তাহার জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন ছিল। সে বাদশাহের দরবারে নৃত্যগীত করিত। কানুনামে তাহার এক পুত্র ছিল। সে নিত্য ভগবানের ভজন না করিয়া আহারাদি করিত না। তাহার সুললিত কণ্ঠের গান শুনিয়া গ্রামবাসীরা সকলেই মুগ্ধ হয়। কানুর ভজন শুনিবার জন্য বাদশা তাহার মাতাকে বলিলেন। মাতা ছেলের নিকট বাদশাহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। কানু দরবারে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বাদশা দুইবার তাঁহার সিপাহীদের পাঠাইলেন। তাহারা অকৃতকার্য হইয়া বাদশাহের সকাশে ফিরিয়া আসিল। অগত্যা বাদশা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কানু পাণ্ডারপুরে আসিয়া বিঠ্ঠলদেবের নিকট সভয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করিল, "প্রভো। বাদশা আমাকে শাস্তি দিতে আসিয়াছেন।" ভগবান বলিলেন, "তোমাকে দরবারে যাইতে হইবে না। তুমি মন্দিরের পাশেই লুকাইয়া থাক। কেহই তোমায় দেখিতে পাইবে না।" ভগবান এইরূপভাবে কানুকে লুকাইয়া রাখিলেন যে, বাদশা তাঁহার সিপাহীগণসহ বহু চেষ্টা করিয়াও কানুর কোনই খোঁজ করিতে পারিলেন না। অকৃতকার্য হইয়া বাদশা বিফলমনোরথে রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। কানু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে জীবন উৎসর্গ করিল।

সেনা হ্বাবি

আণ্ডো সহরে সেনানামে একজন নাপিত বাস করিত। মারাঠী ভাষায় নাপিতকে 'হ্বাবি' বলে। সে বাদশাহের ক্ষৌরকর্ম করিত। নিত্য বিঠ্ঠল ভগবানের পূজা ও ভোজ্য দ্রব্যাদি নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিত। ভুলিয়াও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। একদিন বাদশা ক্ষৌরকর্মের নিমিত্ত সেনাকে ডাকিলেন। সেই সময় সে ভগবানের পূজায় রত ছিল। ভক্ত সেনার পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া বিঠ্ঠলদেব সেনার রূপ ধারণ করিয়া বাদশাহের আদেশ পালন করিলেন। ক্ষৌরকর্ম করিবার সময় ভগবান বাদশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর! কে আপনার কাজ করিতেছে?" বাদশা উত্তর করিলেন, "সেনাই আমার কাজ করিতেছে।" ক্ষৌরকর্ম শেষ করিয়া ভগবান চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে সেনা বাদশাহের সকাশে আদেশ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আসিল। তাহাকে দেখিয়া বাদশা বলিলেন, "সেনা, এই যে তুমি আমার কাজ করিয়া গেলে, আবার কেন আসিয়াছ?" সেনা দ্বিরুক্তি না করিয়া ফিরিয়া আসিল। এই কাজ যে বিঠ্ঠল ভগবানই করিয়াছেন, ইহা সে মরমে মরমে বুঝিয়াছিল। "যিনি জগৎপিতা জগদীশ্বর, তিনি কিনা আমার মতন গণ্য ব্যক্তির রূপ ধারণ করিয়া অস্পৃশ্যকাজ করিয়াছেন!" বিঠ্ঠল ভগবানের এই অপার দয়ার কথা স্মরণ করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া সেনা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দামজী

দামজী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। খুব নিষ্ঠা সহকারে তিনি নিত্য ভগবানের ভগবানের পূজা ও পাঠ সমাপনান্তে আহার করিতেন। তিনি বেদর রাজ্যের মঙ্গলবেড়য়া অঞ্চলের বাদশাহের দেওয়ান ছিলেন। কোন এক সময়ে ঐ দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অনাহারে হাজার হাজার নরনারী আবাল-বৃদ্ধবনিতা অকাল মৃত্যুতে পতিত হইল। একদিন ঐ অঞ্চলের বহুলোক সমবেত হইয়া পাণ্ডারপুরে আসে। সকলেই ইহা স্থির করিল যে, অনাহারে মরার চেয়ে চন্দ্রভাগা নদীতে ডুবিয়া মরাই শ্রেয়ঃ। সকলেই নদীতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ঠিক সেই সময় ছদ্মবেশে বিঠ্ঠল ভগবান তাহাদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি করিতেছ?" তাহারা বলিল, "আমরা পেটের দায়ে চন্দ্রভাগাতে ডুবিয়া মরিব ঠিক করিয়াছি।" ভগবান বলিলেন, "আমার কথা শুন। তোমরা মঙ্গলবেড়য়াতে যাও। সেখানে তোমাদের খাদ্যদ্রব্যাদি পাইবে।" তাহারা মঙ্গলবেড়য়াতে উপস্থিত হইয়া দেওয়ানের নিকট সব বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। দামজী বাদশাহের ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন এবং প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি লইতে আদেশ করিলেন। ফলে বাদশাহের ভাণ্ডার শূন্য হইল বটে, কিন্তু বহুলোকের জীবনরক্ষা হইল। বাদশা জনৈক কর্মচারীর নিকট এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। বিনানুমতিতে ভাণ্ডার হইতে দ্রব্যাদি বিতরণের অপরাধে দামজীকে কারাদণ্ডের উদ্দেশ্যে সিপাহী প্রেরণ করিলেন। সিপাহীরা দামজীকে বন্দী করিয়া বেদর রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিল। দামজী বিনীতভাবে সিপাহীদের বলিল, "পথে পাণ্ডারপুরে বিঠ্ঠল ভগবানকে একবার দর্শন করিব।" সিপাহীরা ইহাতে কোনই আপত্তি করিল না। তাহারা পাণ্ডারপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দামজী স্নান করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রভাগাতে অবতরণ করিলেন।

এদিকে বিঠ্ঠল ভগবান কালো কম্বল গায়ে ও লাঠি হস্তে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি দামজীর চাকর। আমার নাম বিঠু। আমি জাতিতে মহার। ভাণ্ডারের খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাবদ এই টাকা সহ আমাকে তিনি পাঠাইয়াছেন। হিসাব করিয়া রসিদ লিখিয়া দিতে হইবে।" বাদশা টাকা পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ধনভাণ্ডারে টাকা জমা রাখিতে কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল, ভাণ্ডারের শস্যের মূল্য হইতেও টাকার পরিমাণ বেশী। ভগবান বলিলেন, "এই টাকা আপনারই জন্য তিনি দিয়াছেন।" বাদশা রসিদে নিজের নাম দস্তখত করিয়া দিলেন। 'বিঠু' রসিদসহ প্রত্যাবর্তন করিল। রসিদ এই মর্মে লেখা হইয়াছিল— "আমি মঙ্গলবেড়য়া ভাণ্ডারের সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ মূল্য বুঝিয়া পাইয়াছি।" ভগবান ঐ রসিদ দামজীর গীতার ভিতর রাখিয়া দিলেন। স্নানান্তে দামজী পাঠের উদ্দেশ্যে গীতা খুলিয়া দেখিতে পাইলেন, বাদশাহের স্বহস্তের দস্তখতসহ একখানা রসিদ। ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন। দামজী পাঠান্তে ভগবানের

দর্শনলাভ করিয়া সিপাহীগণসহ বেদর রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বাদশা বিঠ্ঠর পুনর্দর্শনলাভমানসে পাগল হইয়া উঠিলেন। কিছুতেই মনে শান্তি নাই। বিঠ্ঠর দর্শন—এই একমাত্র চিন্তাই হৃদয় অধিকার করিল। অগত্যা দর্শনমানসে রাজ্য ছাড়িয়া পথ চলিতে লাগিলেন। পথে দামজীকে দেখিবামাত্র আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি মহাপুরুষ, আমি ঘোরতর অন্যায় করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর। বিঠ্ঠ নামে তোমার চাকরটিকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।" বাদশাহের কথায় দামজী খুবই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "হুজুর! বিঠ্ঠনামে আমার কোন চাকর নাই। আমি তাহাকে জানি না। আপনি দয়া করিয়া তাহার কোন নিদর্শন দিতে পারেন কি?" বাদশা বলিলেন. "সে জাতিতে মহার। ভাণ্ডারের সমস্ত শস্যের মূল্য সে আনিয়াছিল। তাহার গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, পরিধানে কালো কম্বল ও হাতে লাঠি, জ্যোতিঃপূর্ণ বদনমণ্ডল, মনোমুগ্ধকর নয়নযুগল ও সুমিষ্টভাষী।" গীতার ভিতর সেই রসিদের কথা স্মরণ করিয়া দামজী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইল। আর বলিল, "হে বিঠ্ঠলদেব, হে পাণ্ডুরঙ্গ! আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত তুমি মহারের বেশে বাদশাকে দর্শন দিয়াছ। তিনি খুবই ভাগ্যবান। হে প্রভো! তুমি জগৎপিতা জগদীশ্বর, আমার জন্য কতই না কষ্ট করিয়াছ। আমি জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলাম।"

"হে বিঠবা, হে বিঠ্ঠল" বলিয়া দামজী গদগদ-ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। সেই সময় দীনবন্ধু পতিতপাবন ভগবান দামজী ও বাদশাকে শঙ্খ, চক্র, গদা, ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিলেন। সেই অবধি দামজী বিঠবার ভাবে বিভোর হইয়া বাদশাহের দেওয়ানের কর্ম ত্যাগ করিয়া বাকী জীবন পাণ্ডারপুরে বাস করিতে লাগিলেন। বিঠ্ঠলদেবের স্মরণ-মননে তাঁহার দিন পরমশান্তিতে অতিবাহিত হইত।

বিষ্ণু

ডক্টর মতিলাল দাস, এম্‌-এ, বি-এল্‌, পি এইচ্‌-ডি

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, ছন্দে সুরময়, গতির হিল্লোলে হিল্লোলিত। সেই অবাধ, অনন্ত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে যখন যতি ফেলি, তখন দেখি ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং শিব সংহার করেন। কিন্তু গতিবেগের স্রোতে তিনই এক, একই তিন।

এটা আমার সিদ্ধান্ত নয়। ঋষিগণের উপলব্ধ সত্য। তাঁদের প্রজ্ঞাদৃষ্টির ভাস্বর অবদান। বিষ্ণু-পুরাণে মৈত্রেয়ের প্রশ্নে পরাশর এই গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই জগৎ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতেই এই জগৎ অবস্থিত, তিনিই ইহার স্থিতি ও সংযমের কর্তা এবং আসলে তিনিই জগৎ।

দর্শনের পরিপ্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা সমস্তই পুরাণবিদের সঙ্কলনে রূপ পাইয়াছে। বিষ্ণু ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন।

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্‌।
একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্মলম্‌॥ বি-২-১৩

এই পরম জ্ঞান পরম্পরায় পুরাণকারের কৃপায় সাধারণের সম্পদ হইয়াছে। বিষ্ণু ও ব্রহ্মা অভিন্ন—উভয়েই পরম সত্তা—শাশ্বত নিত্য পদার্থ, অজ, অক্ষয় ও অব্যয়। তাহা একেরই বিভূতি ও প্রকাশ, মায়াহীন বলিয়া তাহা নির্মল ও জ্যোতির্ময়।

স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানম্‌ বিষ্ণুঃ পাল্যশ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ॥ বি-২-৬৩

প্রভু বিষ্ণু স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন করেন,

পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকে পালন করেন, শেষে সংহর্তা হইয়া নিজেই সমস্ত ধ্বংস করেন। বিষ্ণুর এই পরম মাহাত্ম্য কিন্তু আদি আর্যগণের মধ্যে ছিল না। ঋগ্বেদে বিষ্ণু কিন্তু অপ্রধান দেবতা—তাঁহার উদ্দেশে ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণের মত সূক্তের উচ্ছ্বাস নাই। অল্প কয়েকটি সূক্তে মাত্র বিষ্ণুর উল্লেখ আছে।

কণ্বপুত্র মেধাতিথি বিষ্ণুর বন্দনা করিতেছেন:—

বিষ্ণু যেথায় সপ্ত ধামে করেছিলেন পাদক্রমণ,
দেবতা সবে সেই ভুবনের করুন মোদের পরিরমণ।

বিষ্ণু যখন বিশ্ব পরে রেখেছিলেন ত্রিধা চরণ,
ধূলি জালে পূর্ণ ধরা নিয়ে ছিল স্নিগ্ধ শয়ন।

বিস্তারিলেন তিনটি চরণ ত্রিলোকেরি ব্যাপ্তি-কারণ,
অবিজেয় পালক তিনি করেছিলেন ধর্ম ধারণ।

ইন্দ্রদেবের যোগ্য সখা বিষ্ণুদেবের কর্ম হেরি,
যাঁহার কৃপায় ব্রত পালি থাকেন যিনি ক্রিয়া ঘেরি।

বিষ্ণুদেবের পরম পদে দেখেন সদা কবি দলে,
অবিরোধে দেখে সকল চক্ষু যথা আকাশতলে।

বিপ্র যারা অপ্রমাদে স্তুতি করেন নিত্য দিবা,
বিষ্ণুদেবের পরমপদে দেন যে তারা দীপ্ত বিভা।"

ইহার পর দীর্ঘতমার বন্দনা পাই। তিনি দুইটি পূর্ণ সূক্তে বিষ্ণুর স্তব করিয়াছেন এবং অন্য একটি সূক্তে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর যুক্ত স্তোত্র রচনা করিয়াছেন।

দীর্ঘতমা বলিতেছেন—এই পৃথিবী বিষ্ণু পরিমাপ করিয়াছিলেন—যাঁহার ত্রিবিক্রম পদক্ষেপের মধ্যেই বিশ্বজগৎ বাস করে। তিনি ত্রিভুবন ধারণ করিয়া আছেন—এই ত্রিভুবন তাঁহার অমৃত ধারায় প্লাবিত—তাঁহার পরমপদে সেই অক্ষয় মধুর উৎস। মানুষ তাঁহার প্রথম দুই পদ জানিতে পারে, কিন্তু তাঁহার তৃতীয় পদ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। গগনচারী বিহগেরাও তাঁহার তৃতীয় পদের সন্ধান পায় না।

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং
ব্যতীঁরবী বিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋকভির্যুবাকুমারঃ
প্রত্যেত্যাহবং॥ ১-১৫৫-৬

কেহ কেহ বলেন বিষ্ণু ও আদিত্য অভিন্ন। বিষ্ণু তাহার নব্বইটি অশ্বকে (দিনকে) গতি দান করেন, তাহাদের চার নাম দিয়া চার ঋতু সৃষ্টি করেন এবং এইরূপে ৩৬০ দিনে বৎসর পরিমাণ করেন।

রাজা বরুণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় মরুৎ-পরিচালক বিষ্ণুর আজ্ঞা মানেন। বিষ্ণু যজমানকে ঋতের ভাগ অর্পণ করেন।

তথাপি বিষ্ণু উপেন্দ্র। ভরদ্বাজ বলেন—বিষ্ণু ইন্দ্রের জন্য শত মহিষ বলির আয়োজন করেন। ভরদ্বাজই ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬৯ সূক্তে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর যুগপৎ উপাসনা করেন। ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে ভরদ্বাজ মদপতি বলিয়াছেন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু অন্তরিক্ষকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন, মানুষের জীবনধারণের জন্য দেশকে প্রসারিত করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাতৃগণ এই শ্লোক হইতে অনুমান করেন, ইন্দ্র ও বিষ্ণু আর্যগণের দুই অবিস্মরণীয় নেতা—দিগ্বিজয়ে যাত্রী আর্য পিতামহগণকে তাঁহারা পথ দেখাইয়া দুর্গম মরুকান্তার পার করাইয়া ভারতবর্ষে নিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নেতৃত্বেই আর্যগণ পঞ্চনদের তীরে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। সেই কথা স্মরণ করিয়াই এই দুই মহাপুরুষের বিজয়গাথা রচিত হইয়াছিল। ভরদ্বাজ পুনরায় বলিতেছেন—ইন্দ্র ও বিষ্ণু চিরবিজয়ী—কেহ তাঁহাদিগকে কখনও পরাজিত করিতে পারে নাই—তাঁহারা তাঁহাদের সমরাভিযানের দ্বারা বিস্তৃতা পৃথ্বীকে আর্যগণের বাসভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে বিষ্ণু ইন্দ্রের গৌরবকে ম্লান করিয়া পরম পুরুষের মাহাত্ম্য লাভ করিলেন—

ঋগ্বেদের দেবতামণ্ডল যবনিকার অন্তরালে অস্তমিত সূর্যের ন্যায় ম্লান হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ-যুগেই ইহা ঘটিয়াছিল এবং মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে ইহার চরম পরিণতি লাভ হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নির্দেশ দিতেছেন—

অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্বা অন্যা দেবাঃ। ১।১

অগ্নি দেবতাদের প্রথম, আর বিষ্ণু দেবগণের পরম অন্য দেবতারা ইহাদের মাঝখানে থাকেন।

শতপথ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক বিষ্ণুর এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কাহিনীর কথা বলিয়াছে। দেবগণ যজ্ঞ করিলেন। স্থির হইল যে, তপস্যার বিভূতিতে যিনি সর্ব প্রথম যজ্ঞ ফল লাভ করিবেন, তিনিই দেবতাদের নেতা পরমদেব হইবেন।

বিষ্ণু স্বকীয় অপূর্ব প্রতিভায় যজ্ঞের চরম সিদ্ধি সকলের পূর্বে লাভ করিলেন, এবং দেবতাগণের প্রথম ও প্রধান হইলেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব শক্তির, বীর্যের ও ক্রিয়ার পরাকাষ্ঠা।

বিষ্ণুর এই অতুলনীয় শ্রীবৃদ্ধিই বামন-কাহিনীর মূল। সুরাসুরের কলহে বিষ্ণু অসুরগণের নিকট মাত্র ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিয়া লইলেন, পরে সেই ত্রিপাদ-সংক্রমণে সমস্ত বিশ্ব গ্রহণ করিলেন। এই ত্রিবিক্রম কথা কিন্তু সংহিতা যুগের ভাবসম্প্রসারণ। ব্রাহ্মণে তাহা বিস্তৃত এবং পুরাণে তাহা পল্লবিত।

কিন্তু এইটুকু বলিলেই বিষ্ণুর পরম বিজয়ের রহস্য বুঝা যায় না। তাঁহার গৌরবের কারণটুকু কঠোপনিষদে সুব্যক্ত করা হইয়াছে। কাঠকেরা বলেন—

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

যে মানুষ বিবেককে সারথি করিয়া চলে, যে মনন-শক্তিরূপ বল্গাকে শাসনে রাখে, সেই মানুষ পথের পরিসমাপ্তি পায়, সেই বিষ্ণুর পরম পদ পায়। বিষ্ণুর পরম পদ মানুষের অভীপ্সার শেষ সীমা, মানুষের অধিকারের পরাকাষ্ঠা!

বিষ্ণুর দুই পদ দৃশ্য, কিন্তু তাঁহার অদৃশ্য যে পদ তাহাই মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সর্বোত্তম অধিষ্ঠান বলিয়া মানুষ ধরিয়া লইল। অপবর্গ, মুক্তি বা চরম অভ্যুদয় বলিতে মানুষ এই অজ্ঞাত পদকে বুঝিতে শিখিল। বিষ্ণু এই পরম পদের গোপ্তা, তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

কবে কোন্ ঋষির সাধনায় এই পরম সত্য মানব জানিয়াছিল, ইতিহাস বা শাস্ত্র তাহার নির্দেশ রাখে নাই, কিন্তু যেদিন হউক, সেই দিন হইতে বিষ্ণু হিন্দুর পরম দেবতা। কালে কালে যুগে যুগে নব নব কল্পনা আসিয়া মানুষকে নূতন নূতন সাধনায় চালাইয়াছিল, কিন্তু দেখা যায়, বিষ্ণু সেই সব সাধনার সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন।

বাসুদেব, নারায়ণ, কৃষ্ণ, প্রভৃতির সহিত বিষ্ণু অভিন্ন হইয়া মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়াছেন। ভাগবতে ও বিষ্ণু পুরাণে এই সব ভক্তিবাদের সকল আবির্ভাব কৌতূহলী সাধককে রসাপ্লুত করে।

বিষ্ণুপুরাণে ভক্তিবাদের সহিত অদ্বৈতবাদের সমন্বয় ঘটানো হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশের দ্বাদশ অধ্যায়ে পাই—

তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ
ক্বচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তু জাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্মভেদ—
বিভিন্নচিত্তৈর্বহুধাঽভ্যুপেতম্।
জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকম্
অশেষশোকাদিনিরস্তসঙ্গম্।
একং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ
স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি॥

সংসারে যাহা কিছু দেখি, তাহা জ্ঞানেরই লীলা। জ্ঞানের বাহিরের বস্তুসত্তা কিছুই নাই—নানা মানুষের নানা চিত্তে এই এক পরম প্রকাশ বিচিত্ররূপে

প্রতিভাসিত, কিন্তু আসলে এক জ্ঞানই আছে। সেই পরম প্রজ্ঞান বিশুদ্ধ, বিমল; তাহাতে শোক নাই, গ্লানি নাই, আর সেই জ্ঞান পরমপুরুষ সনাতন বাসুদেবের সহিত অভিন্ন।

শঙ্করাচার্যের উক্তিই যেন বিষ্ণুপুরাণ-কথক পরাশরের মুখেই বসানো হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণু অদ্বৈতবাদের প্রধান অধিষ্ঠান হইয়া দাঁড়ান নাই, তিনি মানুষের মনে প্রীতি ও অনুরাগের দীপ জ্বালাইয়া মানুষকে বুকে টানিয়াছেন।

বাংলা দেশে চৈতন্যদেব হরিভক্তির যে বন্যা বহাইয়াছেন বাঙালী সকলেই তাহা জানেন, তাহার কথা বলিব না। বিষ্ণুপুরাণেই দেখি বিষ্ণু ভক্তির পাত্র ও পূজাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রহ্লাদ যে বিষ্ণুস্তব করিয়াছিলেন তাহার শেষাংশে তিনি শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা কামনা করিতেছেন এই মন্ত্রে—

নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ।
ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্য প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষয়মব্যয়ম্।
আধারভূতঃ সর্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ॥
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ
যত্র সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বসংশ্রয়ঃ॥

যে পরম দেবতা জগৎ জুড়িয়া আছেন, জগতের কারণ তিনি, ধ্যানের কমলাসনে তাঁহাকেই উপলব্ধি করি, তাঁহার পরিবর্তন নাই, সেই অব্যয় শ্রীহরি প্রসন্নতার আশীর্বাদে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।

এই বিরাট জগৎ যাঁহাতে ওতপ্রোত—কাপড়ের টানা ও পড়েনের মত যাঁহাতে গ্রথিত, সেই পরম পুরুষ শ্রীহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। সেই বিষ্ণুকে বার বার ভজনা করি, যাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, যিনি সর্ব, যাঁহাতে সমস্ত লীন হয়—সেই বিষ্ণুকে বার বার নতি জানাই।

বিষ্ণুর লীলাভিনয় ভারতীয় সাধনার সকল যুগে নব নব রূপ লইয়া ভারতচিত্তকে সরস করিয়াছে। এই অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই লীলার কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম। প্রহ্লাদ যে প্রার্থনা ও যে বর চাহিয়াছিলেন, আমরাও সেই প্রার্থনা জানাই—

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

হে অচ্যুত, জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অবিচলা ভক্তি থাকে। বিষয়ীরা যেমন বিষয়ে মাতিয়া যায়, আমি যেন তোমাতে তেমনই আসক্তি অনুভব করি। আমার হৃদয় হইতে যেন তোমার প্রতি পরানুরক্তি কখনও অপসৃত না হয়।

প্রয়াগে একমাস

শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী রায়

বহু বৎসর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পিতৃতুল্য একজন সাধু বলিয়াছিলেন, "সনাতন ধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্য উপলব্ধি করতে হলে একবার অবশ্য কুম্ভমেলায় যেও।"

কখনও একলা কোনও তীর্থস্থানে যাই নাই। তাহাতে অসুস্থ শরীর। কোনও আত্মীয়-স্বজনের সম্মতি পাইব না বলিয়াই কাহাকেও জানাই নাই। একান্ত আত্মনির্ভরশীল নই, তাই একটু ভয়ে ভয়ে ৮ই জানুয়ারী, ১৯৫৪ (২৪শে পৌষ, ১৩৬০) পাঞ্জাব মেলে রওনা হইলাম কাশী। পরদিন পৌছিলাম। কাশীতে মা রহিয়াছেন।

১২ই জানুয়ারী মায়ের হাতের তৈয়ারী খিচুড়ি

খাইয়া রওনা হইলাম ষ্টেশনে। ষ্টেশনে পৌছিয়া শুনিলাম গাড়ী (যেটা আসিবার কথা ১০-৪৪) বিলম্বে পৌছিবে। ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে করিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। দলে অন্ততঃপক্ষে আমরা পঁচিশ তিরিশ জন ছিলাম। কাশী সেবাশ্রমের কয়েকজন সাধু মহারাজও যাইতেছিলেন।

যাহা হউক অবশেষে বহু প্রত্যাশিত ট্রেনটি ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে সশব্দে কুলীদের ত্রস্ত ব্যস্ত করিয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। যাত্রীরা ছুটিতে ছুটিতে যে যে কামরায় পারিল উঠিয়া বসিল। 'চাচা আপন বাঁচা' কে কার ধার ধারে? সঙ্গীদের কাহারও সাহায্য পাইলাম না। আশ্চর্য, এত ভিড় সত্ত্বেও ষ্টেশনে কেহই পড়িয়া রহিল না।

সন্ধ্যার গোধূলিতে আমরা ঝুসী ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। পশ্চিম আকাশে রঙের খেলা, সূর্য পাটে বসিয়াছেন। সমস্ত ঝুসী শহর বিজলী আলোর মালায় ঝলমল্ করিতেছে। যে দিকে দৃষ্টি যায় বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের তাঁবুর উপর ধর্মের প্রতীক বিচিত্র বর্ণের পতাকা পত্ পত্ শব্দে উড়িতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ক্যাম্পে আসিয়া পৌছিলাম দেড় মাইল হাঁটিয়া। মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সারি সারি কুটীর। একটিতে আমার স্থান হইল। স্থানটি অপরিচিত, তখনও বেশী যাত্রী আসে নাই। একলা একটি ঘরে থাকিতে হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি, পূর্বদিকে নিটোল রক্তগোলক ধীরে ধীরে উদিত হইতেছেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! 'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ ··· এবং ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্' অজ্ঞাতে কখন উচ্চারিত হইল বুঝিতে পারিলাম না।

দুরন্ত শীত, হাত পা অবশ অসাড়; তুষার-তল বায়ু শরীরে সূচিকা বিদ্ধ করিতেছে। তথাপি ত্রিবেণীর সন্ধানে চলিলাম পরমাগ্রহে। ঝুসী হইতে গঙ্গা এক মাইল হইবে। চলিতে চলিতে সঙ্গীদের সহিত আলাপাদি করিতে করিতে গত দিনের ক্লান্তি দূর হইল। গঙ্গাতীর হইতে নৌকাযোগে সঙ্গমে যাইতে হয়। নৌকায় উঠিলাম। গঙ্গার অবিরাম গতি, উচ্ছৃঙ্খল ঢেউয়ের তালের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও নৃত্য করিয়া উঠিল অপার আনন্দে। শরীরমনও স্নিগ্ধ হইল। পূর্বে দুইবার সঙ্গমে স্নান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু এবার সঙ্গমকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিলাম। গঙ্গা ও যমুনার দুইটি ধারা পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে বিভিন্ন রূপ লইয়া। গঙ্গার রং গেরুয়া, যমুনার নীল জলে কাহার রং প্রতিফলিত হইতেছে? এ যে শ্যামসুন্দরের গায়ের অবিকল নীল রংটি! কি অপূর্ব শোভা! 'যো অপ্সু' মনে পড়িল। সুনীল অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া সেই একই অনুভূতি হইল। অরূপের রূপ বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করিয়া আছে। অবগাহন করিয়া শরীর মন পবিত্র হইল। নবশক্তি সঞ্চার হইল।

যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মকর-সংক্রান্তি আসিয়া পড়িল। চারিদিক আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। কি দেখিব? কি জানিব? না জানি সে কি আনন্দ, 'নূতন আলোক আপন হৃদিমাঝে!' শুনিলাম, নানা সম্প্রদায়ের সাধুদিগের মিছিল বাহির হইবে ভোর ছয়টায়। ভিড়ের ভয় সত্ত্বেও দুরন্ত শীতকে অগ্রাহ্য করিয়া ভোর চারিটায় টর্চ্চ জ্বালাইয়া বাহির হইলাম তিনটি প্রাণী। পথে দেখিলাম—জনসমুদ্র, রাস্তার দুই পাশে অসংখ্য যাত্রী স্থানাভাবে রাত্রি যাপন করিয়াছে।

রাজ্য সরকারের বন্দোবস্ত খুব ভালই ছিল। অতি যত্নে গঙ্গার উপর এক নম্বর, দুই নম্বর করিয়া সাত নম্বর পর্যন্ত সেতু নির্মাণ করা হইয়াছিল। যে সেতুর উপর দিয়া মিছিল গঙ্গামুখে যাইবে, সে সেতুর উপর দিয়া জনসাধারণের গমনাগমন নিষিদ্ধ

ছিল। মিছিল এক পথ দিয়া যাইবে এবং স্নানান্তে অন্য পথ দিয়া ফিরিবে এইরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল। দর্শকদিগের জন্য রাস্তার দুই পাশে প্রায় দুইতলা সমান উঁচু পাশাপাশি শালের খুঁটি পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। সেখানে দাঁড়াইয়া আমরা চারিজন মিছিলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কলেজের স্বেচ্ছাসেবকগণ ও পুলিশবাহিনী অতি দক্ষতার সহিত কার্য করিতেছে দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম।

ক্রমে দেখিলাম, নানা সম্প্রদায়ের সাধুগণ আপন আপন নানারূপ অস্ত্র—ঢাল, তলোয়ার, লাঠি, সোঁটা ও বাদ্যযন্ত্র সহ অগ্রসর হইতেছেন। সন্ন্যাসী, বৈরাগী, উদাসী, পঞ্চযতী, নাথপন্থী, কবীর-পন্থী, দাদু-পন্থী, অটল, নিম্বার্ক, আবাহন, শ্রীসম্প্রদায় মাধবী ও বল্লভাচারী প্রভৃতি অসংখ্য সম্প্রদায়। সকলের নামোল্লেখ অসম্ভব। ইঁহারা আপন আপন মর্যাদানুসারে কেহ হাতীতে, কেহ পালকিতে, কেহ উটের পিঠে, কেহ বা চতুর্দোলায়। অধিকাংশ সাধু বিশেষতঃ নাগা সাধুরা পদব্রজে আপন আপন ইষ্টদেবতা ও ধর্মের প্রতীক বিচিত্র পতাকা সহ একে একে (দড়ি দিয়ে ঘেরা) গঙ্গায় নামিলেন স্নান করিতে। নাগা সাধুদিগের স্নান দেখিয়া খুবই আনন্দ পাইলাম। জলে নামিয়া ইঁহারা একে অপরের গায়ে জল ছিটাইলেন, গঙ্গামাটি সারা অঙ্গে মাখিলেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে 'পার্ব্বতীপতে হর হর ব্যোম ব্যোম' শব্দে ওঁকারের ঝঙ্কারে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া চলিলেন।

সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য—ক্ষুদ্র লেখনীতে কিরূপে বর্ণনা করিব? দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলাম।

সাধুদিগের স্নানের পর দড়ি-দিয়া-ঘেরা স্থানেই আমরা স্নান করিলাম। এক অপূর্ব অনুভূতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতের কথা জগতে কাহারও অবিদিত নাই। বেলা সাড়ে এগারটা আন্দাজ ক্যাম্পে ফিরিয়া দেখি চা জলখাবারের পরিপাটী বন্দোবস্ত। মাতা যেমন ক্ষুধিত ক্লান্ত শ্রান্ত সন্তানের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন, রান্নাঘরের ভারপ্রাপ্ত মহারাজও খাদ্যাদি লইয়া সেইরূপ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইতোমধ্যে তিনি যে কখন স্নান সারিয়া ফিরিয়াছেন জানি না! বারটা সাড়ে বারটার ভিতর খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করিলাম।

আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে শান্তিনিকেতনের শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু মহাশয়ের পত্নী ছিলেন। বসুমতীর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃদ্ধা মাতাও ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে শ্রীশ্রীস্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) শিশুকালের অনেক গল্পই শুনিলাম। ছোট বড় সকলের একত্র আহার-বিহার, আলাপ-আলোচনা চলিত মহানন্দে। ক্রমশঃ যাত্রী সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। মহারাজেরা নিজেরাই রান্নার বন্দোবস্ত করিতেন, তরকারি কুটিতেন। এতজন স্ত্রীলোক থাকিতে মহারাজেরা তরকারি কুটিবেন, ইহাতে আমাদের বড় সঙ্কোচ বোধ হইত। অবশেষে আমরাই এই কার্যের ভার লইলাম। খাদ্যাদির ব্যবস্থা অতি পরিপাটী ও চমৎকার ছিল। সকাল বিকাল চা জলখাবার, দুপুরে ও রাত্রে ভাত ও রুটি, দুইটি তরকারি, ডাল ও চাটনি। একত্রে অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ ষাটজন স্ত্রী-যাত্রী আহারে বসিতেন, পরিবেশন মহারাজেরাই করিতেন। প্রত্যেকের নিকটে গিয়া বলিতেন, "মায়েরা লজ্জা করবেন না, পেট ভরে খাবেন।" নিত্য নূতন তরকারি রান্না করাইতেন। আমাদের সংসারাশ্রমে এরূপ সুবন্দোবস্ত সর্বত্র আছে কিনা সন্দেহ। এইরূপে অতি সুখে ও আরামে দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

পূর্বেই বলিয়াছি ঝুসী প্রয়াগ শহরের একপ্রান্তে, মা গঙ্গা সরিয়া যাওয়ায় চড়ার উপর বিভিন্ন সাধু সম্প্রদায়ের ক্যাম্প অধিকাংশই ঝুসীতে স্থাপনা করা হইয়াছিল।

সারবন্দী কুশের ছাওয়া কুটীর ও বিভিন্ন বর্ণের তাঁবুগুলি যেন যাত্রীদের সাদরে আহ্বান করিবার জন্যই নির্মিত হইয়াছে।

দৈনিক কার্যের ধারা ছিল এইরূপ:—ভোর ৫টায় সঙ্গমে স্নান, ফিরিয়া রৌদ্রে বসিয়া পাঠাদি, দুপুরে আহার সারিয়া একসঙ্গে আলাপ-আলোচনা, বিকালে বিভিন্ন ক্যাম্পে যাইয়া সাধু-দর্শন ও তাঁহাদের বাণী-শ্রবণ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একটি বিশিষ্ট ঠাকুর ঘর ছিল। সেখানে আপন আপন ইষ্টদেবের মূর্তি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইত। কোন স্থানে শিবলিঙ্গ, কোনও স্থানে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, কোনও স্থানে বালগোপালের মূর্তি, কোনও স্থানে রামসীতা ও লক্ষ্মণের মূর্তি, আবার কোথাও বা কেবল পটাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহাদের ভোগারতি, পূজা ও স্তবস্তুতি হইত। এক একদিন এক এক স্থানে গিয়া সন্ধ্যারতি ও পুষ্পাঞ্জলি দেখিতাম ও আনন্দে বিভোর হইতাম। আশ্চর্যের বিষয় এই, কোথাও সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। গীতা-মন্দিরে অষ্টপ্রহর গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা চলিত। তথায় মণি-মুক্তা-রত্নাদি-খচিত, অলঙ্কার-মণ্ডিত, স্বর্ণ-নির্মিত নটরাজ শিবের অপূর্ব মূর্তি দেখিলাম। তাহার পার্শ্বে সমগ্র গীতার কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ, তিনখানি তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণফলকে মুদ্রিত রহিয়াছে। শুনিলাম, সীতাদেবী যে বল্কল পরিধান করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে। উহা বিশ্বাসে স্পর্শ করিলাম ও মস্তকে ধারণ করিলাম। সারা শরীরে রোমাঞ্চ হইল।

অপরদিকে প্রতিদিনই এক এক সম্প্রদায়ের প্রধান মোহান্ত সমষ্টি-ভোজন করাইতেন। কোনও দিন গীতামন্দিরে, কোনও দিন ভোলানন্দ গিরির শিবিরে, কোনও দিন মহামণ্ডলেশ্বরের, কোনও দিন কালীকম্লীওয়ালার, কোনও দিন বা হংসরাজের শিবিরে। দীর্ঘ একটি মাস এই সমষ্টি-ভোজন। দরোয়ান ভৃত্য সকলকে একত্রে লইয়া শঙ্করাচার্য এবং মহামণ্ডলেশ্বরের ন্যায় সাধুও ভোজন করিতেন। মেঘমুক্ত অনন্ত আকাশতলে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে চারি পাঁচ হাজার সাধু সন্ন্যাসীর সমাবেশ ও ভোজন দেখিবার সৌভাগ্য জীবনে আর কখনও হইবে কিনা জানি না! যে দিকে দৃষ্টি যায়, অপূর্ব গেরুয়ার রং। সাধুদের মধ্যে খুব অল্পবয়স্ক সৌম্য বালক সন্ন্যাসীও দেখিলাম। ইঁহাদের যে ভোজনসামগ্রী দেওয়া হইত, তাহা গৃহে প্রস্তুত ও উপাদেয়। সকল খাদ্য একত্রে পরিবেশন করিবার পর এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে দক্ষিণা দিবার পর মহাত্মারা খাদ্য গ্রহণ করিতেন নীরবে। পরিবেশনের দক্ষতা ও আয়না দেখাইয়া কাক চিল তাড়াইবার নূতন পন্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই ভক্তি সহকারে ইঁহাদের ভোজনের পর পরিত্যক্ত খাদ্যাদি (প্রসাদ) লইবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিত এবং কণামাত্র পাইয়া ধন্য হইত।

চারিদিকে অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ। কোনও শিবিরে অষ্টপ্রহর হরিনাম কীর্তন, কোথাও গীতাপাঠ, কোনও শিবিরে রামনাম-গান, কোথাও বা ছোট ছোট বালক রামলক্ষ্মণের সাজে সুসজ্জিত হইয়া প্রতিদিন রামায়ণ অভিনয় করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মন স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হইত। মাইক্ এবং লাউডস্পীকারে এই সব প্রচারিত হইত।

আমাদের ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রী-মাতাঠাকুরাণী (সারদামণি) ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। প্রত্যূষে, দ্বিপ্রহরে পূজা ও ভোগারতি হইত। সন্ধ্যায় আরতি, সমবেত স্তোত্রপাঠ, শ্যামাসঙ্গীত ও কথামৃত পাঠ হইত। এক এক দিন এক একজন ভক্ত ফুলের মালা ও ফলমিষ্টান্ন দিয়া পূজা দিতেন। আরতির পর প্রসাদ বিতরণ হইত। অসহ্য শীত। সন্ধ্যায় বাহিরে বসিতে পারা যাইত না।

কিন্তু মহারাজদিগের তত্ত্বাবধানে অনবরত গরম জল পাইতাম, সুতরাং কোনও কষ্ট হইত না।

দেখিতে দেখিতে কুম্ভযোগের দিন আসিয়া পড়িল। এলাহাবাদ শহরে তিল ধারণের স্থান রহিল না। কিছুদিন পূর্বেও বাঙালী যাত্রী দেখিতে না পাওয়ায় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন বাঙালী, গুজরাটী, ওড়িয়া, সিন্ধি, পাঞ্জাবী মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রীয় ও সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসী যাত্রীতে শহর পূর্ণ হইল। কে বলে সনাতন ধর্মের গ্লানি হইয়াছে? এই সকল যাত্রীর ধর্মপ্রাণতা, ব্যাকুলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

প্রত্যূষে সাধুদিগের মিছিল বাহির হইল সাড়ে পাঁচটায়। আকাশ নিবিড় কুয়াসাচ্ছন্ন। পাশের ব্যক্তিকেও দেখা যায় না। পুলিশ দুপাশে দর্শক যাত্রীদের বসাইয়া রাখিয়াছে, মিছিলের পশ্চাৎ যাইতে নিষেধ করিতেছে। এইরূপে অতি সতর্কতার সহিত শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। যাত্রীদিগের সঙ্গমে যাইবার জন্য অন্য পথের ব্যবস্থা ছিল।

সেইদিনই ভোর ৬টা আন্দাজ একটা অসম্ভব কলকোলাহল ও সমবেত কাতর আর্তনাদ শুনিলাম দূর হইতে। ভাবিলাম, যেখানে তিরিশ চল্লিশ লক্ষ লোকের সমাবেশ, সেখানে এরূপ হইলে আশ্চর্যের কিছুই নাই। কিন্তু কী মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা তখন একটুও অনুমান করিতে পারি নাই!

কাণপুর হইতে আগত (প্রয়াগেই আলাপ) একজন বর্ষীয়সী বান্ধবীর পুত্র তাহার মাতা ও আমাকে বেলা সাড়ে নয়টা আন্দাজ স্নান করাইতে লইয়া গেল। সেদিন নৌকাভাড়া জনপিছু আড়াই টাকা। তথাপি স্নানে যাইতে কেহই বিমুখ নহে, কারণ যোগের স্নানে জন্মজন্মান্তরের পাপ-ক্ষয় নিশ্চিত, প্রত্যেকেরই এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বেলা বারটা আন্দাজ আশ্রমে ফিরিয়া শুনিলাম, ওপারে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ন্যূনপক্ষে তিন হাজার যাত্রী ভিড়ের চাপে পদদলিত হইয়া মারা গিয়াছে! দেখিতে দেখিতে আমাদের সেবাশ্রমে অনেক আহত সাধু ও যাত্রী জিপে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের রীতিমত চিকিৎসা করা হইল।

এই দুর্ঘটনার কথা সংবাদপত্রে ও লোকের মুখে মুখে পরদিনই প্রচারিত হইল। নানাস্থান হইতে আগত যাত্রীদিগের আত্মীয়স্বজন আপন আপন প্রিয়জনের সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কুম্ভযোগের এই দুর্ঘটনায় প্রত্যেকেই মর্মান্তিক ব্যথিত হইলেন। দিবারাত্র সকলের মুখে এই একই কথা, একই আলোচনা। যাঁহারা চলিয়া গেলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিবার কি আছে? কিন্তু তাঁহাদের পরিত্যক্ত আত্মীয়-স্বজনের শোকদগ্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনা দিবার বাক্য স্তব্ধ হইয়া গেল। দূর দূরান্তর হইতে কত আশা, কত সংকল্প লইয়া তাঁহারা আসিয়াছিলেন, আজ সব শেষ! সঙ্গীহীন হইয়া হয়তো কত জনকে গৃহে ফিরিতে হইল! বিধাতার বিধান কে খণ্ডাইতে পারে?

কুম্ভযোগের পর, বসন্তপঞ্চমীর স্নানও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। মিছিলও বাহির হইল, কিন্তু পূর্বের সে উৎসাহ, সে আগ্রহ আর দেখা গেল না, সকলেই বিষণ্ণ ও নিরানন্দ। সকলের মুখেই শোকের ছায়া!

মেলায় দোকানপাটের অভাব ছিল না। নানা-স্থান হইতে নানা দ্রব্যাদি—মহামূল্য শাল, কম্বল, বেণারসী সিল্কের কাপড়, খেলনা, তৈজসপত্র, চিত্র, প্রসাধন সামগ্রী, মেওয়া, দুধ দই মিষ্টান্নের সারবন্দী দোকানের সব সুবন্দোবস্তই ছিল। ছিল না মুড়ি চিঁড়া খইয়ের দোকান!

আমাদের সেবাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বেশ আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হইল। হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা, কালীকীর্তন, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা

ও একদিন বিভিন্ন সাধুদের সমষ্টি-ভোজন বেশ সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

বসন্তপঞ্চমীর স্নানের পরেই মেলায় ভাঙন ধরিল। সাধুরা একে একে আপন আপন শিবির তুলিয়া চলিয়া যাইতে শুরু করিলেন। ঝুসীতে কয়েকদিন পূর্বেও তিলধারণের স্থান ছিল না। সেইসব স্থান এখন ফাঁকা হইয়া গেল। একটা বিরাট শূন্যতা! এইবার বিদায়ের পালা। দীর্ঘ একটি মাস যেস্থানে পরমানন্দে কাটাইয়াছি, সেস্থান ও তথাকার সঙ্গীদের ত্যাগ করিতে হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। পরস্পরের ঠিকানা লইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বিদায় লইতে লাগিলাম।

আমাদের শিবির ভাঙিয়া দিবার পূর্ব দিনে একটি হোম হইল। শান্তিজল দেওয়া হইল, শেষ প্রসাদ বিতরণ করা হইল, এবং মঙ্গলকামনা ও আশীর্বাদ-স্বরূপ হোমের বিভূতি সকলের কপালে আঁকিয়া দেওয়া হইল।

পরদিন ভোরে উঠিয়া দেখি, ঠাকুরঘর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। চারিদিকে শূন্যতা, একটা হাহাকার। মনে হইল ঝুসী যেন গুমরিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, একটি মাস আমার বুকে যে উৎসব করিলে—তাহা সত্যই কি মায়ার খেলা? না, আনন্দের মেলা!

রুগ্ন শরীর, অশান্ত মন লইয়া, অসহায় অবস্থায় মেলায় গিয়াছিলাম। কিন্তু ফিরিলাম সুস্থ, শান্ত, সবল, অক্ষত শরীরমন লইয়া। করুণাময়ের কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চরণে লুটাইলাম।

চক্ষে জল আসিল যমুনার নীলজলের নৃত্যশীল অশান্ত বীচিমালা ছাড়িয়া আসিতে। কি অপরূপ মনোমুগ্ধকারিণী এই যমুনা!

এই দীর্ঘ একটি মাসে যাহা যাহা দেখিলাম, যাহা যাহা সংগ্রহ করিলাম—সবই মনের ভাণ্ডারে গচ্ছিত রহিল। এই পরিপূর্ণ নির্মল আনন্দই আমার শেষ জীবনের সম্বল। সংসারের তাপে যখন আবার ক্লিষ্ট হইব, এই দিনগুলির স্মৃতিই আবার নব বল ও নব উদ্যম আনিয়া দিবে। এ সুদিন জীবনে আর আসিবে কি না জানি না! জানেন অন্তর্যামী। তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

জপ ও অজপা জপ

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

জপের স্বরূপ ও পরিণতি

জপ বলিতে প্রণব, বীজাক্ষর মন্ত্র, তারকব্রহ্ম নাম বা যে কোন দেবদেবীর নাম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বা গণনাই আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি। এই জপ হিন্দু, জৈন, পার্শী, বৌদ্ধ, রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান এবং মুসলমান—প্রায় সব ধর্মাবলম্বীদের ভিতরই প্রচলিত। রোমান ক্যাথলিক গির্জার অনুবর্তিগণ 'এভী মেরীয়া' (Ave Maria—A Prayer to the Virgin Mary as Mother of God) এবং 'পিতর্নস্টার' (Paternoster—A Prayer to the Lord Father of all) যথাক্রমে ছোট দশ সংখ্যক মালায় ও পরবর্তী বড় একাদশতম মালায় জপ করিয়া থাকেন।

একটি প্রচলিত শাস্ত্রবাক্য—'জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।—জপের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।" হরিভক্তিবিলাস ধৃত পদ্মনাভীয় বচনে দেখা যায়—

'কোটি জপ্তেন মন্ত্রেণ মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ।
স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্॥'

মুক্তি এবং ইষ্টদর্শন একনিষ্ঠ কোটি জপেতেই

লাভ হয়। উপাসনার উৎকৃষ্ট উপায় হিসাবে জপ একটি যজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। যাজ্ঞবল্ক্য-বচনে জপ-যজ্ঞের মহিমা বর্ণনা আছে—

'পাকযজ্ঞাশ্চ চত্বারো বিধিযজ্ঞে-সমন্বিতাঃ।
সর্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥'

এবং পদ্মনাভীয় বচনেও তুল্য বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—

'যাবন্ত কর্মযজ্ঞাশ্চ প্রদীপ্তানি তপাংসি চ।
সর্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥'

চরু-পাকাদি যত প্রকার প্রসিদ্ধ যজ্ঞ উপাসনা-রাজ্যে বিদ্যমান, তাহাদের কোনটিই জপযজ্ঞের এক ষোড়-শাংশ ফলদানেও সমর্থ নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশমাধ্যায়ে অর্জুনকে উপদেশছলে ইহার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া বলিয়াছেন—'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।' যত প্রকার যজ্ঞ আছে তাহার ভিতর শ্রীভগবান নিজে হইতেছেন জপযজ্ঞ।

বিভিন্ন প্রকারের জপ

জপ সাধারণতঃ তিন প্রকার, যথা—মানস, উপাংশু ও বাচিক। (১) জিহ্বা পর্যন্ত স্পন্দিত না করিয়া কেবল মনে মনে জপ করাকে মানস জপ বলা হয়। (২) ঈষৎ রসনা-স্পন্দন সহ কেবল শ্রুতি-গোচর হয়—এমন জপের নাম উপাংশু জপ। (৩) সুস্পষ্ট উচ্চারণপূর্বক নিজের ও অপরের শ্রুতিগোচর হয়, এমন জপের নাম বাচিক জপ; কীর্তন, স্তোত্রপাঠাদিও ইহার অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত এক এক সংখ্যা জপের সঙ্গে সঙ্গে এক একবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সহ যে জপ করা হয়, তাহাকে মানস জপের অন্তর্গত (১ক) প্রণাম জপ বলা হয়। তণ্ডুলের দ্বারা সংখ্যা রাখিতে রাখিতে জপ করিয়া সেই জপ-সংখ্যা তণ্ডুল-সমষ্টির অন্নমাত্র দিবারাত্রির ভিতর একবার ভোজনক্রমে আজীবন বা নির্দিষ্ট কালের জন্য জপনিষ্ঠ সাধক-সাধিকার উদাহরণও ভক্তিরাজ্যে আছে, এইরূপ জপকেও মানসজপের অন্তর্গত (১খ) সংখ্যায় জপ বল[া] যায়। এই সংখ্যায় জপের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

সকল জপেই জাপককে নির্দিষ্ট সংখ্যা রাখি[য়া] জপিতে হয়। এই নিমিত্ত করমালা স্ফটিক, শঙ্খ মহাশঙ্খ, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ, তুলসী, গুঞ্জা প্রভৃতি গ্রথিত মালায় সংখ্যা-রক্ষা-ক্রমে জপের ব্যবস্[থা] আছে। বাহ্য গ্রথিত মালায় জপ করিবার সম[য়] মধ্যশীর্ষ মালা লঙ্ঘন করিতে নাই। উহা লঙ্ঘ[ন] করিলে মেরুলঙ্ঘনজনিত অপরাধ হয়। করাঙ্গুলি বৈদিক, শৈব বা দেবমন্ত্রজপে মধ্যমার মধ্য ও নি[ম্ন] পর্বকে এবং তান্ত্রিক, শক্তি বা দেবী মন্ত্রজপে তর্জনী অগ্র ও মধ্য পর্বকে মেরুজ্ঞানে লঙ্ঘন করিতে নাই অনামিকার মধ পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জনী নিম্নপর্বে দশবার জপ শেষ করিতে হয়। দশ সংখ্যা কম জপ কোন ফলদায়ক বলিয়া গণ্য হয় না। জ[প] অষ্টাদশ সংখ্যা হইতে ক্রমশঃ অষ্টবিংশ, অষ্টোত্তর শ[ত] অষ্টোত্তর সহস্র বা তদূর্ধ্ব সাধ্যমত কর্তব্য। এইভা[বে] শ্রীশ্রীগুরুদত্ত বীজমন্ত্র বা ভগবন্নাম দৃঢ় একাগ্রত[া] সহকারে জপের ফলে জাপকের দেহটি সম্পূর্ণরূ[পে] জপময় হইয়া ইষ্টের সহিত অভেদাত্ম হয়।

অজপার স্বরূপ এবং প্রতিষ্ঠা

জপযজ্ঞনিষ্ঠ মানব ঐকান্তিকী নিষ্ঠার ফলে যখ[ন] জপময় অবস্থা বা পূর্ণ তন্ময়তা লাভ করে, তখ[ন] অজ্ঞাত বা অচিন্ত্য রূপে দেহ-যন্ত্রের ভিতর আপ[নি] আপনি জপকার্য চলিতে থাকে। কোনরূপ যত্ন নিরপেক্ষ এই ফল্গুনদীপ্রবাহবৎ আভ্যন্তরিক জপকে একতম মহান্ অজপা জপ বলা হয়। চেষ্টাশূন্য জপ[ই] অজপ। ন+জপ=অজপ, স্ত্রী লিঙ্গে আপ্ প্রত্যয় যোগে অজপা অর্থাৎ চেষ্টা ব্যতিরেকে জপনীয়া। বৈষ্ণব শাস্ত্র বর্ণনা করেন—

'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥'—

ভগবন্নাম এবং বিগ্রহ অতলগর্ভ চিন্তামণি এবং চিন্ময় রসখনি বলিয়া জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তবে পুনঃ পুনঃ নামকীর্তন, পুনঃ পুনঃ বিগ্রহ-দর্শনের ফলে অভ্যাস সুদৃঢ় হইলে রসনাতেও আপনি বাজিয়া উঠে এবং নয়নেও আপনি ভাসিয়া উঠে। পূর্বেকার প্রগাঢ় জপ বা সাধন অভ্যাসের ফলেই এই অজপা স্ফূর্তি ঘটে !

ইষ্টের সহিত একাত্মবোধ বা চরম মিলনানুভূতি-রূপ অজপা-স্রোত যার দেহযন্ত্রে অবিরাম প্রবাহিত হয়, যদি অকস্মাৎ এর বিরাম ঘটে, তবে অজপা-স্পন্দন-বিরতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-স্পন্দন স্থগিত হইয়া তার প্রাণ-পাখী দেহ-খাঁচা ভাঙিয়া চলিয়া যায়, তাহাতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই নিমিত্ত অজপা ফুরাইয়া যাওয়াকে মৃত্যু বলা হয়। ভক্ত কবি মদনমোহন তাঁর অমর সঙ্গীতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কে বা চায় ?
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়।'

তীর্থে দেহত্যাগ শ্রেয়স্কামী মানব মাত্রেরই কাম্য, তবে ইষ্টস্মৃতি এবং ইষ্টনাম-জপকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলেবর-ত্যাগ তদপেক্ষাও শ্রেয়স্কর।

অজপা-নিবৃত্তি বা ইষ্ট-মিলনানুভূতির অভাবকে বৈষ্ণব গ্রন্থেও দেহত্যাগের দশায় পর্যবসিত করা হইয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অমর পদাবলীতে বর্ণনা করিয়াছেন—

অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম,　　যেন জাম্বুনদ হেম,
এ প্রেম নৃলোকে নাহি হয়।
যদি হয় তার যোগ,　　না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হইলে না জীয়য় ॥'

চেষ্টা নিরপেক্ষ স্বাভাবিক অজপা

অন্যতম অজপা জপ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়াসাধ্য। তন্ত্রশাস্ত্র ঘোষণা করেন,—

'উচ্ছ্বাসৈরেব নিঃশ্বাসৈর্হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
তস্মাৎ প্রাণশ্চ হংসাখ্য আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ ॥'

হং—সঃ এই দুইটি অক্ষর বীজমন্ত্র পূরক রেচকে অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে দিবানিশি জপিত হওয়ায় হংসাখ্য প্রাণবায়ু আত্মারূপে দেহাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এইটি জীবের জীবিতাবস্থা। মাতৃসাধক-চূড়ামণি রামপ্রসাদ তাঁহার অমর সঙ্গীতে অক্ষয় বর্ণনা দিয়াছেন,—

'হং বর্ণ পূরকে হয়,　　সঃ বর্ণ রেচকে কয়,
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে।
অজপা হইলে সাঙ্গ,　　কোথা রবে তব রঙ্গ,
সকলি হইল ভঙ্গ ভবানীরে না ভাবিয়ে ॥'

তন্ত্রশাস্ত্রীয় দক্ষিণা-মূর্তি সংহিতায় শিববাক্য আছে,—

'একবিংশতিসহস্রং ষট্শতাধিকমীশ্বরি !
জপ্যতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্।
বিনা জপেন দেবেশি ! জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তিনী।'

তন্ত্রে মহাদেবীকে অজপা নাম দেওয়া হইয়াছে। রূপে তিনি অর্ধনারীশ্বর, ভবপাশনিকৃন্তিনী সান্দ্রানন্দময়ী পমেশ্বরীকে প্রাণিগণ প্রত্যহ ২১৬০০ একুশ হাজার ছয় শত বার বিনা চেষ্টায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে জপিয়া থাকে। প্রতীচ্য শারীরবিজ্ঞানমতে এই অজ্ঞাত অজপা জপ দিবা-নিশিতে প্রতি দেহযন্ত্রে ৩৮৮৮০ আটত্রিশ হাজার আট শত আশি বার হয় বলিয়া নির্ধারিত।

এই অজপা জপ যাঁহার ভিতর চৈতন্যলাভ করে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধমনী সব ভাবময়, ইষ্টময়, এক অপার্থিব সত্তায় পরিণত হয়। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য যেমন ঈশ্বর-লাভ, তেমনই ঈশ্বরলাভে ব্যাকুল জীবের ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মান, কুল, শীল, জাতি, গর্ব ইত্যাদি অষ্টপাশ ঘুচিয়া এই দিব্যভাবপ্রাপ্তি ঘটে। তখন সাধক, মন্ত্র ও ইষ্ট সব এক হইয়া যায়। এই অবস্থা যখন দক্ষিণেশ্বরের পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘটিয়াছিল, তখন তিনি যে যে অঙ্গে যে যে মন্ত্র জপ করিতেন, সেই সেই অঙ্গে সেই সেই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে

প্রত্যক্ষ করিতেন। ইহা পূর্ণ চিন্ময়ত্ব বা ইষ্টময়ত্ব। জপ করিতে করিতে তিনি দেখিতে স্পষ্ট পাইতেন, সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী সুষুম্নাপথে সহস্রারে উঠিয়া জীবশিব পরমশিবপদে লীন হইতেছে। এ দর্শন শুধু কথার কথা নয়, এ বহু জন্মের তপস্যার এবং অসীম ভাগবতীকৃপার ফল!

অজপা-নিবৃত্তি বা দেহান্তদশা-প্রাপ্তি

জপ ও অজপা জপের কতক পরিচয় এইভাবে বিভিন্ন আলোচনায় লাভ করা গেল। অজ্ঞাত ও অচেতন ভাবে এই অজপা জপ প্রতিনিয়ত সকলেরই হইতেছে; উহাকে জ্ঞানগম্য এবং সচেতন অনুভূতিতে আনিতে পারিলে অর্থাৎ হাতেকলমে সাধিতে পারিলে মানবজমি আবাদ হইয়া সত্যসত্যই যে সোনা ফলে এবং জন্ম ও জীবন সার্থক হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অজপা ফুরাইয়া গেলে দেহান্তদশাপ্রাপ্তির কথা রামপ্রসাদ-প্রমুখ বহু কবি বহু ভাবে সুপরিব্যক্ত করিয়াছেন। রামপ্রসাদ নিজ অন্তিমকালে গভীর খেদ করিয়া গাহিয়াছিলেন –

'বাল্যকালে কত খেলা
মিছে খেলায় দিন গোয়াল,
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা-খেলায়
অজপা ফুরায়ে গেল।'

অন্য কবিদের বর্ণনায় আছে,—

'অজপা হিমের প্রায়, কৃতান্ত তপন তায়
তীক্ষ্ণ করে করে নাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে!'

* * *

'সহজ অজপাগতি, যদিগো লভে বিরতি,
অষ্ট পাশাবদ্ধ জীব পায় যে মহামুকতি।'

মহাশক্তিময়ী জগদম্বার স্নেহাশ্রিত আমরা ক্ষণে ক্ষণে জীবনবায়ু নিঃশেষিত হইতে হইতে যে দিন অজপা সাঙ্গ হইবার হউক, তাহাতে কোনই ভয় ভাবনা নাই; কিন্তু মায়ের শ্রীপাদপদ্ম-স্মরণমনন হইতে যেন কিছুতেই কোন অবস্থায় বিচ্যুত না হই,—এই ঐকান্তিকী প্রার্থনা জগজ্জননীর শ্রীচরণারবিন্দে।

আবিষ্কার

অনিরুদ্ধ

বন্ধন যদি ভার লাগে, শোন্
বন্ধন কিছু নাই
তুই তো নিজেই বাঁধিস্ নিজেরে
বন্ধন শুধু তা-ই।

মুক্তি কোথায় ভেবে ভেবে যদি
নাহি মেলে কোন কূল
জেনে রাখ্ তবে আপনারি মাঝে
রয়েছে মুক্তি-মূল।

সুন্দর লাগি যদিরে ব্যাকুল
আঁখি দুটি তোর ছোটে
চিরসুন্দর যিনি দেখ্ তাঁরি
বিভা সব খানে ফোটে।

যদি তোরে কেহ নাহি বাসে ভাল
প্রাণ কাঁদি হয় সারা—
অখিল প্রেমের দেবতা হৃদয়ে
খুঁজিয়া নিজেরে হারা।

আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র*

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

মানুষের দেবত্ব, মনুষ্যজাতির সেবা—এই হচ্ছে বর্তমান যুগের সর্বোচ্চ আদর্শ। প্রাচীন যুগের লোকেরা দেবসত্তাকে একটি পৃথক্ বস্তু বলে দেখতেন এবং সেই বস্তুকে তাঁরা মেঘের ওপর কোন এক স্বর্গ রাজ্যে স্থাপন করতেন, তথা ঐ দেবসত্তায় আরোপ করতেন অসংখ্য কাল্পনিক গুণ। তাঁদের ধারণা ছিল, মৃত্যুর পর মানুষ একটি কাল্পনিক রাজ্যে যাবে, যার নাম স্বর্গ ; আর ধর্মব্যাখ্যাতাদের কোন কিছু দান করলে ঐ স্বর্গে তা জমা থাকবে ও মৃত্যুর পর দাতা সেখানে গিয়ে তা ভোগ করবে। পুরোহিতগণ যেন ছিলেন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যস্থ বাহন। কেউ যদি এই পুরোহিতদের বিরাগভাজন হয়, তবে তার জন্যে নির্দিষ্ট ছিল আর একটি জায়গা —নরক। স্বর্গ বা নরকে পাঠাবার ক্ষমতাও ছিল সকল পুরোহিতের হাতে। অনেক ধর্মপুস্তকে আমরা যে নরকের বর্ণনা দেখতে পাই, তা এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক স্থান। অজ্ঞ জনসাধারণের কাছ থেকে পুরোহিতগণ স্বর্গ ও নরকের আশা বা ভয় দেখিয়ে বহু অর্থ আদায় করতেন। দেবতা ও মানুষ এদুটি তখন ছিল পৃথক্ বস্তু।

মানুষের এখন দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। দেবত্বকে এখন পেতে হবে মানুষের মধ্যে। স্বর্গের দিব্যত্ব মানুষের পবিত্রতারই প্রতিবিম্ব। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবসত্তার একটি অংশবিশেষ হল স্বর্গের দেবত্ব। এই কারণেই এখনকার কেন্দ্র হয়েছে মানুষ এবং কাল্পনিক স্বর্গস্থ দেবতা হয়েছে তার কক্ষ বা পরিধি। মানুষের সেবা তাই দেবতার সেবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই এখন অনেক পরিবর্তিত হয়েছে এবং মানব-কেন্দ্রিক ভাবই ফুটে উঠছে। দেব-কেন্দ্রিক থেকে মানব-কেন্দ্রিক নয়, বরং মানবকেন্দ্রিক ভাব থেকেই দেবসত্তার বিকাশ হচ্ছে। সেই জন্য আধুনিক যুগে ধর্মব্যবসায়িগণের এবং তাঁদের পুঁথিপত্রেরও বেশী মূল্য নেই।

সেমিটিকগণ মানুষের 'আদিম পাপে'র (Original sin) যে মতবাদ পোষণ করেন, তা অতি ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর। দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রগতির পক্ষে এই মতবাদ হচ্ছে এক বিপুল আঘাতস্বরূপ। সর্বতোভাবে এই 'আদিম পাপে'র ধারণা পরিত্যাগ করা উচিত। দেব-কেন্দ্রিক ও মানব-কেন্দ্রিক ভাবের বৈপরীত্য তো এইভাবেই আসে। মানুষকে জন্মপাপী বলে প্রচার না করে, তার অন্তর্নিহিত দেবসত্তার কথা প্রচার করা উচিত। মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ।

মতবাদ-নিষ্ঠ ধর্মানুশাসনের আর একটি দিক এই যে, ইহা মানুষকে শেখায় বশ্যতা, নিরানন্দভাব আর নিজেকে দুর্বল মনে করা। মানুষের যেন কোন শক্তি নেই! পুরোহিতদের আজ্ঞাধীনে রেখে মনুষ্যজাতিকে একদল মূঢ় ক্রীতদাসে পরিণত করাই যেন ধর্মের আসল উদ্দেশ্য। অদৃশ্য দেবতাদের কাছ থেকে পুরোহিতগণ যেন পেয়েছিলেন রাজার অধিকার। কোন রকম স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ভাবকে বরদাস্ত করা হত না। মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে পাপ বলে গণ্য করা হত। ঐরূপ মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ছিল নরকের ব্যবস্থা।

রাজ্যের স্বেচ্ছাচারী শাসকদের জীবনযাত্রা থেকে এই মতবাদ এসেছে। পুরোহিতগণ পৃথিবীর রাজাদের নকল করে এই একাধিপত্য-ভাবটি স্বর্গে চালান দিয়েছেন। স্বর্গের অধীশ্বর প্রকৃতপক্ষে

* লেখকের মূল ইংরেজী-রচনা হইতে শ্রীলালবিহারী ঘোষ কর্তৃক অনূদিত।

পার্থিব নরপতিরই প্রতিরূপ বা প্রতিনিধিমাত্র। পক্ষান্তরে আমরা যদি আত্মার স্বরূপ ও মানুষের প্রকৃত সত্তার প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে, দৃঢ়তা ও আত্মবিকাশই হচ্ছে দেবত্বের শ্রেষ্ঠ চিহ্ন। ইহা অহমিকা বা দম্ভ নয়, কিন্তু আত্মবিশ্বাস—আত্মসত্যের অভিব্যক্তি। অহমিকায় ভ্রান্তি ও দুই ব্যক্তিতে মতের পার্থক্য থাকতে পারে, এবং সেই জন্য পরস্পরের যোগ বা মিলনে বাধা ঘটাও স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে 'আত্মাভিব্যক্তি' সেখানে সকলেই এক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই আত্মাভিব্যক্তিই সমাজের একপ্রাণতার নিদান। মানুষের দেবত্বকে অতএব তারস্বরে ঘোষণা করা উচিত। স্বর্গের দেবতার ধারণা মানব দেবতা থেকেই আসছে। মানব-কেন্দ্রিক ভাবের দিকে জোর দিয়ে ধর্মের দেব-কেন্দ্রিকতার দিকটি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করা উচিত।

পুরোহিত এবং ধর্মব্যবসায়িগণ আধুনিক কালে বাস করলেও তাঁরা যেন প্রাচীনকালের বৃদ্ধ-শিশু-বিশেষ। তাঁরা আধুনিককালের উন্নতির কথা বুঝতে এবং ভাবতে পারেন না, স্বীকারও করেন না। তাঁরা পাঁচ হাজার বৎসর অতীত কালের সামাজিক অবস্থার কথা বলে থাকেন। এই সব পুরোহিতকুল সমাজের ক্ষতি করছে, কিন্তু সমাজ তাদের ছাড়তেও পারছে না! মানুষের চিন্তাজগৎ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। পারলৌকিকবাদকে অতএব কালোপযোগী অদলবদল করে নিতে হবে।

কামন্দকের 'নীতিসারে' বিগ্রহ ও কূটযুদ্ধ

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্., সাহিত্যরত্ন

প্রাচীন ভারতে যুদ্ধবিদ্যার যথেষ্ট চর্চা ছিল এবং সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড-নীতির উপযুক্ত প্রয়োগদ্বারা দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি-সাধনের জন্য অত্যুত্তম রাষ্ট্রনীতি অবলম্বিত হইত। 'শুক্রনীতিসার', কামন্দকের 'নীতিসার' এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'—এই তিনখানা প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিগ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে কামন্দকের 'নীতিসার' গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও অতিশয় উপযোগী। শুক্র ও কৌটিল্যের নীতিশাস্ত্রে রাজনীতি ব্যতীতও অন্যান্য অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু কামন্দকের 'নীতিসারের' বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কেবল রাজনীতির কথাই আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে দণ্ড, আত্মরক্ষা, সন্ধি, বিগ্রহ, যান-বাহন, মন্ত্রণা, দূত-চর, যুদ্ধযাত্রা, শিবির-সন্নিবেশ, সৈন্য, সেনাপতি, কূটযুদ্ধ, ব্যূহরচনা, রাজকোষ-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অতিশয় নিপুণতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে কামন্দকের 'নীতিসার' গ্রন্থ হইতে বিগ্রহ ও কূটযুদ্ধ নামক দুইটি বিষয় আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

কামন্দক বিগ্রহের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, পরস্পর অপকার করিলে তাহা হইতে যে ক্রোধ ও দুঃখ জন্মায়, ইহাই মনুষ্যগণের মধ্যে বিগ্রহ বা যুদ্ধের প্রধান কারণ। রাজা নিজের অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষায় অথবা শত্রুকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া দেশ, কাল ও নিজের সৈন্যবলাদি বিবেচনা করিয়া বিগ্রহ আরম্ভ করিবেন। শত্রুর রাজ্যের প্রজাগণ তাহাদের নিজেদের রাজার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়াছে—এরূপ রাষ্ট্রিক পরিস্থিতির সুযোগ-গ্রহণই দেশের কথা বিবেচনা করা। আর মন্ত্রী প্রভৃতি কর্মচারিগণ বিরূপ হওয়ায় শত্রু যখন

অত্যন্ত ক্ষীণবল হইয়া পড়ে সেই সুযোগ-গ্রহণই কালের কথা বিবেচনা করা। শত্রুকর্তৃক রাজ্য, স্ত্রী, দুর্গ, যান, ধন, সৈন্য, মান প্রভৃতির নাশ, প্রজাগণের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ-সৃষ্টির চেষ্টা, একটি বিষয়লাভের জন্য উভয়ের আকাঙ্ক্ষা—এগুলিই সাধারণতঃ বিগ্রহের কারণ।

রাজ্য, স্ত্রী, ও দুর্গের নাশহেতু যে বিগ্রহ সংঘটিত হয়, উহা দান অর্থাৎ কোষ, অশ্বাদি বা ভূমি-প্রদান দ্বারা, কিংবা দম অর্থাৎ গুপ্ত দণ্ড দ্বারা প্রশমিত করিবে—ইহা রাজনীতিজ্ঞদের মত। অপমান হইতে যে যুদ্ধ হয়, সম্মান প্রদান করিয়া উহার উপশম করিবে। শত্রুকর্তৃক ধনের অপচয় ঘটিলে যুদ্ধ করা উচিত নয়, কারণ যুদ্ধ লোকক্ষয়কর ও অশেষরূপে অনিষ্টজনক। উভয়ের একই বস্তুলাভের জন্য যে বিগ্রহ উপস্থিত হয়, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ যুদ্ধপরিহারের নিমিত্ত ঐ বস্তুলাভের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবে।

কোন্ কোন্ যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না তৎসম্বন্ধে কামন্দক বলিয়াছেন: যে যুদ্ধ অল্প ফল দান করে, যে যুদ্ধে কোন ফল হয় না, যে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যে যুদ্ধ বর্তমানে দোষজনক ও পরিণামে নিষ্ফল, যে যুদ্ধ বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অনিষ্টকর, যে যুদ্ধ অপরিজ্ঞাত প্রবল পরাক্রমশালী শত্রুর সহিত, যে যুদ্ধ দীর্ঘকালব্যাপী, যে যুদ্ধে শত্রু বলবান মিত্রের সহিত যুক্ত হইয়াছে, যে যুদ্ধ বর্তমানে ফলোপধায়ক কিন্তু ভবিষ্যতে ফলশূন্য, যে যুদ্ধ ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ কিন্তু বর্তমানে নিষ্ফল—এই-সকল যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে।

যুদ্ধ আরম্ভ করিবার সময়-নির্ধারণ সম্বন্ধে কামন্দক বলিয়াছেন: বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন নিজ সৈন্যসামন্তগণকে উৎসাহযুক্ত ও বলবান আর শত্রুসৈন্যদিগকে ইহার বিপরীত দেখিবে, তখন যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। যখন নিজের জনমণ্ডলীকে অতিশয় বলশালী ও অনুরক্ত, আর শত্রুকে ইহার বিপরীতভাবাপন্ন দেখিবে, তখন বিগ্রহ করিবে। ভূমি, মিত্র ও হিরণ্য—এই তিনটি বিগ্রহের ফল। যখন এই তিনটি অবশ্যই পাইবার নিশ্চয়তা থাকে, তখন বিগ্রহ করিবে। প্রথমতঃ অর্থই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা মিত্র, তদপেক্ষা ভূমি।

প্রবল শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও যে পরিণামে জয়লাভ করিতে কৃতসংকল্প, সে বেতসবৃত্তি অবলম্বন করিবে অর্থাৎ বেতকে যেমনি ইচ্ছামত ঘোরান-ফেরান-বাঁকান যায়, তেমনি প্রবল শত্রুর মতানুবর্তী হইয়া চলিবে; কিন্তু ভুজঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিবে না অর্থাৎ সাপের ন্যায় তাড়া করিয়া কামড়াইতে যাইবে না। বেতসবৃত্তি-অবলম্বনকারী কালক্রমে অতুল শক্তিসঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়, আর ভুজঙ্গবৃত্তি-অবলম্বনকারী কেবল বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বেতসবৃত্তি-অবলম্বনকারী রাজনীতিজ্ঞ সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিবে এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই দুর্বার শত্রুকে সিংহের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া গ্রাস করিবে। বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ অকালে কূর্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া পীড়নও সহ্য করিবে কিন্তু সময় পাইলেই ক্রূর সর্পের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে এবং পাষাণে আছড়াইলে ঘট যেমন চূর্ণ হইয়া যায়, শত্রুকেও সেরূপ বিনাশ করিবে। স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে শত্রুর সহিত ব্যবহার করিবে। রাজা স্বয়ং মন্ত্র, প্রভাব ও উৎসাহ—এই ত্রিশক্তিতে শক্তিমান হইয়া শত্রুকে জয় করিবার জন্য অভিযান করিবেন। যিনি ইহার অন্যথা করেন, তিনি আত্মঘাতী। ফলতঃ উপযুক্ত সময়ে শত্রুকে দমন না করিলে নিজেকেই নিজের বিনাশের কারণ হইতে হয়।

কূটযুদ্ধের প্রণালী-সম্বন্ধেও কামন্দক তাঁহার নীতিসার গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। দেশ ও কাল অনুকূল হইলে এবং শত্রুর প্রকৃতি ভেদ করিতে পারিলে রাজা প্রকাশ্য যুদ্ধ করিবেন; কিন্তু দেশ ও কাল প্রতিকূল হইলে এবং শত্রুর

প্রকৃতি ভেদ করিতে না পারিলে রাজা কূটযুদ্ধ করিবেন। গিরিকন্দরাদি পথে 'অভূমিষ্ঠ' অর্থাৎ উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত নয়, অতএব অসাবধান শত্রুসৈন্যকে বধ করিবে। আর 'ভূমিষ্ঠ' অর্থাৎ উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত শত্রুসৈন্যকে উপজাপ করিয়া বধ করিবে। সম্মুখে একদল সৈন্য যুদ্ধের জন্য রাখিবে এবং আর একদল বলবান বেগগামী বীরসৈন্য দ্বারা পশ্চাৎদিক হইতে শত্রুসৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া দুই দিক হইতে বিধ্বস্ত করিবে, অথবা পশ্চাৎদিক হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, শেষে সম্মুখ হইতে শক্তিশালী সৈন্যদ্বারা আক্রমণপূর্বক বিব্রত করিয়া বধ করিবে। ইহাও দুই দিক হইতে আক্রমণ। সম্মুখদেশ বিষম হইলে পশ্চাৎ হইতে বেগবান হইয়া বধ করিবে। আর পশ্চাৎদিক বিষম প্রদেশ হইলে সম্মুখ হইতে বধ করিবে। এরূপে পার্শ্বের বিষয়ও বুঝিতে হইবে। অসার সৈন্যের মধ্যে সারবান সৈন্যবল লুকাইয়া রাখিয়া যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধে অসার সৈন্যের বিনাশে শত্রুসৈন্য শিথিলপ্রযত্ন হইলে তখন ঐ শত্রুসৈন্যকে সিংহের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা নিহত করিবে। আক্রমণের ভয়ে রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত, দিবাপ্রসুপ্ত, নিদ্রাতুর শত্রুসৈন্যকে বিনাশ করিবে। রাত্রিতে বিশ্বস্তভাবে নিদ্রিত শত্রুসৈন্যকে হত্যা করিবে। সূর্যাভিমুখী হওয়ায় অথবা প্রচণ্ড বাতাসে পড়ায় ভালরূপে দেখিতে পারিতেছে না, এরূপ অবস্থায় পতিত প্রবল শত্রুসৈন্যকে বিনাশ করিবে। এরূপ কূটযুদ্ধে লঘুহস্ত হইয়া শত্রুদিগকে বধ করিবে। কুয়াসা, অন্ধকার, কাল পরিচ্ছদ, গর্ত, অগ্নি, বন, নদী—এইসকলের ছদ্মে বা ছলে কূটযুদ্ধ করিয়া শত্রুবধ করিবে। ছলপূর্বক শত্রুবধে অধর্ম হয় না। দেখা যায়, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বিশ্বস্তভাবে নিদ্রিত পাণ্ডবসৈন্যদিগকে শাণিত খড়্গদ্বারা রাত্রিকালে বধ করিয়াছিল। চরদ্বারা শত্রুদিগের প্রচার অবগত হইয়া রাজা অতিশয় সতর্কতা ও উৎসাহের সহিত যে উপায়ে শত্রুবধ করেন, শত্রুদিগের নিকট হইতেও রাজা সতর্কতার সহিত তদ্রূপ স্বপক্ষের নিধনের আশঙ্কা করিবেন।

কামন্দক পণ্ডিত তাঁহার নীতিসার গ্রন্থে রাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন ভারতবর্ষ রাষ্ট্রনীতিতে অনগ্রসর ছিল, তাঁহারা কামন্দকের নীতিসার, শুক্রনীতিসার ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে পারেন। ভারতবর্ষ যে এককালে রাজনীতিতেও প্রশংসনীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা এই তিনখানি নীতিশাস্ত্রপাঠেই অবগত হওয়া যায়।

স্মরণে

(বদরিকাধামের যোশী মঠের ভূতপূর্ব শঙ্করাচার্য শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত চরিতকথা ও কয়েকটি উপদেশ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌

প্রায় চুয়াত্তর বৎসর আগেকার কথা। অযোধ্যার "গানা" গ্রাম নিবাসী অষ্টম বর্ষীয় এক ব্রাহ্মণকুমার এলো ৺কাশীধামে বিদ্যালাভের জন্য। এক বছর পার হতে না হতেই এলো তার বিয়ের ডাক। তাই ছিল তখনকার প্রথা। বাড়ী থেকে এক আত্মীয় এলো শিশুটিকে নিয়ে যাবার জন্য। আজন্ম উদাসীন শিশুর মন হয়ে উঠল বিদ্রোহী। আত্মীয়কে ফাঁকি দিয়ে অজানা পথের সন্ধানে গঙ্গার তীর ধরে

কিশোর চলতে লাগল হিমালয়ের উদ্দেশে। তিন দিন গেল, তিন রাত্রিও গেল, স্নান করলো গঙ্গাজলে, পান করলো গঙ্গাজল, বিশ্রাম করলো গঙ্গাতীরে বৃক্ষছায়ায়। বিশ্বম্ভরের উপর অখণ্ড বিশ্বাস, হাত পাতলো না সে কারো কাছে। তিন দিন, তিন রাত্রি পথ চলার পর এক জমিদারের দৃষ্টি পড়ল ঐ সৌম্য বালকের উপর। বৃক্ষতলে বসে তিনি ডাকলেন বালককে। বালক ফিরে তাকালো বটে, কিন্তু এলো না। খানিক পরে জমিদারই এলেন তার কাছে, আহ্বান করলেন তাকে তাঁর বাড়ীতে। কিছুতেই সে হলো না রাজী। অগত্যা জমিদার এক ঘটি দুধ আনিয়ে দিলেন। গঙ্গামাকে ⅓ অংশ নিবেদন করে বাকীটুকু খেয়ে নিয়ে বালক আবার চললো অজানার সন্ধানে। একদিনের জন্যও নাকি তাপসকে থাকতে হয়নি উপবাসে। অযাচিতভাবে পেয়েছেন ফল-মূল খাদ্য।

তারপর সুরু হল হিমালয়ের উত্তর খণ্ডে গুরু-অন্বেষণ। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটল উত্তর খণ্ডের পাহাড়ে পর্বতে। দীক্ষা নিলেন শেষে দণ্ডী স্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর কাছে।

সুদীর্ঘ বার বৎসর শাস্ত্রপাঠ ও তপস্যার পর মিললো পরম বস্তুর সন্ধান। সিদ্ধ হল মনস্কাম। তাঁর গুরুদত্ত নাম হল ব্রহ্মানন্দ। তারপর গভীর তপস্যা সুরু হল মধ্যভারতের অমরকণ্টকে। পরে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল চিত্রকূট ও বিন্ধ্য পর্বতের গভীর অরণ্যে। গুরুর আদেশে চাতুর্মাস্যের জন্য আসতেন লোকালয়ে। ভারত ধর্ম-মহামণ্ডল হিমালয়ের জ্যোতির্মঠের পুনরুদ্ধারের জন্য পাহাড় থেকে খুঁজে বার করলেন এ মহাযোগীকে। যে জ্যোতির্মঠ ১৬৫ বৎসর আচার্য-বিহীন হয়ে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছিল, সেই জ্যোতিষ্পীঠ উদ্ধারের ভার পড়ল এ মহাপুরুষের উপর। শত শত মুমুক্ষু সন্ন্যাসী ও তাপদগ্ধ নরনারী এসে আশ্রয় নিলেন মহাযোগীর পাদমূলে। গড়ে উঠল শঙ্করের আদর্শে ধর্মপীঠ—বেজে উঠল চারিদিকে ধর্মের জয় ডঙ্কা।

২১শে মে ১৯৫৩ খ্রীঃ বেলা ১।১৫ মিঃ এ, এই মহাযোগী কলিকাতায় যোগাসনে বসে লাভ করেছেন মহাসমাধি। ২০শে মে তারিখেও দিয়েছেন দর্শন ও দীক্ষা। ২১শে তারিখেও বেলা ১২½টা পর্যন্ত দিয়েছেন দর্শন। তখনও কেউ বুঝতে পারেনি এই শেষ দর্শন।

নিম্নে আচার্যদেবের কয়েকটি উপদেশ হিন্দী থেকে অনুবাদ করে লিপিবদ্ধ হল :—

উপদেশ

মানুষের অসাধ্য নেই কোন কাজ। ভারতের ইতিহাসও এ সাক্ষ্য দিচ্ছে। নাস্তিক ও দুর্বলের দলে মিশে মানুষ ভুলে গেছে আপনস্বরূপ—তাই আপনাকে ভাবছে দুঃখী, দরিদ্র, অনাথ। মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী আছে ?

আগুনের রয়েচে প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি—যা কিছু সামনে পড়ে, সমস্তই পারে আগুন ভস্মে পরিণত করতে। কিন্তু এ হেন আগুনের চারদিকে যদি থাকে শৈত্যের আবরণ, তবে দাহিকা শক্তি হয়ে যায় ম্লান—পারে না একটি তৃণকেও সে ভস্ম করতে। মানুষের মধ্যে রয়েছে যে পরমাত্মার অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার—তার চারিদিকে গড়ে উঠেছে বিষয় বাসনার বিশাল প্রাচীর। মানুষ ভুলে গেছে প্রাচীরের ভেতরকার দেবতাকে—যে দেবতা হ'লো অফুরন্ত শক্তি, আনন্দ ও ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। বাসনা ও আসক্তি কমিয়ে দিয়ে হালকা করে তুলতে হবে সে প্রাচীরটিকে। ভগবানের পূজা আরাধনায় আস্তে আস্তে মনের বৃত্তিগুলিকে করতে হবে অন্তর্মুখী। এ পথে এগিয়ে চলতে পারবে যদি সৎসঙ্গ কর, আর দুর্জনের সংশ্রব থেকে চল নিজেকে বাঁচিয়ে। কালে ভগবানের অনন্ত শক্তি উপলব্ধি করবে।

*　　*　　*　　*

তোমার অন্তঃকরণ অপবিত্র ও মলিন হয়েছে তোমারই কর্মে।—নিষিদ্ধ ও অপবিত্র কর্মই তোমার এ দুর্বল অপবিত্র মনের কারণ। কর্মদ্বারাই এখন পবিত্র ও শুদ্ধ করে তুলতে হবে অশুদ্ধ মনকে। শাস্ত্রের বিধান মেনে করতে হবে কর্ম, আর সে কর্মের ফল অর্পণ করে যেতে হবে ভগবানকে।

কোন কর্মেরই ফল কখনও চাইবে না। ফল চাওয়া মানেই প্রতারিত হওয়া। চাইবে তো তুমি তোমার মাপে। গরীবের ছেলে হয়তো ২।১ হাজার টাকা চেয়েই হবে সন্তুষ্ট, আর ধনীর ছেলে হ'লে না হয় চাইবে লাখ, দু'লাখ। কিন্তু পরমাত্মা যা দিতে পারেন, মানুষ পারে না তা কখনও কল্পনা করতে, চাওয়া তো দূরের কথা।

কাহারও আয় গেল কমে, স্ত্রীর হ'লো ব্যারাম, ছেলে হলো অবাধ্য। তখন শিবের মাথায় সে গিয়ে ঢাললো একঘটী জল, আর সঙ্গে সঙ্গে চাইলো যত সব অসুখ-অসুবিধার ব্যবস্থা ও শান্তি। এ ভাবের পূজা যেন না হয় তোমার।

সৎকর্ম করে চলো—আর তার ফলাফল কর ভগবানের চরণে অর্পণ। সুখশান্তি পাবে এ জীবনে, আর পরকালও হবে সমুজ্জ্বল।

* * * *

অন্নের জন্য কারো কাছে হাত পাতা হচ্ছে সব চেয়ে ছোট কাজ।—

তুলসী কর পর কর করো
করতল কর ন করো।
জাদিন করতল কর করো
তা দিন মরণ করো॥

এ হ'লো ভক্তের বাণী। অন্নের জন্য পরের কাছে ভিক্ষা করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

শিবাজীর একবার মস্ত অহংকার হল এই ভেবে যে, বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর আমি, আমারই সুশাসনে প্রজামণ্ডলীর ভরণ-পোষণ চলছে। কথাটা গেল শিবাজীর গুরু রামদাসের কানে। শিষ্যের প্রাসাদে এলেন গুরু রামদাস। শিষ্য বুঝতে পারলেন না গুরুজীর উদ্দেশ্য। প্রাসাদের সম্মুখেই ছিল এক পাথরের স্তম্ভ। হুকুম করলেন গুরুজী "ভাঙ্গাও স্তম্ভ।" আজ্ঞামাত্র কাজ সুরু হল। হঠাৎ স্তম্ভের ভিতর থেকে বেগে বেরিয়ে পড়ল এক অশ্ব। গুরু জিজ্ঞাসা করলেন শিবাজীকে—"এ পাথরের ভেতরে কে একে খেতে দিত বল?" সবই বুঝলেন শিবাজী। তখনই গুরুদেবের পায়ে পড়ে নিজের ভ্রান্তির জন্য চাইলেন অজস্র ক্ষমা।

মূলকথা হল এই, সৃষ্টি যিনি করেছেন, সৃষ্ট প্রাণীর ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তাঁরই।

"যদস্মদীয়ং নহি তৎপরেষাম্।"—

প্রারব্ধার্জিত তোমার ভোজ্য তোমারই কাছে আসবে, যাবেনা তা' অন্য কারো কাছে।

ভ্রমসংশোধন

গত আষাঢ় সংখ্যায় 'পুরী নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা' প্রবন্ধে ৩১৭ পৃষ্ঠায় দক্ষিণ স্তম্ভের ১ম পঙক্তিতে 'অষ্টমী'-র স্থানে 'নবমী' এবং ৩য় পঙক্তিতে 'নবমী'-র স্থানে 'দশমী' বসিবে।

শ্রাবণ সংখ্যায় ৩৬৩ পৃষ্ঠার 'একটি দিনের স্মৃতি' প্রবন্ধের লেখকের নাম—শ্রীতারকচন্দ্র রায়। (অনবধানতাবশতঃ শ্রীতারকনাথ রায় ছাপা হইয়াছে)

শ্রীকৃষ্ণপ্রাতঃস্মরণস্তোত্রম্

শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, সপ্ততীর্থ

প্রাতঃস্মরামি যদুনাথপদারবিন্দং
ভক্তার্তিনাশকরচারুব্রজাঙ্গনাস্বম্।
বজ্রাঙ্কুশাদিপরিলাঞ্ছিতপাটলাভং
যদ্ব্যাধভ্রান্তিমজনয়ন্মনোঽভিরামম্॥ ১॥

প্রাতর্ভজামি পরিবেষ্টিতদেববৃন্দং
কৃষ্ণং তমালঘনকোমলশ্যামলাঙ্গম্।
শ্রীরাধিকাঽবিরহহৃষ্টমনন্তপুণ্য-
বৃন্দাবনালিবসতিং কমলাক্ষিপত্রম্॥ ২॥

প্রাতর্নমামি বসুদেবসুতং বরেণ্যং
গোবিন্দমাদিভুবনং সদসৎপরেশম্।
গর্গাদিভির্মুনিভিরানুতমাপতদ্ভিঃ
পাদান্তিকে বরতনুংকরুণার্দ্রবেশম্॥ ৩॥

প্রাতর্জপামি সততং হরিনাম পুণ্যং
ততোঽধিকং কিমিহ নাথ মমাস্তি বিত্তম্।
আশাং বিহায় সকলাং রসনে মদীয়ে
অহনিশং জপ হরীতি যথার্থচিন্তম্॥ ৪॥

প্রাতর্বদামি দয়িতং জগদেকবন্ধুং
কিঞ্চিন্মমাধিহরণং হৃদয়েন দেবম্।
যদ্‌যৎ করোতি করণং শ্রবণাদি কর্ম
তত্তদ্দধাতু সকলং ভবদাভিমুখ্যম্॥ ৫॥

কৃষ্ণস্য পঠতি স্তোত্রং য ইদং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
স মোদতে তেন সহ প্রাতঃস্মরণপঞ্চকম্॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ—ব্যাধের ভ্রান্তি-উৎপাদনকারী, ভক্তবৃন্দের আর্তিবিনাশকারী, নয়নাভিরাম, ব্রজবালাগণের পরমসম্পদ্, বজ্র, অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্নলাঞ্ছিত, ঈষৎ রক্তিমাভ, মনোমোহন যদুপতির চরণকমল প্রভাতে স্মরণ করি। ১

যাঁহার কোমল অঙ্গ তমাল ও মেঘসদৃশ শ্যামবর্ণ, যিনি শ্রীরাধিকার বিরহাভাবে আনন্দিত, অনন্ত পুণ্যবতী বৃন্দাবনসখীগণের মধ্যে যিনি বিরাজমান, দেবগণ-পরিবেষ্টিত, পদ্মপলাশলোচন সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাতঃকালে ভজনা করি। ২

যিনি জগতের আদিকারণ এবং কার্য ও কারণ সবই, পরমেশ্বর, গর্গ প্রভৃতি মুনিগণ যাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া স্তব করেন, বসুদেবনন্দন, বরেণ্য, দিব্য ও করুণাবিগলিতদেহধারী সেই গোবিন্দকে প্রভাতকালে প্রণাম করি। ৩

হে নাথ! আমি প্রত্যূষে 'হরি' এই পুণ্য নাম নিরন্তর জপ করি, ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ কি আছে? হে আমার রসনা, সকল আশা (কথা) পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশি অর্থচিন্তন সহ 'হরি' এই নাম জপ কর। ৪

জগতের একমাত্র বন্ধু, পতি, আমার দুঃখহারক দেবতাকে প্রভাতে অন্তরের সহিত কিছু নিবেদন করিতেছি। (হে নাথ!) আমার ইন্দ্রিয়সকল শ্রবণাদি যাহা কিছু করে, সমস্তই আপনার অভিমুখী করুন। ৫

যিনি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রাতঃস্মরণপঞ্চক এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য অনুভব করিয়া আনন্দমগ্ন থাকেন। ৬

সমালোচনা

গীতা পরিচয়—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ—প্রণীত; প্রকাশক রথীন্দ্র গীতা-প্রচার প্রতিষ্ঠান, ১নং রথীন ব্যানার্জী লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১; পৃষ্ঠা—১২২; মূল্য—১।০ আনা।

চিন্তাশীল অধ্যাপক-গ্রন্থকার কোন একটি বিশেষ দার্শনিক মতকে প্রাধান্য না দিয়া বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সহজ সরল ভাষায় গীতার বিষয়বস্তুটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের ভাল লাগিল। পুস্তকখানিতে মূল গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের মতো ১৮টি অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। গীতার প্রত্যেক শ্লোকের ভাব বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই; কেবলমাত্র প্রত্যেক অধ্যায়ের পরিচয়-প্রদান-উদ্দেশে গূঢ় অর্থদ্যোতক শ্লোকগুলির অন্তর্নিহিত ভাবটি পরিস্ফুট করা হইয়াছে। এই দিক দিয়া পুস্তকখানির 'গীতা পরিচয়' নামটি সার্থক। পাঠকপাঠিকাগণ বইটিতে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করিতে পারিবেন। 'গীতাধর্ম প্রচারের জন্য গীতাপ্রেমিকগণকে এই পুস্তক বিনামূল্যে প্রদানে'র সাধু ইচ্ছা সত্যই প্রশংসনীয়।

যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় (সংক্ষিপ্ত পরিচয়)—স্বামী সত্যানন্দ গিরি-প্রণীত; দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক: সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর); পৃষ্ঠা—৫১; মূল্য বার আনা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে যে সমস্ত সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল, কাশীপ্রবাসী শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। আলোচ্য স্বল্পপরিসর জীবনকাহিনীটিতে যোগিরাজের জন্ম, বাল্য, যৌবন, দীক্ষালাভ, কর্মক্ষেত্র, সাধনা, গুরুভাব এবং তিরোধান বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রারম্ভে শ্রীশ্রীলাহিড়ীমহাশয়ের একখানি আলেখ্য এবং পরিশিষ্টে তাঁহার হস্তাক্ষর, সাধন-প্রণালী (ক্রিয়া), 'অঞ্জলি' ও 'আরতি' সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধর্মপিপাসুগণ এবং যোগিরাজ লাহিড়ীমহাশয়ের গুণমুগ্ধ সাধকবৃন্দ পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত এবং আনন্দিত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ (সংক্ষিপ্ত হিন্দী জীবন-চরিত)—স্বামী জপানন্দ-প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর, বিকানীর (রাজস্থান)। পৃষ্ঠা: ১৩৩; মূল্য এক টাকা।

রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে সাধারণের উপযোগী করিয়া স্বামীজীর এই জীবনীটি প্রকাশ করিবার জন্য গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করি। পুস্তকখানির ভাষা সহজবোধ্য; যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয়, তাঁহারাও অনায়াসে ইহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বইখানি ক্ষুদ্র হইলেও স্বামীজীর জীবনের উল্লেখযোগ্য সমস্ত ঘটনাই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 'প্রথম দর্শন', 'পরিব্রাজক', 'আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার,' 'মাদ্রাজে', 'বেলুড় মঠ'—পরিচ্ছেদগুলি বেশ ভাল লাগিল।

—ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

শ্রীশ্রীচণ্ডী-প্রসঙ্গ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষ-প্রণীত। ষোল পৃষ্ঠা; মূল্য চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—দীপক প্রিণ্টার্স, ৪৫নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯।

লেখক এই পুস্তিকায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতে লজ্জা-মাহাত্ম্য, শ্রীশ্রীচণ্ডীর নাম ও রূপ, শ্রীশ্রীচণ্ডীতে রক্তবীজ-বধ, শবাসনা শ্রীশ্রীকালী, শ্রীশ্রীকালীর কলঙ্ক-ভঞ্জন—এই পাঁচটি প্রসঙ্গ গভীর শ্রদ্ধা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও সবিশেষ নিপুণতার সহিত

আলোচনা করিয়াছেন। চণ্ডীতে দেবী 'লজ্জা'-রূপে বর্ণিতা ও আরাধিতা হইয়াছেন। লজ্জা শব্দের অর্থ ধর্মবিরুদ্ধ চিন্তা ও কর্ম হইতে বিমুখকরী বৃত্তি, স্বতঃ অধর্ম-বিমুখতা, অকার্যকরণে চিত্তের সংকোচ। কিরূপে মানুষ লজ্জার প্রভাবে শান্ত ও সংযত হয়, উহার অভাবে অসংযত ও বিপথগামী হয়, কিরূপে লজ্জা শান্তির উৎস, ধারক ও বাহক, এবং মহতী বৃত্তিসমূহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিকারক—এই তত্ত্বটি লেখক বেশ দক্ষতার সহিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রক্তবীজ-বধ-বৃত্তান্তটিরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখকের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-শক্তি প্রশংসনীয়, ভাষাও বেশ সরস।

—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

উপনিষৎ—চিত্রিতা দেবী-প্রণীত।

প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; পৃষ্ঠা—১৪৫; মূল্য—২৷৷৹ টাকা।

ঈশ, কেন, কঠ এই তিনটি উপনিষদের মূল সংস্কৃত শ্লোক এবং উহাদের সুখপাঠ্য পদ্যানুবাদ-যুক্ত এই সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত পুস্তকটি প্রকাশ করিয়া স্বর্গত দার্শনিকপ্রবর ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কন্যা বিদুষী লেখিকা বাংলা ধর্মসাহিত্যের পাঠকপাঠিকাগণের ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন। প্রত্যেকটি উপনিষদের পূর্বে উহার একটি সুলিখিত প্রারম্ভিক পরিচিতি দেওয়া আছে। অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় গ্রন্থের প্রাক্‌কথনে বইখানির যে সমাদর জ্ঞাপন করিয়াছেন, আমরা উহা অকুণ্ঠিতভাবে সমর্থন করি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (প্রথম খণ্ড: ১-৯ অধ্যায়)—শ্রীমতিলাল রায়—প্রণীত; প্রকাশক—প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২; পৃষ্ঠা—৩৫২; মূল্য—৫৲ টাকা।

চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা বহুশ্রদ্ধেয় শ্রীমতিলাল রায় কিছুকাল পূর্বে বেদান্ত দর্শনের 'জীবনভাষ্য' প্রকাশ করিয়া শাস্ত্র-ব্যাখ্যানে একটি সংস্কার-বিমুক্ত স্বাধীন মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল শ্লোক, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ সহ তাঁহার নিজের একটি বিস্তারিত 'ভাষ্যে'র মাধ্যমে সর্বোপনিষৎ-সার গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য নির্ণয় করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যানে প্রাচীন ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের মত অনেকস্থলে গৃহীত হইয়াছে—অনেকস্থলে গ্রন্থকার তাঁহাদের ব্যাখ্যায় অসামঞ্জস্য দেখিয়া 'জীবন-বাদের'র আলোকে গীতা-বাণীর অর্থ উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন।

"গীতা শুধু যোগবিশ্লেষণ নহে, তত্ত্ববিচার নহে, বিজ্ঞানশাস্ত্র নহে, সিদ্ধজীবন গঠনের অব্যর্থ বিধানই ইহার মধ্যে আছে।" (পৃঃ ৮২)

"মোক্ষধর্মে আত্মবিচার হইয়াছে প্রচুর, আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার নানাপ্রকার দার্শনিক তত্ত্বে পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু ইহা জীবনের সমাধান নহে। * * সাংখ্যের পুরুষবাদ বা প্রকৃতিবাদ কিম্বা বেদান্তের মায়াবাদ বা অবিদ্যাবাদ বাহির করিয়া এই তত্ত্ব গতানুগতিক পন্থায় বিচার করার আমরা পক্ষপাতী নহি। গীতায় অমৃতময় জীবনবাদের কথাই বলা হইয়াছে; সেই দিকের আলো অনুসরণ করিয়াই আমরা গীতার মর্ম অবধারণ করার পথে অগ্রসর হইব।" (পৃঃ ১৯০)

গীতার উপদেশগুলি যে মানুষের সুখদুঃখময় দৈনন্দিন জীবনের সহিত নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত—গীতা যে জগৎ-সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না, শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ, জগতের মধ্যে ভাগবত-সত্তা অনুভব, এবং ভাগবতকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া দিব্য জীবন যাপন করিতে বলে—ইহাই গ্রন্থকারের 'জীবনবাদে'র প্রধান কথা। আমাদের মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গী কিছু নূতন নয়। প্রাচীন গীতা-ব্যাখ্যাতাগণের টীকা ভাষ্যাদিতেও ইহার নিঃসন্দিগ্ধ সমর্থন পাওয়া যায়। তবে শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার তাঁহার সতেজ ও সুখপাঠ্য আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর একটি সরস আধ্যাত্মিক প্রেরণা সক্ষমভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং বোধ করি আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই খানেই।

যে সকল স্থানে তিনি আচার্য শঙ্করের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সর্বত্র তাঁহার বিচার-ধারা আমাদিগের নিকট সুসমঞ্জস মনে হইল না।

শাস্ত্র-সংশয়-নিরসন—শ্রীভবেন্দ্রনাথ মজুমদার-প্রণীত ; প্রাপ্তিস্থান—(১) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ভবন, ১০৯।১১এ, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬ (২) বেঙ্গল অটোটাইপ কোং, ২১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ; পৃষ্ঠা—৪২৫ ; মূল্য—(শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবানুকূল্যে) ৪৲ টাকা।

হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যে এমন বহু বিশ্বাস, সংস্কার ও প্রথা আছে যেগুলি সম্বন্ধে অনেকের (বিশেষতঃ বর্তমানের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানিগণের) মনে নানা প্রশ্ন জাগে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই ধরনের কতকগুলি সংশয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী উদার এবং যুক্তি-প্রতিষ্ঠ। যে প্রশ্নগুলি তিনি বাছিয়া লইয়াছেন, উহাদের কতকগুলি বর্তমান হিন্দুসমাজের জীবনধারার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। পুস্তকখানি তাই খুব কালোপযোগী হইয়াছে। ধৈর্যসহকারে আলোচনাগুলি পড়িলে পাঠক-পাঠিকার মনে হিন্দুধর্মে ও শাস্ত্রে বিশ্বাস দৃঢ় হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধীর অনেক উক্তি আলোচনাগুলিতে উপজীব্যরূপে ব্যবহৃত হওয়াতে গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলির শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সহজ মানুষ—পশুপতি ভট্টাচার্য-প্রণীত ; প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ; পৃষ্ঠা—২৮২ ; মূল্য—৪৷৷০ টাকা।

এই বইখানি একটি উপন্যাস—ধর্মমূলক উপন্যাস (Religious fiction) বলাই অধিকতর সঙ্গত। লেখকের উপক্রমণিকায় আছে—"এই কাহিনীর মূল ঘটনাগুলিও সত্য, এর মূল চরিত্রগুলি ও তাদের অনুভবগুলিও সত্য। লেখকের কল্পনার কাজ এতে বিশেষ কিছুই নেই, আগাগোড়াই এক প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধুর কাছে শুনে লেখা।" কাহিনীটি কিন্তু কাল্পনিক-সৃষ্টি হইতেও চিত্তাকর্ষক। গল্পের আরম্ভ—"এই অদ্ভুত মেয়েটির নাম ইলা।" কলিকাতার কোন কলেজের জনৈক অধ্যাপকের কন্যা গল্পের নায়িকা ইলার মনটি ছেলেবেলা হইতে অনুকূল ও প্রতিকূল নানা পরিবেশের মধ্যে কি করিয়া বিচিত্র ভাবে বাড়িয়া উঠিল—মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি একটি 'সহজ মানুষ' রহিয়াছে তাহাকে আবিষ্কার ও বিকশিত করিল তাহা কাহিনীর ভিতর দিয়া অনুসরণ করিতে করিতে মেয়েটিকে সত্যই 'অদ্ভুত' না বলিয়া পারা যায় না। ধর্মসাধনার বহু কথা কথোপকথনগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। তবে স্থানে স্থানে ধর্মপ্রসঙ্গগুলি অতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ায় 'উপন্যাসে'র গতি ব্যাহত হইয়াছে মনে হইল।

তপন কুমার—শ্রীকানু কর-প্রণীত ; পূর্বাচল পাবলিশার্স, ২৫, দত্ত লেন, কলিকাতা-৭ ; পৃষ্ঠা—১৮৩ ; মূল্য—১৷৷০ টাকা।

আদর্শমূলক উপন্যাস। কর্মজীবনে স্বাবলম্বন, সততা এবং সামাজিক জীবনে ধর্মনিষ্ঠা, সেবা প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের মহিমা কাহিনীটির মধ্য দিয়া প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সৎ, ভাষাও কাঁচা নয়, তবে গল্পটি যথোপযুক্ত জমিয়া উঠিতে পারে নাই। জায়গায় জায়গায় ঘটনাগুলি খুবই অবাস্তব মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যের গল্প—শ্রীজয়দেব রায়-প্রণীত ; প্রকাশক—শ্রীবামনদাস সেন, ৯১নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ; পৃষ্ঠা—১৬৭ ; মূল্য—২৲ টাকা।

কুড়িটি পরিচ্ছেদযুক্ত বইখানিতে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখক অতি সরস ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, বৈষ্ণব সাহিত্য, গোরক্ষ-বিজয়, রামপ্রসাদের রচনা, কবির গান প্রভৃতি সব

আলোচনাই কাহিনীর আকারে অতি সুন্দর লাগিল।

শিক্ষাব্রতী (রবীন্দ্র সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১)—শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক-সম্পাদিত। কার্যালয়—৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ; পৃষ্ঠা—৩২৪ ; মূল্য—২৲ টাকা।

শিক্ষাব্রতী মাসিক পত্রিকার বহু রচনাসমৃদ্ধ এবারকার রবীন্দ্র সংখ্যাটি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। শিক্ষা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা লইয়া আলোচনাগুলি বিশেষ মূল্যবান। বিশ্বকবির কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও জাতীয়তা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও সুলিখিত। এই সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও জীবনধারার একটি উৎকৃষ্ট পরিচিতি-গ্রন্থরূপে সমাদরণীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠান—গত ৪ঠা জুন, নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে শ্রীমা সারদা-দেবীর শতবার্ষিকীর শেষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐদিন বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি ম্যাল্‌ভিনা হফ্‌ম্যান নির্মিত শ্রীশ্রীমার একটি মনোরম আবক্ষ ব্রোঞ্জ্‌মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। এই কেন্দ্রে এই বিখ্যাত শিল্পীর আরও দুইটি শিল্পনিদর্শন রহিয়াছে। সেইদিন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বহু উৎসাহী শ্রোতার সম্মুখে ভাষণ প্রদান করেন। বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রাক্তন মেথডিষ্ট্‌ বিশপ্‌ ডাঃ ফ্রেডরিক ফিসারের বিধবা পত্নী মিসেস্‌ ওয়েল্‌দি এইচ্‌ ফিসার, রাষ্ট্রপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী-রাজেশ্বর দয়াল, নিউইয়র্কের ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ডক্টর রুথ্‌ আন্‌সেন, আন্তর্জাতিক অর্থ-তহবিলের এশিয়াবিভাগের পরিচালক ডক্টর এইচ্‌ এল্‌ দে এবং সারা লরেন্স্‌ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক মিঃ জোসেফ ক্যাম্প্‌বেল। এই উপলক্ষ্যে প্রার্থনাগৃহটি অতি সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিমূর্তিস্থাপনের জন্য নির্মিত বেদীর সম্মুখে ভক্ত ও অনুরাগী বন্ধুগণ মাল্য দান করেন।

একটি সংস্কৃত স্তোত্র-পাঠের পর স্বামী নিখিলানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের দুইটি বাণী পাঠ করেন। প্রথমটি শতবার্ষিকী-বৎসরের উদ্বোধন-সম্বন্ধীয় সাধারণ বাণী ; দ্বিতীয়টি ছিল ঐদিনকার অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত বিশেষ বাণী। দ্বিতীয় বাণীটির একস্থানে অধ্যক্ষ মহারাজ বলেনঃ "প্রার্থনা করি, শ্রীশ্রীমায়ের এই মূর্তি-প্রতিষ্ঠা যেন তাঁহার ভক্ত-সন্তানহৃদয়ে নিত্য-অধিষ্ঠানের নিদর্শন হয় ; ইহা যেন নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও মানবসেবার উৎস হয়।" ইহার পরেই স্বামী নিখিলানন্দজী শ্রীমতী চম্পকলতা দে'র পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীযুক্তা দে ডক্টর এইচ্‌ এল্‌ দে'র পত্নী এবং মিশনের একজন অনুরাগিণী ভক্ত। তিনি শ্রীমা সারদা দেবীর প্রস্তর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রশান্ত সুন্দর ও করুণাময় মুখমণ্ডল যখন প্রথম দেখা গেল, তখন একটি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দধ্বনি যেন ভাঙিয়া পড়িল। ম্যালভিনা হফ্‌ম্যান নির্মিত শ্রীশ্রীমার তরুণ বয়সের এই প্রতিমূর্তিটি তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্যতম বলিয়া বিবেচিত। আবরণ-উন্মোচনের পর স্বামী নিখিলানন্দজী শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, শ্রীশ্রীমার দেহরক্ষা-কাল পর্যন্তও তাঁহার ছবির কথা জনসাধারণ জানিত না। তিনি সর্বদাই নিজেকে 'লজ্জাপটাবৃতা" রাখিতেন। আজ শ্রীশ্রীমার তিরোভাবের ৩৫ বৎসর পরে আমেরিকার অন্যতম এক বিশিষ্ট

শিল্পিনির্মিত মায়ের ব্রোঞ্জ-প্রতিমূর্তি সর্বসমক্ষে উন্মোচিত হইতেছে। শ্রীশ্রীমা আদর্শ হিন্দু নারীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন; ঈশ্বরের মাতৃত্ব হইতেছে এই আদর্শের ভিত্তিভূমি।

সমাগত অতিথি-হিসাবে সর্বপ্রথম বক্তৃতা করেন মিসেস্ ওয়েল্‌দি ফিসার। তিনি তাঁহার সহৃদয়তাপূর্ণ উদার দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। মিসেস্ ফিসারের একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আছে; ইহার লক্ষ্য হইল কলেজের ছাত্রদের দ্বারা ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের প্রাপ্ত-বয়স্ক-দিগকে লেখাপড়া শেখান। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন স্বদেশে তাঁহার পরিকল্পনার সক্রিয় সমর্থন লাভ করিবার জন্য। তাঁহার স্বামী বিশপ ফিসার ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর একজন অনুরাগী বন্ধু। স্বামী নিখিলানন্দজী মিসেস্ ফিসারের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবর্ষে তাঁহাকে ও তাঁহার স্বামীকে লোকে প্রীতির চক্ষে দেখে। তিনি আরও বলেন, "আমি মনে করি, আমেরিকায় ভারতবর্ষের প্রতি প্রচুর সদ্ভাব বর্তমান রহিয়াছে; ভারতবর্ষেও আমেরিকার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখা যায়।" মিসেস্ ফিসার একটি উদ্দীপনাময় ও হৃদয়-গ্রাহী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবী ভারতবর্ষে দয়াসুকোমল সমাজসেবা-ব্রতের নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি একথাও বলেন যে, যাঁহারা প্রেমের মহনীয় ধর্মের অনুশীলন করেন, তাঁহারা সর্বদাই আপন আপন ধর্মনির্বিনেশে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন। ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট প্রিয়; ইহার কারণ, ভারতবর্ষে এই মহান্ প্রেমধর্মের বহু সাধক রহিয়াছেন। ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও অন্যান্য সমাজসেবীরা জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট কাজ করিতেছেন। তিনি এই বলিয়া শেষ করেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে 'জনসাধারণের সহিত জনসাধারণের সংযোগ'-রূপ আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজন—অর্থাৎ ভারতীয় ও আমেরিকার জনসাধারণের পরস্পরকে জানিবার আন্দোলন চালাইতে হইবে।

দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন শ্রীরাজেশ্বর দয়াল। তিনি শ্রীমা সারদার অমানব চরিত্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন-প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীমা সারদা অকুণ্ঠিত ভাবে সকলকেই তাঁহার ভালবাসা দিয়াছেন। তিনি ছিলেন সকলের মাতা, বিশ্বের জননী। শ্রীদয়াল শ্রীশ্রীমার কয়েকটি উপদেশবাণী পাঠ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন। তাঁহার মতে মায়ের উপদেশ-রাজী কত কার্যকর, কত ফলপ্রদ, অথচ মাতা ছিলেন নিরক্ষর গ্রাম্য মেয়ে!

পরবর্তী বক্তা ছিলেন ডক্টর রুথ্ আন্‌সেন। তিনি বলেন, বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাপুঞ্জ সমগ্র মানবজাতির প্রয়োজনের অনিবার্য তাগিদে এশিয়ার সংস্কৃতিকে ইউরোপ আমেরিকার সংস্কৃতির সহিত যুক্ত করিতেছে। উদ্দেশ্য, সত্যকার একটি বিশ্ব-সভ্যতার গোড়াপত্তন করা। তিনি আরও বলেন, পাশ্চাত্ত্যের অনেক প্রাচীন সভ্যতা নানা সদ্গুণ সত্ত্বেও ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু শত বাধাবিপর্যয়ের ভিতর দিয়াও প্রাচ্য সভ্যতা এখনও বাঁচিয়া আছে। ইহার রহস্য হইল, প্রাচ্যসভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তি।

ডক্টর এইচ্ এল্ দে সস্ত্রীক ওয়াশিংটন হইতে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীমা সারদার প্রতি ভক্তি কত বড় শক্তি ও সাহস দান করে তাহার কথাই তিনি বলিলেন।

সর্বশেষে বক্তৃতা দেন অধ্যাপক জোসেফ্ ক্যাম্প্‌বেল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার আধ্যাত্মিক সম্পর্কের গভীরতা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অধ্যাপক জোসেফ্ বলেন, "শ্রীশ্রীমা সর্ব-বিসারী করুণা, অকুণ্ঠ আত্মদান, ধৈর্য, সান্ত্বনা ও ক্ষমার নিখুঁত প্রতিমূর্তি।" তাঁহার মতে শ্রীশ্রীমা শক্তিস্বরূপা; এই শক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

(১) To the youth of India—By Swami Vivekananda. প্রকাশক—অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, (আলমোড়া), ইউ, পি।

পৃষ্ঠা—১৬৮ ; মূল্য—১৷৴০ আনা।

ভারতের তরুণদের প্রতি স্বামীজীর বাণীর সঙ্কলন। নিম্নোক্ত ৯টি অধ্যায়ে বাণীগুলি সাজানো হইয়াছে :—(১) জগতের প্রতি ভারতের বাণী (২) ভারত এখনও কেন বাঁচিয়া আছে ? (৩) বেদান্তের ব্রত (৪) আমার সমর-নীতি (৫) ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ (৬) ভারত কি করিয়া পৃথিবী জয় করিতে পারে ? (৭) ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ (৮) হিন্দু-ধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ (৯) আমরা যে ধর্মে জন্মিয়াছি।

(২) Laghu Vakya-Vritti of Sri Sankaracharya প্রকাশক—স্বামী অপর্ণানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আলমোড়া, ইউ, পি।

পৃষ্ঠা—৪৩ ; মূল্য—৷৴০ আনা।

১৮টি শ্লোকে নিবদ্ধ ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্যের একটি প্রকরণগ্রন্থ—'লঘুবাক্যবৃত্তি'র সুখপাঠ্য সংস্করণ। 'পুষ্পাঞ্জলি' নামক সংস্কৃত টীকা এবং ইংরেজীতে অন্বয়ার্থ, সরল অর্থ এবং টীকার অনুবাদও দেওয়া আছে।

(৩) The Vedanta Kesari—Holy Mother Birth Centenary Number স্বামী কৈলাসানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ; মায়লাপুর, মাদ্রাজ—৪ ; পৃষ্ঠা—২০০ (ডবলক্রাউন অক্টেভো) ; মূল্য—২৲ টাকা।

বেলুড় মঠের অনেক প্রাচীন সন্ন্যাসী এবং ভারতের ও বিদেশের বহু মনীষীর লিখিত প্রবন্ধাবলী, আলোচনা ও স্মৃতিকথা সংযুক্ত এবং ৩২ খানি চিত্র (১ খানি ত্রিবর্ণ) শোভিত জননী সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর মনোরম স্মারকগ্রন্থ। বেদান্ত কেশরী মাসিক পত্রিকার গ্রাহকবর্গের এই বিশেষ সংখ্যার জন্য আলাদা দাম লাগিবে না। (যে মাস হইতে ৪১তম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে ; বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা)।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শ্রীধীরেশচাঁদ ঘোষ—গত ১৩ই শ্রাবণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত কলিকাতা মোহনলাল ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীধীরেশ চাঁদ ঘোষ মহাশয় পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বাংলাদেশের কাচশিল্পের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে শ্রীযুত ঘোষ নিজ কর্মদক্ষতায় অল্প সময়ের মধ্যেই কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সমাজসেবা মূলক কার্য, বিশেষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্যে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, সরলতা ও ধর্মানুসন্ধিৎসা সকলকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার পরলোকগত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণপাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ—বিগত ১৫ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই) কলিকাতা রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ৪১৭ জন ছাত্রছাত্রীকে মানপত্র এবং ২৭টি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক বিতরণ করা হয়। উৎসবের প্রধান অতিথি মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন, "সুযোগ্য পরিচালনার গুণে আমাদের বঙ্গীয় সংস্কৃত

শিক্ষা পরিষদ্ দিকে দিকে সমুন্নতি লাভ করেছে। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ে যে ক্ষেত্রে বৎসরে হাজার খানেক পত্রের আদানপ্রদান হত, এখন তা' ত্রিশ হাজারে উন্নীত হয়েছে। পরিষদের ব্যয় পূর্বে ছিল ১৫০০০৲(পনের হাজার) টাকায় সীমাবদ্ধ, এখন তা' তিন লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিগত পাঁচ বৎসরে ছাত্র-সংখ্যা ক্রমবিবর্ধিত হয়ে তিন হাজারের স্থলে নয় হাজারে দাঁড়িয়েছে। ভারতের সর্বত্র আমাদের পরীক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ছে এবং নূতন নূতন কেন্দ্র সংস্থাপিত হচ্ছে। বিগত পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের রেজিষ্ট্রীকৃত পণ্ডিতসংখ্যাও আট শত থেকে ষোল শতে উন্নীত হয়েছে। আমাদের ৫৪টি পরীক্ষাকেন্দ্রে সহস্র সহস্র ছাত্র আমাদের পরীক্ষা দেন ব'লে আমাদের পরিষদের সঙ্গে নিখিল ভারতের একটি অচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে।" তিনি আরও বলেন যে, তিনি সুপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বংশধর ব'লে তাঁর সঙ্গে পণ্ডিতমণ্ডলীর একটি নাড়ীর টান আছে। উপসংহারে তিনি বলেন, "পরম মঙ্গলময়ের মঙ্গল আশিসে আমাদের পরিষদ্ উন্নতির শ্রেষ্ঠ সোপানে আরূঢ় হোক্ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করুক। পণ্ডিতমণ্ডলী আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন।"

বিচারপতি ডক্টর শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে বলেন, বর্তমানে পরিষদের বাসস্থান যে প্রকার আবর্জনাপূর্ণ দুষিত স্থানে অবস্থিত, সেইরূপ অপরিষ্কার স্থানে কোনও প্রকার শিক্ষাসংস্থান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। অতঃপর তিনি মাসিক একশত টাকা হারে বৃদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর ছয়টী মাসিক বৃত্তি পূর্বে সরকার বাহাদুর কর্তৃক প্রদানের স্বীকৃতি সত্ত্বেও বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যেও না দেওয়ার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন এবং এবিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গবর্ণমেন্টের ৪র্থ সংস্কৃত কলেজটি কুচবিহারেই স্থাপিত হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন। অবশেষে পণ্ডিতমণ্ডলীর বৃত্তিবর্ধনের নিমিত্তও তিনি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন জানান। পরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চোধুরী মহাশয় বলেন, বিগত উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর আদিভাগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যকে জনসাধারণের মধ্যে আরও জনপ্রিয়, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় একমাত্র যোগসূত্র সুদৃঢ়তম করবার জন্য যে যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, তাহা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফলপ্রসূ হয়েছে। বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশ ভারতীয় জাতীয় জীবনকে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচারের দ্বারা যেভাবে প্রভাবিত করবার প্রয়াস করছেন, অদূর ভবিষ্যতে নিখিলভারতে ঐ প্রয়াসই সার্থক প্রয়াস বলে পরিগৃহীত হবে। বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন-পূর্বক নিখিলভারতে সংস্কৃত শিক্ষা সংপ্রসারণের প্রয়াসী। প্রত্যেক ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্য এমনভাবে সুপরিপুষ্ট হওয়া বিধেয়, যাহাতে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র সংস্কৃতপ্রধান দেশীয় ভাষার মাধ্যমে অনুকূল আকার লাভ করতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, বঙ্গদেশ সংস্কৃতনিষ্ঠ দেশ। বঙ্গদেশের অব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজ, মুসলমানগণ ও নারীসমাজ যেভাবে সংস্কৃতের সেবা করিয়াছেন, তাহাও চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত থাকবে। বঙ্গদেশের ঐতিহ্যের দিক থেকে এবং অন্যান্য দিক দিয়াও সংস্কৃত সাহিত্যের বিজয়যাত্রা ঘোষণায় বঙ্গদেশের কণ্ঠ সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ হওয়া বিধেয়।

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু মহাশয় বলেন, সংস্কৃতশিক্ষা পরিষদ্ যেভাবে সুষ্ঠু পরিচালনার গুণে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রচারে সার্থককাম হয়েছে, অচিরে বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন অনিবার্য। চুঁচুড়ায় গত বৎসর তিনি নিজেই এবিষয়ে ঘোষণা করেছিলেন, পুনরায় এই উৎসবেও একই কথা বলছেন।

শ্রীশ্রীদুর্গা

রমাবড়লির [illegible] কর্তৃক
অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত

কালীভূষণ সেন কবিরাজ
মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

মুদ্রণ—বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

মহামায়া

মহারূপা মহাপূজ্যা মহাপাতকনাশিনী।
মহামায়া মহাসত্ত্বা মহাশক্তির্মহারতিঃ॥

মহাভোগা মহৈশ্বর্যা মহাবীর্যা মহাবলা।
মহাবুদ্ধির্মহাসিদ্ধির্মহাযোগীশ্বরেশ্বরী॥

মহাতন্ত্রা মহামন্ত্রা মহাযন্ত্রা মহাসনা।
মহাযাগক্রমারাধ্যা মহাভৈরবপূজিতা॥

মহেশ্বরমহাকল্পমহাতাণ্ডবসাক্ষিণী।
মহাকামেশমহিষী মহাত্রিপুরসুন্দরী॥

—শ্রীললিতাসহস্রনামস্তোত্রম্, ৫৭-৫৭।

[জগজ্জননী মহামায়ার অতুলনীয় মহিমার কে সীমা করিবে ?]

অখিল সংসারে যত মূর্তি সব তাঁহারই মূর্তি—সকল রূপের মধ্যে তাঁহারই রূপ জ্বল জ্বল করিতেছে, মা যে আমাদের মহারূপা। যেখানে যত দেহ সব মাহামায়ারই দেহ, যেখানে যত শক্তি সব তাঁহারই শক্তি, যেখানে যাহা কিছু আনন্দ সব তাঁহারই আনন্দ; মা যে আমাদের মহাসত্ত্বা, মহাশক্তি, মহারতি। সকল পূজা, সকল আরাধনার লক্ষ্য তিনিই; তাই তাঁহার নাম মহাপূজ্যা। এমন কোন পাপ নাই যাহা তাঁহার পুণ্যস্পর্শে তিরোহিত না হইতে পারে—তাই তো তাঁহাকে বলি মহাপাতকনাশিনী।

এই বিশ্বভুবনে যত ভোগ, যত ঐশ্বর্য, যত বীর্য, যত বল সকলই মহামায়ার। মহাযোগীশ্বর শিবেরও যিনি ঈশ্বরী তিনি নিখিল-মানসে বুদ্ধিবৃত্তিরূপে প্রকাশ পাইয়া সংসারের সকল কার্যকারণশৃঙ্খলা ধরিয়া রাখিয়াছেন, নিখিল জীবের যাবতীয় কর্মের সিদ্ধিও তিনিই।

মা আমাদের মহাতন্ত্রা, মহামন্ত্রা—সকল সাধন, সকল সিদ্ধান্ত তাঁহাকে লইয়াই—সকল মন্ত্র তাঁহারই মন্ত্রে নিহিত। মহাযন্ত্রা তিনি—তাঁহারই অধিষ্ঠান-প্রতীকে সকল দেবতার আবির্ভাব ঘটে; মহাসনা তিনি—তাঁহারই আসন সকল আরাধ্যের আসন। আবার বিবিধ যাগযজ্ঞের দ্বারা যাজ্ঞিকগণের যে দেবতার তুষ্টিবিধানপ্রয়াস—উহারও লক্ষ্য মহাভৈরবপূজিতা জগদম্বাই।

মহাশিবের মহাকামনা—'এক আমি বহু হইব।' সেই কামনাকে ব্যক্ত করিতে অচল শিবের তদাত্মভূতা মহামায়ার আবির্ভাব, অসংখ্য নামরূপাত্মক আকৃতির প্রসব, কত যত্নে পোষণ, সংরক্ষণ। তাহার পর একদিন ঘনাইয়া আসে কল্পের অবসান। মহাকাল প্রলয়তাণ্ডবের নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতিপদক্ষেপে লক্ষ কোটি আকৃতি ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া বিলীন হইতেছে। কোথায়? ত্রিলোকসুন্দরী মহেশ্বর-মহিষীর পদকমলে। মহাতাণ্ডবের সাক্ষিণী হইয়া মা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, প্রলয়-লীন জীবনিবহের কর্মবীজগুলি কুড়াইয়া রাখিতেছেন। পরবর্তী কল্পে আবার উহা হইতে জগৎ-সংসার সৃষ্টি করিবেন।

কথাপ্রসঙ্গে

সুরথ এবং সমাধি

দশভুজার পূজাকৃত্যের এক প্রধান অঙ্গরূপে নয় দিন বা চার দিন বা তিন তিন দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডী নিয়মপূর্বক পাঠ করা হইয়া থাকে। রাজা সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্যের কাহিনী অবলম্বনে মহাশক্তিস্বরূপা বিশ্বজননীর দুষ্টদমন, শিষ্টপালন এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূরণ করিবার বর্ণনা আজিও শ্রদ্ধালু নরনারীর চিত্তে যে বিচিত্র আবেগসম্ভার জাগ্রত করে উহার আধ্যাত্মিক মূল্য বিপুল। বেদবেদান্তের নিগূঢ় সত্য উপাখ্যানের ভিতর দিয়া এমন সহজ ও সুস্পষ্টভাবে জনমানসে যিনি গাঁথিয়া দিতে পারিয়াছেন সেই মার্কণ্ডেয় ঋষির রচনা-কীর্তির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ একান্তই অবান্তর প্রশ্ন। চণ্ডী মানুষের সামগ্রিক জীবন-শাস্ত্র—মানুষের মানস-প্রকৃতি, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম—তাহার বন্ধন ও মুক্তি—এই সব কিছুরই অপূর্ব বিশ্লেষণ ও অসন্দিগ্ধ দিগ্‌দর্শন! কে ছিলেন ভূপতি সুরথ, কোন্ দূর অতীতে কোন্ অঞ্চলে কতদিন তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন, কি কি ঘাতপ্রতিঘাত তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহার খুঁটিনাটি তথ্য ও পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিচার করা বড় কথা নয়; বড় কথা—উপাখ্যানের সুরথের মধ্য দিয়া সংসারের শত শত মানুষের যে একটি বিশেষ পরিচয় প্রতিফলিত হইয়াছে উহাকে চিনিয়া রাখা। সংসারে সব কিছু আছে অথচ কিছুই নাই, সকল শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে অথচ প্রয়োগ করিতে গেলে ব্যর্থ হইতেছে, কুসুমে কুসুমে রম্যোদ্যান পরিপূর্ণ কিন্তু যে কোন একটিও ফুল তুলিতে গেলে আঙুলে কাঁটা বিঁধিয়া যাইতেছে, এমন যখন হয়, হওয়া উচিত নয় তবুও হয়—তখন আমাদের বিপন্নতার যেন অবধি থাকে না। আমাদের সকল পৌরুষ যেন তখন নির্বাণোন্মুখ, বিস্তীর্ণ আকাশের কোন দিকেই কোন কোণেই আর যেন কোন আলোর চিহ্ন নাই—কেবলই অন্ধকার, কেবলই বিভীষিকা। ঠিক এমনই সঙ্কট মুহূর্তে কিন্তু জীবনের এক পরম শুভক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়—জীবন-তরণীর কর্ণধারের দিকে ফিরিয়া চাহিবার কল্যাণ অবসর। প্রশ্ন জাগে—কে, কে? পিছনে কে দাঁড়াইয়া রঙ্গমঞ্চের এই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছ? এই আলোক-আঁধার-ঘেরা, এই হাস্য-রোদন-বিকীর্ণ, এই সফলতা-ব্যর্থতাময় সংসার-নাটকের পরিচালনা? রাজা সুরথের এবং বৈশ্য সমাধির জীবনে ঐরূপই দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই দুর্ভাগ্যেরই পরিণতিতে মহৎ সৌভাগ্যও। একই মানসিক বিপর্যয়ে পরিক্লিষ্ট হইয়া উভয়ে যুক্তি করিয়া মেধস ঋষির চরণতলে গিয়া বসিলেন—উদ্দেশ্য, জানিয়া লইবেন, কেন, কেন এমন হয়? কাহার ইচ্ছায় এমন করিয়া পুতুল নাচে? এ নৃত্যের লক্ষ্য কি? অবসান কখন?

'ঋষিরুবাচ'—বিপন্ন মানবদ্বয়ের দুঃখে সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া সত্যদ্রষ্টা মুনি বলিলেন,—হে রাজন্, হে শ্রেষ্ঠিন্, তোমাদের প্রশ্ন জগৎ ও জীবনের একটি মৌলিক প্রশ্ন। ইহা শুধু তোমাদের দুজনেরই জিজ্ঞাসা নয়, সমগ্র মানবপ্রকৃতির জিজ্ঞাসা—না, পশুপ্রকৃতিরও বটে। থাকি, থাকি না; জানি, জানি না; পাই, পাই না;—এই দুই রং দিয়াই সমস্ত সংসারের ছবি আঁকা। ইহারই নাম মায়া—এই আলো-ছায়ার অভিব্যক্তি।

প্রতিটি ঘটনার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু সচরাচর ধরা পড়ে না। দ্বন্দ্বকে মানিয়া

লইয়াই সকলে দানাপানি খাইয়া চলে, লাউ কুমড়া সওদা করিয়া অগ্রসর হয়, রাম-শ্যাম মালতী-মাধবী, ঐ মঙ্গলা গাভীটি, ঐ ভুলো কুকুরটা, ঐ উড়িয়া-যাওয়া শালিক পাখীর দলটি—সকল প্রাণীই। জগৎচক্রের এই মানিয়া-লওয়া সহিয়া-চলা রীতি কিন্তু ধরা পড়ে কখনও কখনও কাহারও কাহারও কাছে। বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া ক্লান্ত চোখ দুটি যখন ভিতরে চায়, রাস্তায় ছুটিয়া ছুটিয়া ঘর্মাক্ত দেহ যখন গৃহে ফিরিয়া বিশ্রাম খোঁজে, তখনই মায়া ধরা পড়িবার যোগ্য কাল! নীরন্ধ্র অন্ধকার ফাটিয়া হঠাৎ বিদ্যুৎরেখা চমকাইযা উঠে। আবিষ্কার করি মহামায়াকে—যাঁহার মায়া তাঁহাকে—জগৎসূত্রধারিণী জগদম্বিকাকে। ডাকিলে তিনি সাড়া দেন, চাহিলে তিনি প্রার্থনা পূরণ করেন, কাঁদিলে তিনি কোলে তুলিয়া লন।

সুরথ ও সমাধি উভয়েরই জিজ্ঞাসার পটভূমি ছিল এক, কিন্তু চিত্তের সংস্কার ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তাই নদীপুলিনে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি গড়িয়া তিন বৎসর একান্ত নিষ্ঠায় তদ্গতভাবে পূজা জপতপ করিয়া তাঁহারা মহামায়াকে যখন প্রসন্ন করিতে পারিলেন এবং দেবী সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন তাঁহাদের বরযাচ্ঞা এক হইল না। নৃপতি প্রার্থনা করিলেন, এই জন্মেই শত্রুকে পরাভব করিয়া রাজ্যোদ্ধারের সামর্থ্য আর পরজন্মে সুচিরকালস্থায়ী নিষ্কণ্টক রাজ্য। বৈশ্য চাহিলেন—'আমি আমার'-রূপ মোহ যাহাতে দূর হয়, এমন তত্ত্বজ্ঞান। জগন্মাতা দুই জনকেই বলিয়াছিলেন, 'ভবিষ্যতি'—হইবে। রাজধর্মশীল রাজা তোমার রাজ্য হইবে, এ জন্মে এবং ভবিষ্যৎ সাবর্ণিক-মনুজন্মে; সংসার-বাণিজ্যনির্বিণ্ণ বৈশ্যবর, তোমার জ্ঞান হইবে, এই জন্মেই, এই দেহেই। সংসার-চক্রে আর ঘুরিতে হইবে না—আলোক অন্ধকারের দ্বন্দ্বখেলা আর খেলিতে হইবে না। তুমি মুক্তিলাভ করিবে।

সুরথ-সমাধি এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছেন এবং বরাবর থাকিবেন—কালে কালে, মানুষে মানুষে। আর্ত মানুষ—আর্তিপরিত্রাণের কামনায় সঙ্কটমোচনী মহামায়ার শরণাগত মানুষ, সুরথ-সমাধিকে চিরদিন মানসপটে ধরিয়া রাখিবে, তাঁহাদের উপাখ্যানালোকে নিজেদের পথ চলিবার প্রেরণা পাইবার জন্য, তাঁহাদেরই মতো মহামায়ার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া ভোগ ও অপবর্গ লাভ করিবার জন্য। ধর্মসঙ্গত ভোগ, অপবর্গের পথের অপরিহার্য ধাপ, কিন্তু চিরদিনই সেই ধাপকে আঁকড়াইয়া থাকাও মানুষের কর্তব্য নয়; তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জগৎ-প্রহেলিকা—বা মায়া হইতে মুক্তির অন্বেষণ মানুষের পরমপুরুষার্থ—হিন্দুধর্মেব এই মহৎ শিক্ষাটি দুর্গাপূজাবসবে চণ্ডীপাঠ বা শ্রবণ করিতে করিতে বার বার স্মরণীয়।

রূপ ও অরূপ

রূপ ও অরূপের রহস্য পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যে নির্মম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহা সকল কালের অধ্যাত্ম-সাধকের নিকট প্রচুর শিক্ষাবহ। রূপকে অবলম্বন করিয়াই তিনি ভগবানকে ভালবাসিয়া আসিয়াছেন—ভগবানের মাতৃরূপ। জাগরণে মা, শয়নে মা। সকল আশায়, সকল আকাঙ্ক্ষায়, সকল চেষ্টায় মা। মা ছাড়া চিন্তা করিবার কিছু নাই, ভালবাসিবার, পাইবারও কিছু নাই। কিন্তু জটাজুটধারী সন্ন্যাসীগুরু তোতাপুরী বলিয়াছেন, রূপকে বর্জন করিতে হইবে অরূপে পৌঁছিবার জন্য, বেদান্তপ্রতিপাদ্য নামরূপাতীত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার জন্য। জগদম্বারও আদেশ পাইয়াছেন, নিঃসংশয়ে অদ্বৈত-সাধনায় প্রবৃত্ত হও। তাই মায়েরই আদেশ পালন করিতে বসিয়া রূপ ভুলিয়া অরূপে মন নিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। হয় না। পৃথিবীর অন্য যাহা কিছু রূপ হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসে, কিন্তু জগদম্বার বরাভয়করা হাস্যময়ী

মূর্তিকে দূর করা যায় না, রূপ অরূপের রাস্তা রোধ করিয়া দাঁড়ায়! বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও পারেন না, অসহায় অবস্থা গুরুকে নিবেদন করেন। তোতাপুরী একখণ্ড কাচের অগ্রভাগ দিয়া শিষ্যের ভ্রূ-মধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলেন, এই বিন্দুতে মন গুটাইয়া আন।

"তখন পুনরায় দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং জগদম্বার শ্রীমূর্তি পূর্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহা দ্বারা ঐ মূর্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না; একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নামরূপ রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিমগ্ন হইলাম।"

(শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের উক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ সাধকভাব, ১৩শ অধ্যায়)

প্রাণপ্রিয় ইষ্টমূর্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলা নির্মম অভিজ্ঞতা বই কি! কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন, তিনি যখন মায়ের উপর বিশ্বাস করিয়াছেন তখন মা তাঁহার মান রাখিবেন—তাঁহার যে হাত ধরিয়া আছেন উহা কখনো ছাড়িবেন না; তাই মায়েরই আদেশে মায়ের মূর্তি বিসর্জন দিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চাৎপদ হন নাই। জানিতেন, রূপ হইতে অরূপে যাইবার নিশ্চিতই প্রয়োজন আছে, মায়েরই কাজে। কত যে প্রয়োজন ছিল তাহা উত্তরকালীনরা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। রূপ হইতে অরূপে গিয়াছিলেন আবার অরূপ হইতে রূপে ফিরিয়া রূপ ও অরূপের তাদাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তো শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমন্বয়াচার্য। নহিলে একদেশদর্শী পথিকদের মতো তাঁহাকেও বলিতে শুনিতাম—'গাছের উপর গিরগিটিকে দেখিয়া আসিয়াছি; তাহার বর্ণ লাল বা হলুদ বা বেগুনী।' সে যে বহুরূপী—দিবসে নানা সময়ে নানা রঙ ধরিতে পারে, আবার কখনও বা কোন বর্ণ থাকে না, এ তত্ত্ব শুনিতে পাইতাম না। ইহাই সমন্বয়ের বাণী।

"যে সমন্বয় করেছে, সেইই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি—সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্তমত—সব সেই এককে লয়ে। যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁর নানা রূপ। * * * বেদে যাঁর কথা আছে তন্ত্রে তাঁর কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা।"

(শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১৫।১)

যে মায়ের মূর্তিকে একদিন নির্মমভাবে 'দ্বিখণ্ড' করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল পুনরায় সেই মূর্তিকে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, কাছে রাখিয়াছিলেন; পাইয়াছিলেন—বোধ হয় পূর্বাপেক্ষা আরও নিবিড়তর ভাবে। পঞ্চবটীতে সন্ন্যাসী-গুরু ও সন্ন্যাসী-শিষ্য সারাদিন বেদান্ত-বাক্যের বিচার করিতেছেন—কিন্তু সন্ধ্যা আসিলে শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের নেতি নেতি বিচারে ছেদ পড়িয়াছে। হাতে তালি দিয়া মায়ের নাম করিতেছেন। তোতাপুরী উপহাস করিয়া বলেন, আরে কেঁও রোটি ঠোকতে হো?—হাতে আটার গুলি পিটাইয়া পিটাইয়া যেমন রুটি গড়ে সেইরূপই যে করিতেছ দেখিতেছি, উহা আবার কিরূপ বেদান্তসাধনা? শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুকে বুঝাইতে পারেন না, মা যে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যে সর্প স্থির, সেই সর্পেরই তির্যক্ দেহগতি।

মা কিন্তু নিজেই তোতাপুরীকে বুঝাইয়াছিলেন বুঝাইয়া তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দজী তাঁহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (গুরুভাব পূর্বার্ধ, অষ্টম অধ্যায়) গ্রন্থে এই ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। সর্বনামরূপভেদ-বিকল্পাতীত অদ্বৈত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—নামরূপ মায়ার প্রতিভাস মাত্র; পুরুষকারসহায়ে সেই প্রতিভাসকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া আত্মসত্যে সুস্থির থাকাই জীবনলক্ষ্য—ইহাই ছিল তোতাপুরীর দৃষ্টিভঙ্গি। ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রহ্মশক্তি মহামায়াকে মানিবার, আরাধনা করিবার কোন সঙ্গত স্থান নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল শারীরিক ব্যাধিতে ভুগিয়া এক গভীর নিশীথে নশ্বর দেহকে গঙ্গাগর্ভে

বিসর্জন দিবার সঙ্কল্পে সন্ন্যাসী জলে নামিয়া দেখিয়াছিলেন তাঁহার পুরুষকার ব্যর্থ। জলে নামিলেই ডোবা যায় না। ডুবিলেও মরা যায় না। মহামায়ার ইচ্ছা না হইলে মরিবার উপায় নাই। এই সংসার মহামায়ার এলাকা—নিগুর্ণ ব্রহ্ম সেখানে অটল নিস্পন্দ শুইয়া আছেন মাত্র! মহামায়ার 'হাঁ' তে সব কিছু চলিতেছে, তাঁহার 'না' তে সব কিছু থামিতেছে। তোতাপুরীর লব্ধ শিক্ষা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গকারের ভাষায় অনুপম ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"তোতা প্রায় পরপারে চলিয়া আসিলেন তত্রাচ ডুবজল পাইলেন না। ক্রমে যখন রাত্রির ঘন অন্ধকারে অপর পারের বৃক্ষ ও বাটীসকল ছায়ার মত নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন তোতা অবাক হইয়া ভাবিলেন, 'একি দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার পর্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই। একি ঈশ্বরের অপূর্বলীলা!' অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল! তোতার মন উজ্জল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্য শক্তিরূপিণী মা; জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা। তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নিগুর্ণা মা!—এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তিভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী মূর্তিতে অবস্থিত! — ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ!"

*　　*　　*

আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে রূপ ও অরূপের রহস্য বিশেষভাবে খ্যাপন করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া। নিরাকার উপাসনায় অভ্যস্ত এবং সাকার দেবতার পূজাদিতে অনাস্থাসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ সাংসারিক অভাব দূরীকরণের উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অনুরোধ করিয়াছেন তাঁহার হইয়া ভবতারিণী কালীকে জানাইতে, যাহাতে তাঁহাদের পরিবারের আর্থিক অনটন দূর হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি না। তুই যা না কেন? * * মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন—তিনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন?" শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে মঙ্গলবার রাত্রে নরেন্দ্র কালীমন্দিরে গিয়াছেন। কিন্তু দেবীর সম্মুখে গিয়া সংসারের দুঃখকষ্টের স্মৃতি আর রহিল না। প্রার্থনা করিয়া আসিলেন—"মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।" শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিয়া বলিলেন,—"যা, যা, ফের যা, গিয়ে ঐকথা জানিয়ে আয়।" নরেন্দ্র পুনরায় গিয়া জগদম্বার নিকট ঐ একই প্রকার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পুনর্বার পাঠাইলেন, এবারও পূর্বঘটনার পুনরাবৃত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন,—"তোর অদৃষ্টে সংসার সুখ নেই, তা আমি কি কোরব?" নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিলেন, মায়ের গান শিখাইয়া দিন। 'মা ত্বং হি তারা'—এই মাতৃসঙ্গীত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে শিখাইয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথ সারারাত ঐ গানটি ভাববিহ্বল প্রাণে গাহিয়া কাটাইলেন। পরের দিন জনৈক ভক্ত দ্বিপ্রহরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে আসিয়া লক্ষ্য করিলেন তাঁহার ঘরে নরেন্দ্রনাথ শুইয়া আছেন এবং ঠাকুর নিজে একটি অপূর্ব আনন্দাবেশে নিজের খাটে বসিয়া রহিয়াছেন। ভক্তটি আসিলে শায়িত নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সোৎসাহে পূর্বরাত্রির ঘটনা বলিলেন এবং বালক যেমন নূতন কোন মূল্যবান সামগ্রী উপহার পাইলে উৎফুল্ল হয় সেইরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বার বার ভক্তটিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে—কেমন?" রূপ ও অরূপের সমন্বয় সাধন না করিলে অধ্যাত্মজীবন সম্পূর্ণ হয় না; তাই, নরেন্দ্রের—ভাবী বিবেকানন্দের

জীবনে এই সমন্বয়ের পাতনিকা দেখিতে পাইয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের অত পরিতৃপ্তি-বোধ। উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বলিয়াছিলেন,—"যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের জন্য এক একটি আলাদা ধর্ম থাকিত তাহা হইলে আমি সুখী হইতাম।" অনন্ত মানব প্রকৃতি—তাই অনন্ত পথে পূর্ণতার অভিযান। ইহা কিছু অসমীচীন নয়। কিন্তু অসমীচীন—উহাদের যে কোনটির উপর কাহারও অসহিষ্ণুতা। প্রত্যেক মানবের ধর্মসাধনাকে সম্মান দান, শ্রদ্ধা করা তাহারই পক্ষে সম্ভব যে রূপ এবং অরূপ দুইএরই মর্ম উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তাহাই করিবার আহ্বান আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

"বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা"

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

একটি আমের চারা পুতেছিনু জামগাছ তলে
নিতান্তই খেলিবার ছলে।
বহুবর্ষ পরে গিয়ে দেখি
দিব্য সে হয়েছে বড়, একি!
দুহাত বাঁকিয়া গিয়া আলোকের দিকে
তুলিয়াছে তার মাথাটিকে।
আজ—তাই ভাবি
কে দিল তাহারে বুদ্ধি মিটাইতে দাবি॥

লতাটি লুটাত ভূমে, জামগাছ কিছু দূরে আছে
ঠিক তারে লক্ষ্য ক'রে চলিয়া তা উঠে সেই গাছে।
আজ তাই ভাবি
কে দিল তাহারে বুদ্ধি মিটাইতে দাবি।
পাখী উড়ে যায় কত দূরে!
নিজের বাসাটি চিনে সন্ধ্যাকালে ঠিক আসে ঘুরে।
শুধু তাই কেন, শত যোজনের দূরস্থান হ'তে,
কপোত খপোত-সম বার্তা বহি আসে বায়ুস্রোতে।
ভাবি মোর জনমে বিস্ময়,
কে এদের দিল বুদ্ধি, পথ ভুল কভু ত না হয়।
দেখেছি কুকুরে
হাজার লোকের মাঝে চিনে ফেলে আপন প্রভুরে।

বিড়ালে ছাড়িয়া দিলে দশ ক্রোশ দূরে,
পূর্ব্বস্থানে পথ চিনে পুন আসে ঘুরে।
আহত সৈনিকে বহি শক্রব্যূহ চিরে
বাঁচাইয়া আনে অশ্ব তাহার শিবিরে।
ক্ষুধিত কেশরী
নিজ প্রাণদাতা সেই গোলামেরে যায় না পাশরি'।
ভাবি মোর জনমে বিস্ময়
কে এদের বুদ্ধি দিল, যোগাল হৃদয়।
সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে মহামায়া করেন বিরাজ,
এ শির প্রণত হয় তাঁহারি চরণ তলে আজ।

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার

যিনি সর্বভূতে, সর্ব সময়ে বর্তমান, যাঁর স্থিতিতেই এই জগৎপ্রপঞ্চের অনুভূতি, তাঁর আবাহন, তাঁর পূজা, সর্বকালেই হতে পারে। তাঁর পূজার কালাকাল নেই, কেননা তিনি কালাতীত। মহাকাল তাঁর চরণ বক্ষে ধারণ করে নিশ্চল। তবুও আমরা দেখতে পাই, দেবীর শারদীয়া আবাহনের সময়েই সকলে বেশী উদ্‌গ্রীব, শিশু যুবা নরনারী সকলেই।

যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তিনিই যখন নিজ মায়ার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মানবরূপে আবির্ভূত হলেন তখন তিনি অবতার উপাধিধারী শ্রীরামচন্দ্র। তখন তিনি 'মায়াধীন' বলেই প্রতীয়মান। মায়ার অধীনে থাকাকালীন তিনি ভেদজ্ঞানও মেনে নিয়েছেন। তখন তাঁর জাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা, তিনি শক্তিহীন—শক্তি ও তিনি ভিন্ন। সেই জন্য যখন তাঁর অসুরাগ্রগণ্য তমোগুণাধিপ রাবণকে জয়ের প্রয়োজন হল, তখন স্বভাবতই তাঁর দরকার হল শক্তিসাধনার, মহাশক্তির কৃপালাভ, অর্থাৎ তাঁর নিজ দেহাধারে মহাশক্তির আবিভাবের। সেই জন্যই তাঁকে আরাধনা করতে হল মহাশক্তির সেই ভাবঘন রূপকে; যেরূপে সর্বব্যষ্টি শক্তি সমষ্টিভূত হয়ে, মহাসুর নিধনে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই ভাবঘন মূর্তিই শ্রীশ্রীদুর্গামূর্তি। মহাশক্তির সমষ্টিভূত এই মূর্তি। সেইজন্য দেখতে পাই, সর্ব-জ্যোতি ও সর্বকমনীয়তাপূর্ণ অতসীপুষ্প-বর্ণাভা, সর্বশক্তিকেন্দ্রীভূতা, সর্বৈশ্বর্যশালিনী, সবজ্ঞান ও সর্বসিদ্ধির সমষ্টিভূতা মায়ের এই অদ্ভুত রূপ। তাঁর সর্ব অঙ্গে, দশদিকপ্রসারিণী দশটি হাতে নানা অস্ত্রের সংযোজনা। যুগে যুগে যখনই অত্যাচারী অসুরকুল (অর্থাৎ তমঃশক্তি) দমনের প্রয়োজন হয়, তখনই মহামায়ার এই চণ্ডিকা শক্তিকেই উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ই থাকেনা। তাই শ্রীরামচন্দ্র আরাধনা করলেন মহাশক্তিকে এই দুর্গামূর্তিতে। শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বে মহাশক্তির এই

মূর্তির আরাধনা করেছিলেন সুরথরাজা। তিনি পূজা আরম্ভ করেছিলেন বসন্তকালে। সেই হতে শ্রীরামচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বসন্তকালেই এ পূজার প্রচলন ছিল—কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী আরাধনা করলেন শরৎকালে। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্রের এই পূজাকে আমরা অকাল পূজা বলে থাকি। যাহোক, অকালে পূজা হলেও শ্রীরামচন্দ্র দেবীর প্রসন্নতালাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

যদিও বর্তমানে, চৈত্রমাসে বসন্ত ঋতুতে বাসন্তী দুর্গা ও আশ্বিন বা কার্তিক মাসে শরৎ ঋতুতে শারদীয়া দুর্গা এই দুটি পূজাই আমাদের বাঙ্গালা-দেশে হয়ে আসছে তবুও শারদীয়া দুর্গা পূজাই সমাজে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠার কারণ—শ্রীরামচন্দ্র এ পূজা অনুষ্ঠান করে সফলতা লাভ করেছিলেন, আর বর্তমান হিন্দু সমাজের প্রায় সকলেই শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ জ্ঞানে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা করে থাকেন। কিন্তু এ ছাড়াও শরৎ ঋতুতে পূজাযজ্ঞাদির প্রাধান্যের আরও এক কারণ বৈদিক-যুগের গ্রন্থাবলী থেকে পাওয়া যায়। যেমন বাজসনেয়ী সংহিতায় (১৪।১৬) আছে—"ইষশ্চোর্জশ্চ শারদাবৃতু"। বৈদিক যুগে 'ইষ' বলতে আশ্বিন মাস বোঝাত এবং 'উর্জ' অর্থে কার্তিক মাস। বৈদিক ঋষিরা শরৎঋতু বলতে এই 'ইষ' ও 'উর্জ' তথা আশ্বিন-কার্তিক মাস বুঝতেন। তাঁরা বলতেন 'শারদেন ঋতুনা দেবাঃ' অর্থাৎ শরৎকালই দেবতাদের (দেব ও দেবী দুই-ই) অর্চনা প্রশস্ত। সংবৎসরের ভিতর শরৎ ঋতুতেই এক সাম্য অবস্থা প্রকটিত হয়—বর্ষাধৌত পরিস্ফুট প্রকৃতি, নাতিগ্রীষ্ম নাতিশীত, জলাশয়াদি সামঞ্জস্যভাবে পূর্ণ, পথ-ঘাট কর্দমাক্তও নয় ধূলিধূসরিতও নয়, মাঠে মাঠে শস্যসম্ভার—এমন সময় মানুষের মনে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ আসে, তাই দেবীর আরাধনার উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসবে সকলে মেতে ওঠে—তাই এই উৎসবের নাম দেওয়া হয়েছে 'শারদোৎসব'।

এরপর আমরা আলোচনা করব এই পূজার 'বোধন', 'সঙ্কল্প', 'আবাহন', 'পূজা নিবেদন', 'নিরঞ্জন' ও 'বিসর্জন' এবং বিসর্জনের পরে আচরিত অনুষ্ঠানগুলিতে বাঙ্গালীর দৃষ্টিভঙ্গি কি। আমরা দেখতে পাই দেবদেবীর যত ভাবের পূজার প্রচলন আছে, তার ভিতর একমাত্র দুর্গামূর্তি অর্থাৎ মহিষাসুরমর্দিনীর পূজার সময়েই 'বোধনের' বিশেষ অনুষ্ঠান। 'বোধন' শব্দের অর্থ উদ্বোধন, উদ্দীপন, জাগানো। আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে, জগন্মাতার যে মূর্তির পূজায় এই শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়, সেই মূর্তির উদ্ভবের উৎস কোথায়? শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমরা দেখতে পাই যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবতাগণের তেজ ও শক্তির কেন্দ্রীভূত শক্তি হতে রূপ পরিগ্রহ করলেন এক নারী মূর্তি, যথা—

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥

সমস্ত ব্যষ্টি শক্তি সমষ্টিভূত হয়ে, তা থেকে আবির্ভূত হলেন একটি মাত্র নারী মূর্তি। আমরা যে দুর্গা প্রতিমাতে অন্যান্য দেব ও দেবী মূর্তির সংযোজনা দেখতে পাই শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহিষাসুর মর্দিনীর রূপ বর্ণনায়, তার কোনই উল্লেখ নেই। মনে হয়, এই মহাশক্তির অন্তর্ভূত ভিন্ন ভিন্ন শক্তির উপস্থিতিকে, লোকচক্ষুর সামনে রূপ দেবার জন্যে ক্রমবিকাশ পর্যায়ে এগুলি সংযোজিত হয়েছে যুগ যুগ ধরে। প্রকৃতপক্ষে মহিষাসুর নিধনকালে সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত একটিমাত্র মূর্তিরই উদ্ভব হয়েছিল, দেবতাগণের আহ্বানে—যে দেবতাগণ এই মহিষাসুর দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। মহিষাসুর অর্থে তমঃশক্তি, দেবতাগণ অর্থে সত্ত্বশক্তি। মহিষাসুরের শক্তির উৎসও সেই একই মহাশক্তি—কিন্তু সীমাবিশিষ্ট মাত্র কয়েকটি ব্যষ্টি শক্তির কেন্দ্রীভূত শক্তি। তথাপি এমনি শক্তিমান মহিষাসুর যখন সমস্ত জীবের কল্যাণকর দেবশক্তিকে পরাজিত,

দমিত করে জীবের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ তমঃশক্তি প্রবল হয়ে পড়ে, তখন সেই শক্তিমানকে দমিত করবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই থাকতে পারে, যিনি মহাতেজসম্পন্ন সর্বব্যষ্টি-শক্তির সমষ্টিভূত আধার ও উৎস। মহিষাসুর শিবাংশজাত। কালিকাপুরাণে আছে, মহিষাসুর রম্ভাসুরের তনয় ও শিব অংশে তার জন্ম হয়। অপুত্রক রম্ভাসুরের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব তাকে পুত্রলাভের বর দান করেন। এই পুত্রই মহিষাসুর ; শক্তিলাভের আশায় সে মহাশক্তির আরাধনা করে। দেবী প্রসন্না হয়ে যখন তাকে বরপ্রার্থনা করতে বলেন, তখন সে প্রথমে প্রার্থনা করে ত্রিভুবনের রাজত্ব (অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল) এবং অন্তিমে দেবীর সাযুজ্য (অর্থাৎ সান্নিধ্য)। এহেন মহিষাসুর যখন মর্ত্য ও পাতাল জয়লাভের পর স্বর্গের দেবতাদের (সত্ত্বশক্তি) পরাজিত ক'রে, ত্রিভুবনের ত্রাস সঞ্চার করতে আরম্ভ করল, যখন দেবতাদের ব্যষ্টিশক্তি বিচ্ছিন্ন ও নিস্তেজ, তখন সেই শক্তিমান দুষ্ট মহিষাসুরের নিধনকল্পে দেবতাদের প্রয়োজন হলো ব্যষ্টিশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা। সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি-সমষ্টি থেকে যে মূর্তির উদ্ভব হল, তার তেজে ত্রিভুবন উদ্ভাসিত হয়ে গেল। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ঋষি বলেছেন :—

স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াংত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরিটোল্লিখিতাম্বরাম্॥
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্।
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্॥

(চঃ-২।৩৭-৩৮)

"—অনন্তর যাঁহার অঙ্গজ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত, যাঁহার পদভরে পৃথিবী অবনত, যাঁহার ধনুকের জ্যা-শব্দে পাতাল পর্যন্ত (সপ্তনিম্নলোক) আকুলিত, যিনি সহস্রহস্তে (অনন্ত হস্তে) সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতা এবং যিনি গগনস্পর্শী মুকুট পরিহিতা, সেই দেবীকে মহিষাসুর দেখিতে পাইল।"

শক্তিমান অসুরনিধনকল্পে যখন মহাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে, তাঁর পূজাচনা দ্বারা তাঁর প্রসন্নতা লাভের প্রয়োজন হয়, তখনই আবার দরকার হয় পূজকের নিজস্ব সুপ্ত ও বিক্ষিপ্ত শক্তিকে জাগরিত ও কেন্দ্রীভূত করবার দৃঢ় সংকল্প। অতএব এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে বোধন শব্দের অর্থ 'উদ্দীপন' বলা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। তাই মহিষাসুরমর্দিনী মহাশক্তির অর্চনায় প্রথমে হয় বোধন এবং পরে হয় সঙ্কল্প, প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠান। শ্রীরামচন্দ্রও এই মহিষাসুরমর্দিনীর পূজাচনার মানসে শরৎকালে 'বোধন' করেছিলেন, সেই হেতুই এই শারদীয়া পূজাকে 'অকাল বোধন' বলা হয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, মহিষাসুরকে বধের সময় মহাশক্তি আবির্ভূতা হয়েছিলেন দেবী দুর্গারূপে। শ্রীরামচন্দ্র এই দুর্গাদেবীরই আরাধনা ক'রে পূজা করেছিলেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিকেয় প্রভৃতি দেবতার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রতীককে তখন তিনিও ভিন্নভাবে পূজা করেন নি। পুরাতন দুর্গাদেবীর বিগ্রহে কেবল দুর্গাদেবী ও মহিষাসুরেরই মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, মহিষাসুর যেখানে বধ হয়েছিল বলে প্রবাদ, এবং যার নামানুসারে মৈসুরু বা মহীশূর দেশের উদ্ভব সেখানে দেবী চণ্ডিকার যে মূর্তি চামুণ্ডী পাহাড়ে আছে তা কেবল মহিষমর্দিনী দুর্গার। শারদীয়া দুর্গাপূজায় লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির কল্পনা ও সংযোজনার ক্রমবিবর্তন বোধ করি হয়েছিল বাঙ্গলাদেশেই ; কারণ বাঙ্গালী দেবী দুর্গাকে আরাধনা করে পরম আত্মীয়াভাবে —স্বামী গৃহ হতে পিতৃগৃহে প্রত্যাগতা কন্যারূপে। সমস্ত বিভূতি পরিবেষ্টিত মহাশক্তিকেই সে কন্যারূপে দেখতে চায়, সেবা করতে চায়। বাঙ্গালীর পূজা-পদ্ধতির ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করলে এইটাই দেখা যায় যে, প্রতিটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই বহুদিন পরে গৃহাগত আত্মীয়ের সেবা পরিচর্যার রূপই প্রকটিত

হয়ে ওঠে। বাঙ্গালী কল্পনা করে, দেবীর এক একটি বিভূতি যেন দেবীরই বিভিন্ন পুত্রকন্যার স্বরূপ—তাই মন্ত্রোচ্চারণ করে "সপরিবারায়ৈ শ্রীদুর্গায়ৈ বৌষট্।" এ মন্ত্র, এ ভাব চণ্ডীতে নেই—এ ভাবধারা বাঙ্গলারই বৈশিষ্ট্য। এই ভাবকে ভিত্তি রেখেই তাঁর আরাধনা, তাঁর পূজা—বহুদিন পরে পিতৃগৃহে প্রত্যাগতা পুত্রকন্যাপরিবেষ্টিতা পরম আদরের কন্যাকে নিয়েই তার আনন্দোৎসব। এমন কি পূজান্তে কন্যারূপিণী মহাশক্তির প্রতিমাটিকে বিসর্জনের আগে বরণ, মিষ্টি-পান-এলাচ প্রভৃতি খাওয়ানো, সিঁথিতে সিন্দুর-দান ও চরণ দুটি অলক্ত রাগে রঞ্জিত করা, স্বামী গৃহে গমনোন্মুখ কন্যার জননীর মত স্নেহভারাক্রান্ত কণ্ঠে কানে কানে "আবার এসো" বলে গালে চুম্বন-দানটি পর্যন্ত সবই পরম আত্মীয়ের ভাবে পূর্ণ। তাই দেখতে পাই কেন্দ্রীভূত মহাশক্তির এই প্রতিমাটির পূজান্তে যখন বিসর্জন দেওয়া হয়, জলের মধ্যে তখন সেই বিশ্বব্যাপী মহাশক্তিকে আবার বিশ্বমাঝেই বিলীন হয়ে যাবার ভাবটিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়, সেই জলের প্রতি বিন্দুর ভিতর মহাশক্তির স্থিতিকে উপলব্ধি করেই সেই জল সকলের উপর সিঞ্চন ক'রে শান্তি কামনা করা হয়, যেন এই মহাশক্তি সকলের ভিতর প্রবেশ করে, সকল অসুরশক্তি, অশান্তির উৎস তমঃশক্তিকে বিনাশ ক'রে দেন শান্তি। এই ভাবই তখন প্রকটিত হয়ে ওঠে যে, আজ থেকে আমরা সকলে এক। তাই করি পরস্পরকে আলিঙ্গন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে করেন আশীর্বাদ, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে করে ভক্তিনম্রচিত্তে প্রণাম। আমরা যেন সকলেই একই জননী থেকে উদ্ভূত, সকলে আমরা এক, ছোট বড়র ভেদ নেই—জাতিবিচার নেই—ধনী নির্ধন নেই—সকলেই আমরা একই মহাশক্তির আধারস্বরূপ। এ ভাবধারা, এ দৃষ্টিভঙ্গি আছে মাত্র বাঙ্গালীরই, অন্তরে বাঙ্গলার এইটাই বৈশিষ্ট্য। তাই বাঙ্গালীর ঘরে দেবী দুর্গার পূজাকে কেন্দ্র করে হয় মহোৎসব।

কালো মেয়ে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাজিকরদের কুৎসিত এক মেয়ে,
দেখিলাম মোর দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে,
ম্লান মুখ—তবু, হাসি মোর পানে চেয়ে
হাত পেতে শুধু একটি পয়সা যাচে।
দেখিয়া তাহার মুখ,
স্নেহেতে ভরিল বুক,
লাগিল বড়ই ভালো,
দেখিনি তো হাসি হেন—
দেবের দেউলে যেন,
কালো প্রদীপের আলো।

সুধার প্রলেপ দিয়ে গেল মোর চোখে,
কুশ্রী বলিতে এখন লাগে যে ডর।
জগৎ এখন দেখি তার ছায়ালোকে
কিছুই আমার লাগে না অসুন্দর।
বরাহ, কমঠ, মীন—
রূপে কেহ নহে হীন,
পুণ্য ওরূপ কি না?
যে রূপ স্বয়ং হরি—
ধরেছেন কৃপা করি,
তাহাকে কে করে ঘৃণা?

বিশ্বজননী যিনি ভুবনেশ্বরী,—
কখনো ষোড়শী, কভু তিনি ধূমাবতী,
কত ভাবে আহা, কত রূপ র'ন ধরি
তাঁরে অবজ্ঞা করে—যার দুর্মতি।
সোহাগে মাখায়ে রঙ
মেয়েকে সাজান সঙ
তা দেখিতে জমে ভিড়।
হাসি সুধাব্ধি তীরে
'নুলিয়া'র সাজে ফিরে
সুতা সম্রাজ্ঞীর।

কুৎসিত রূপ ভুলায় আমার মন
স্নিগ্ধ এবং শুচি করে মোর আঁখি।
ও মোর মায়ের প্রসাদী যে অঞ্জন
জলে ভরে চোখ—অবাক হইয়া থাকি।
কাহারে বলিব পর ?
কাহারে অসুন্দর ?
মুখ নাই বলিবার।
যত করি অভিমান,
আমরা তো সন্তান
কালো কুৎসিত 'মা'র।

বর্তমান ভারতবর্ষে ধর্মের ভূমিকা*

স্বামী নিখিলানন্দ

ভারতীয় কৃষ্টির সৃজন ও সংরক্ষণে ধর্মের ভূমিকা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আজিও ভারতবর্ষে জাতীয় মহাবীররূপে গভীর শ্রদ্ধা যাঁহারা পাইয়া থাকেন তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যের ন্যায় প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ও দার্শনিকগণই। ভারতীয় জীবনধারার প্রত্যেকটি দিক ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন—"আমি একজন নগণ্য সত্য-সন্ধানী। আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই এই সত্যের দর্শনের জন্যই নিয়োজিত আছে। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় কোন ত্যাগকেই আমি খুব বেশী মনে করি না। সামাজিক, রাজনৈতিক বা মানবপ্রেম ও নীতিজ্ঞান বোধে আমার জীবনের যত কিছু কার্য, সবই ঐ একই লক্ষ্যে অগ্রসর।" বর্তমান ভারতের অন্যতম দেশপ্রেমিক মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন,—"ত্যাগ ও সেবাই ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ। ভারতীয় জীবনকে এই ধারাদ্বয়ের মধ্যে প্রবাহিত কর, অন্যান্য যাহা কিছু আপনা হইতেই সফল হইয়া উঠিবে। আধ্যাত্মিকতার পতাকা এই দেশে যত উচ্চেই তোল, উহা বাড়াবাড়ি মনে হইবে না। আত্মিক সত্যেই প্রকৃত মুক্তি।" পুরাকালে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণের দ্বারা, অথবা বর্তমানকালে স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে বহির্জগতে ভারতীয় সংস্কৃতির যাহা অবদান তাহা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই। আমাদের আলোচনার প্রারম্ভে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আদিমকালেও হিন্দু চিন্তানায়কগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে সুচিন্তিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। সূক্ষ্ম যুক্তি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও যোগ-ধ্যানের দ্বারা তাঁহারা মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দুইটি চিরস্থির সত্যকে আবিষ্কার করিয়া 'আত্মা' ও 'ব্রহ্ম' নামে

* এশিয়ার সমস্যাবলী-সম্পর্কিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত লিখিত বক্তৃতার অনুবাদ। অনুবাদক—শ্রীনবশঙ্কর রায়চৌধুরী।

অভিহিত করেন। পরে তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু। হিন্দুদের 'দর্শনে' এই চরম সত্যকে বুদ্ধিবৃত্তির মধ্য দিয়া উপলব্ধি করার চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে। আর তাঁহাদের 'ধর্মে'র লক্ষ্য হইতেছে কতকগুলি অভ্যাস ও আচরণের মাধ্যমে এই তত্ত্বের অনুভব ও দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ। সাধারণ মানুষের জন্য হিন্দু দার্শনিকগণ জগৎ ও জীবনের সত্যতা কখনও অস্বীকার করিতে বলেন নাই। এই কারণেই দেখি, পার্থিব বিষয় সমূহ—নীতিশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিরও সবিস্তার অনুশীলনে তাঁহারা প্রভূত উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুধর্মকে বুঝিতে গেলে 'ধর্ম' শব্দটির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। ইহার ভাবার্থ অতি গভীর ও ব্যাপক। অনেক সময়ে কর্তব্য, পুণ্যশীলতা, ঈশ্বরনিষ্ঠা—এই সকল আখ্যায় উহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তির পূর্বতন কর্ম অনুসারে যখন তাহার 'ধর্ম' নিরূপিত হয়—উহাই তখন 'কর্তব্য'। উচ্চতর বিকাশের জন্য এই 'কর্তব্য' মানুষকে অবশ্যই করিয়া যাইতে হইবে। হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার অন্বেষণ অপেক্ষা কর্তব্যবোধ ও বাধ্যবাধকতাই মানুষের সামাজিক ব্যবহার বেশী নিয়ন্ত্রিত করে।

বর্ণপ্রথা ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও আদর্শের পরিকল্পনা হইতে ইহাই বোধগম্য হয় যে, হিন্দুধর্ম মানুষের সাংসারিক ব্যবহারকে চরম ও পরম সত্যের উপলব্ধিতে প্রয়োগ করিয়াছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ হইতেছেন ইহার স্রষ্টা, ক্ষত্রিয় ইহার রক্ষাকর্তা আর বৈশ্য ইহার বিস্তারকর্তা। শূদ্র নিজ দৈহিক শক্তির দ্বারা এই সংস্কৃতির সংরক্ষণে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। সমাজের এই চারিটি বর্ণের প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। ন্যায়দৃষ্টিই উহাদের নিয়ন্তা। সত্যের উপর ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বর্ণপ্রথা অতএব ন্যায় ও সত্যে অধিষ্ঠিত। যদিও অধুনা এই প্রথা অদ্ভুত ঠেকিতে পারে, তথাপি এই বর্ণবিভাগ মানুষের সমাজকে নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিয়া একদিন সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার মাধ্যমেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী সামাজিক কর্তব্যবোধের দ্বারা সাম্যপ্রাপ্ত করা হইয়াছিল।

সাধারণ ভাবে মানুষের জীবনকে চারটি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। জীবনের প্রথম পর্যায়ে বিদ্যাভ্যাস, দ্বিতীয় পর্যায়ে সংসার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন, তৃতীয় পর্যায়ে সংসারের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে অনুধ্যান। চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে মানুষ একটি নির্দিষ্ট পরিবার ও সমাজের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অখিল বিশ্বকেই গৃহ জানিয়া পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিবেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক মানুষের চারিটি জীবনাদর্শ হইতেছে কর্তব্যপরায়ণতা (ধর্ম), অর্থ, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি (কাম) এবং শেষে জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্তি। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত ভোগ দ্বারা একদিন মানুষ অতিক্রম করিতে পারে। হিন্দুদর্শন সংসারকে অস্বীকার করে না, উহাকে অধ্যাত্ম সত্যে স্থাপন করে। ধর্মের লক্ষ্য হইতেছে বিশ্বসংসারের সসীমতাকে অতিক্রম করিয়া উহার সহিত তাদাত্ম্যলাভ।

ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে নৃপতিগণ যখন সংস্কৃতির রক্ষা ও প্রতিপালনের দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করিতেন, তখন উহা মুক্ত, সৃজনক্ষম ও গতিশীল ছিল। মুসলমান বিজয়ের পর ইহার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। সেই সময় সমাজ ও তৎব্যবস্থা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। কতকগুলি অনমনীয় নিয়মাদি ও অনুষ্ঠানের দ্বারা তখন সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ধর্ম তখন কেবল

মতবাদে এবং দর্শন বাক্‌সর্বস্ব তর্কশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সাধুসন্তগণ কালে কালে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমাজকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইংরেজ জাতির ভারতবর্ষ বিজয়ের পর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজীর মাধ্যমে যখন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তখন ধর্মের ইতিহাসের তৃতীয় পর্যায় শুরু হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ সমাজসেবাকে ধর্মের অঙ্গরূপে প্রচলিত করেন। বিদ্যালয়গুলিতে পাশ্চাত্যের যুক্তিপ্রধান বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। ভারতসংস্কৃতির অনুরাগিগণ হিন্দুশাস্ত্রসকল ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া যুবকদের সহজবোধ্য করিয়া গেলেন। ধর্মও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ধারায় অধ্যয়ন করা হইতে লাগিল। ধর্ম-সম্বন্ধীয় অনুভূতিসমূহকে যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হইতে লাগিল। ফরাসী বিপ্লবের বাণীগুলি সমাজের একটি আমূল পরিবর্তন, বিশেষতঃ স্ত্রী ও নিম্নশ্রেণীর উপর অবিচার বিলোপের দাবী লইয়া উপস্থিত হইল। পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতবাসীর মনে বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। একদল লোকে হিন্দুসমাজকে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য আদর্শে রূপান্তরিত করিতে চাহিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়ায় সমাজের অন্য এক অংশ সনাতন প্রথা সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে চাহিয়া পাশ্চাত্যের সম্পর্কিত সমস্ত কিছু বর্জনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু একটি তৃতীয় দল পাশ্চাত্য ভাবধারার সাহায্যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তের বিশিষ্টতা বুঝিতে সক্ষম হইলেন। রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া তিলক, রাণাডে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া মহাত্মা গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত বর্তমান ভারতের নির্মাতাগণের অনেকেই এই দলভুক্ত। প্রতীচীর বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্রাবকের সাহায্যে ইঁহারা বর্তমান হিন্দুধর্মের যাহা খাদ তাহা নষ্ট করিয়া উহার উজ্জ্বল সার বস্তুকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন, দয়ানন্দ, রমণ মহর্ষি এবং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ অনেকগুলি ধর্মক্ষেত্রের চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতের অবতারপুরুষরূপে অভিনন্দিত হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ মনুষ্যসেবার মাধ্যমে ঈশ্বর-উপাসনার উপর জোর দিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও বলিয়াছেন যে, খালিপেটে ধর্মসাধনা অসম্ভব।

সৌভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের কোন অভিব্যক্তিকে কখনও আক্রমণ করে নাই। অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানের ন্যায় লৌকিক বিজ্ঞানও বহুকাল হইতে সমান শ্রদ্ধায় অনুশীলিত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান ভারতের ধর্মনেতাগণ বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিক্ষাকে অবহেলা করেন নাই। ইহা স্পষ্ট যে, এইগুলি ছাড়া ভারতবর্ষের অভাব, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য এবং সামাজিক পশ্চাদ্‌-বর্তিতা দূর করা সম্ভব হইবেনা। শত শত বৎসর ধরিয়া নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন যে, দুর্লঙ্ঘ্য কর্মফলেই তাঁহারা দুর্দশায় পতিত রহিয়াছেন। কিন্তু আজ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাহা সত্য নয়; পার্থিব জীবনের সঙ্গত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আজ তাই তাঁহারা সচেষ্ট।

পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে সুষ্ঠু ভাবধারার আমন্ত্রণে আগ্রহশীল হইলেও সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুগণ কোন বিরোধী ভাবধারার ভারতীয় সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের অপচেষ্টাকে সহ্য করিবে না। অন্যান্য দেশ হইতে আমাদের শিখিবার অনেক কিছু আছে। যে জাতি শিক্ষাগ্রহণে পরাঙ্মুখ সে তো মৃত জাতি। কিন্তু ভারতবর্ষ পৃথিবীর নিকট ভিক্ষুকের মতো দাঁড়াইবে না। বহিঃপ্রাপ্ত পার্থিব বস্তুনিচয়ের পরিবর্তে তাহার আধ্যাত্মিক সম্পদ বিনিময় করিবে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ তাহার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীন ভারতে লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান

ও মুসলমান আছেন। ধর্মান্ধতার সর্ব প্রকার আশঙ্কা নিরসনের জন্য ভারতের রাষ্ট্রনেতাগণ ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এ কথার অর্থ ইহা নয় যে, ভারতবর্ষ নাস্তিক্যবাদী সংস্কৃতির পরিপোষক। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের জন্য নাগরিক অধিকারে কোন তারতম্য থাকিবে না—ভারতীয় সংবিধানে ইহা জোর করিয়া বলা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সব শক্তি ক্রিয়াশীল তাহাদের মধ্যে ধর্ম প্রধানতম। সৌভাগ্যবশতঃ বর্তমান পৃথিবীতে সমাদৃত আদর্শগুলি যথা—স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিকসাম্য প্রভৃতির সহিত ভারতে ধর্মের কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নাই। হিন্দু-ধর্ম বরং ঐ সকল আদর্শের ভিত্তি দান করিয়াছে। বেদোক্ত আত্মার দিব্যসত্তাই গণতন্ত্রের আধ্যাত্মিক বনিয়াদ। সমন্বয়ের আদর্শই বিশ্বভ্রাতৃত্বের সোপান। বিশ্বসংসারের একতারূপ বৈদান্তিক আদর্শের দ্বারাই নৈতিক গুণাবলীর যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর। নিজের ও পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ভারত-বর্ষকে তাহার ঋষিমুনিগণের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা জীবন ও জগতের জড়বাদীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে।

আগমনী-বিজয়াসংগীত ও বাঙলার গার্হস্থ্যচিত্র

অধ্যাপক শ্রীঅনিল বসু, এম্-এ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ

অপরাপর প্রাচীন সাহিত্যের মতো আমাদের প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যেও ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও উপধর্মের প্রভাব। এই প্রভাব হইতে প্রাচীন যুগের কবিগণ পাইয়াছিলেন তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা ও উদ্দীপনা। শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের কাব্যপ্রবাহ মঙ্গল-কাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী, নাথসাহিত্য প্রভৃতি বাঁধাধরা খাতে প্রবাহিত হইতেছিল। উল্লিখিত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল স্বর্গের দেবতা—মর্ত্যের মানুষ নহে। দেবদেবীর মহিমা কীর্তন ও ধর্মের জয়গানের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়াছিল ধূলার ধরণীর রক্তমাংসেগড়া মানুষের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা ও আশানৈরাশ্যের কাহিনী। কবি ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এই কাব্যিক ধারা অপ্রতিহত-গতিতে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতেছিল।

ভারতচন্দ্রের পর অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙলায় কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায় না। দেশে তখন চলিতেছিল এক-প্রকার অরাজকতা। কলঙ্কমাখা পলাশীর আম্রকাননে বাঙলার তথা ভারতের স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন পর্যন্ত দেশে পররাজ্যলোলুপ বিদেশী বণিকদের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই অরাজকতার দিনে যাঁহারা বাঙলা সাহিত্যের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ভিড় করিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহারা কবি নহেন—কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকার। বাঙলার সহজ সরল পল্লীবাসীরা কর্মক্লান্ত দিবসের অবসরে তাঁহাদের রচিত গানগুলির রস উপভোগ করিয়া চিত্তবিনোদন করিত। কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারেরা যেমন বৈষ্ণবপদাবলী হইতে বিষয়-বস্তু গ্রহণ করিয়া মান, বিরহ, সখিসংবাদ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদরচনা করিতেন, তদ্রূপ রচনা করিতেন সুকুমার মানবিক সম্বন্ধ প্রকাশক শাক্ত পদাবলী। শাক্ত পদাবলীর একটি বিশিষ্ট শাখা—আগমনী ও বিজয়া সংগীত। আগমনী ও বিজয়া সংগীত এবং

তাহাদের উৎস আমাদের এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারদের রচিত গানগুলি বাঙলা কাব্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় একটি অনবদ্য অবদানরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। সন্ধানী পাঠকমাত্রেরই জানিবার কথা যে, বাঙলা সাহিত্যে নবযুগের প্রেরণা পশ্চিম হইতে নূতন আমদানি করা হয় নাই। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণে এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে দেবদেবীর মহিমাকীর্তনের পাশে পাশে যে মানবিক সুরটি অস্পষ্টভাবে অনুরণিত হইতেছিল তাহা পরবর্তীকালের কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারদের গানে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সভ্যতার প্রভাবে স্পষ্টতমরূপে মাইকেল মধুসূদনের রচনায় আত্মপ্রকাশ করিল। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—বাঙলা কাব্য কুঞ্জের পিকোপম চণ্ডীদাসের কণ্ঠনিঃসৃত এই বাণীই নবযুগের সাহিত্যিক আদর্শরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারেরা ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী কবি। তাঁহাদের রচিত আগমনী এবং বিজয়াসংগীতে মানবিক সুরটি প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং এইগুণেই গানগুলি চিরকালই বাঙলার দরদী মানুষের নিকট প্রিয় ও সমাদৃত হইতেছে। বাৎসল্যরসের প্রেরণায় অভিভূত হইয়া কবিওয়ালা এবং পাঁচালিকারেরা জগজ্জননীকে মায়ের আসন হইতে নামাইয়া মেয়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই গানগুলি পুরাতন বাঙ্‌লার সমাজের নিরক্ষর পল্লীবাসীদিগকে যুগপৎ আনন্দ এবং শিক্ষা দিয়াছিল। আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি তৎকালীন বাঙলার গার্হস্থ্যজীবনের হর্ষবিষাদময় কাহিনী হইতে সংগৃহীত উপাদানে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্‌লার সমাজ ও গার্হস্থ্যজীবনের বিশেষতঃ বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, কন্যার পিতৃগৃহে আগমন ও পতিগৃহে প্রত্যাবর্তনের চিত্র এইগানগুলিতে বাস্তব ও প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে! কোথায়ও কৃত্রিমতার আবরণ ও কৃত্রিম আভরণের চিহ্নমাত্র পরিদৃষ্ট হয় না। পৌরাণিক পরিকল্পনার সহিত বাঙলার জননীর বৎসলতা মিশাইয়া স্বকীয় প্রতিভার সাহায্যে বাঙলার গার্হস্থ্যচিত্রের অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া এই গানগুলির সার্থক রূপদান করা হইয়াছিল। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথিরায় প্রভৃতি আগমনী ও বিজয়াসংগীত রচয়িতাদের উদ্ধৃতি আলোচনা করিয়া উল্লিখিত মন্তব্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙলার তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল বাল্যবিবাহ। সংসারানভিজ্ঞা কিশোরী তনয়াকে পতিগৃহে বিদায় দিয়া বাঙালী জননী কখনও সজলনয়নে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন, কখনও বা নিশীথরাত্রে স্নেহের দুলালীকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া অশ্রুজলে শয্যাপ্রান্ত সিক্ত করিতেন। এই গার্হস্থ্যচিত্রেরই ছায়া অবলম্বনে রচিত হইয়াছে আগমনী গানের ভূমিকা। শরৎকালের রাত্রিশেষে মাতা মেনকা রাজকন্যা, অধুনা শিবের গৃহিণী উমাকে স্বপ্নে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়েন,—

"আমি কি হেরিলাম নিশিস্বপনে
গিরিরাজ! অচেতনে কতনা ঘুমাও হে॥
এই এখুনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা
গেল হে।"
(কমলাকান্ত)

তনয়াবিশ্লেষের ব্যথায় ব্যথিতহৃদয়া বঙ্গজননীর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতীত হয়, আসে বৎসর। বৎসরান্তে অন্ততঃ একবার কন্যাকে পিতৃগৃহে আনিতেই হইবে—ইহা লইয়া পিতামাতার মধ্যে সাময়িক কলহও সংঘটিত হয়। অবশেষে কন্যাকে আনিবার জন্য মাতা পিতার নিকট জানান কাতর প্রার্থনা। এই চিত্রের প্রতিচ্ছবি আগমনী-গানেও চিত্রিত হইয়াছে। সংবৎসরান্তে উমাকে

জামাতার গৃহ হইতে আনিতে হইবে—এই বিষয় লইয়া গিরিরাজ ও মেনকার মধ্যে ঝগড়া বাধে। স্নেহাভিভূত মাতা মেনকা দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের যাতনায় কাতর হইয়া উমাকে আনিবার জন্য অনুরোধ করেন গিরিরাজকে। কিন্তু পিতৃহৃদয়ের জ্ঞানা-লোকে উদ্ভাসিত বাঙালী পিতা যেমন তনয়াবিরহ-কাতর জননীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন, তদ্রূপ গিরিরাজ ও বিরহবিহ্বলা মেনকাকে বুঝাইয়া বলেন —"কন্যা আমার স্বামীর সহিত পরমসুখে আছে, সুতরাং মনকে সান্ত্বনা দাও, ধৈর্যহারা হইওনা।" কিন্তু মায়ের প্রাণ শুধু কথায় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে কি? কন্যা বিত্তশালী স্বামীর হস্তে পরিলেও যে মায়ের হৃদয় অকারণ অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থির হইয়া পড়ে, দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও সতীনের সংসারে পড়িলে তাহা যে অধিকতর উদ্বেল হইয়া পড়িবে ইহা আর বিচিত্র কি। আগমনীগানে এই চিত্রেরও ছায়া সুপরিস্ফুটরূপে অংকিত হইয়াছে। জামাতা শিব একে তো নিঃস্ব, তদুপরি তিনি সতীন গঙ্গাকে মস্তকোপরি স্থান দিয়াছেন। জননী মেনকার চিত্ত তাই কন্যার অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া বিচলিত হইযা পড়ে।

"গিরিরাজ, ভিখারী সে শূলপাণি, তারে দিয়ে নন্দিনী,
আর না কখন মনে কর একবার।
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার॥"
(কমলাকান্ত)

কোমলপ্রাণা বঙ্গ-জননীর অশ্রুসজল করুণ প্রার্থনা যেমন কঠিনপ্রাণ পিতা উপেক্ষা করিতে পারেন না, তেমনই মেনকার মিনতি কঠিন গিরিজাকেও আর্দ্রপ্রাণ করিয়া তুলিয়াছে—তাঁহার অশ্রুজলের পুরস্কার মিলিয়াছে,—

"তখন গিরি যায়, আনিতে গিরিজায়।
দুনয়নে বহে বারি, বলে উমা আয়লো আয়॥"

প্রতিবেশীর মুখে কন্যার আগমনবার্তা শুনিয়া প্রতীক্ষমাণা বাঙালী মা আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারেন না। আলুলায়িতকুন্তলা বিস্রস্তবসনা জননী পথে অগ্রসর হইয়া যেমন আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়া কন্যাকে বরণ করিয়া লন, সেইরূপ আগমনীসংগীতে জননী মেনকাও—

"শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রানী,
বসন না সম্বরে।
গদ্‌গদ্ ভাবভরে ঝর ঝর আঁখি ঝরে
পাছে করি গিরিবরে
অমনি কাঁদে গলা ধরে॥"
(রামপ্রসাদ)

দীর্ঘবিচ্ছেদের পর মাতাকন্যার অশ্রুসিক্ত এই করুণ মিলনের মধ্যে সময়ের দীর্ঘব্যবধানের ভিতর একবারও তাহাকে পিতৃগৃহে আনিতে পাঠায় নাই বলিয়া অনুযোগ করিয়া কন্যা মাতার উপর অভিমান প্রকাশ করে এবং ইহাও জানাইয়া দিতে সে ভুলেনা যে, সে দুইদিনের জন্য আসিয়াছে এবং দুইদিন পরে চলিয়া যাইবে। মেনকা এবং উমার এই মান-অভিমানের চিত্রের ভিতর দিয়া তৎকালীন বাঙলার সাংসারিক চিত্রটি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"কই মেয়ে ব'লে আনতে গিয়েছিলে।
তোমার পাষাণপ্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ
জেনে, এলাম আপনা হতে।
গেলে নাকো নিতে,
রব না, যাব দুদিন গেলে॥"

পিত্রালয়ে কিছুদিন থাকিতে না থাকিতেই জামাতার ডাক আসিয়া পড়ে। তাহার উপর মাতাপিতার কোন জোর নাই। "অর্থোহি কন্যা পরকীয় এব।" বিবাহের পর কন্যা পর হইয়া যায়— এই কথা বাঙ্গালী মা বুঝিয়াও বুঝেন না। জননী মেনকার কথায় ও গার্হস্থ্যধর্মের এই করুণ ও মর্মান্তিক দিকটি ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।"
(রামপ্রসাদ)

দশমী তিথিতে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা কল্পনা করিয়া বাঙলার জননীর ন্যায় উমাজননী মেনকা অধীর হইয়া বলেন—

"আর তোরে পাঠাব না
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ কারু কথা শুন্‌ব না।
আমরা মায়ে ঝিয়ে কর্‌ব ঝগড়া
জামাই বলে মান্‌ব না।" (কবিরঞ্জন)

কিন্তু যতই ঝগড়া করুন না কেন কন্যাকে শেষপর্যন্ত পাঠাইতেই হয়, আর এই বিদায়ের প্রাক্কালে জননীর প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠে। মাতা মেনকা উমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—

"আমার প্রাণ উমা,
আজ কি যাবি গো কৈলাসপুরে।
আজ কি মা যাবি ছেড়ে হিমালয় শূন্য করে॥"

অনন্যোপায় হইয়া মাতা শেষে মনে মনে বলেন,— "ওরে নবমী-নিশি না হইও রে অবসান।" অথবা

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে॥"
(মধুসূদন)

কিন্তু মাতার কাতর প্রার্থনা ও মিনতিসত্ত্বেও নবমীর নিশি প্রভাত হয় এবং দশমী তিথিতে স্নেহের দুলালীকে বিদায় দিতে হয়।

আগমনী ও বিজয়াসংগীতের করুণ মানবিক আবেদন আজও বাঙালীর নিকট অব্যাহত রহিয়াছে। শরতের শিশিরসিক্ত সোনালী প্রভাতে শিউলিঝরা পল্লীপথ দিয়া পথিক যখন আপনমনে গাহিয়া চলে—"গা তোল, গা তোল মাগো, বাঁধো কুন্তল"—তখন কোন্ বাঙালী জননীর মন দূরদেশবাসিনী কন্যার মুখখানি দেখিবার জন্য ব্যাকুল না হয়? আবার বিজয়া দশমীতে কোন্ বাঙালী মা-ই বা আপন তনয়ার আসন্ন বিচ্ছেদ কল্পনা করিয়া অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত না করেন? বাঙলার গার্হস্থ্য-চিত্রের ছায়া অবলম্বনে রচিত এই গানগুলির প্রভাব বাঙলার গার্হস্থ্য জীবনে আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

ভারত ও ইন্দোনেশিয়া

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ এম্-এ, ডি-লিট্

জাভা ও বলীদ্বীপে গিয়েছিলাম ১৯২৪ সালে। আবার ত্রিশ বছর পরে সেদিন ইন্দোনেশিয়া পরিদর্শন করে ফিরলাম। ১৯২৭ সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐ দেশে গিয়েছিলেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি যে তথ্যপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী লেখেন তার নাম দেন "দ্বীপ-ময় ভারত।" অর্থাৎ সেখানে দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য যা কিছু তার বেশীর ভাগ ভারতীয় সভ্যতা—দ্বীপে দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। বিজয়ী ওলন্দাজগণ এ ব্যাখ্যা পছন্দ করবেন না এবং এখন স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার মানুষও ভারতের প্রভাব অতটা মানতে রাজী নন। তার কারণ আছে। হিন্দু বলীদ্বীপ ও লম্বক দ্বীপে আজও হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য) সভ্যতা—বহু প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে থাকলেও ভারতবাসীদের কাছ থেকে তারা সাহায্য কমই পায়। সংস্কৃত ভাষা তাদের দেবভাষা কিন্তু সে ভাষা শিখাবার উপযুক্ত হিন্দু শিক্ষক ও পাঠ্য-পুস্তকাদি পাঠাবার কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা এ পর্যন্ত

ভারতে করা হয়নি। অথচ পাকিস্তানীদের আবির্ভাব ও মসজিদ-নির্মাণাদি বলীদ্বীপে সুরু হয়েছে এবার দেখে এলাম। তার উপর ডলার-ছড়ান মার্কিন "টুরিষ্ট" দল ও খৃষ্টান মিশনারীরা ত আছেনই। ভারতীয় ব্যাপারী বলীদ্বীপে কম, (যবদ্বীপে ও সুমাত্রায় বেশী) তবু তাঁদের সাহায্যে একজন পাঞ্জাবী পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা ও মন্ত্রপাঠাদি বলীদ্বীপের ছেলেমেয়েদের শিখাচ্ছেন এবং ভারতের নেতাদের সাহায্যে ক্রমশঃ এক বৃহত্তর ভারত কেন্দ্র (নামকরণ হয়েছে "ভুবন সরস্বতী") গড়ে উঠবে এই আশা আছে। বলীর পেতাও বা পণ্ডিতবংশের এক ছাত্র শান্তিনিকেতনে' পাঠ শেষ করে দেশে ফেরেন এবং তাঁর ইচ্ছা আবার ভারতে এসে একটি বড় গ্রন্থ রচনা করেন। এই সব মানুষ ও নীরব কর্মীদের উৎসাহ দিয়ে এসে এবার মনে হল উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশবাসীদের এই আবেদন জানাই যে, তাঁরা সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকাদি সংগ্রহ করে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন; আর রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের কাছে প্রার্থনা যে, তাঁরা ইন্দোনেশিয়ায় (প্রথম রাজধানী জাকর্তা—Jakarta) কেন্দ্র স্থাপনের উৎসাহ দিন। জাকর্তা ও সুরবায়া প্রভৃতি সহরে বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী আছেন, তাঁদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে এবং সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশন এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই সেখানকার বিচক্ষণ এক কর্মীকে ইন্দোনেশিয়ায় পাঠালে কাজ হবেই—এ আশা রাখি। হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানাদি-শিক্ষায় বলীদ্বীপের হিন্দুদের বিশেষ আগ্রহ এবং গ্রামে গ্রামে মন্দিরগুলি কেন্দ্র করে পূজা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি—তাঁরা করে চলেছেন। এসব বিষয়ে ভালরকম গবেষণা করে প্রামাণ্য গ্রন্থাদি রচনা করতে পারেন এমন সুযোগ্য যুবককর্মী যেমন পাঠান দরকার তেমনি সহানুভূতিশীল জনকল্যাণব্রতীদেরও পাঠান চাই। প্রায় ১০।১৫ লক্ষ হিন্দু এ অঞ্চলে আছেন এটা মনে রেখে কাজে নামতে হবে।

কিন্তু কঠিন সমস্যাও আমাদের সামনে, সেটা চাপা দেওয়া চলবে না। পূর্ববঙ্গ যেমন (mass conversion এর ফলে) আজ পাকিস্তানের কুক্ষিগত, তেমনি বিরাট ইন্দোনেশিয়ার ৮৫ মিলিয়ন মানুষ সভ্যতায় হিন্দু হলেও ধর্মে প্রধানতঃ মুসলমান। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় masjumi নামে রাজনৈতিক দল গঠন করে ইসলাম রাষ্ট্র গঠন করতে প্রবল চেষ্টা করছে এবং প্রেসিডেণ্ট Soekarno-র ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ অতি সুস্পষ্ট। এই দল আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম রাষ্ট্র অনিবার্য। খৃষ্টান (সাদা ও অ-সাদা) কয়েক লক্ষ মাত্র—তাঁরাও প্রটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক্ দলে বিভক্ত—সুতরাং দুর্বল। পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধ-মন্দির Borobudur মধ্য জাভার মধ্যমণি; এত বিরাট স্থাপত্য ও অনুপম ভাস্কর্যের নিদর্শন ভারতেই মেলে না। তাই জাভার জনসাধারণের মধ্যে বহু বৌদ্ধ যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা যেন ঐতিহাসিক পরিহাসের ফলে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ"। Census-বিভাগ তাদের বৌদ্ধ বলে না লিখিয়ে শতকরা ৯০ জনের মত "মুসলিম" বলে পরিচয় দেয়। অথচ এশিয়ার স্বাধীন বৌদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যথা বর্মা, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতির রাষ্ট্রদূতগণ এ বিষয়ে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদের প্রকাশ্যে বৌদ্ধ বলে Census এ নাম তুলতে সাহায্য করতে পারেন। তাঁদের মধ্যে সিংহল ও বর্মার দূত, স্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে মিলে Borobudur মন্দিরে বুদ্ধ জন্মতিথি বৈশাখে পালন করতে সুরু করেন; সে ত বহু শতাব্দী পরে—গত দুই বছর পালিত হচ্ছে। কিন্তু স্থায়ী বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শাক্যমুনির ২৫০০ বর্ষ-পূর্তি উৎসবের আয়োজন অবিলম্বে করা উচিত। ব্রহ্মদেশ শ্যাম-কাম্বোজ সিংহল প্রভৃতি দেশে বহু অর্থব্যয়ে উৎসবের আয়োজন হয়েছে—এখন ইন্দোনেশিয়ায় বৌদ্ধ কেন্দ্র স্থাপন করে Borobudur

মন্দিরে উৎসবাদির জন্য ভারত থেকে তীর্থযাত্রী নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা উচিত। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি (Bengal Buddhist Association, 1, Buddhist Temple Road, Bowbazar P.O.) সম্প্রতি এই মর্মে প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। এই শুভ প্রচেষ্টায় দেশবাসীদের পূর্ণ সহযোগ দিতে অনুরোধ করি। কারণ উদারনৈতিক রাষ্ট্রপাল Soekarno এ বিষয়ে তাঁর যথাসাধ্য সাহায্য দান করবেন ; তিনি গত ডিসেম্বর মাসে Prambanan এর বিরাট শৈব মন্দিরটির পুনর্নির্মাণের পর উদ্বোধন করেন। এবার মধ্য জাভার সেই মন্দির দেখে এলাম—এরই ভিত্তিগাত্রে আগাগোড়া রামায়ণের প্রস্তর-খোদিত চিত্রাবলী হাজার বছর আগে (৯ম শতকে) রচিত হয়েছিল। ভাস্কর্য শিল্পে সেগুলি অতুলনীয়—ভারতের কোন মন্দিরেই এমন অপূর্ব রামায়ণ চিত্র মেলে না। শিব মন্দির ছাড়া ব্রহ্মা বিষ্ণু দুর্গা নন্দী প্রভৃতির মন্দির ধ্বংসপ্রায়—সেগুলির সংস্কারাদির ব্যবস্থা শীঘ্র হওয়া উচিত—যদিও সেকাজ বহু ব্যয়সাপেক্ষ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ (Archaeological Survey) থেকে আমরা কতটুকু সাহচর্য করতে পারি সেটাও ভাবা দরকার। এক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার শিল্পীদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে হয়ত ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নূতন প্রাণ ও প্রেরণা লাভ করবে। সিংহশারীর যে মন্দির আমাদের কোনার্কের সমকালীন, সেই মন্দির—Surebaya থেকে এবার দেখলাম। মনে পড়ে গেল বুদ্ধের অধ্যাত্ম জননী প্রজ্ঞাপারমিতার প্রস্তরমূর্তি এখান থেকে সরিয়ে ডাচ্ কর্তারা Leyden চিত্রশালায় রেখেছেন (হলণ্ড ভ্রমণের সময় দেখে এসেছি)। সেই অপূর্ব মূর্তিখানি স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ায় ফেরৎ পাঠাবার দাবী করা উচিত—যেমন ইংলণ্ড ভারতে ফেরৎ দিয়েছেন বুদ্ধশিষ্য শারীপুত্র ও মোগ্গলায়নের "শরীর"। স্থাপত্য ভাস্কর্য ছাড়া সংগীত নাট্য নৃত্যাদি লোক-সংস্কৃতির কত অমূল্য উপাদান আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে প্রায় ১৫০০ বছর ধরে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মানুষ সমধর্মী ও সহকর্মীরূপে কাজ করে এসেছে—সে যেন এক অলিখিত মহাকাব্য। শূরকর্তা ও যোগ্যকর্তার সুলতান মহোদয়দ্বয় ১৯২৪ সালে আমাকে তাঁদের অতিথি করে যে রামায়ণ মহাভারতাদির অভিনয় দেখিয়েছিলেন তা' জীবনে ভুলতে পারব না। প্রতি বৎসর তাই ভারতীয় বন্ধুদের অনুরোধ করি 'বিলাত-ভ্রমণ' কিছুদিন স্থগিত রেখে ইন্দোনেশিয়া—তথা এশিয়ার দেশগুলি পরিদর্শন করে কৃতার্থ হোন্। যাঁদের কাছে আমাদের নাড়ীর যোগ তাঁদের উপেক্ষা করে ভুলে থেকে হিন্দুজাতি ও সভ্যতার ভিত্তি শিথিল হয়েছে—সেটি সত্য ও সুদৃঢ় করতে যেন পরাঙ্মুখ আমরা না হই। ভারতের বাইরে ৫০ লক্ষ নরনারী "বৃহত্তর ভারত"-পরিবারের অন্তর্গত, এ ঐতিহাসিক চেতনা জাগ্রত হোক এই শেষ নিবেদন।

সাম্প্রদায়িক ঐক্যের গোড়ার কথা

অধ্যাপক রেজাউল করীম, এম্-এ, বি-এল্

"যত মত তত পথ"—রামকৃষ্ণদেবের এই কথাটি আজিকার যুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আদর্শ। ইহা ধর্মমতের উদারতা সম্বন্ধে চরম ঘোষণা। আজ মনে হইতে পারে যে ইহা কি এমন মহান্ শিক্ষা যাহাকে বিপ্লবাত্মক বলিয়া স্বীকার করিব? কিন্তু মধ্যযুগে বহুদেশের মানুষ ইহা স্বীকার করিতে চাহে নাই।

সে যুগে ধর্মের জন্য কত যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে। কত নিরীহ মানুষকে ধর্মান্ধতার যূপকাষ্ঠে বলিদান করিতে হইয়াছে। আজ ভারতবর্ষে নানা ধর্ম-সম্প্রদায় বসবাস করে। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে সাম্প্রদায়িক কলহ প্রায়ই হইত। স্বাধীনতার পরেও সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। সুতরাং, আজ স্বাধীন ভারতের সম্মুখে রামকৃষ্ণদেবের ঐ বাণীটি উদারতার সমুন্নত বাণী। আজ বিনা দ্বিধায় তাঁর এই অমর বাণী গ্রহণ করিতে হইবে। সব ধর্মই ভাল। সব ধর্মেই মুক্তি আছে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের অনুবর্তীগণ অনুদার ভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। তাই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, উহারা বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা এমন পথ ধরিয়া চলিয়াছিল যে, তাহাতে মনে হইত যে, ইহাই বুঝি চিরন্তন ব্যবস্থা। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব ও রেশারেশি চিরন্তন ব্যবস্থা হইতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব যে আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন তাহা সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

আজ রাজনীতি ভারতের হিন্দু মুসলমানকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, রাজনৈতিক পার্থক্য একেবারেই কৃত্রিম। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া বিবাদ হয়, আবার তাহা মিটিয়াও যায়। তাহা চিরকাল জাগিয়া থাকে না। তেমনি একই দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হইয়া থাকে। দেশে আরও নানা কারণে দলাদলি হইয়া থাকে। কিন্তু এইসব ঝগড়া বিবাদ সাময়িক ব্যপার, চিরন্তন ব্যবস্থা নয়। এইসব তিক্ততার অন্তরালে প্রবাহিত হইতে থাকে একটা মানবিকতা, একটা ঐক্যের ধারা। আর এই ঐক্যধারাই চিরকালের বস্তু। এইটি ধরিতে পারিলে সব ভেদজ্ঞান ও কলহ দূর হইয়া যায়।

বাস্তবিকই রাজনীতি হইতেছে একটা পথ, পথের শেষও নহে, উদ্দেশ্যও নহে। আমাদের পূর্বতন নেতারা ও দেশকর্মিগণ এই রাজনীতির মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনীতি জীবনের সর্বস্ব নহে। রাজনীতিরও গভীরে যে ধর্মীয় আদর্শ আছে তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি আমরা একটা সুগঠিত জাতি গঠন করিতে চাই, তবে রাজনৈতিক দাবীদাওয়া অতিক্রম করিয়া আরও গভীর দেশে প্রবেশ করিতে হইবে। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব হইতে সত্যকার মিলনের ভিত্তি রচিত হইবে। প্রত্যেকটি ধর্মসম্প্রদায় তাহার নিজের যে সব মৌলিক আদর্শ, বিশ্বাস ও ধারণাকে প্রিয় মনে করে অপর ধর্মসম্প্রদায়কে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে হইবে। এই ভাবে যখন ধর্মগত বিদ্বেষ দূর হইবে, তখন সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে খাঁটি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর "যত মত তত পথ" শিক্ষার দ্বারা এই কথাটার উপরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। এযুগে তিনিই সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক।

সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের রাজনৈতিক সমাধান করিতে চাওয়া অর্থে গোড়া কাটিয়া ডালের অগ্রভাগে জল দিয়া চারাটিকে বাঁচাইতে যাওয়া। ইংরেজ আমলের কিছুদিন হইতেই আমাদের দেশের অনেকের মনে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধটা তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমানগণ স্বতন্ত্র জাতি এই থিওরীর উপর আমরা জোর দিয়াছিলাম। স্বতন্ত্রভাবে সাম্প্রদায়িক দল উপদল গঠনের চেষ্টা করিয়া ছিলাম। এইভাবে আশা করা গিয়াছিল যে, এই স্বাতন্ত্র্যবোধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিবে, কিন্তু আমরা এই পথে শক্তি সঞ্চয় করিতে গিয়া আরও নানাবিধ উপসর্গ সৃষ্টি করিয়াছি—যাহার পরিণতি ভারত-বিভাগ। সাংস্কৃতিক দিক দিয়া আমরা যদি

প্রথম হইতে সৌহার্দ্য ও মিলনের কথা চিন্তা করিতাম তবে এ দুর্গতি হইত না। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্ম গঠন কর্মকে Revivalism বলা চলে না। Revivalism একটা অনুদার প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐক্য গঠনের কর্মপরিক্রমা বিপ্লবাত্মক আদর্শ—ইহা মানুষের মনকে অগ্রগতির পথে লইয়া যায়, পশ্চাতের দিকে নহে।

সাতশত বৎসর ধরিয়া ভারতের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভিন্ন সাধকের সাধনার ফলে যে সাংস্কৃতিক মিলন ধীরে ধীরে হইয়া আসিতেছে, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হইতেছে সেইসব ঘটনা ও বিষয়কে লোক সমাজের নিকট তুলিয়া ধরা। বৃটিশ আমলে তাহা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এখন এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। আমরা যদি তাহা না করি, অথবা তাহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি তবে তাহা নিতান্ত ভুল হইবে। পাঠান মোগল যুগের শিল্পী কবি সাধকগণের প্রভাবে যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল, সেগুলিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে নূতন করিয়া উদ্ধার করিতে হইবে। সেই যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাকে লইয়া কবিতা, নাটক, উপন্যাস রচনা করিতে হইবে। কিন্তু এ সবের মধ্যে থাকা চাই একটা সহানুভূতি ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ।

স্থায়ী ভিত্তির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে হইলে সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শকে গ্রহণ করিতে হইবে। বিভেদকারী উপাদান যতদূর সম্ভব বর্জন করা প্রয়োজন। সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন চাই। ভারতের বৈশিষ্ট্য এই যে, ভারতবর্ষ সকল মতের সঙ্গে আপস করিতে জানে। রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বলিয়াছেন, "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।" অন্য কোন দেশে এই আপস (adjustment) এর ব্যবস্থা নাই। অতীত কালে আর্য অনার্য দ্রাবিড় হুন শক, গ্রীক প্রভৃতি কালচারকে ভারত আপন উদার বক্ষে ধারণ করিয়াছে। শুধু ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই। সবই ভারতের এক দেহে লীন হইয়া গিয়াছে। মধ্যযুগে যাহারা বিদেশ হইতে আসিয়াছে, যেমন—পাঠান মোগল তুর্কি প্রভৃতি জাতি—তাহারাও ভারতের সহিত এক হইয়া এমন কালচার সৃষ্টি করিয়াছে যাহার অস্তিত্ব আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই যে কালচারের সমন্বয় ইহা ভারতীয় সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য কালচারকে ভারতবর্ষ একেবারে বর্জন করে নাই। স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের শাসন-তন্ত্রে পাশ্চাত্য কালচারের নিদর্শন চিরকালের ছাপ মারিয়া দিয়াছে। এই সব সাংস্কৃতিক নিদর্শনকে বর্জনে কৃতিত্ব নাই—কৃতিত্ব আছে ইহাদের সমন্বয়ে নূতন ভারত রচনায়। আমাদের সম্মুখে বৃহত্তর ও কঠিনতর দায়িত্ব আসিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কাজ আরম্ভ হইয়াছে তাহাকেই পূর্ণ পরিণতির দিকে লইয়া যাওয়াই আমাদের যুগের প্রধান কাজ। ইহাতে আমাদের ভারতীয়ত্ব নষ্ট হইবে না, বরং বৃহত্তর ভারতের ভিত্তি রচিত হইবে।

এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়কে পূর্ণ রূপ দিবার জন্য আজ ভারতের সম্মুখে মাহেন্দ্র ক্ষণ উপস্থিত। ভারত বিভক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তবুও আজ ভারত যেরূপ সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত পূর্বে কখনও সেরূপ ছিল না। উত্তরে হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত এই যে বিরাট ভূভাগ যাহা একই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্গত, এরূপ সুগঠিত ভারত পূর্বে ছিল না। আজ এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশের, উত্তর হইতে দক্ষিণের দূরত্ব হ্রাস পাইয়াছে। সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক জাতীয়তার ভাব জাগ্রত হইয়াছে —একই শাসনতন্ত্রের অধীনে একই সিভিক আইন

অনুসারে সকলেই নিয়ন্ত্রিত। আজ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত নহে। একদেশ হইতে অপর দেশের যাতায়াতের পথ সহজ ও নিরাপদ হইয়াছে। বিজ্ঞান ভারতবর্ষকে সমগ্র জগতের সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া দিতে প্রস্তুত। ভারতের সহিত নিখিল বিশ্বের মানসিক সংযোগ স্থাপিত হইতেছে। আজ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় একই বিদ্যালয়ে একই ধরনের পাঠ্য পুস্তক পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে। ভারতীয় ভাষা হিন্দী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাইয়াছে। এই এক ভাষা সমগ্র ভারতকে এক করিতে সাহায্য করিতেছে। চতুর্দিকের আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ সকল মানুষের মনকে সমানভাবে দোলাইয়া দিতেছে। সামাজিক সুবিচার সম্বন্ধে সকলেই একই ভাবধারার বশবর্তী। গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সমগ্র দেশের উপর একটা নবজীবনের স্পন্দন আনিয়া দিয়াছে। নূতন সমাজব্যবস্থার রচনার ইহাই উপযুক্ত সময়। সমগ্র এসিয়া, সমগ্র জগত ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া আছে এই নবযুগের নূতন পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ কি করে তাহাই দেখিবার জন্য। সকল সম্প্রদায়কে লইয়া সকলের সমন্বয়ে নূতন ভারতবর্ষ গড়িতে হইবে।

এই সম্মিলিত ভারতের আদর্শ রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহামানবগণ নিজেদের জীবন-দর্শন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমাদের চোখের সামনে গান্ধীজী তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে কয়েকবারই উপবাস ব্রত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে জীবনদান করিতে হইল। কিন্তু তবুও দেশবিভাগ বন্ধ হইল না। সাম্প্রদায়িক প্রীতিও আশানুরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল না। এইরূপ ব্যর্থতার কারণ কি? সমস্যা সমাধানের জন্য আগ্রহের কোন অভাব হয় নাই। অভাব ছিল পদ্ধতির। যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে প্রীতির পথের সকল বাধা দূর হইতে পারে সে পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই। বিভেদের কারণগুলি দূর না করিয়া কেবল রাজনৈতিক আপস রফার দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। যদি পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও অবিশ্বাস থাকে, একে অপরকে যদি ভাল করিয়া চিনিতে না পারে তবে কিছুই হইবে না। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলাইতে হইবে। রাজনৈতিক নেতাগণ রাজনৈতিক পদ্ধতির দ্বারা যাহা পারেন নাই সাংস্কৃতিক আবেদন দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে। আমাদের রাজনৈতিক নেতাগণ এদেশের অতীত ইতিহাসের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের আদর্শ সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। এই যে যুগ যুগ ধরিয়া ভারতে সংস্কৃতি-সমন্বয় হইয়া আসিতেছে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাহার কি গুরুত্ব ও মূল্য থাকিতে পারে সে সম্বন্ধে বেশী চিন্তা করেন নাই। আর একদল লোক আছেন যাঁহারা পুরাতন সংস্কৃতিকে উদ্ধার করিতে চান। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাঁহারা সংস্কৃতির নামে সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির কথাই বুঝেন। একদিকে রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতার দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া সংস্কৃতি-সমন্বয়কে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই, আবার অপরদিকে প্রাচীন সংস্কৃতির নামে রক্ষণশীলগণ সংস্কৃতিকে একটা সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের দৃঢ়ভিত্তির উপরই স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

এখন দরকার হইয়াছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করা। সাংস্কৃতিক বোঝাপড়াই পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আনয়ন করিতে পারিবে। সেই মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইবে সর্বাগ্রে। ভারতে

রামকৃষ্ণমিশনের কর্মিগণ সর্বধর্মসমন্বয়ের যে আদর্শ প্রচার করেন তাহা জাতীয় ঐক্যের সহায়ক। আমাদের এই স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, Race, ধর্ম, সম্প্রদায় সবই রহিয়াছে। সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের সকলের স্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করিয়া কোন লাভ নাই। বরং ইহাদের সকলকেই সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেককে তাহার সংস্কৃতির উন্নতি ও বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। এই সবকে একীভূত করিবার জন্য আধ্যাত্মিক পন্থা অবলম্বনের দরকার। ভারতে সাধারণ ঐতিহ্য আছে যাহা সহস্র বৎসর ধরিয়া নানা জনের নানা চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে। সাধারণ উৎসব পালপার্বণ আছে যাহা এক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। বহু ঐতিহাসিক নজীর আছে যাহা সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি। হিন্দুমুসলমান মিলিত হইয়া দেশের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে এবং একত্র হইয়া সকলের সাধারণ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছে। সম্রাট আকবর হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা রামমোহনের সময় পর্যন্ত বহু বিষয়ে এই দুই সম্প্রদায় একই ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কাজ করিয়াছে। আর রামানুজ, দাদু, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ সাধকগণ কত উদার-ভাবে সমন্বয় ও ঐক্যের আদর্শকে রূপ দিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশে যে মাতৃভাষাকে হিন্দু মুসলমান সমভাবেই সেবা করিয়াছে ও ব্যবহার করিয়াছে তাহা উভয় সম্প্রদায় দ্বারা পুষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। পাঞ্জাবী, হিন্দী, উর্দু, বাঙ্গলা, আসামী ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু এইসব ভাষা সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রধান বাহন। একই ভাষা আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধকে অনেকটা দূর করিয়াছে ও একই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের মানসিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করিয়াছে। এইসব ঐক্যের উপাদানের উপর জোর দিতে হইবে। সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের চরিত্রকে সহানুভূতির ভাব লইয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

সুতরাং সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সমন্বয়ের আদর্শের ভিত্তির উপর আবার আমাদের সাধারণ কালচার বা সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। উপরোক্ত মহাসাধকগণ একদিক দিয়া বৈপ্লবিক ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ট্রাডিসনের নামে অতীত-পূজার মোহ ছিলনা। তাঁহারা নিজেদের বৈপ্লবিক আদর্শসম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহারা উন্নত জীবনের মহৎ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। গতানুগতিকতার মোহ তাঁহাদিগকে পাইয়া বসে নাই। ক্ষুদ্রতা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। তাঁহারা জীবনকে পৃথকভাবে দেখেন নাই। তাঁহাদের মতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক—সবই ছিল একটা বেগবান জীবনবোধের বিকাশ। তাই দেখি যে পণ্ডিত ও মৌলবী অপেক্ষা তাঁহারাই সমাজের মধ্যে সাম্য মৈত্রী ও চেতনার ভাব জাগাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ভাবাদর্শের জন্য আবুল ফজল মহাভারতের ফার্সি অনুবাদের ভূমিকায় বলিয়াছিলেন: "সত্য অনুসন্ধান করিতে হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থগুলি অপর সম্প্রদায়ের পাঠ করা উচিত। তাহা হইলে মিথ্যা ধারণা দূর হইবে, নৈকট্য স্থাপিত হইবে এবং সত্যসন্ধানে অগ্রসর হইবে। তাহারা যখন পরস্পরের ভালমন্দ গুণাগুণ দেখিতে পাইবে তখন আপনা হইতেই তাহাদের মনে উদারতার ভাব জাগ্রত হইবে।" আর এই ভাবাদর্শের ফলেই সে যুগের বহু হিন্দুসাধক ও মুসলমান অপরাপর ধর্মসম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। পরস্পরকে ভালভাবে বুঝিতে হইবে—সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ইহাই বড় কথা। এই উপলব্ধির অভাবে সমস্ত রাজনৈতিক আপস-ব্যবস্থা পণ্ড হইয়া যাইবে। যদি এই আদর্শ অনুসারে আজিকার মুসলমানগণ গীতা

উপনিষদ্ পাঠ করে এবং হিন্দুগণ কোরআন, হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে তবে তাহাদের অনেক ভ্রম দূর হইবে—মুসলমান দেখিবে যে হিন্দুধর্ম ইসলামের মূলনীতির বিরোধী নহে। আর হিন্দুও বুঝিবে যে ইসলামের সহিত তাহাদের ধর্মের বিশেষ পার্থক্য নাই। এই ভাবে এমন একটা সাংস্কৃতিক সমন্বয় হইবে যাহার ভিত্তি কিছুতেই শিথিল ও দুর্বল হইবে না।

আয় মা

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

সূর্যকরোজ্জ্বল শ্যামল ধরণীতল
শারদ জননি তোরে চায় মা !
ধানক্ষেতে ঢেউ তুলে, পুষ্পিত বনফুলে
হসিতা জগন্মাতা আয় মা !
শুভ্র মেঘের পালে আয়রে,
নিশিব শিশির—মৃদু বায় রে,
গুঞ্জিতা ভ্রমরের শোন্ তান গুঞ্জন,
ঐ শোন্ বিহঙ্গ গায় মা !
হসিতা জগন্মাতা আয় মা !

আসিয়াছে ভাই-বোন হেথা-হোথা অগণন
সদা আকুলিত হৃদি-চিত্ত,
নাই ধনী, নাই দীন,—মাতোয়ারা নিশিদিন
ঢালে জীবনের স্নেহ-বিত্ত।
আনন্দময়ী তুই তাই যে,
তুই বিনা গতি কিছু নাই যে,
আশা নাই, ভাষা নাই.—আছে শুধু অনশন—
দৈন্যের নিপীড়ন হায় মা !
হসিতা জগন্মাতা আয় মা !

ঐ নীল অম্বরে কত নীল রং ঝরে,
সুহাসিতা শ্যামলিতা পৃথ্বী,
দুল্ দুল্ কাশফুল, ঝুম্‌কা দোদুল দুল,
শেফালি-আঁচলে শোভে মূর্তি।
মন্দিরে বাজে মহাডঙ্কা
দূর করি' যত ভয়-শঙ্কা,
দিকে দিকে, আগমনী-আনন্দ-শিহরণ
শানা'য়ের শত সুরে গায় মা।
হসিতা জগন্মাতা আয় মা !

মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ীরূপে আয়,
আন প্রাণে আন্ দৃঢ় ভক্তি,
অস্ত্রের ঝঞ্চনা তোল্ তুই ঘোরাননা,
বাহুভরা দুর্জয় শক্তি।
শত্রুবিনাশে লভি' অংশ
শত্রুরে কর্ আজ ধ্বংস,
নৃত্যের তালে যাক্ ঘুচে পাপ-আচরণ,
জয় দে ! জয় দে'—আয় মা !
হসিতা জগন্মাতা আয় মা !

পল্লীর পৌষপার্বণের একটি চিত্র *

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

(বিশ্বভারতী)

পৌষপার্বণ তথা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি হিন্দুদের—বিশেষ করিয়া পল্লীবাসীদের নিকট একটি বিশেষ পবিত্র দিবস। মহাভারতে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপিতামহ দক্ষিণায়নে শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যু ভীষ্মের ইচ্ছাধীন ছিল; সেজন্য তিনি উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করিয়াছিলেন। "সূর্য যখন উত্তর দিকে গিয়ে সর্বলোক প্রতপ্ত করবেন, তখন আমার প্রিয় সুহৃদতুল্য প্রাণ ত্যাগ করব।" (মহাভারত—শ্রীরাজশেখর বসু) এই সংকল্প করিয়া তিনি যুদ্ধে পতিত হইয়াও শরশয্যায় বহুদিন বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি শরশয্যায় অবস্থান করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলাভের উপায় ও রাজ্যশাসন নীতি সম্পর্কে সারগর্ভ উপদেশ দান করিয়াছিলেন। উত্তরায়ণ সমাগত হওয়ার পর ভীষ্ম দেহরক্ষা করেন। পল্লীর হিন্দুরা আজও অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই পুণ্য দিবসটি উদ্‌যাপন করে।

ভীষ্মের দেহত্যাগে মাতা ভাগীরথী শোকে অধীর হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সরোদনা ভাগীরথীকে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন। আজও সেই পুণ্যদিবসে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব উপলক্ষে সাগরসঙ্গমে শত শত ধর্মপ্রাণ যাত্রীর বিপুল সমাগম হয়। সেখানে যাত্রীরা কপিল-মুনিও দর্শন করিয়া থাকেন। ভারতের সকল প্রান্ত হইতে বহু সাধু সন্ন্যাসী ও পুণ্যকামী স্নানার্থী সেখানে সমবেত হইয়া থাকেন।

"গীতগোবিন্দ"-রচয়িতা অমর বৈষ্ণবকবি জয়দেব গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে পৌষসংক্রান্তি দিবসে অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব নামক স্থানে বিরাট মেলা বসে। সেদিন শত সহস্র হিন্দু অজয় নদে প্রত্যূষে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ বোধ করে। প্রবাদ আছে, সেদিন অজয় নদেও গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। বাউল, কীর্তন ও অন্নসত্রের জন্য এই মেলা বিখ্যাত। আটশত বৎসর পূর্বে জয়দেব মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে দেশের রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্তু জয়দেবের মেলা প্রতিবৎসরই মহাসমারোহে আজও সংঘটিত হয়।

কেন্দুবিল্বের একাধিক মন্দিরে মর্মর শিলার উপর জয়দেব রচিত বিখ্যাত কবিতা—"স্মর-গরল-খণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্, দেহি পদপল্লবমুদারম্" ভক্তপ্রাণে আজও স্পন্দন জাগায়। কিংবদন্তি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই পদটি পূরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্ট জেলার একটি পল্লীতে আমার পিতৃগৃহ ছিল। ছেলেবেলায় আপন পল্লীতে পৌষপার্বণের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এ জীবনে সেরূপটি দেখিবার আশা নাই বলিলেও চলে। মাত্র কয়েক দশক পূর্বেও সেখানকার পল্লীর আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনস্রোত কতখানি বেগবান ছিল, হিন্দুর বার মাসের তের পার্বণ কত না জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইত, আর উৎসবসমূহকে কেন্দ্র করিয়া সেখানকার পল্লীর সামাজিক জীবন কতখানি স্পন্দিত হইত, তাহা অনভিজ্ঞের পক্ষে আজ অনুভব করা সহজ নয়। আজকাল শহরে নগরে সার্বজনীন পূজাপার্বণের রেওয়াজ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু পল্লী-উৎসবের সার্বজনীনত্ব প্রতিপন্ন করিবার

* এই প্রবন্ধে পরিবেশিত রেখাচিত্রগুলি আঁকিয়াছেন শ্রীসুখময় মিত্র।

জন্য বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন মোটেই হইত না। উৎসব সমাগমে সকলের প্রাণমন স্বতই আনন্দে নাচিয়া উঠিত। পল্লীজীবন এখন পারতপক্ষে কাহাকেও আকর্ষণ করে না, আর শ্রীহট্ট জেলার হিন্দুর প্রাচীন সাংস্কৃতিক জীবনও দ্রুত ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যে, নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরে যাঁহারা শহরে দেশান্তরে বাস করিতেন, তাঁহারাও উৎসব পর্বাদি উপলক্ষে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিতেন। পল্লীজীবন আনন্দমুখরিত হইয়া উঠিত।

শ্রীহট্ট জেলার যে অঞ্চলের কথা বলিতেছি, সেখানে বর্ষার জল নামিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান ফসল ধান কাটার কাজে পল্লীবাসী ব্যস্ত হইয়া উঠিত। বাড়ীর উঠান ও ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া উৎকৃষ্ট মাটিতে লেপন করিয়া করিয়া ধান রাখার উপযুক্ত করিয়া তুলিত। গোলা-ঘর মেরামত করিত। ধান কাটা শুরু হইলে, দিনের বেলা ধান কাটা, রাত্রিবেলা মাড়া দেওয়া, পরদিন রৌদ্রে ধান শুকানো, রাত্রিবেলা আবার মাড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজে গৃহস্থগণ বিশেষ ব্যস্ত থাকিত। এসকল রীতি ঐ অঞ্চলে এখনও বলবৎ আছে, কিন্তু নাই কেবল পল্লীজীবনের পূর্বেকার আনন্দের হিল্লোল।

অগ্রহায়ণে ধান উঠিয়া গেলে আর পৌষমাস সমাগত হইলেই পল্লীর ছেলেরা 'গুলী' বাহির করিত। বন্দুকের গুলী নয়, খেলার গুলী। সর্বজন প্রিয় গুলীখেলা সুরু হইলেই পৌষ সংক্রান্তির উৎসবের বাণী সকলের মনে পৌছিত। সংক্রান্তি দিবসের কর্মসূচী এইরূপ ছিল:—প্রাতঃস্নান, ভ্যাড়াঘর পোড়ানো, গুলীখেলা ও নগর সংকীর্তন। স্বতঃস্ফূর্ত সেই উৎসবের স্মৃতি আজও মনকে আলোড়িত করে।

শীতারম্ভে স্থানীয় কুমোরেরা হাঁড়ি পাতিলের সঙ্গে তিন হইতে চার ইঞ্চি পরিধির উৎকৃষ্ট মাটির গুলী তৈরি করিয়া রাখিয়া দিত। পল্লীর খেলোয়াড়ের দল ছিল এই গুলীর গ্রাহক। আধুনিক খেলার ন্যায় গুলী খেলার নিয়ম কানুন ছিল। যতজন খেলোয়াড়, ততগুলি গুলীর প্রয়োজন হইত। গুলীখেলার একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, সংখ্যায় যত খুশী লোক খেলায় যোগ দিতে পারিত। খেলোয়াড়ের দল সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রতিযোগিতা করিত। বিজোড় অর্থাৎ অতিরিক্ত খেলোয়াড় মাঠে উপস্থিত থাকিলে তাহাকেও বাদ দেওয়া হইত না। তাহাকে উভয় পক্ষেই খেলিতে দেওয়া হইত। মুদ্রা-নিক্ষেপ,—মুদ্রার অভাবে হাঁড়ি পাতিলের ভাঙ্গা টুকরা নিক্ষেপ করিয়া কোন্ দল প্রথম খেলিবে, তাহা স্থিরীকৃত হইত।

সমকোণী লম্বাকৃতি চতুর্ভুজ ক্ষেত্র খেলার স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। লম্বা ও চওড়া নির্ভর করিত উপযুক্ত ভূমির উপর। নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে একদিকে মাটির উপর একটি চৌকোণ চার পাঁচ ইঞ্চি বাহু বিশিষ্ট ঘর আঁকা হইত। ইহাতে দ্বিতীয় দলের গুলী বিশেষ আকারে স্থাপন করা হইত। সীমানার বিপরীত রেখার উপর দাঁড়াইয়া প্রথম দলের খেলোয়াড়েরা পর্যায়ক্রমে নিজেদের গুলী ছুড়িত। এই গুলী ছোড়াকে "গুলী গাওয়া" বলা হইত। গুলী গাওয়ার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকিত দ্বিতীয় দলের গুলী ঘরের যথাসম্ভব নিকটে যাওয়া। গাওয়া গুলী স্থির হইলে একই পর্যায়ে বসিয়া দ্বিতীয় দলের গুলিকে মারিতে হইত। এইভাবে গুলী মারিয়া নির্দিষ্ট সীমানা পার করিতে পারিলে "গোল্লা" হইত। গোল্লাকে আজকালকার ভাষায় পয়েণ্ট বলা যাইতে পারে। গুলী খেলার বহু বিধি ও অনুশাসন ছিল; যেমন এক পক্ষের এক জনের গুলী অন্য পক্ষের কোন গুলীর অতি নিকটে চারি আঙ্গুল মধ্যে অবস্থান করিলে "ব" বলা হইত। একবার 'ব' হইলে ইহা ভাঙ্গিবার বিধি ছিল। 'ব' না ভাঙ্গিয়া খেলা চলিত না। বিপক্ষদলের মারা

গুলী সীমানার নিকটে আসিয়া থামিলে "যাদ্দু" অথবা "চুম্‌কা" হইত। গুলীর স্থান হইতে জোড়পায়ে লম্ফ দিয়া সীমানায় পৌঁছিলে যাদ্দু হইত। যাদ্দুর গুলী মারিতে হইলে দুই পায়ের গোড়ালির মধ্যে গুলী রাখিয়া 'গুলী গাহিতে' হইত। চুমকা স্থিরীকৃত হইত অন্যভাবে। চুম্‌কার গুলী মারিতে হইত খেলার মাঠের বিপরীত দিক হইতে এবং তাহা প্রায় কঠিন হইত। গুলী গাহিবার সময় বিশেষ কবিতা ব্যবহার করা হইত। যেমন—"গুলীরে ভাই, ঘরের কাছে যাইতে চাই।" গুলী মারিয়া ভাঙ্গিতে পারিলে অমনিই একটা পয়েন্ট হইত। কোন কোন খেলোয়াড় বিপক্ষের গুলী ভাঙ্গিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিতেন। পল্লীর বয়োবৃদ্ধেরা খেলার মাঠে উপস্থিত থাকিয়া খেলোয়াড়দিগকে উৎসাহ দান করিতেন। খেলার নিয়মে কোন সঙ্কট দেখা দিলে বয়োবৃদ্ধেরা তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। পৌষসংক্রান্তি দিবসে গুলীখেলা চরম পর্যায়ে পৌঁছিত। সেদিনকার খেলার জন্য প্রচুর নূতন গুলী আমদানি করা হইত। বয়োবৃদ্ধেরাও সেদিন খেলার উৎসবে যোগ দিতেন।

সংক্রান্তির পর গুলীর মরসুম শেষ হইয়া যাইত। গুলীর মালিকেরা মৃত্তিকামধ্যে গুলী পুতিয়া রাখিতেন। ইহাতে নাকি গুলী শক্ত থাকিত। আবার পর বৎসর পৌষমাস সমাগত হইলেই পুরাণ গুলী মাটির নীচ হইতে বাহির করিয়া খেলা আরম্ভ করা হইত। গুলীখেলা এখনও হয়ত কোন কোন পল্লীতে বাঁচিয়া আছে কিন্তু, সংক্রান্তির গুলীখেলার উৎসবে ভাটা পড়িয়াছে।

ভ্যাড়াঘর পোড়ানোর প্রথাও সেই অঞ্চলে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ কখন ভ্যাড়াঘর-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা জানা সহজ নয়। উত্তরায়ণ-সমাগমে অগ্নিদ্বারা আলোকের আহ্বান বা শীতাবসান ঘোষণা করাই হয়ত ভ্যাড়াঘর পোড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল। ঋতু-উৎসব বহুদেশেই বিদ্যমান দেখা যায়। স্কান্‌ডিনাভীয় দেশসমূহে 'লুৎসিয়া' উৎসব অনেকটা এই ধরনের বলিয়া মনে হইয়াছে। বাঁশের খুঁটি ও ঠাট এবং ন্যাড়ার ছাউনি ও বেড়া দ্বারা ভ্যাড়াঘর নির্মিত হইত। আমাদের জলাদেশের ধানগাছ স্বভাবতই বড় হইয়া থাকে। বর্ষার জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানগাছও যেন সাঁতার কাটে। ধান কাটার পর গাছের যে অংশ (বৃহত্তম নিম্নাংশ) ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে, তাহাই ন্যাড়া নামে অভিহিত হয়। ধানসিদ্ধ করিবার জন্য কৃষকেরা জ্বালানিরূপে ন্যাড়া ব্যবহার করিয়া থাকে। খড়ের অভাবে অসমর্থেরা ঘরের চালেও ন্যাড়া ব্যবহার করে। ভ্যাড়াঘরের জন্য পল্লীর যুবকদল প্রচুর ন্যাড়া সংগ্রহ করিত।

সংক্রান্তির পূর্বদিবস প্রতিঘরেই অসাধারণ কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিত। নারীরা বাসনপত্র বিশেষভাবে পরিষ্কার করিতেন, ঘরদোর ঝাড়িয়া মুছিয়া নিকাইয়া তকতকে করা হইত। উঠান ও তুলসীতলা নিকাইয়া উৎসবের জন্য প্রস্তুত করা হইত। পুরাতন রান্নার মাটির বাসন ফেলিয়া নূতন বাসন সেদিন ব্যবহার করা হইত।

ভ্যাড়াঘর নির্মাণে ও গুলীখেলার মাঠ পরিষ্করণে তরুণ ও যুবকদের দল সংক্রান্তির পূর্বদিবসে মাতিয়া উঠিত। পল্লীবাসীর বাঁশঝাড় হইতে ঘনগাঁটবিশিষ্ট কাঁচা বাঁশ কাটিয়া আনা হইত। কেহ কেহ 'মুক্তা' সংগ্রহ করিত। মুক্তা একজাতীয় বেতগাছ—আমাদের অঞ্চলে জলাভূমির নিকটে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। বাঁশ-মুক্তা-সংগ্রহ ও গুলীখেলার মাঠের পরিষ্করণ স্নানের পূর্বেই সারিয়া ফেলা হইত। স্নানাহারের পর আবার সকলে কাজে মত্ত হইয়া উঠিত। কেহ দা লইয়া বাঁশ কাটিত, কেহ বা বাঁশ 'কান্তাইত'—(খুঁটির মাথা V আকারে কাটাকে বাঁশ কান্তান বলা হয়),—যাহাতে মারুলের বাঁশ বসিতে পারে। কেহ খন্তা দ্বারা খুঁটির উপযোগী গর্ত করিত। বাঁশের কাঠামো শেষ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যাড়ার ছাউনি ও বেড়ার কাজ হাতে হাতে সমাধা করা হইত। প্রবল উৎসাহে কাজ চলিত। পল্লীর বালকের দলও সেদিন ভ্যাড়াঘর নির্মাণের কাজে সহায়তা করিয়া আত্মগৌরব বোধ করিত। ভ্যাড়াঘর নির্মাণ সম্পূর্ণ হইলে ঘরের মেজের উপর ন্যাড়া বিছাইয়া চাটাই দেওয়া হইত। এই ভ্যাড়াঘরে সারারাত্রি 'বাউলা' গানের আসর বসিত।

প্রথানুযায়ী তামাকু সেবনও সারারাত্রি চলিত। বাউলা গায়কদের কেহ কেহ গঞ্জিকা সেবন করিতেন। বোধ করি সেজন্য বয়োবৃদ্ধেরা বালকদিগকে বাউলাগানের আসরে যাইতে দিতেন না। পৌষ সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে সমগ্র পল্লীতে তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় একটা আনন্দের হিল্লোল বহিত। গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঘরে ঘরে আলো জ্বলিত। নারীরা পাকালের (চুল্লী) নিকটে

পৌষপার্বণের পূর্বরাত্রে 'ভ্যাড়াঘরে' বাউল ও কীর্তনগানের আসর

বাউলের গানকেই আমাদের অঞ্চলে বাউলা বলা হয়। এই আসরের জন্য চাঁদা তুলিয়া প্রচুর আহার্যবস্তু সংগ্রহ করা হইত। ফলের মধ্যে শ্রীহট্টের কমলা, উক্‌রা (খইয়ের মুড়কি), কদমা, বাতাসা ইত্যাদি সকলে উপভোগ করিত। তাছাড়া পল্লী-

বসিয়া পিষ্টক, লাড়ু ইত্যাদি উৎসবের আহার্য তৈরী করিতেন।

বাউলাগানের আসরে লাউয়ের একতারা, খঞ্জনি, ঢোল ও করতাল সহযোগে গান চলিত। প্রথমে 'তিন্‌নাথের' গুণ গাওয়া হইত। তিন্‌নাথ—

ত্রিনাথ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। ত্রিনাথ শব্দের অর্থ—যিনি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই তিন কালের অধিপতি। রাত্রি অবসানের কিয়ৎকাল পূর্বে গানের আসর ভাঙ্গিয়া যাইত। চাটাই সরাইয়া ভ্যাড়াঘর প্রচুর অতিরিক্ত ন্যাড়ায় পূর্ণ করিয়া সকলে ঘরে ফিরিত।

আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইত। অরুণোদয়ের পূর্বে অথবা সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাড়াঘর পুড়াইবার পর্ব শেষ করিয়া পুরুষের দল গুলী খেলার মাঠে সমবেত হইতেন। আমাদের পল্লীর চন্দ্রমোহন নামক একজন উৎকৃষ্ট গুলী-খেলোয়াড়কে সত্তর বৎসর বয়সেও ঐ দিনের গুলীখেলায় যোগ দিতে দেখিয়াছি।

"দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখা আকাশে বিস্তারলাভ করিত……"

আমরা অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়াই স্নান করিতাম। স্নানান্তে পরিষ্কার কাপড় ও শীতবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সকলে ভ্যাড়াঘরের নিকটে জড় হইতাম। তারপর ভ্যাড়াঘরে অগ্নিসংযোগ করা হইত। দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখা আকাশে বিস্তারলাভ করিত এবং বাঁশের ঘন গাঁটগুলি একটি একটি করিয়া সশব্দে ফুটিত আর ছেলে মহলে

সেদিন খেলোয়াড়ের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হইত। খেলার উৎসাহ যেন কোন বাধাই মানিত না। অবশ্য এরূপ ভিড়ে খেলা বড় সহজ হইত না। এত লোকের গুলী চিনিয়া রাখাই কঠিন হইয়া পড়িত। তাছাড়া খেলোয়াড়ের সংখ্যাধিক্য হেতু ঘন ঘন 'ব' হইত। 'ব' লাগিলেই খেলোয়াড়ের দলকে নূতন করিয়া গুলী গাহিয়া আনিতে হইত। ঘণ্টা-

কাল উত্তেজনাপূর্ণ খেলার পর সকলেই দ্রুতপদে যার যার ঘরে ফিরিত এবং পর্বদিনের প্রাতরাশ, যথা ঘরের দৈ, ঘরের চিড়া, পিঠা ইত্যাদি খাইয়া সংকীর্তনের আসরে একে একে জড় হইত।

চারিশত বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যরূপী মহামানব প্রেমগীতির যে বন্যা আনিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ এদেশে এখনও স্তিমিত হইয়া যায় নাই। শ্রীহট্ট বৈষ্ণবপ্রধান জেলা। আমাদের পল্লীর একাধিক গৃহে বিগ্রহ ছিলেন। একসময়ে গৃহদেবতার নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদি আড়ম্বর সহকারে সম্পন্ন হইত। পৌষসংক্রান্তি দিনে পালা-ক্রমে কোন বাড়ীর বিগ্রহের মন্দিরপ্রাঙ্গণে গায়কগণ সমবেত হইতেন। আমাদের পল্লীতে একটি "নট" পরিবার ছিল। কৃষিই ছিল নট পরিবারের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। বস্তুতঃ পরিবারটি এক সময়ে সচ্ছল গৃহস্থ ছিল। কিন্তু নট পরিবারের প্রধান পেশা ছিল গান বাজনার চর্চা। পল্লীর উৎসবে নাচগানে বাদ্যে নটেরাই অগ্রণী হইতেন। নট পরিবারের ছেলেদিগকে অল্পবয়সে ওস্তাদের নিকট গানবাজনার শিক্ষা লইতে হইত। হিন্দুর সকল পর্বের সময়োচিত গানের চর্চা নটেরা করিতেন।

সংক্রান্তি দিবসে কোন বাড়ীর মন্দির প্রাঙ্গণে গায়কগণ খোলকরতালসহ সমবেত হইতেন। প্রথমেই ধামালী। খোলীর দল বাদ্যদ্বারা সকলের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিতেন। এই খোলের বাজনা পল্লীবাসীর কর্ণকুহরে পৌছিলে সকলেই দ্রুতপদে কীর্তনের আসরে আসিয়া জড় হইতেন। প্রথম গান—গৌরচন্দ্রিকা, যেমন—

> নগরবাসী ওরূপ দেখ্‌বি যদি
> শীঘ্র আয়,
> শচীর দুলাল গৌর
> নেচে যায়।
> ওরূপ যে দেখেছে, সে ভুলেছে
> তারে কি পাশরা যায়।
> (নগরবাসী, ওরূপ দেখে যা রে)

তখনকার দিনে পল্লীতে দুচারজন লোক দেখা যাইত, যাঁহারা অবসর সময়ে সাধন ভজন ও ধর্মগ্রন্থ পাঠে আনন্দ পাইতেন এবং অন্য সকলকেও আনন্দদান করিতেন। ভক্তশ্রেণীর সেই সকল গায়ক সেদিন কীর্তনের আসরে যেন শচীর দুলালকে প্রত্যক্ষ করিতেন। তাঁহাদের অপূর্ব নৃত্যভঙ্গীতে এই প্রেমলীলাগীতির আনন্দ-হাট অপূর্ব শ্রী লাভ করিত। নৃত্যকালে তাঁহাদের কাহারও কাহারও শিখা খাড়া হইয়া উঠিত। চৈতন্যের প্রেমগীতির আবেশে কাহারও কাহারও শরীরে অশ্রুকণা পুলকাদি প্রকাশ পাইত। বাদকের দল বিভিন্ন তাললয়ের কলা-কৌশল প্রদর্শন করিতেন। পল্লীরমণীগণ হাতের কাজ ফেলিয়া কীর্তনের আসরে কোন একদিকে সমবেত হইয়া উলুধ্বনিতে পর্বদিনের মঙ্গলগীতিকে অভ্যর্থনা করিতেন। এই চিরাচরিত কীর্তন এখনও হয়; কিন্তু তাহা নিছক সংস্কার ও নিয়ম রক্ষার জন্য!

মন্দির-প্রাঙ্গণে দুএকটি গান গীত হইবার পর কীর্তনীয়ার দল পল্লী-পরিক্রমায় বাহির হইতেন। এই দলকে পল্লীর প্রতিটি বাড়ীতেই যাইতে হইত। সেদিন সকলের বাড়ীতেই লুটের ব্যবস্থা থাকিত। পল্লীর সকল বয়সের নরনারীর হৃদয় মন আনন্দে উদ্বেলিত হইত। পৌষপার্বণ বস্তুত গণ-উৎসব ছিল।

চৈতন্যের সহযোগী নিত্যানন্দের প্রেমগাথা গাহিয়া কীর্তনীয়ার দল যখন উন্মুক্ত মাঠের উপর দিয়া এক হাটি হইতে অন্য হাটিতে যাইত, তখন কী যেন অপূর্ব প্রেমভাবপ্রবাহ চলিত! ইহার বর্ণনা দেওয়া কঠিন।

> আয় সবে ভাই
> নিতাই গুণ গাই
> অভিমানশূন্য
> গৌর নিতাই।
> অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় (রে)
> (নিতাই) যারে দেখে, আপন করে
> হরির নাম বিলায় (রে)।

'অভিমানশূন্য' 'অক্রোধপরমানন্দ' মহাজন যে বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, চারিশত বৎসর-কাল বাংলার পল্লীর হিন্দুসাধারণ তাহা হইতে প্রেমের ও অহিংসার প্রেরণা লাভ করিয়াছে। পৌষসংক্রান্তিতে সেই বাণীর জয়গাতি সমগ্র পল্লীর হৃদয়মনকে আলোড়িত করিত।

বহুরকমের কীর্তন সেই দিন গাওয়া হইত। দীনভাবে উদ্বুদ্ধ গায়কগণ গৌর নিতাইয়ের পদধ্বনি যেন সেদিন প্রত্যাশা করিতেন।

আমাদের পল্লীর এক কোণে চৈতন্য মহাপ্রভুর আখড়া আছে। ইহার সুপ্রাচীন অট্টালিকাসমূহ, পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাধকদের সমাধি মন্দিরের শ্রেণী ও সুবিশাল নাটমন্দিব আখড়ার প্রাচীন ঐশ্বর্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। বহু সিদ্ধসাধক এই আখড়ায়

পৌষপাবণে কীর্ত্তনীয়াদের পল্লীপরিক্রমা

প্রেমধর্মের আচরণ করিয়া সমাধিলাভ করিয়াছেন। শ্রীহট্টের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আখড়াটি প্রাচীনতমের একটি। বৈষ্ণবধর্মপ্রবাহ একসময়ে শ্রীহট্টবাসীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। আখড়া-সমূহ ইহার সাক্ষী। বিথলঙ্গের আখড়ার কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। বিথলঙ্গে অতিথিদের

পল্লীপরিক্রমার আর একটি গানের নমুনা এখানে দিতেছি—

ওরে কে রে, হরিবল বলে যায়
গৌর যায় কি নিতাই যায়,
যা রে মাধাই দেখে আয়,
সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়।

জন্য বিশাল অট্টালিকার শ্রেণী ও সহস্রাধিক লোকের বাসস্থান দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয়না, চৈতন্যবাণী একসময়ে শ্রীহট্টে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সংক্রান্তিদিবসে কীর্তনীয়ার দল আখড়ায় পৌঁছিলেই আবার নূতন উৎসাহে নব নব কীর্তন

"অক্রোধপরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়
যারে দেখে আপন করে হরির নাম বিলায়।"

গাওয়া হইত। এই কীর্তনের একটা বিশিষ্ট ধারা ছিল। যেমন—

নিতাই রে,
ঐ নাকি রে ব্রজধাম
শ্রবণে না শুনি কৃষ্ণ নাম।
বৃন্দাবন হত যদি
শুকসারী করত গান।

কী বেদনা! বৃন্দাবনে আসিয়াও কৃষ্ণনাম শোনা যায় না। শুকসারীর গানও কর্ণকুহরে পৌঁছে না! আখড়ার বৈষ্ণবীয় পরিবেশে এই গান যেন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিত। গায়কদের কাহারও কাহারও অশ্রুপ্রবাহ যেন আর বাধা মানিত না। এই প্রেমগীতি পার্থিব সুখের তো কোন সন্ধান দিত না! আমার মনে প্রশ্ন জাগিত। প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইতাম না। ইহা বিকার বলিয়াও মনে করিতে পারিতাম না।

আমাদের জীবদ্দশায় দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রকোপে আমাদের পল্লীসংস্কৃতির মর্মবাণীও মরুভূমিতে নদীস্রোত বিলীন হইবার মতো অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। হিংসাদ্বেষে ও কালোবাজারী মনোবৃত্তিতে কলুষিত যুদ্ধোত্তর পল্লীসমাজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ পল্লীর পূর্বেকার পৌষপার্বণের

প্রেমগীতির ধারা ও অনুরূপ উৎসব—যেমন বিজয়া-দশমীর প্রীতির আলিঙ্গনের রীতির তুলনা করিলে স্বতই মনে হয় অহিংসার সাধনা এদেশের সমাজের সকল স্তরে কিভাবে অনুষ্ঠিত হইত।

যে মন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্তন আরম্ভ হইত কীর্তনীয়ার দল পরিক্রমা শেষ করিয়া আবার সেখানেই পৌঁছিতেন। তখন একাধিক কীর্তন গাওয়া হইত। যেমন চৌতালের গান :—

আমি ব্রজপুরে যাব রে,
গুণের ভাইরে নিতাই
মায় যে জানে না।
জানিলে সন্ন্যাসের কথা রে,
(মায়) পাষাণে ভাঙ্গিবে মাথা রে—
(মায় যে জানে না)

চৈতন্যের সন্ন্যাসের গান জমিয়া উঠিলে দেখিতাম, রমণীগণ গৃহের কাজ ফেলিয়া কীর্তনের আসরের কোণে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইতেন। গৃহকর্ম বিস্মৃত হইতেন। অনেকের চোখে অবিরাম জলের ধারা বহিত। মাতৃহৃদয়ের বেদনা অনুভব করিয়া চৈতন্য নিতাইকে সতর্ক করিতেছেন। পল্লীর মাতৃহৃদয়ও সেই বেদনায় ভারাক্রান্ত হইত। চারিশত বৎসর পরও চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণচিত্র পল্লীরমণীদের হৃদয়ে ব্যথা জাগাইত। এই চৌতালের গান কত-দিনের জানি না। অশীতিপর বৃদ্ধের কাছে শুনিয়াছি যে, তাঁহারাও বাল্যকাল হইতে এই গান শুনিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পিতা, প্রপিতা-মহেরাও এই গান গাহিয়াছেন। ধীর লয়ে নৃত্য-সংযোগে এই ধরনের চৌতালের গান দ্রুতলয়ে শেষ হইত। আর একটি গানের নমুনা দিতেছি :—

জয় রাধে শ্রীরাধে বলে মুদিলা নয়ন,
হরিদাস ত্যজিলা জীবন।
হরিদাসের গলে ধরে, প্রভু তুলি নিলেন কোলে
প্রেমভরে দিলেন আলিঙ্গন।
চৌদিকে খোল করতাল বাজে
(সবে) করে নাম সংকীর্তন।

হরিদাসের মহাপ্রয়াণের চিত্রটি গানে ফুটিয়া উঠিত। এরূপ কত প্রাচীন গান সেদিন শোনা যাইত। লুটের গান গাহিয়া কীর্তনের পালা শেষ করা হইত। তারপর লুট; লুটের পর সকলে খিচুড়ি, পরমান্ন, ফলাদি আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া প্রসাদ পাইতেন। কাহার প্রসাদ!—চৈতন্যরূপী বিশ্বাত্মার নামে উৎসর্গীকৃত প্রসাদ,—যাঁর গুণে সকলের আত্মা তৃপ্তিলাভ করে। প্রসাদ গ্রহণের পূর্বে পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া সকলে প্রেমধ্বনি দিতেন। সেই ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস স্পন্দিত হইত। ইহাই ছিল পৌষসংক্রান্তির বাণী,—ধর্মরূপী কুরুপিতামহ ভীষ্মের অহিংসার বাণী। মহাভারত আজও মানবীয় প্রেরণার আধার।

পল্লীজীবনের বাল্যস্মৃতি আমাকে আকর্ষণ করিত, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বেদনা জাগাইত। ফলে প্রৌঢ় বয়সে আবার পল্লীতে ফিরিয়াছিলাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বপর্যন্ত একটানা পাঁচ বৎসর পল্লীতে অতিবাহিত করিয়াছি। দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় বহুলোককেই আমার মত উদ্বাস্তু হইতে হইয়াছে। হয়ত ইহা স্বাধীনতার মূল্য। কিন্তু জন্মপল্লীর শেষ অভিজ্ঞতা হইতে আমার এইটুকু ধারণা হইয়াছে যে, যে শাশ্বত প্রেমধর্ম এদেশের পল্লীজীবনের ঐতিহ্যকে নানা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও সঞ্জীবিত করিয়াছে, ফল্গুর ধারার ন্যায় সেই ঐতিহ্যের প্রবাহ এখনও এ দেশের পল্লীধমনীতে প্রবহমান।

চৈতন্য নিত্যানন্দের উত্তরাধিকারী স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ গঠনের আহ্বান, রবীন্দ্রনাথের মৈত্রীর বাণী এবং গান্ধীজীর প্রেম ও অহিংসার অমৃতসম বাণী বর্তমান যুগকে নূতন করিয়া ঐশ্বর্য-মণ্ডিত করিয়াছে। সেই ঐতিহ্যকে সর্বলোকের সম্পদে পরিণত করার পথ নিরঙ্কুশ করিবার মত মহামানবতার জাগরণের প্রতীক্ষা স্বাধীন ভারতের নাগরিকরূপে আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

তাপসী অপর্ণা

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

সতীর অংগ ছিন্ন ভিন্ন, প'ড়ে আছে মৃত-ভার
নিঃসাড় জড়পিণ্ডের সম ভুবনের চারিধার।
হর-কোপানলে সৃষ্টি-সুষমা পেয়েছে সকলি লয়,
পুঞ্জিত দুঃখ-দৈন্যের স্তূপ দিকে দিকে ভরি রয়!
মহাদেব রন উদাসীন ডুবি গভীর ধ্যানেতে আজ,
পরমাত্মার অটল গহন নীরব-সত্তা মাঝ।
বিশ্বের ছায়া নাহিক সে ধ্যানে স্তব্ধ কালের স্রোত
সীমার পরিধি অসীমের বোধে রয়েছে ওতপ্রোত।
এমনি সময়ে হিমালয়-গেহে দক্ষরাজের সুতা,
পার্বতী-রূপে মেনকা-গর্ভে হ'লেন আবির্ভূতা।
বাতাসে সেদিন কি মধু পরশ—কি যেন বারতা জাগে,
কোন্ শুভরূপ বিকশি উঠিল অরুণ-কিরণ-রাগে।
গৌরী সবার নয়নের মণি, সবার বক্ষ-ধন,
হৃদয়ে হৃদয়ে আনিল সে বহি' স্নেহের প্রস্রবণ!
শশি কলা সম দিনে দিনে বাড়ে অতি কমনীয় দেহ,
নব নব আশা, বিমল শান্তি ছায় গিরিরাজগেহ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে একদা নারদ উপনীত হিমাচলে,
গৌরীরে হেরি অনুপম সুখ লভিলেন হিয়াতলে।
ডাকি' গিরিরাজে কহিলেন মুনি, "শুন রাজা মোর বাণী
তব কন্যার যোগ্য পাত্র সদাশিব শূলপাণি।"
দেবর্ষি-কথা শুনি হিমালয় হর্ষিত-অন্তর,
ভাবিলেন মনে, "কেমনে গৌরী লভিবে মহেশ্বর।
যিনি ত্রিলোকের স্রষ্টা-পালক, হর্তা ও অধিপতি,
একি সম্ভব—তাঁহারে লভিবে পতিত্বে পার্বতী!"

গঙ্গা-নদীর পূত-ধারা যেথা দেবদারুবন পাশে,
ব'য়ে যায় ধীরে, সুরভিত বায়ু মৃগ-নাভি-মধু-বাসে,
যেথা কিন্নর-সংগীত-তানে দশদিশি মুখরিত,
সেই সুরম্য পর্বত-দেশে মহেশ অবস্থিত।
ধবল-গিরির সদৃশ-কান্তি, জটাজুট শোভে শিরে,
অর্ধ-চন্দ্র-সমুদিত-ভাতি অর্ধ-ললাট ঘিরে।
অর্ধমুদিত-নয়ন-পদ্মে স্ফুরিছে দিব্য-প্রভা,
ধ্যান-প্রশান্ত নিশ্চল-কায়—অরণ্য করে শোভা!
অনিমেষ-চোখে চাহিয়া গৌরী শান্ত শিবের পানে,
পরমাগ্রহে পতি-রূপে তাঁরে বরিলেন নিজপ্রাণে।
ভাবিলেন মনে—বিনা মহাদেব ব্যর্থ জীবন তাঁর,
তাঁরে না লভিলে এ মহাভুবনে কিবা সুখ আছে আর!
প্রভাতে নিত্য পার্বতী তাই সাজায়ে পূজার ডালা
আনিতেন কুশ-সিত-চন্দন, সুরভি-কুসুম-মালা।
স্বাদু বন-ফল সংগ্রহ করি রাখিতেন শিলাতলে,
দিতেন ধুইয়া সানুদেশ নিতি পূত-জাহ্নবী-জলে।

একদা মদন সেই বনভূমে বসন্তে ল'য়ে সাথে,
রূপময়ী মায়া করেন রচনা কুসুম শায়কাঘাতে!
দুই সখী সাথে সেথা পার্বতী হ'লেন উপস্থিত,
হেরিছেন দেবী—কাননভূমির সব যেন বিপরীত!
পুষ্পে পুষ্পে সাজিলেন নিজে ক'রি দেহ মনোহর,
মদন-শায়ক বিঁধিল তাঁহার সুকোমল অন্তর!
অশোক-পুষ্প অংগে ধরিল পদ্ম-রাগের প্রভা,
কর্ণিকা হ'ল কণ্ঠ-বাহুতে হেম-আভরণ-শোভা!
মহেশ সকাশে ক্রমে পার্বতী করিলেন আগমন,
ভক্তিতে শির ক'রি লুণ্ঠিত বন্দেন ত্রিনয়ন।
যত্ন-চয়িত নব-পল্লব, সুগন্ধি ফুল-দল,
আরাধ্য-পদে সপেন গৌরী ভ'রি দুই করতল।
হৃদয়ের মাঝে ছিল সঞ্চিত যাহা কিছু বৈভব,
ঈশান-চরণে দিলেন ঢালিয়া মানি' পূজা-গৌরব!
অভয়-হস্ত ধীরে প্রসারিয়া চাহি' গৌরীর প্রতি,
কহিলেন শিব—"কর' তুমি লাভ মনোমত তব পতি!"
সহসা তখন অনংগ-দেব ল'য়ে কুসুমের শর—
দাঁড়ালেন উঠি করিতে বিদ্ধ মহেশের অন্তর!
নেহারি' মদনে প্রলয়-দেবতা উঠিলেন রোষে জ্বলি,'
কম্পিত হ'ল সে-তেজ-অনলে বিজন-বনস্থলী!

তৃতীয় নয়ন জলে ধক্ ধক্—ভ'রে যায় দিগ্‌দেশ,
মদনের রূপ সে অনলে পুড়ে—ভস্মেতে অবশেষ !
স্বামীরে হারায়ে কেঁদে ফিরে রতি, কাঁদে সারা চরাচর—
প্রলয়-আভাস হ'ল কি সূচিত আবার ধরার পর।
সখীদের সাথে ব্যথিত-হৃদয়ে ফিরিলেন পার্বতী,
অন্তর তাঁর করিল আহত কি যেন দারুণ ক্ষতি !
হৃদয়ের ধ্যান করেছেন যাঁরে, তাঁরে কি যাবে না পাওয়া?
সুকঠোর তপ সাধিলে তবে কি সফল হইবে চাওয়া ?
কহেন মেনকা—"হও নিবৃত্ত, তপস্যা অকারণ,
তনু আর মন নিগ্রহ ক'রি শিবে কিবা প্রয়োজন ?
ভবনে মোদের কত দেবতার মূর্তি বিরাজমান্,
যাঁহারে ইচ্ছ', তাঁর করে তোমা করিব সম্প্রদান !"
শিবের চরণে তিলে তিলে উমা বিলায়েছে আপনারে,
তনু মন প্রাণ তাঁহাতে ন্যস্ত, চাহিবে অন্য কারে ?
তপের আসনে বসিলেন তাই দৃঢ় ক'রি প্রাণমন,
চারুবেশ খুলে লইলেন দেহে বল্কল আবরণ !
জটাজ্‌টাকারে বাধিলেন কেশ, হলেন নিরাভরণা,
সকল ত্যজিয়া কাঙালিনী আজ হিমাচল নন্দনা !
বৃক্ষপত্র সম্বল তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তি-তরে,
অপর্ণা ক্রমে তাও ত্যজিলেন লভিতে মহেশ্বরে !
দিনে দিনে উমা হ'লেন শীর্ণা, তবুও ক্লান্তি-হারা
সাগরের পানে ছুটে যেন চলে স্রোতস্বিনীর ধারা !
রাত্রি কি দিবা, বর্ষা কি শীত, কিছু ভ্রূক্ষেপ নাহি,
প্রতীক্ষা-ভরে দিন কেটে যায় আশা-পথ-পানে চাহি'
বেদনার মাঝে কি যেন পুলক গভীর হিয়ায় জাগে,
নয়নের তারা শুধু চেয়ে থাকে অন্তর-অনুরাগে।
শিব তাঁর ধ্যান, শিব তাঁর জ্ঞান, সব তাঁর শিবময়,
বিরহের মাঝে মিলনের সুর প্রাণে ঝংকৃত হয়।

একদিন সেথা আসিলেন এক দণ্ডী ব্রহ্মচারী,
সূর্যের সম প্রতাপ তাঁহার, মুরতি হৃদয়হারী।
তাপসী উমারে শুধালেন তিনি—"কহ হে নিষ্ঠাবতি,
কিসের লাগিয়া সুকঠোর ব্রতে রয়েছ সতত ব্রতী ?
চাহ কি স্বর্গ ? চাহ সম্পদ ? কি তব অভাব আছে ?
ছাড় তপস্যা মিনতি আমার জানাই তোমার কাছে !
তনুলতা তব হয়েছে শুষ্ক, শ্রীহীন চন্দ্রানন,
তব অংগের স্বর্ণ-কান্তি দহে যেন হুতাশন !"
ব্রহ্মচারীর বচন শুনিয়া কহেন সখীদ্বয়—
"তপোরতা উমা চাহেন লভিতে মহেশ-পদাশ্রয় !
ত্রিভুবন মাঝে তিনি তাঁর পতি, চির-আরাধ্য ধন,
তনু প্রাণ মন করেছেন উমা তাঁহারে সমর্পণ !"
কহেন দণ্ডী—"জানি সে মহেশে, অতিশয় দীনহীন,
ভস্ম-বিভূতি মাখা তার গায়, সংসারে উদাসীন।
ভিক্ষুক সম বেড়ায় ঘুরিয়া, শ্মশানে মশানে রয়,
কেহ কোন দিন পায়নিক' তার জন্মের পরিচয় !"
কহেন গৌরী ব্রহ্মচারীরে রোষ-কম্পিত-স্বরে,—
"কেন করিছেন অযথা নিন্দা সেই পরমেশ্বরে ?
এই জগতের ত্রাণকারী তিনি, বাসনা-বিবর্জিত,
নির্ধন তিনি, সব সম্পদ তাঁহাতেই বিধৃত।
শ্মশান-নিবাসী হ'লেও তিনি যে ত্রিলোকের অধিপতি,
তাই এ হৃদয় তাঁহার চরণে স্বীকার করেছে নতি !"
কহি' এই বাণী তাপসী গৌরী করিলেন উত্থান,
নিমেষে সেথায় অপূর্ব রূপ হইল দৃশ্যমান্ !
এ যে মহাদেব, ত্রিভুবন-স্বামী, এ যে শিব-শংকর !
ছলিতে উমাকে এসেছেন নিজে সাজিয়া দণ্ডধর !
পার্বতী-দেহ কাঁপে থর থর, ঝরে দ্রব স্বেদ-ধারা,
প্রাণের দেবতা দিয়াছেন দেখা, নয়ন নিমেষ-হারা !
শিবের আননে ঝরে মধু-হাসি, প্রসন্নতায় ভরা,
সেই মাধুরীতে উজ্জ্বল নভঃ, উছল মাটির ধারা !
বিরূপ-দিঠিতে অপরূপ-ভাতি বরষে করুণাভয়,
বিশ্ব-প্রকৃতি পায় নব প্রাণ, নিখিল জ্যোতির্ময় !
কহিলেন হর পার্বতী প্রতি—"আমি তব চিরদাস !
বরণ করিয়া লহ মোরে দেবি, পুরাও প্রাণের আশ !"

প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ

(শ্রৌত ও স্মার্ত উপাসনার সামঞ্জস্য)

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

উত্তরমীমাংসাদর্শনে পূজ্যপাদ আচার্য বাদরায়ণ বলিয়াছেন—"অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি" (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১৫—'যাঁহারা প্রতীকালম্বনে উপাসনা করেন না, অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে বিদ্যুল্লোক হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।' (ছাঃ ৫।১০।২), ইত্যাদি। তাহাতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে—যাঁহারা প্রতীকালম্বনে উপাসনা করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি হয় না; সুতরাং ক্রমমুক্তিও হয় না। বর্তমানকালে বেদপন্থী হিন্দুগণ পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া শ্রীশ্রীদুর্গা, কালী, শিব ও বিষ্ণু ইত্যাদি তত্তৎ প্রতিমাবলম্বনে প্রতীকোপাসনাতেই ব্যাপৃত। শুদ্ধ বৈদিক উপাসনার অনুশীলনকারী এখন অতি বিরল। পুরাণ ও তন্ত্রাদি তত্তৎ স্মৃতিশাস্ত্রের অনুসরণে যাঁহারা প্রতিমারূপ প্রতীকাবলম্বনে শ্রীশ্রীদুর্গা শিব, কালী ও বিষ্ণু ইত্যাদি নামে পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মুক্তি হয়, অথবা হয় না—এই বিষয়ে উত্তরমীমাংসাকার ও বেদ এবং পুরাণের বিভাগকর্তা,[১] পূজ্যপাদ আচার্য বাদরায়ণ বেদব্যাসের অভিপ্রায় কি তাহাই এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার জন্য আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রধান বিচার্য বিষয়টিতে প্রবেশ করিবার পূর্বে মুক্তি কি, উপাসনা কি, প্রতীকোপাসনাই বা কাহাকে বলে, তাহাদের বিভাগ ও ফল ইত্যাদি প্রারম্ভিক বিষয়গুলিতে কিঞ্চিৎ আলোক সম্পাত করিতে চেষ্টা করিতেছি। উত্তরমীমাংসা, পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য বিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্য, পুরাণ ও তন্ত্রাদিই এই বিষয়ে আমাদের উপজীব্য।

মুক্তি কি ?

"সর্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমানন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তিরই" নাম মুক্তি। ব্রহ্মস্বরূপভূতা সেই মুক্তি একই প্রকার হইলেও, তৎপ্রাপ্তির উপায়ভূতা বিদ্যার বিভিন্নতা এবং সাধকের প্রাপ্তব্য অবস্থার বিভিন্নতা বশতঃ দুই প্রকাররূপে অভিহিত হইয়া থাকে, যথা—সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফলে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের (ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্বজ্ঞানের) উদয় হইলে মূলাবিদ্যার আত্যন্তিক নাশ বশতঃ জীবের যে ব্রহ্মরূপ স্বস্বরূপে স্থিতি, তাহাই 'সদ্যোমুক্তি'। 'সদ্যোমুক্তি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান-সমকালে মুক্তি',[২] ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি; এক্ষণে জ্ঞানোৎপত্তি হইল, আর মুক্তি কর্মফলের ন্যায় কালান্তরে হইবে, এইরূপ নহে। জ্ঞানোৎপত্তির সমকালেই—'ইহার পূর্বেও আমি

১ অনেকেই জানেন ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ সকলের রচয়িতা। কিন্তু "পুরাণমেকমেবাসীৎ পর্বকল্পেষু মানদ। * * হরির্ব্যাসস্বরূপেণ জায়তে চ যুগে যুগে। * * তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূলোকে নির্দিশত্যপি" ॥ ইত্যাদি বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত বচনানুসারে অবগত হওয়া যায় যে—ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণসকলের রচয়িতা নহেন, পরন্তু অষ্টাদশভাগে তাহাদের বিভাগকর্তা।

২ কেহ কেহ মনে করেন—'সদ্যোমুক্তি' শব্দের অর্থ—'জ্ঞানসমকালে দেহত্যাগ।' তাহা ভ্রম। যেহেতু উত্তরমীমাংসার ৩।১।১৯ যাবদধিকারাধিকরণে নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিদেরও লোকব্যবস্থা সম্পাদনরূপ অধিকারকালপর্যন্ত শরীরস্থিতি ও পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে। আর নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তির পরই শরীরপাত হইলে সেই বিদ্যার বিষয় বলিবার কেহ না থাকায় মনুষ্য সমাজে সেই বিদ্যার অস্তিত্বই থাকিত না। আর তাহা হইলে আমরা যাঁহাদিগকে ঋষি বা অবতার পুরুষ ইত্যাদি বলি, যাঁহারা এই নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিদ্যার কথা বলেন, তাঁহাদিগকে মিথ্যাভাষী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। উপরন্তু নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনকারিণী শ্রুতির প্রবৃত্তিও ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ শরীরপাত ভয়ে মনুষ্যগণ আর তাহাতে প্রবৃত্তই হইতে চাহিবে না। আর শাস্ত্রে যে জীবন্মুক্তির বিচার-প্রসঙ্গে প্রারব্ধকর্ম রূপ প্রতিবন্ধক, লেশ অবিদ্যা ইত্যাদির বিচার পরিদৃষ্ট হয়, তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

কর্তা বা ভোক্তা ছিলাম না, বর্তমানকালেও তাহা নহি, আর ভবিষ্যৎকালেও তাহা হইব না', সদ্যোমুক্ত পুরুষ এইপ্রকার অনুভব করিতে থাকেন।[৩] আর তখনই তিনি "নবদ্বারেপুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্" (গীতা ৫।১৩), এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহা হইল সদ্যোমুক্তের স্বদৃষ্টিতে অবস্থা। অস্মদাদির দৃষ্টিতে তাদৃশ সদ্যোমুক্তেরও প্রারব্ধকর্ম বশে যতদিন শরীর থাকে, ততদিন তাঁহাকে বলা হয় 'জীবন্মুক্ত', সুতরাং তৎকালে তাঁহার মুক্তির আখ্যা হয় 'জীবন্মুক্তি'। আবার অস্মদাদির দৃষ্টিতে প্রারব্ধকর্মশেষে সেই সদ্যোমুক্ত পুরুষের শরীর বিনষ্ট হইলে, তাঁহাকে বলা হয় 'বিদেহমুক্ত' বা 'নির্বাণমুক্ত'। সুতরাং তৎকালে তাঁহার মুক্তির আখ্যা হয়—'বিদেহমুক্তি' বা 'নির্বাণমুক্তি।' এইরূপে দেখা গেল—জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি বা নির্বাণমুক্তি সদ্যোমুক্তিরই দৃষ্টিভেদে নামান্তর মাত্র। নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিদের স্বদৃষ্টিতে শরীর বা প্রারব্ধ কর্ম ইত্যাদি কিছুই না থাকায় কোন কোন আচার্য সদ্যোমুক্তি মাত্রই স্বীকার করেন, জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তি স্বীকার করেন না। আর সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা যে মুক্তি, তাহাকে বলে ক্রমমুক্তি। ইহাতে দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি, তথায় অবস্থিতি এবং নানা ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্যভোগান্তে কল্পান্তে হিরণ্যগর্ভের (ব্রহ্মার) সহিত সদ্যোমুক্তিলাভ হয়। ক্রমমুক্ত পুরুষকে পুনরায় আর ইহলোকে আসিয়া জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইতে হয় না। এই ক্রমমুক্তাবস্থাকে সগুণ ব্রহ্মাত্মবিদের সদ্যোমুক্তিলাভের পূর্বাবস্থা বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে সগুণ ব্রহ্মাত্মবিদ্‌কেও তাঁহার জীবদ্দশাতে 'জীবন্মুক্ত' বলা হইয়াছে। ইহাই হইল মুক্তির একটা মোটামুটি পরিচয়।

উপাসনার পরিচয়

'উপাসনা' শব্দটির অর্থ—'উপ' + 'আসনা' অর্থাৎ 'নিকটে অবস্থান।' কিন্তু যে পরমেশ্বরকে আমরা দেখি নাই, যাঁহার বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কিছুই জানা নাই, তাঁহার নিকটে অবস্থান করা যাইবে কি প্রকারে? যিনি ধরা ও ছোঁয়ার বাহিরে তাঁহার নিকট অবস্থান করা তো বাতুলের প্রলাপমাত্র। না, তাহা নহে। আমাদের প্রিয়জন যখন বিদেশে থাকেন, তখন তিনি আমাদের নিকটে না থাকিলেও আমরা তাঁহার নিকটেই থাকি। কি প্রকারে? অবিরাম চিন্তার দ্বারা। মাতা প্রবাসী পুত্রের চিন্তায় তন্ময় হইয়া যেন পুত্রের নিকটেই থাকেন। লবণপিণ্ডের সর্বত্রই যেমন লবণ ওতপ্রোত থাকে, আমাদের ভগবানও তদ্রূপ এই বিশ্বে সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। শ্রুতি বলিতেছেন—"ব্রহ্ম এব ইদং সর্বম্" 'এই সমস্তই ব্রহ্ম,' স্মৃতি বলিতেছেন—"যদেতদখিলং বিষ্ণোর্জগন্ন ব্যতিরিচ্যতে" (বিষ্ণুপুরাণ ৬।৮।৮)— 'এই অখিলজগৎ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন কিছুই নহে'; সুতরাং মাতার সহিত প্রবাসী পুত্রের দেশজ ব্যবধান থাকিলেও জগন্মাতার সহিত আমাদের কোন প্রকার ব্যবধান এতটুকুও নাই। অতএব মাত্র তদ্বিষয়ে চিন্তারই আবশ্যকতা, তাঁহাকে চিন্তা করিলে তাঁহার নিকটে সত্যকার অবস্থান স্বতই আসিয়া পড়ে। এই কারণে অন্য বিষয়ক চিন্তার দ্বারা ব্যাহত না হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে যে ভগবদ্বিষয়ক চিন্তা, তদ্বিষয়ে মানসবৃত্তির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, তাহাই উপাসনা, তাহাই 'তাঁহার নিকটে অবস্থান'।

কিন্তু বাহ্য রূপরসাদি বিষয়ে স্বভাবতই আকৃষ্টচিত্ত আমাদের চিন্তাধারা পরমেশ্বরের প্রতি ধাবিত হয় না। তাঁহাকে চিন্তা করিতে বলিলেই তদ্বিষয়ক চিন্তা মনে আসে না, কারণ কি চিন্তা করিব, কি তাহার অবলম্বন? মনতো একটা অবলম্বন ব্যতিরেকে কিছু ধরিতে বা বুঝিতেই পারে না। মানবের এই দুর্বলতা বুঝিয়া পরম করুণাময়ী শ্রুতি তাহার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন—সর্বব্যাপী

৩ উত্তরমীমাংসা ৪।১।১৩ তদধিগমাধিকরণ ভাষ্য।

নিরাকার নির্গুণ পরমেশ্বরে কতকগুলি গুণের আরোপ করিয়া। [এই 'আরোপ' কথাটা বোধ হয় এখানে সঙ্গত হইল না, কারণ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা আরোপ, কিন্তু উপাসকের নিকট ইহা সত্য।] সত্য-কামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, পাপরাহিত্য, অশেষকল্যাণগুণাকরত্ব, জরামরণরাহিত্য ইত্যাদিই সেইগুণ। এই গুণসকলের যোগে যে পরমেশ্বরবিষয়ক অবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহ, তাহাকেই বলে ভগবদুপাসনা বা ধ্যান।

আমাদের প্রস্তাবিত প্রতীকোপাসনারূপ বিচার্য বিষয়টিতে অবতরণ করিবার পূর্বে ব্রহ্মবিদ্যার সহিত তাহার সম্বন্ধ কিপ্রকার, মূলেই তাহা ব্রহ্মবিদ্যা কি না, ইহা বুঝিবার জন্য শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার বিভিন্ন প্রকার ধারার সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। এক্ষণে আমরা তাহাই বলিব—

শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার বিভাগ

যে বিদ্যাবলে ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়, তাহাকে বলে ব্রহ্মবিদ্যা। তদ্ব্যতিরিক্ত বিদ্যাকে বলে অব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা দুইপ্রকার, যথা—পরব্রহ্মবিদ্যা এবং অপরব্রহ্মবিদ্যা (হিরণ্যগর্ভবিদ্যা)। পরব্রহ্মবিদ্যা আবার দুইপ্রকার, যথা—সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা এবং নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা। সগুণ ব্রহ্মবিদ্যাব দুই বিভাগ, যথা—অপ্রতীকালম্বনা এবং প্রতীকালম্বনা। প্রতীকালম্বনা সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা আবার দুইপ্রকার, যথা—কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা এবং কর্মাঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা। উদাহরণ ও আকরের (শ্রুতিতে যে স্থলে উক্ত বিদ্যাটি পঠিত হইয়াছে, সেইস্থলের) পরিচয় সহ নিম্নোক্ত বিভাগ চিত্রটি হইতে ব্রহ্মবিদ্যার বিভাগবিষয়ে কতকটা পারিষ্কার ধারণা হইবে মনে করিয়া তাহা সন্নিবেশ করা হইতেছে—
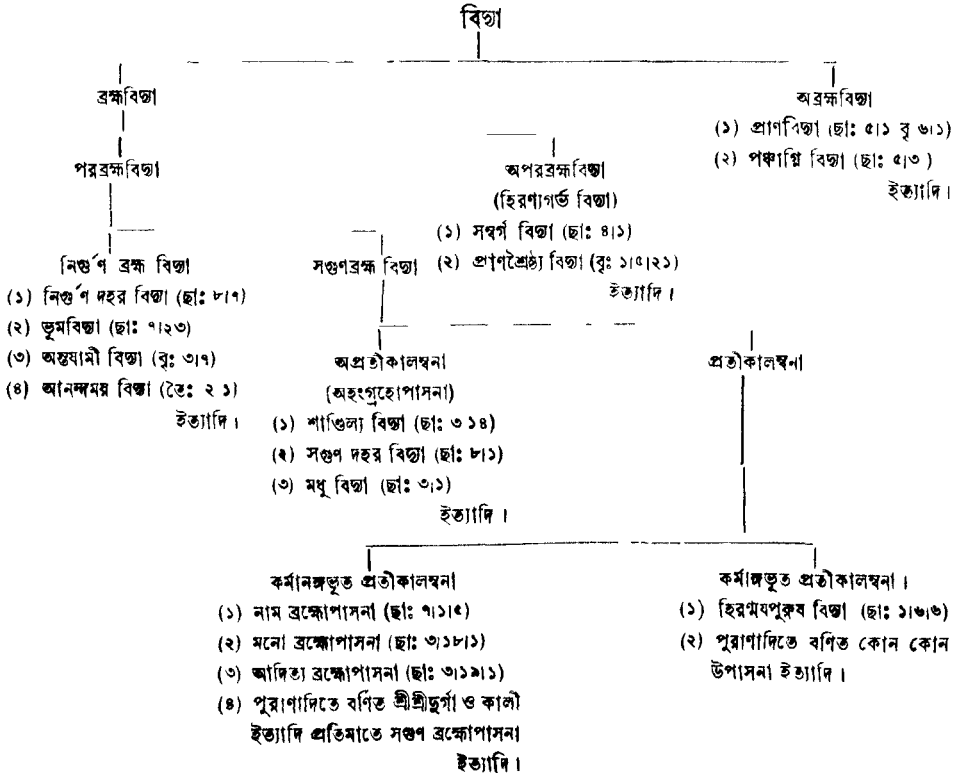
অব্রহ্মবিদ্যারও উক্ত প্রকার বিভাগসকল আছে, কিন্তু তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। পুরাণাদিতে বর্ণিত প্রতীকালম্বনা উপাসনা কি প্রকারে কর্মানঙ্গভূত প্রতীক ও কর্মাঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা উপাসনার অন্তর্গত হইয়া পড়ে, তাহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব। শ্রৌতবিদ্যা না হইলেও বোধ-সৌকর্যের জন্য বিভাগচিত্রমধ্যে তাহারা সন্নিবিষ্ট হইল।

নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তাবিত প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যা, কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা ব্রহ্মবিদ্যা এবং কর্মাঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে কি বুঝায় অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপ কি, সাধনক্রম এবং ফলই বা কি, এইসকল বিষয়ের একটা পরিষ্কার ধারণার আবশ্যকতা আছে। নতুবা আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয় যে পৌরাণিক প্রতিমাদি প্রতীকাবলম্বনে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, তদ্বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা হইবে না। এক্ষণে আমরা তাহাই বর্ণনা করিব—

[অপ্রতীকালম্বনা শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যার (-অহংগ্রহোপাসনার) পরিচয়, সাধনক্রম ও ফল]

অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যা—ইহাতে শুদ্ধ ব্রহ্মকে কতকগুলি গুণযুক্তরূপে উপাসনা করা হয়। সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব ইত্যাদিই সেইগুণ, ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। শ্রুতিতে যে যে বিদ্যাতে যে যে গুণযোগে উপাসনার কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই গুণযোগেই সেই সেই উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। স্বীয় ইচ্ছামত কতকগুলি গুণের সমাবেশ করিলেই চলিবে না। তদ্ব্যতীত এই জাতীয় উপাসনাতে আরও কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, তাহা এই—শ্রুতি বলেন, "তৎ যঃ অহং সঃ অসৌ, যঃ অসৌ সঃ অহম্" (ঐতঃ আঃ ২।২।৪।৬)—'আমি যাহা উনিও (-পরমেশ্বরও) তাহা, উনি যাহা আমিও তাহা'; "ত্বং বা অহম্ অস্মি ভগবো দেবতে অহংবৈ ত্বমসি" জাবাল)—'হে পূজনীয় দেবতা, তুমিই আমি, আমিই তুমি'; "অথ যঃ অন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে অন্যঃ অসৌ অন্যঃ অহম্ অস্মি, ন সঃ বেদ, যথা পশুঃ এবং সঃ দেবানাম্" (বৃঃ ১।৪।১০)—'উনি (—আমার উপাস্য আমা হইতে ভিন্ন এবং আমি তাঁহা হইতে ভিন্ন, এই প্রকারে যিনি অন্য [নিজ হইতে ভিন্ন] দেবতাকে উপাসনা করেন, তিনি তত্ত্ব, অবগত নহেন। [মনুষ্যগণের নিকট] পশু যে প্রকার, সেই ব্যক্তিও দেবগণের নিকট সেইপ্রকার'; "দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি" (বৃঃ ৪।১।২)—'দেবতা হইয়া দেবতাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬) 'ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হন,' ইত্যাদি। এইসকল বেদবাক্যবলে এই অপ্রতী-কালম্বনা ব্রহ্মোপাসনাতে উপাসনাকালে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে নিজ হইতে অভিন্নরূপে এবং নিজেকে স্বীয় ইষ্টদেবতা হইতে অভিন্নরূপে ধ্যান করিতে হয়। এই প্রকারে যে নিজের ও দেবতার মধ্যে বিশেষ্য বিশেষণভাবের পরিবর্তন করিয়া ধ্যান, তাহাকে বলে **ব্যতিহার ধ্যান** (উত্তরমীমাংসা—৩।৩।২৩ ব্যতিহারাধিকরণ)। কিন্তু এইপ্রকার ব্যতিহারধ্যানের সময় উপাসক নিজেকে দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত ও জন্মমৃত্যুর অধীন সংসারী জীবরূপে চিন্তা করিবেন না। পরন্তু তিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠানভূত শুদ্ধ সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ, এইরূপে নিজের স্বরূপের চিন্তা করিয়া নিজের সেই দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপের সহিত সত্যকামত্বাদি গুণযুক্ত পরমেশ্বরের অভেদ চিন্তন করিতে হইবে। এই প্রকারে শুদ্ধ জীবচৈতন্যের সহিত পাপরাহিত্যাদি তত্তৎ গুণযুক্ত পরমেশ্বরের অভিন্নতামূলক যে চিন্তাপ্রবাহ অর্থাৎ ধ্যান, তাহাকে বলে **অহংগ্রহোপাসনা**। "উপাস্যস্বরূপস্য স্বাভেদেন চিন্তনম্" ইহাই অহংগ্রহোপাসনার লক্ষণ। এইপ্রকার ধ্যানে ঈশ্বরনিষ্ঠ পাপরাহিত্যাদিগুণসকল জীবে ধ্যেয় হওয়ায় নিকৃষ্ট জীবের উৎকৃষ্টতা

সিদ্ধ হয়। উপাস্যদেবতাপ্রাপ্তি যাহার ফল, সেই সকল প্রকার অপ্রতীকালম্বনা উপাসনাতেই এইপ্রকার 'অহংগ্রহধ্যান' করিতে হয় (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, ৩।৩।৩৭ সূঃ), [প্রসঙ্গতঃ জানিয়া রাখিতে হইবে যে—ঈশ্বর চৈতন্য হইতে উক্ত সর্বজ্ঞত্ব ও পাপরাহিত্যাদি গুণসকলকে বাদ দিয়া সেই শুদ্ধ ঈশ্বরচৈতন্যের সহিত শুদ্ধ জীবচৈতন্যের যে অভেদধ্যান, তাহাকে বলে 'নিদিধ্যাসন।' ইহা নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিদ্যার সাধন, সুতরাং এখানে আলোচ্য নহে]

শাণ্ডিল্যবিদ্যা (ছাঃ ৩।১৪), সগুণদহরবিদ্যা (ছাঃ ৮।১) ইত্যাদি অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যাসকলে এই প্রকারে ব্যতিহারধ্যানদ্বারা উপাস্য ও উপাসকের অভিন্নতা চিন্তন করিতে হয় বলিয়া উক্ত অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যাসকলকেই অহংগ্রহবিদ্যা বা অহংগ্রহোপাসনা বলা হয়। তন্নামক অন্য কোন স্বতন্ত্র বিদ্যা নাই। যদিও সম্বর্গবিদ্যা (ছাঃ ৪।৩।৬) ইত্যাদি অপরব্রহ্মবিদ্যাতে এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (ছাঃ ৫।৩) ও প্রাণবিদ্যা (ছাঃ ৫।১) ইত্যাদি অব্রহ্মবিদ্যাতেও দেবতার সহিত উপাসকের 'অহংগ্রহ' (—আমিই সেই দেবতা, এইপ্রকার চিন্তন) পরিদৃষ্ট হয়, [৪] তাহা হইলেও সেইসকল উপাসনাকে 'অহংগ্রহোপাসনা' বলা হয় না। উক্ত শব্দটি এই অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মোপাসনাতেই রূঢ়. শাস্ত্রালোচনাতে ইহাই প্রতিভাত হয় [৫]।

উপাস্যসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত এই অহংগ্রহোপাসনাসকলের মধ্যে যে কোন একটির অতি যত্নসহকারে আদরের সহিত নিরন্তর অভ্যাস করিতে হয়। চিত্তের বিক্ষেপকর হওয়ায় এই বিদ্যার একাধিকের অনুশীলন নিষিদ্ধ। আর এই বিদ্যাসকলের মধ্যে একাধিকের অনুশীলনের কোন আবশ্যকতাও নাই, কারণ সকলপ্রকার অহংগ্রহবিদ্যার ফলেই সাধকের সগুণব্রহ্মাত্মজ্ঞান, দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন ও তথায় ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্যভোগ হয়। উত্তর মীমাংসার ৩।৩।৩৪ বিকল্পাধিকরণ, ৩।৩।১৮ অনিয়মাধিকরণ এবং ৪।৩।৫ কার্যাধিকরণে এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত বিচার দ্রষ্টব্য। শাস্ত্রে যে সালোক্য (ইষ্টের সহিত সমান লোকে অবস্থিতি), সারূপ্য (—তাঁহার ন্যায় চতুর্মুখাদিরূপপ্রাপ্তি), সামীপ্য (—ইষ্টের সমীপে অবস্থান) ও সার্ষ্টি (—ইষ্টের ঐশ্বর্যের সমান ঐশ্বর্যলাভ), ইত্যাদি মুক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই অপ্রতীকালম্বনা সগুণ ব্রহ্মবিদ্যারই ফল। ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া সিদ্ধসাধক উক্ত বিভূতিসকল লাভ করেন। এই বিদ্যাতে সিদ্ধিলাভ করিলে সাধককে আর ব্রহ্মলোক হইতে মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিতে (পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে) হয় না, কল্পান্তে হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান লাভ পূর্বক নির্বাণ মুক্তিলাভ করেন। এই প্রকারে অপ্রতীকালম্বনা সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফলে সাধক ক্রমশঃ নির্বাণমুক্তির সন্নিহিত হইয়া কল্পান্তে তাহা লাভ করেন বলিয়া এই প্রকার সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা মুক্তিকে 'ক্রমমুক্তি' বলা হয়। ইহাই হইল শ্রৌত অহংগ্রহোপাসনাবিষয়ে মোটামুটি জ্ঞাতব্য।

(ক্রমশঃ)

৪ সম্বর্গবিদ্যাতে অহংগ্রহ—ছাঃ ৪।৩।৬ ; পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে অহংগ্রহ—(ছাঃ ৫।১০।১ ভাষ্য) ; প্রাণবিদ্যাতে অহংগ্রহ—ছাঃ ৫।২।১ আনন্দগিরিটীকা দ্রষ্টব্য।

৫ উত্তরমীমাংসা ৩।৩।৩৪ বিকল্পাধিকরণের এবং ৪।১।১ আবৃত্ত্যধিকরণের ভাষ্য ও ন্যায়নির্ণয়াদি টীকা দ্রষ্টব্য।

নামকরণ *

(কীর্তন)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

জানি না তো সখী, আমি যে কী—তোরে কেমনে বলিব বল ?
আমি যে জানি না আজো এ-জীবনে—কোথা সখী, এর তল !

হরির অধরে রাজে যে-মুরলী—আমি বুঝি তারি তান।
হরিনামটংকৃত যে-ধনুক তাহারি একটি বাণ।
ভক্তের মুখবন্দিত আমি কীর্তনঝঙ্কার।
প্রেমিক যে-হার মেনে লভে জয়—আমি বুঝি সেই হার।

নই নই সখী, কিছু নই আমি ঃ
সেই সব—প্রতি-অন্তরযামী ঃ

জানি না তো সখী, আমি যে কী তোরে কেমনে বলিব বল ·
আমি যে জানি না আজো এ-জীবনে কোথা সখী, এর তল !

আমি উচ্ছলা গোপীর আঁখির অশ্রুমুকুতামোতি।
কালো নিশাপথে চলে যে-পান্থ—সে-পথে জোনাকি-জ্যোতি।
নাথের চরণে নিবেদিতা আমি একটি কুসুমহার।
সুরসুন্দর প্রেমের বীণার আমি মঞ্জুল তার।

নই নই সখী, কিছু নই আমি ঃ
সেই সব—প্রতি-অন্তরযামী ঃ

জানি না তো সখী আমি যে কী—তোরে কেমনে বলিব বল্ ?
আমি যে জানি না আজো এ-জীবনে কোথা সখী, এর তল !

বৃন্দাবনের বালা আমি মীরা—নন্দিনী মেবারের।
সাধুচরণের ধূলিকণা—দাসী শ্যামল বল্লভের—
গোপালের হাতে যে বিকালো হ'তে খেলার পুতুল তার
করুণাশাখায় লগ্ন একটি হিল্লোল লতিকার।

নই নই সখী, কিছু নই আমি ঃ
সেই সব—প্রতি-অন্তরযামী ঃ

জানি না তো সখী আমি যে কী—তোরে কেমনে বলিব বল্ ?
আমি যে জানি না আজো এ-জীবনে কোথা সখী এর তল !

* শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর রচিত হিন্দী মীরারভজনের অনুবাদ

রামায়ণে সংকার, প্রেতকৃত্য এবং শ্রাদ্ধ

ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, এম্-এ, ডি-লিট্, শাস্ত্রী

জীবমাত্রই মরণশীল অথচ জীবমাত্রই দেহকে অত্যন্ত আপনার মনে করে। জীব দেহের সঙ্গে সহজে সম্বন্ধ নিঃশেষ করিতে চাহে না। মৃতদেহ প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; মৃত্যুর অল্প-দিনের মধ্যেই দেহ বিগলিত হইতে আরম্ভ করে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও মৃতদেহকে চিরন্তন করা অসাধ্য, সুতরাং এই ক্ষয়িষ্ণু মৃতদেহের যথোচিত গতি করাকে আত্মীয় স্বজন অত্যাবশ্যক মনে করিয়া ব্যবস্থা করে। সাধারণতঃ মানুষমাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে পরলোকে বিশ্বাস করে। পরলোকে সদ্গতি মানুষের ইহলোকের কর্মের উপর নির্ভর করে বলিয়া মানুষের সহজ বিশ্বাস। তেমনি মৃত ব্যক্তির সংকার পারলৌকিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে বলিয়া মানুষের বিশ্বাস। ইহলোকের কর্মের জন্য মানুষ স্বয়ং দায়ী, কিন্তু মৃতদেহের সংকারাদির জন্য পরবর্তী আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব। কোন কোন জাতির মধ্যে মৃতদেহ ভক্ষণ করার রীতি আছে। কোন জাতি মৃতদেহকে উচ্চ বৃক্ষে বিলম্বিত করিয়া রাখে এবং সেই দেহ পশুপক্ষীর খাদ্য, কোন জাতি মৃতদেহকে জলে নিক্ষেপ করে, তাহা মীন কূর্ম কুম্ভীর ইত্যাদি জলজন্তুর খাদ্য, কোথাও মৃতদেহকে রাসায়নিক দ্রব্যদ্বারা চিরন্তন করিয়া রাখার প্রয়াস করে, কেহ বা দেহ অগ্নিদাহ করে; অস্থি, নাভি ইত্যাদি অংশ জলে নিক্ষেপ করে। পরলোক, কর্মফল, ঈশ্বর ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে মৃতদেহের সংকারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মৃতদেহের সংকার মানুষের সভ্যতা ও সংস্কারের সাক্ষ্য দেয়। রামায়ণে নর, বানর, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি জাতিগুলির মধ্যে মৃতদেহ সংকারের উল্লেখ আছে। এই সংকারবিধি, অশৌচপালন, শ্রাদ্ধ, উদকদান, তর্পণাদি কার্য পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় যেন এই জাতিগুলি একইপ্রকার সমাজব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইত। পরলোক, কর্মফল, ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রভৃতি ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে একটা আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ঐক্য ছিল। রামায়ণে দেবতাদের মৃত্যু এবং শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। কারণ তাঁহারা অমৃত ভক্ষণ করিয়া অমর হইয়াছিলেন। রামায়ণে এই কয়েকটি মৃতদেহের সংকার, শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারের উল্লেখ আছে :

নররাজ—দশরথ
শাপগ্রস্ত—বিরাধ
গৃধ্ররাজ—জটায়ু
বানররাজ—বালী
রাক্ষসবীর—ইন্দ্রজিৎ
রাক্ষসরাজ—রাবণ

মানবরাজ দশরথের মৃত্যুর সময় তাঁহার কোন পুত্রই অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না। রাম-লক্ষ্মণ বনবাসে ছিলেন, ভরত-শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে পল্লীগ্রামে ছিলেন; পুত্রাভাবে মুখাগ্নি হইতে পারে না বিবেচনায় তাঁহার মৃতদেহ দশ দিন পর্যন্ত তৈলদ্রোণাতে স্থাপিত ছিল।

> ঋতেতু পুত্রাদ্দহনং মহীপতে
> র্নারোচয়ংস্তে সুহৃদঃ সমাগতাঃ।
> ইতীব তস্মিন্ শয়নে ন্যবেশয়ন্
> বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্ ॥ ২ ৬৬ ২৭

দশরথের মৃত্যুর দশ দিবসান্তে ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের পরামর্শ-অনুসারে রাজা দশরথের মৃতদেহ সংকারের আয়োজন করা হইল। মৃতদেহকে তৈলপূর্ণ কটাহ হইতে উত্তোলন করিয়া ভূমিতে স্থাপন করা হইল।

সংকারের সময় ঔর্ধ্বদৈহিক কার্যের জন্য ঋত্বিক্, পুরোহিত এবং আচার্যের প্রয়োজন হইল। সেই যুগে প্রতি গৃহস্থের গৃহে অগ্নিহোত্রের অগ্নি থাকিত। সেই অগ্নি হইতে আনীত অগ্নি দ্বারা হোম করা হইত। মৃতদেহকে শিবিকামধ্যে স্থাপন করাইয়া শ্মশানে বহন করিল, শবদেহের অগ্রে মৃত ব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্ত স্বুবর্ণ, রৌপ্য ও বস্ত্র রাজপথে ছড়াইয়া দেওয়া হইল।

পদ্মক, দেবদারু, চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা চিতা সজ্জিত করা হইল। চন্দন, অগুরু, গুগ্গুল প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য চিতামধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। ঋত্বিক্‌গণ চিতামধ্যে দশরথের শব স্থাপন করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলেন, কালোচিত মন্ত্র জপ করিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে সামগান করিলেন।

> তত্র সংবেশয়ামাসুশ্চিতামধ্যে তমৃত্বিজঃ ॥
> তদা হুতাশনং হুত্বা জেপুস্তস্য তু ঋত্বিজঃ।
> জগুশ্চ তে যথাশাস্ত্রং তত্র সামানি সামগাঃ॥
> ২।৭৬।১৭-১৮

শ্মশানে রাজমহিলারা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারা পদব্রজে গমন করিতেন না। শিবিকা এবং রথে শ্মশানে গমন করিলেন। নারী ও ঋত্বিক্‌গণ চিতাগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। শবদাহ শেষ হইলে রাজকুমার ভরত পুরনারী, পুরোহিত এবং অমাত্যগণ সহ সরযূতীরে গমন করিয়া উদকক্রিয়া বা তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

> কৃত্বোদকং তে ভরতেন সার্দ্ধং
> নৃপাঙ্গনামন্ত্রিপুরোহিতাশ্চ।
> পুরং প্রবিশ্যাশ্রুপরীতনেত্রা
> ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত দুঃখম্। ২।৭৬।২৩

অনন্তর দশ দিন ভূমিশয্যায় অতিবাহিত করিলেন। দশ দিবস অতীত হইলে একাদশ দিবসে দশরথ-তনয় ভরত কৃতাশৌচ হইলেন, দ্বাদশ দিবসে ঋত্বিক্‌গণ শ্রাদ্ধকার্য সমাধা করিলেন। শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে মৃত রাজার পারলৌকিক মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অন্ন, ধন, রত্ন, রজত, ছাগ, গো, দাসদাসী ও গৃহ দান করিলেন। ত্রয়োদশ দিবসে পিতার অস্থি সংগ্রহ করিবার জন্য শ্মশানে উপস্থিত হইলেন।

> বশিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ।
> ত্রয়োদশোঽয়ং দিবসঃ পিতুর্বৃত্তস্য তে বিভো।
> সাবশেষাস্থিনিচয়ে কিমিহ ত্বং বিলম্বসে॥ ২।৭৭।২১-২২

দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় পুত্র ভরত মৃত পিতার পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরে রামচন্দ্র ভরতের নিকট পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া বিলাপ করিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, "তুমি পাবার্ণ ইষ্ট ইঙ্গুদীফল আনয়ন কর। নূতন চীরবসন আহরণ কর, মহানুভব পিতার তর্পণাদির জন্য গমন করিব।"

> আনয়েঙ্গুদিপিণ্যাকং চীরমাহর চোত্তরম্।
> জলক্রিয়ার্থং তাতস্য গমিষ্যামি মহাত্মনঃ॥ ২।১০৩।২০

তর্পণ-উদ্দেশ্যে সীতাকে পুরোভাগে উপস্থাপিত করিয়া রামলক্ষ্মণ মন্দাকিনী অভিমুখে গমন করিলেন। জলে অবতরণ করিয়া রামচন্দ্র পিতার নামগোত্র উচ্চারণপূর্বক তর্পণজল প্রদান করিলেন। দক্ষিণমুখী হইয়া রামচন্দ্র জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উচ্চারণ করিলেন :—

> এতত্তে রাজশার্দূল বিমলং তোয়মক্ষয়ম্।
> পিতৃলোকগতস্যাদ্য মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতু॥ ২।১০৩।২৭

তর্পণ সমর্পিত হইলে রামচন্দ্র পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলেন। এই পিণ্ড বদরীফলমিশ্রিত তিলকল্কযুক্ত দর্ভাসংস্তরে ইঙ্গুদীফল দ্বারা রচিত হইয়াছিল। পিণ্ডদান কালে রামচন্দ্র পিতার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"হে মহারাজ, আমাদিগের যাহা ভোজ্য তাহাই ভোজন করুন। মানুষ নিজে যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহার পিতৃগণ ও দেবতাসকল তাহাই আহার করেন।"

> ঐঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে।
> ন্যস্য রামঃ সুদুঃখার্তো রুদন্ বচনমব্রবীৎ॥

ইদং ভুঙ্‌ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্‌।
যদন্নাঃ পুরুষাঃ রাজন্‌ তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ ॥
২।১০৩।২৯—৩০

দশরথের সংকার ও শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন মানবের সংকার ও শ্রাদ্ধের কোন উল্লেখ রামায়ণে পাওয়া যায় না।

রাম তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিলেন কিন্তু তাহার মৃতদেহের সংকারের সম্বন্ধে কোন বিবরণ রামায়ণে নাই।

রামচন্দ্র বিরাধ রাক্ষসকে পরাজিত করিলেন। এই বিরাধ পূর্বে তুম্বুরু নামধারী একজন গন্ধর্ব ছিলেন। কুবেরের শাপে গন্ধর্ববীর তুম্বুরু রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইয়া বিরাধ নামক রাক্ষসরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইলে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশে বিরাট গর্ত খনন করিয়া বিরাধ রাক্ষসকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করিলেন। রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে, মৃত্যুর পরে গর্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া রাক্ষস-দিগের চিরন্তন ধর্ম। মৃত্যুর পর যে সকল রাক্ষস গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহারা সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকে।

রক্ষসাম্‌ গতসত্ত্বানাম্‌ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ। ৩।৪।২২

সুতরাং দেখা যায় যে, কোন কোন রাক্ষস-শ্রেণীর মধ্যে মৃতদেহ প্রোথিত করার রীতি ছিল, কারণ উহা পারলৌকিক মঙ্গলার্থ বিহিত ছিল। রাক্ষসের মধ্যে মৃতদেহের সলিলসমাধিও দেওয়া হইত। লঙ্কায় যুদ্ধের সময় রাবণের আদেশে মৃত রাক্ষসদিগকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

যে হন্যন্তে রণে তত্র রাক্ষসকুঞ্জরৈরঃ।
হতাহতস্তে ক্ষিপ্যন্তে সর্বে এব তু সাগরে ॥ ৬।৫৬।৭২

সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে রাম জটায়ুর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, গৃধ্ররাজ জটায়ু দশরথের বন্ধু ছিলেন এবং সীতারক্ষাহেতু যুদ্ধে তিনি রাবণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন "এই বিহঙ্গরাজ আমার পিতৃবন্ধু, সুতরাং তিনি পিতৃতুল্য মাননীয় ও পূজনীয়। লক্ষ্মণ, তুমি কাষ্ঠ সংগ্রহ কর। আমি অগ্নি উৎপাদন করিয়া এই গৃধ্ররাজের সংকার করিব। কেননা, তিনি আমাদের হিতের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

রামচন্দ্রের এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, পিতৃবন্ধুর পারলৌকিক কার্যে বন্ধুপুত্রের অধিকার ছিল এবং এই জাতীয় প্রাণীদিগের দেহ অগ্নিতে দাহ করা হইত।

তারপর রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ কাষ্ঠদ্বারা চিতা রচনা করিলেন এবং রামচন্দ্র জটায়ুকে জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে সংস্থাপন পূর্বক তাঁহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

এবমুক্ত্বা চিতাং দীপ্তামারোপ্য পতগেশ্বরম্‌।
দদাহ রামো ধর্মাত্মা স্ববন্ধুমিব দুঃখিতঃ ॥ ৩।৬৮।৩২

পরে তিনি মৃগমাংস দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া বৃহৎ কুশোপরি জটায়ুর উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলেন। রোহিমাংসানি চোদ্ধৃত্য পেশীকৃত্বা মহাযশাঃ এবং ব্রাহ্মণেরা যে মন্ত্রজপ দ্বারা প্রেতের স্বর্গগমনে সাহায্য করেন, সেই মন্ত্র জপ করিলেন।

যৎ তৎ প্রেতস্য মর্ত্যস্য কথয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
তৎ স্বর্গগমনং ক্ষিপ্রং তস্য রাম জজাপ হ ॥ ৩।৬৮।৩৪

সুতরাং দেখা যায় যে, সেই যুগে মৃগমাংস দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করা হইত, দাহের অব্যবহিত পরে সদ্যসদ্যই প্রেতের উদ্দেশ্যে মন্ত্র জপ করা হইত, ব্রাহ্মণ আদি মানব এবং গৃধ্র প্রভৃতি জাতির পারলৌকিক কার্য একই প্রথায় সম্পন্ন হইত। মৃত্যুর পরে মানব, রক্ষ, যক্ষ প্রভৃতি জাতির স্বর্গ এবং পারলৌকিক কার্যের ধারণা একই প্রকার ছিল।

মন্ত্রজপ ও মৃগমাংস দ্বারা পিণ্ডদান সমাপ্ত করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীতে গিয়া জটায়ুকে জলদান করিয়া উদকক্রিয়া সম্পন্ন

করিলেন। তারপর শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে স্নানপূর্বক তাঁহার তর্পণ সমাপ্ত করিলেন।

ততো গোদাবরীং গত্বা নদীং নরোবরাত্মজৌ।
উদকং চক্রতুস্তস্মৈ গৃধ্ররাজায় তাবুভৌ॥
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা জলং গৃধ্রায় রাঘবৌ।
স্নাত্বা তৌ গৃধ্ররাজায় উদকং চক্রতুস্তদা॥ ৩।৬৮।৩৫-৩৬

জটায়ুর সংকার, শবদাহ, শ্রাদ্ধ, পিণ্ড, মন্ত্রজপ, তর্পণ-ক্রিয়া হইতে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, ভারতের সর্বত্র একই প্রকার পরলোকে বিশ্বাস ছিল এবং একই প্রকার পারলৌকিক কার্যদ্বারা আত্মীয়স্বজন মৃত ব্যক্তির প্রতি কর্তব্য সম্পন্ন করিত।

এই ঘটনার পর রামচন্দ্রের সঙ্গে কবন্ধ দানবের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। এই কবন্ধ দনুর পুত্র ছিলেন। সুতরাং তিনি দানব এবং স্থূলশিরা ঋষির অভিশাপে বিকট রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কবন্ধ দানবের হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন। কবন্ধ বুঝিলেন, তাঁহার মৃত্যু নিকট। তিনি বলিলেন, "রামচন্দ্র আপনি আমাকে আগে দাহ করুন। সূর্যাস্তের পূর্বে আমাকে গর্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া যথাশাস্ত্র দাহ করুন।"

তাবন্মামবটে ক্ষিপ্ত্বা দহ রাম যথাবিধি।
দগ্ধস্ত্বয়াহমবটে ন্যায়েন রঘুনন্দন॥ ৩।৭১।৩২

লক্ষ্মণ চিতা প্রজ্বলিত করিলে অল্পে অল্পে কবন্ধের শরীর দগ্ধ হইল। সুতরাং দেখা যায় যে, দানব সম্প্রদায়ের মধ্যেও মৃতদেহের অগ্নিসংকার করা হইত। এই কবন্ধ অগ্নিসংকারের পরে শাপবিমুক্ত হইয়া রামচন্দ্রকে বানররাজকুমার সদাচারী সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করিবার পরামর্শ দিলেন। কারণ সমদুঃখভাক্ কবন্ধের সাহায্য ব্যতীত রামচন্দ্রের পক্ষে সীতা-উদ্ধার সম্ভব নয়। পত্নীবিচ্যুত রাজপুত্র সুগ্রীব এবং রামচন্দ্রের অবস্থার সমতা ছিল। কবন্ধের উপদেশ সীতার উদ্ধারের পক্ষে সুফলপ্রসূ হইয়াছিল।

বানররাজ বালীর মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে বলিলেন, "তুমি তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালীর সংকারাদি অন্তিমকার্য সম্পাদন কর। তাঁহার সংকারের জন্য বহুল কাষ্ঠ ও সুবাসিত চন্দন সংগ্রহ কর। অঙ্গদ বিবিধ বস্ত্র, মাল্য, গন্ধ, ঘৃত, তৈল আনয়ন করুক।" তারা নামক একজন বানর অমাত্য শিবিকা আনয়ন করিলেন। সেই শিবিকা বর্তমান যুগের মৃতদেহ-বহনোপযোগী সাময়িক প্রয়োজন সাধনের জন্য নির্মিত বাহিকা নয়। উহা সিদ্ধগণের বিমানের ন্যায়। উহাতে বিচিত্র পুষ্পমাল্যশোভিত, চিত্রাঙ্কিত জাল সদৃশ বাতায়ন ছিল।

মৃত বালীকে বহু অলঙ্কার, বস্ত্র, মাল্যদ্বারা ভূষিত করিয়া শিবিকায় স্থাপন করা হইল।

ততো বালিনমুদ্যম্য সুগ্রীবঃ শিবিকাং তদা।
আরোপয়ত বিক্রোশন্নঙ্গদেন সহৈব তু॥
আরোপ্য শিবিকাঞ্চৈব বালিনং গতজীবিতম্।
অলঙ্কারৈশ্চৈব বিবিধৈর্মাল্যৈর্বস্ত্রৈশ্চ ভূষিতম্॥ ৪।২৫।২৮-২৯

বানরগণ মৃতদেহ নদীকূলে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বহন করিয়া আনিল, পথে তাহারা অগ্রে অগ্রে নানাবিধ ধনরত্ন বিতরণ করিতে করিতে চলিল। অঙ্গদ স্বয়ং পিতাকে চিতায় আরোহণ করাইলেন। তিনি মৃত পিতাকে শাস্ত্র বিধি অনুসারে অগ্নিপ্রদান করিলেন এবং দগ্ধ চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন।

সুগ্রীবেণ ততঃ সার্দ্ধং সোহঙ্গদ পিতরং রুদন্।
চিতামারোপয়ামাস শোকেনাভিপ্লুতেন্দ্রিয়ঃ॥
ততোহগ্নিং বিধিবদ্দত্বা সোপসব্যং চকার হ॥
পিতরং দীর্ঘমধ্বানং প্রস্থিতং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪।২৫।৪৯-৫০

তারপর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক নদীসলিলে উদকক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। বানরের মধ্যে নারীগণ পারলৌকিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিতেন। সুগ্রীব, তারা ও অন্যান্য বানরগণ অঙ্গদকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

ততস্তে সহিতাস্তত্র অঙ্গদং স্থাপ্য চাগ্রতঃ।
সুগ্রীবতারাসহিতাঃ সিষিচুর্বানরাঃ জলম্॥ ৪।২৫।৫২

বালীর শ্মশানকার্যের উল্লেখ রামায়ণে আছে, কিন্তু তাঁহার শ্রাদ্ধের বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। এই সংকারের মধ্যে দেখা যায়, মৃতদেহতে চন্দনকাষ্ঠ সজ্জিত করা হইত। মৃতদেহবহনের সময় পথে পথে ধনরত্ন বিতরণ করা হইত। পুত্র মৃতদেহের মুখে অগ্নিসংযোগ করিত। শবদাহ শেষ হইলে নদীসলিলে উদকক্রিয়া সমাপ্ত করিত। নারীগণও পারলৌকিক ক্রিয়াতে যোগদান করিত।

জটায়ুর ভ্রাতা তাঁহার মৃত ভ্রাতার উদকক্রিয়া বরুণালয়ে সমুদ্রতীরে সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

সমুদ্রং নেতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্বরুণালয়ম্।
প্রদাস্যাম্যুদকং ভ্রাতুঃ স্বর্গতস্য মহাত্মনঃ॥ ৪।৫৮।৩৩

বহু রাক্ষস ও বানরবীর লঙ্কাযুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তাহাদের মৃতদেহ সংকারের কোন সংবাদ রামায়ণে নাই। মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। ৬।৫৬।৭২

ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হইলে রাবণ স্বয়ং তাঁহার প্রেতকার্য সম্পন্ন করিলেন। ইন্দ্রজিতের পারলৌকিক কার্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ নাই। কেবল একমাত্র রাবণের বিলাপের অবসরে রাবণ বলিয়াছিলেন—"হে বীরপুত্র! কোথায় আমি যমালয়ে গমন করিলে তুমি আমার প্রেতকার্য করিবে, তাহা না করিয়া আমাকেই তোমার বিপরীত প্রেতকার্য করিতে হইল।"— অর্থাৎ পিতা হইয়া পুত্রের প্রেতকার্য রাবণ সম্পন্ন করিলেন।

মম নাম ত্বয়া বীর গতস্য যমসদনম্।
প্রেতকার্যানি কার্যানি, বিপরীত হি বর্ততে। ৬।০৩।১৪।

এইখানে দেখা যায় যে, রাক্ষসসমাজে পিতা অবস্থাবিশেষে পুত্রের পারলৌকিক কার্যের অধিকারী। রাক্ষসরাজ রাবণের প্রেতকৃত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। রাবণ নিহত হইলে রামচন্দ্র শোকার্ত বিভীষণকে বলিলেন,—"যাহারা জয়ের আশায় ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনপূর্বক সম্মুখ রণে প্রাণ বিসর্জন করে তাহাদের নিমিত্ত শোককরা উচিত নয়। ...... " প্রাচীনগণ সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়সম্মতা গতি বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব ক্ষত্রিয় রণমধ্যে নিহত হইলে তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়।

নৈবং বিনষ্টাঃ শোচ্যন্তে ক্ষত্রধর্মব্যবস্থিতাঃ।
বৃদ্ধিমাশংসমানা যে নিপতন্তি রণাজিরে॥
ইয়ং হি পূর্বৈঃ সান্দিষ্টা গতিঃ ক্ষত্রিয়সম্মতা।
ক্ষত্রিয়ো নিহতঃ সংখ্যে ন শোচ্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥
৬।১১১।১৫,১৮

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, রাবণ রাক্ষসসমাজভুক্ত হইলেও ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়ধর্মানুযায়ী তাঁহার সংকারকার্য সম্পন্ন করা উচিত। বিভীষণ বলিলেন, "রাবণ আহিতাগ্নি, মহাতেজস্বী, বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।"

ইহার দ্বারা বিভীষণ বলিতে চাহিলেন—রাক্ষসরাজ রাবণের সংকার্য যথাবিধি সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

এষোহহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ বেদান্তগঃ কর্মসু চাগ্র্যশূরঃ।
এতস্য যৎ প্রেতগতস্য কৃত্যং তৎ কর্তুমিচ্ছামি তব প্রসাদাৎ॥
৬।১১।২৩

লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরী প্রবেশপূর্বক দশাননের অগ্নিহোত্র বাহির করিলেন। অচিরকালমধ্যে শকট, দারুপাত্র, চন্দন, অগুরু ও অন্যান্য বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ, গন্ধদ্রব্য, মণিমুক্তা, প্রবাল এবং অগ্নি সংগ্রহ করিলেন।

সা প্রবিশ্য পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ।
রাবণস্যাগ্নিহোত্রন্তু নির্যাপয়তি সত্বরম্॥
শকটান্ দারুপাত্রাণি অগ্নীন্ বৈ যাজকাংস্তথা।
তথা চন্দনকাষ্ঠানি কাষ্ঠানি বিবিধানি চ॥
অগুরূণি সুগন্ধীনি গন্ধাংশ্চ সুরভীংস্তথা।
মণিমুক্তাপ্রবালানি নির্যাপয়তি রাক্ষসঃ॥
৬।১১৩।১০৪—১০৬

এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনায়ন করা হইলে রাবণের মাতামহ মাল্যবানের সহযোগে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

আরম্ভ হইল। রাক্ষসরাজকে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করাইয়া সুবর্ণময় দিব্য শিবিকায় আরোহণ করাইলেন। সেই শিবিকা বিচিত্র মাল্য ও পতাকায় সুশোভিত করা হইল। ব্রাহ্মণ রাক্ষসগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। এইখানে দেখা যায় যে, রাক্ষসের মৃতদেহকে নববস্ত্র পরিধান করান হইত। রাজা দশরথ এবং বানররাজ বালীকেও নূতন বস্ত্র পরিধান করানো হইয়াছিল। পারলৌকিক কার্যের জন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল এবং ইহা স্বয়ং বাল্মীকি উল্লেখ করিয়াছেন।

সৌবর্ণীং শিবিকাং দিব্যামারোপ্য ক্ষৌমবাসসম্।
রাবণং রাক্ষসাধীশমশ্রুপূর্ণমুখা দ্বিজাঃ॥ ৬।১১৩।১০৭

তারপর রাবণের মৃতদেহ বেদোক্ত বিধি অনুসারে দাহের জন্য চন্দনকাষ্ঠ, পদ্মক, উশীর ও চন্দন দ্বারা অগ্নিকোণে চিতা নির্মাণ করা হইল। ঋত্বিক্‌গণ বেদী নির্মাণপূর্বক যথাস্থানে অগ্নিস্থাপন করিলেন। রাক্ষসরাজের পিতৃমেধবিহিত কর্ম সমাপন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ মৃতের স্কন্ধদেশে দধি ও আজ্যপূর্ণ স্রব, পদদ্বয়ে শকট, উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে উদূখল এবং অরণি—উত্তর অরণি এবং অন্যান্য দারুপাত্রসকল যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। শাস্ত্র-বিধান অনুসারে মেধ্য পশু হনন পূর্বক তাহার চর্মদ্বারা রাক্ষসরাজের মুখ আবৃত করিলেন। তারপরে রাক্ষসরাজের দেহ গন্ধ, মাল্য এবং বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অলঙ্কৃত দেহের উপরে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন। সর্বশেষে বিভীষণ যথাবিধি অগ্নি প্রদান করিলেন।

রাবণং প্রয়তে দেশে স্থাপ্য তে ভৃশদুঃখিতাঃ।
চিতাং চন্দনকাষ্ঠৈশ্চ পদ্মকোশীরচন্দনৈঃ॥
ব্রাহ্ম্যা সংবর্তয়ামাসু রাঙ্কবাস্তরণাবৃতাম্।
প্রচক্রু রাক্ষসেন্দ্রস্য পিতৃমেধমনুত্তমম্॥
বেদীং চ দক্ষিণাপ্রাচীং যথাস্থানঞ্চ পাবকম্।
পৃষদাজ্যেন সম্পূর্ণং স্রুবং স্কন্ধে প্রচিক্ষিপুঃ॥
পাদয়োঃ শকটং প্রাদাদন্তরূর্বোরুলূখলম্।
দারুপাত্রাণি সর্বাণি অরণিঞ্চোত্তরারণিম্॥
দত্ত্বা তু মুষলম্ চান্যং যথাস্থানং বিচক্রমুঃ।
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষিবিহিতেন চ।
তত্র মেধ্যং পশুং হত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ॥
পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন্।
গন্ধৈর্মাল্যৈরলংকৃত্য রাবণং দীনমানসাঃ॥
বিভীষণসহায়াস্তে বস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি।
লাজৈরবকিরন্তি স্ম বাষ্পপূর্ণমুখাস্তদা॥ ৬।১১৩।১১২-১৭

শবদাহান্তে শ্মশানবন্ধুগণ স্নান সমাপ্ত করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে বিধিপূর্বক তিল ও দর্ভ মিশ্রিত উদকাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

স্নাত্বা চৈবার্দ্রবস্ত্রেণ তিলান্ দর্ভবিমিশ্রিতান।
উদকেন চ সম্মিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্বকম্॥ ৬।১১৩।১১

রামায়ণে বর্ণিত সংকার এবং শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কার্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে মানব, দানব, দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি জাতির পরলোকে বিশ্বাস ছিল। মৃতদেহের সংকারের উপর ঊর্ধ্ব দৈহিক গতি নির্ভর করে বলিয়া এই সমস্ত জাতি বিশ্বাস করিত। শবদেহকে দাহ করা, জলে নিক্ষেপ করা, ভূমিতে প্রোথিত করা প্রথাই প্রশস্ত ছিল। মানব দশরথ, শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব বিরাধ, গৃধ্ররাজ জটায়ু, বানররাজ বালী, রাক্ষসরাজ রাবণকে দাহ করা হইয়াছিল। শাপগ্রস্ত দানব কবন্ধকে প্রোথিত করা হইয়াছিল। লঙ্কায় নিহত রাক্ষসগণকে সমুদ্র-জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

শববহনের সময় ধনরত্নাদি বিতরণ করা হইত। শবদেহ বহনের জন্য শিবিকা ব্যবহার করা হইত। দাহকার্যের জন্য চিতা, চিতার জন্য চন্দনকাষ্ঠ, অগুরু, মাল্য, গুগ্গুল্ ইত্যাদি ব্যবহার করা হইত। দশরথ, বালী এবং রাবণের জন্য এই সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করা হইয়াছিল। জটায়ু এবং বিরাধকে বনমধ্যে দাহ করা হইয়াছিল, সুতরাং বনবাসী রামের দ্বারা ঐ সমস্ত দ্রব্যসংগ্রহের উপায় ছিল না।

চিতায় অগ্নিসংযোগের নিমিত্ত পরিবারের জন্য সুরক্ষিত অগ্নিই ব্যবহার হইত। দশরথের ও

রাবণের জন্য গৃহসংরক্ষিত অগ্নিহোত্র হইতে সংগৃহীত অগ্নি ব্যবহৃত হইয়াছিল। (২।৭৩।১৩) জ্যেষ্ঠপুত্র, জ্যেষ্ঠের অভাবে অন্যপুত্র, পুত্রের অভাবে পিতা (রাবণ মেঘনাথের কার্য), পিতৃবন্ধু (জটায়ুর কার্যে রাম), বা ভ্রাতাকে (রাবণের প্রেতকার্যে ভ্রাতা বিভীষণ) ঊর্ধ্বদৈহিক কার্যের অধিকারীরূপে রামায়ণে দেখা যায়। অগ্নিসংযোগের পরেই প্রেতের উদ্দেশ্যে মন্ত্রজপ করা হইত। দশরথ ও রাবণের প্রেতকার্যে ব্রাহ্মণ কর্তৃক মন্ত্র জপ করা হয়। (২।৭৬।১৭-১৮) ঋত্বিক্, পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ শ্মশানকার্য সমাধা করিতেন। শ্মশানে হোম করার বিধি ছিল। দশরথের শ্মশানে হোম করা হইয়াছিল। (২।৭৬।১৩)

দগ্ধ চিতা প্রদক্ষিণ করার রীতি ছিল। নারী ও ঋত্বিক্‌গণ দশরথের চিতা প্রদক্ষিণ করেন। অঙ্গদ বালীর চিতা প্রদক্ষিণ করেন। বিভীষণ ও পুরনারী-গণ রাবণের চিতা প্রদক্ষিণ করেন। নারীগণ শ্মশান-কার্যে উপস্থিত থাকিতেন।

মেধ্য পশু হনন করিয়া তাহার চর্মদ্বারা রাবণের শবদেহের মুখকে আবৃত করা হইয়াছিল। (৬।১১৩।১১৭) রাবণের শবদেহের মতন অন্য কাহারো দেহকে আবৃত করা হয় নাই। চীরবসন দ্বারা দশরথের দেহ, বালীর দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হয়। রাবণের মৃতদেহকে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করান হয়।

ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর পর দশ দিবস অশৌচ থাকিত। একাদশ দিনে কৃতাশৌচ হয়। দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধান্তে ব্রাহ্মণকে দান করা হয় (২।৭৭।২১)। ত্রয়োদশ দিবসে শবের অস্থি সংগ্রহ করার রীতি ছিল। (২।৭৭।২২) বালী বা রাবণের শ্রাদ্ধবিষয়ের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। মৃতের সৎকারের পর পিণ্ডদান করা হইত। জটায়ুর পিণ্ডদান করা হইয়াছিল (মাংসদ্বারা), দশরথের পিণ্ডদান করা হইয়াছিল বদরী, তিল ও ইঙ্গুদীফল দ্বারা (২।১০৩।২৯)। জল দ্বারা তর্পণ-বিধি মানব, বানর এবং রাক্ষসের মধ্যে যেমন দেখা যায়, তেমন জটায়ুর জন্য তাঁহার ভ্রাতা সম্পাতি এবং রামচন্দ্র স্বয়ং তর্পণ করিয়াছিলেন। (৪।১১।৩৬)। তর্পণের জন্য নদীতীর প্রশস্ত স্থান। ভরত কর্তৃক দশরথের উদকক্রিয়া সরযূতীরে সম্পন্ন হয় (২।৭৬।২২)। রামচন্দ্র দশরথের উদকক্রিয়া মন্দাকিনী তীরে সম্পন্ন করেন (২।১১৩।২৮)। জটায়ুর উদকক্রিয়া রামচন্দ্র কর্তৃক গোদাবরী তীরে সম্পন্ন হইয়াছিল (৩।৬৯।৩৫)। সম্পাতিকে তাঁহার ভ্রাতার উদকক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বরুণালয়ে সমুদ্রতীরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রাবণের শ্মশানকার্য সমাপ্ত হইলে বিভীষণ প্রভৃতি সকলেই স্নান করিয়াছিলেন। সুতরাং রাবণের শ্মশানের পার্শ্বে নিশ্চয় জলাশয় ছিল, সেখানে কোন নদীর উল্লেখ নাই।

"তোমরা সহস্র সহস্র সমিতি গঠন করিতে পার, বিশ হাজার রাজনৈতিক সম্মিলন করিতে পার, পঞ্চাশ হাজার শিক্ষালয় স্থাপন করিতে পার; কিন্তু এই সকলে কিছুই ফল হইবে না, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই সহানুভূতি, সেই প্রেম আসিতেছে, যতদিন না তোমাদের ভিতর সেই হৃদয় আসিতেছে—যাহা সকলের জন্য ভাবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বেলুড়মঠে প্রথম দুর্গোৎসব

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

[বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে আছে ; তথাপি ঐ অবিস্মরণীয় ঘটনার অনেক প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হিসাবে বর্তমান লেখক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যযুক্ত এই যে স্মৃতিধ্যানটি পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা পাঠকপাঠিকাগণের উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই।—উঃ সঃ]

প্রায় তিপ্পান্ন বৎসর আগেকার কথা। সেই পুণ্য স্মৃতি আজও মাঝে মাঝে মনে উদিত হয়। পুরাতন জীর্ণ কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে একদিন এক টুকরা নিজের লেখা ১৩০৮ সালের দিন-তারিখ-সমেত বেলুড়মঠের দুর্গোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাইলাম। এই স্মৃতির অর্ঘ্য পাঠকবর্গকে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইব।

বাংলা ১৩০৮ সাল—ইংরেজী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ। সেবার মহালয়া ২৬শে আশ্বিন, শনিবার। বেলুড়মঠে গিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দ আছেন। কয়েকমাস পূর্বে পূর্ববঙ্গ ও কামাখ্যাতীর্থ দর্শন করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এই ভগ্ন স্বাস্থ্যেই সদানন্দ মহাপুরুষের মুখমণ্ডল দিব্য ভাব-জ্যোতিতে দীপ্তিমান্। আকর্ণবিস্তৃত নয়নদ্বয় তেজঃপূর্ণ, প্রেমকরুণায় সমুজ্জ্বল। মহালয়ার দিন মঠে শুনিলাম, বেলুড়মঠে প্রতিমায় দুর্গোৎসব হইবে, ইহা ঠিক হইয়াছে।

সুহৃদ্বর, 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর মুখে পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, কামাখ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মৃন্ময়ী প্রতিমাতে শ্রীশ্রীমা দশভুজার পূজার সঙ্কল্প স্বামীজীর মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু মহালয়ার পূর্বে বহু বার যাতায়াত করিয়াও কাহারও নিকট স্বামীজীর এই সঙ্কল্পের কথা শুনিতে পাই নাই। মহালয়ার দিন অপরাহ্নে পশুপক্ষীদের লইয়া খানিকক্ষণ খেলা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী বিল্বমূলে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া তিনি মধুরকণ্ঠে আপন মনে গাহিতে লাগিলেন—বোধনের গান।

"গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি ॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, কর্ণে শুনব চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী জটাজুটধারী ॥
মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী
লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী
সুরেশ কুমার গণেশ আমার
তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন-বারি ॥"

ঠাকুরঘরে সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—স্বামীজী ধীরে ধীরে দোতালায় নিজকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই রাত্রিতে আমি মঠে বাস করিলাম। পরদিন রবিবার প্রাতে একটু বেলা হইলে স্বামীজী নীচে নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মঠের গঙ্গা-তীরের বারান্দায় হেলানদেওয়া বেঞ্চিতে বসিলেন। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও স্বামী প্রেমানন্দজী সেখানে আসিলেন। তাঁহাদের সহিত ৺পূজার আয়োজন এবং নানাবিধ বন্দোবস্তের প্রসঙ্গ আলোচিত হইল। নানা স্থানে গৃহস্থ ভক্তগণ এবং বালি উত্তরপাড়া প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে, জাতিবর্ণনির্বিচারে সকলকে এবং বিশেষভাবে দরিদ্রনারায়ণগণকে পূজার দিবসত্রয় প্রতিমাদর্শন ও প্রসাদগ্রহণের আমন্ত্রণ করিবার

কথা হইল। স্বামীজী গুরুভ্রাতৃদ্বয়কে বলিলেন—"খরচের জন্য ভাবনা নেই—মহামায়ার ইচ্ছা, তা পূর্ণ হবে। নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে মা ঠাকরুণ সদলবলে থাকবেন। একমাসের কম যখন ভাড়া দেবে না —তখন তাই স্বীকার করে নিতে হবে।" মহারাজ বলিলেন,—"ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। এখন প্রতিমা পেলে হয়। কুমারটুলিতে কোনও কুমোরই এত অল্প সময়ে নূতন প্রতিমা তৈয়ার করতে রাজী হল না। তৈয়ারী প্রতিমাতো কৃষ্ণলাল * পেলে না। একজনের মাত্র একখানি ফরমাশী প্রতিমা আছে, ৫।৭ দিন পূর্বে তার নেবার কথা ছিল, কিন্তু নেয়নি। কৃষ্ণলাল ঐ প্রতিমাখানি নিতে চাইলে—খুব ইতস্ততঃ করছে, আরও দুদিন অপেক্ষা করতে চাইছে।"—

স্বামীজী বলিলেন,—"বাবুরাম, তুই যা কৃষ্ণলালকে নিয়ে। যে টাকা চায় সেই টাকা দিয়ে প্রতিমাখানি কিনে ফেল্। কৃষ্ণলাল ছেলেমানুষ, তোরা গেলে সে রাজী হ'য়ে যাবে। আমিও তোদের সঙ্গে কলকাতায় যাব।"

গুরুভ্রাতারা অমনি বলিয়া উঠিলেন—"তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমরা সব করব। তুমি এখানে বসে থাক। ঠাকুরের ইচ্ছায় তোমার শরীর ভাল থাকলে, তবে তো আনন্দময়ীর উৎসবে সকলে আনন্দোৎসব করতে পারবে।"

স্বামীজী বলিলেন—"মার কৃপায় ভাল থাকব, ভাবিস নি। প্রতিমা ঠিক করে মা ঠাকরুণকে নিমন্ত্রণের পর সিমলা আমার মার কাছে যাব, তাঁকে পূজোয় মঠে আসতে বলব। আজ রবিবার, এখনই নৌকা ঠিক কর, আর দেরি করা হবে না। প্রতিমাখানি না কেনা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় না।"

কানাই মহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) নিকট শুনিলাম, দুইদিন আগে স্বামীজী নৌকায় কলিকাতা হইতে মঠে আসিবার সময় দেখিলেন যেন মঠে দুর্গোৎসব হইতেছে, মায়ের প্রতিমাখানি চারিদিক আলো করিয়া শোভা পাইতেছে। মঠে নামিয়াই রাজা (মহারাজ) কোথায় খোঁজ হইল। মহারাজ আসিলে তাঁহাকে "এবার মঠে প্রতিমা এনে দুর্গোৎসবের আয়োজন কর্" বলিয়াই স্বামীজী তাঁহার দর্শনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। মহারাজও বলিলেন,—"মঠে এই বেঞ্চিতে বসে গঙ্গাদর্শন করছি—এমন সময় দেখি, মা দুর্গা দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে চলে এসে একেবারে বেলতলায় উঠলেন।" তাহা শুনিয়া স্বামীজী আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "যেরূপে হোক এবার মঠে পূজো করতেই হবে।" মহারাজ বলিলেন, "সময় সংক্ষেপ—আগে প্রতিমা পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিতে হবে—দুদিন পরে তোমাকে কথা দেব।" এদিকে মঠের সাধুব্রহ্মচারীরা আয়োজন ও নিমন্ত্রণ করিতে ইতোমধ্যেই আরম্ভ করিয়াছেন, মঠে দুর্গোৎসব—স্বামীজীর ইচ্ছা কে রোধ করিবে ?

যে প্রতিমা কুমারটুলিতে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল দেখিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, তাহার গ্রাহক আর আসে নাই। স্বামী প্রেমানন্দ কুমারের প্রার্থিত মূল্য দিয়াই কিনিলেন।

৩১শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর), বৃহস্পতিবার মঠের সাধু ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা নৌকায় করিয়া মঠের ঘাটে তুলিলেন,—ধীরে ধীরে যত্নসহকারে ঠাকুর ঘরের নীচের দালানে প্রতিমা রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে প্রবল বৃষ্টি—আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িল। মঠের জমিতে উত্তর দিকে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসবে এখন বৃহৎ মণ্ডপ নির্মিত হয়—সেইখানে সেবার শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। জলঝড় হইলেও যাহাতে কোনও প্রতিবন্ধক না হয়, সেইরূপ সাবধানতার সঙ্গে মণ্ডপটি তৈয়ার করা হইয়াছিল।

* পরে স্বামী ধীরানন্দ

১লা কার্তিক (১৮ই অক্টোবর) ষষ্ঠীতে বিল্বতলায় বোধন হইল—

"বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন—"

স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত সেই গীত সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। শ্রীশ্রীমাও এইদিন কলিকাতা বাগবাজার হইতে অন্যান্য পরিজনবর্গ ও মেয়ে ভক্তদের লইয়া গঙ্গাতীরে নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রতিমা মণ্ডপে আনা হইল। কলিকাতা হইতে বহু প্রাচীন ও নবীন ভক্ত আসিয়াছিলেন। মহোৎসব আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রী-জগজ্জননী দুর্গামায়ীর আজ বোধন, অধিবাস ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। অগ্রে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লইয়া পূজা করিতে বসিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল এবং তন্ত্রধারক হইলেন পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) পূর্বাশ্রমের পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। ঈশ্বরচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

প্রতিমার সম্মুখে যখন পূজক ব্রহ্মচারী ভক্তিভাবে অর্চনায় সমাসীন, পার্শ্বে দীর্ঘকেশ শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত রুদ্রাক্ষমালা পরিশোভিত তেজোদীপ্ত কাষায়বস্ত্রধারী তন্ত্রধারক ঈশ্বরচন্দ্র সুললিত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন—তখন দর্শনার্থীরা তন্ময়চিত্তে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিল। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীবক্ষে প্রাতঃকালে রসুনচৌকীর সানাই মধুরস্বরে নানা রাগিণীতে বাজিতেছিল এবং মাঝে মাঝে ঢাকঢোল দুই কূল পরিপ্লাবিত করিয়া মহামায়ীর পূজাবার্তা বীরগর্বে ঘোষণা করিতেছিল। বালি-উত্তরপাড়া-বেলুড়ের স্থানীয় অধিবাসীদের স্বামী বিবেকানন্দ এবং মঠের সাধুদের সম্বন্ধে কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল। দেখিয়াছি, কেহ কেহ ফলমিষ্টি প্রসাদস্বরূপে গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত। কিন্তু মঠে ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীদুর্গা-মায়ীর শাস্ত্রবিহিত বিস্তারিত পূজা, আনুপূর্বিক সকল অনুষ্ঠান, শুদ্ধাচারে ক্রিয়াকলাপ তাহাদের চিত্তে মঠ ও স্বামীজীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক করিল। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেই অপূর্ব পরিবেশ—আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীমার নামে পূজার সংকল্প হইয়াছিল। তাঁহার অনভিপ্রেত বলিয়া পূজায় পশু-বলিদান হয় নাই। ভক্তেরা দেখিতেছেন -একদিকে দশপ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী অসুরদলনী দশভূজা —দক্ষিণে সর্বৈশ্বর্যদায়িনী লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ—বামে পরাবিদ্যাস্বরূপিণী জ্ঞানদাত্রী কমল-দলবাসিনী সরস্বতী ও দেবসেনাপতি কার্তিকেয়—মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী দেবীর আবির্ভাব, অপর দিকে স্বয়ং মহাশক্তি মানবী দেহে শ্রীশ্রীজগজ্জননী মাতৃরূপে অবতীর্ণা—উপাস্য ও উপাসিকা ভাবে পূজামণ্ডপে বিদ্যমানা। এই অপূর্ব ছবি দেখিয়া আনন্দরসে ভক্তদের হৃদয় পরিপ্লুত হইতেছিল।

স্বামীজী মহাষ্টমীর দিন সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় (প্রথম ভাগ) আছে—শ্রীমা বলিতেছেন, "পূজার দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাটছে। নরেন এসে বলে কি, 'মা, আমার জর করে দাও।' ওমা, বলতে না বলতে খানিক বাদে হাড় কেঁপে জর এল।' আমি বলি, 'ওমা, একি হল এখন কি হবে?' নরেন বললে 'কোন চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জর নিলুম এই জন্যে যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে ত খাটছে, তবু কোথাও কি ত্রুটি হবে আমি রেগে যাব, বকবো, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসবো। তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম—কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জরে পড়ে।' তারপর কাজকর্ম চুকে আসতেই আমি বললুম 'ও নরেন, এখন তা হলে ওঠ।' নরেন বললে, 'হাঁ মা, এই উঠলুম

আর কি'—বলে সুস্থ হ'য়ে যেমন তেমনি উঠে বসল।" মাতা পুত্রের এই কথাবার্তা আমাদের তখন অজ্ঞাত। সপ্তমীর দিন সদানন্দময় পুরুষ স্বামীজীকে এদিক ওদিক পায়চারি, গল্প ও হাস্যকৌতুক করিতে দেখিয়াছি—সমাহিত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শ্রীশ্রীদুর্গামণ্ডপে বসিয়া আছেন—কখনও গুণ গুণ স্বরে গাহিতেছেন—

"সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি।"

রবিবার, মহাষ্টমী। মঠে হাজার হাজার নরনারী পূজা দেখিতে ও পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিয়াছে। কেহ কেহ স্বামীজীকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শুনিল স্বামীজী দোতালায় স্বীয় কক্ষে জ্বরে শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। তবুও চারিদিকে আনন্দের হাট চলিয়াছে, হাজার হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পাইতেছে। দরিদ্রনারায়ণদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া খাওয়াইতে হইবে—ইহা ছিল স্বামীজীর আদেশ।

পরদিন সোমবার প্রাতে সন্ধিপূজা—ভোর সাড়ে ছয়টার কিছুক্ষণ পর সন্ধিপূজা আরম্ভ—স্বামীজী পূজা মণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। শ্রীশ্রীদুর্গা প্রতিমার পাদপদ্মে সচন্দনজবাবিল্বদলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন—কে বলিবে গতকল্য তিনি অসুস্থ ছিলেন? উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় সহাস্য মুখমণ্ডল,—ভাবগম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। যথাবিধি কয়েকটি কুমারীর পূজা হইল—স্বামীজী একজনকে পূজা করিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! শ্রীশ্রীমা উপস্থিত ছিলেন।

মহানবমীর সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর স্বামীজী স্বয়ং ভজন গান ধরিলেন। ঠাকুর যেসব গান নবমীর রাত্রিতে গাহিতেন, উহাদের কয়েকটি গাওয়া হইয়াছিল।

৫ই কার্তিক মঙ্গলবার ৺বিজয়া দশমী। অপরাহ্ণে দলে দলে লোক মঠে প্রতিমা-বিসর্জন দেখিতে আসিল। গঙ্গাতীরে মঠের ঘাটটি লোকে লোকারণ্য হইল। প্রতিমা যখন নৌকায় উঠান হইল—তখন ঢাক, ঢোল, রসুনচৌকী এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী বাদ্য ব্যাণ্ড প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল। গঙ্গাবক্ষে প্রতিমা যখন নৌকায় তোলা হইতেছিল, চারিদিকে "মহামায়ী-কী জয় দুর্গামায়ী-কী জয়" শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।—এই সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি বৃন্দাবনী চাদরের গাঁতি বাঁধিয়া সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। দেবী-প্রতিমার সম্মুখে ভাবে বিভোর হইয়া তালে তালে মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহারাজের সেই অপূর্ব ভাবময় মনোরম মধুর নৃত্য সকলে নির্বাক্‌ভাবে মুগ্ধনেত্রে আনন্দোৎ-ফুল্ল হৃদয়ে দর্শন করিল। স্বামীজী ভগ্নস্বাস্থ্যে ভিড়ে নীচে নামিয়া আসেন নাই। কিন্তু পরে মহারাজ নাচিতেছেন শুনিয়া মঠের দোতালার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্য দেখিতে লাগিলেন।

নৃত্য থামিলে চারিদিকে আবার ঘনঘন উচ্চকণ্ঠে "মহামায়ী-কী জয়—দুর্গা মায়ী-কী জয়" ধ্বনি গর্জিয়া উঠিল। ভাগীরথীর তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে নৌকা চলিল—প্রতিমার বিসর্জনে।

পরদিন শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে চলিয়া আসিলেন। আজও বেলুড়মঠে দুর্গোৎসবে সেই স্মৃতি জাগিয়া উঠে। এখনও শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী সাধুব্রহ্মচারীদের অর্চনায় আনন্দময়ীর পূজায় যে আনন্দ ও অপূর্বভাব উদ্দীপিত হয়—তাহা অন্যত্র দুর্লভ।

পূজার মুখ্য উপায় ও উদ্দেশ্য

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শরতের পুনরাগমনে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে শারদ লক্ষ্মীর পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তাঁহার প্রসাদ ও প্রভাব পরিব্যাপ্ত। তড়াগতটিনী ও সরিৎসরোবর বর্ষা-বারিপুষ্ট, কানায়-কানায় পরিপূর্ণ, জলচরসমাকুল, প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পে পরিশোভিত, সন্তরমান মৎস্য ও হংসের ক্রীড়াক্ষেত্র। স্থলে কাশকুসুম ও শেফালিকা পুষ্পে প্রান্তর ও প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ, তৃণ-গুল্ম-লতা-পাদপে পুষ্প-পল্লবের সমাবেশ; ফলফুলে বনভূমি সুশোভিত, ক্ষেত্র-সকল শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ। অন্তরীক্ষে নীলাকাশে বর্ষণলঘু ক্ষুদ্র বৃহৎ মেঘ-সম্ভারের ললিতলীলা; তন্নিম্নে শুভ্র বলাকাশ্রেণীর বিচিত্র বিহার। যামিনীযোগে দীপ্তিমান্ তারকা-পুঞ্জে পরিবেষ্টিত-শশাঙ্ক-কিরণে মহীমণ্ডল উদ্ভাসিত; মৃদুমন্দ বায়ুর স্নিগ্ধ সঞ্চলনে দেহমন পুলকিত। অভাব-অভিযোগের তিরোধানে প্রাচুর্যের সমাবেশ; আধিব্যাধির স্বল্পতা-হেতু গৃহস্থগৃহে সচ্ছলতা-প্রসূত সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজিত। এই তো জগজ্জননী দুর্গাদেবীর শুভাগমনের প্রকৃষ্ট সময়,—অন্নপূর্ণা অম্বিকাদেবীর পূজার্চনার যোগ্য কাল। দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্য যে নাই, তাহা নহে; অশান্তি-উপদ্রব যে ঘটে না, তাহা নহে। তথাপি অন্যান্য ঋতুর তুলনায় শরৎকালই বসন্ত অপেক্ষা সমধিক প্রীতিপ্রদ। পীড়ারও এই সময় প্রচুর প্রশমন ঘটে।

পূজা আমরা কেন করি? পূজার সুমহান উদ্দেশ্য—আধ্যাত্মিক উন্নতি। পুণ্যকামী গৃহীর অভীষ্ট কামনা-বাসনা সংযমন ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব। জীবনযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত দেহ ও মনের উৎকর্ষ-সাধন প্রয়োজন। আহারে যেমন দেহের পুষ্টি,—দৈবকর্মে তেমনি মনের তুষ্টি। মনই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মনই দেহকে পরিচালনা করে। মনই সঙ্কল্পবিকল্পের কর্তা। প্রাণ হইতেই মনের উৎপত্তি। প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই মন। মনের স্থিরতা ঘটিলে, সঙ্কল্প-বিকল্প থাকে না। সেই স্থির মনই আত্মা। প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মা—এই চতুষ্টয় একই। স্থান ভেদে, অবস্থা ভেদ; এবং অবস্থা ভেদে উপাধি ভেদ। প্রাণকে স্থির করিয়া, ভ্রূর ঊর্ধ্বে রাখিতে পারিলে মনরূপ উপাধির নাশ হয়—মন আত্মার স্বরূপ ধারণ করে। মন যখন যে গুণের স্থানে থাকে, তখন তদ্ভাবে প্রভাবান্বিত হয়। কণ্ঠের ঊর্ধ্বে থাকিলে সাত্ত্বিক ভাব, নাভির ঊর্ধ্বে ও কণ্ঠের নিম্নে থাকিলে রাজসিক ভাব এবং নাভির নিম্নে আসিলে তামসিক ভাব। মন সর্বদাই সুখলাভের জন্য লালায়িত। চঞ্চল মন এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে আসক্ত হয়, কিন্তু কোথাও সুখশান্তি লাভ করিতে পারে না। এই চঞ্চল মন কোথায় ও কিরূপে অবিচলিত ভাবে শান্তিলাভ করিতে পারে—তাহাই সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানহেতু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—অভ্যাসযোগের বিশ্লেষণ। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল, সন্দেহ নাই, কিন্তু অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে নিগৃহীত অর্থাৎ নিরুদ্ধ করা যায়। মনের স্থির অবস্থা কিরূপ?

মনঃ স্থিরং যত্র বিনাবলম্বনম্।
বায়ু স্থিরো যত্র বিনাবরোধনম্।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যত্র বিনাবলোকনম্॥

সাধকের মন যখন সাধনা দ্বারা এইরূপ অবস্থা-প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া নিয়মিত হইয়া, সাত্ত্বিকী বৃত্তি লাভ

হয়। ইহা অতি দুরূহ, সন্দেহ নাই। কিন্তু যোগ সহজ-সাধ্য হইতে পারে না; এবং বৈরাগ্যও সহজ-লভ্য নহে। আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া মন উপাধি ধারণ করে এবং সেই মন হইতেই সৃষ্টি। আত্মা যখন নির্গুণ, তখনই তাহার নাম পুরুষ; আর যখন সগুণ, তখন তাহার সংজ্ঞা প্রকৃতি। আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত গুণের স্থান। সংযম-সাধন, অর্থাৎ অভ্যাস-যোগ দ্বারা, মনকে ভ্রূর ঊর্ধ্বে রাখিতে পারিলে, উপাধির নাশ ঘটে। সাধক তখন ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন তিনি "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" দেখেন। আর সাধন দ্বারা কণ্ঠের ঊর্ধ্বে মন রাখিতে পারিলে, রজস্তমঃ অতিক্রম করিয়া কেবল মাত্র সত্ত্বগুণে অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবস্থান করা যায়। তখন তিনি এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্যক্ত দেখেন। আজ্ঞাচক্র হইতে অধোদেশে থাকিলেই ইচ্ছার উদ্ভব হয় এবং সেই ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টি। সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধাবস্থায় সাধক যে সকল কর্ম করেন, তৎসমুদয়ই সাত্ত্বিক কর্ম; কারণ তখন তিনি কামনাশূন্য। ইচ্ছা থাকিলেই কর্মফল ভোগ করিতে হয়। ইচ্ছারহিত হইয়া কর্ম করাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। কর্ম না করিয়া কর্মত্যাগকে ত্যাগ বলে না।

পূজার্চনার প্রথম ও প্রধান অবলম্বন—এই মন। চঞ্চল মন লইয়া কোন কার্য করা সঙ্গত নহে; কারণ তাহাতে কার্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। প্রাণ চঞ্চল বলিয়া মনও চঞ্চল। প্রাণ বিনাবরোধে স্থির হইলে, মনও বিনাবলম্বনে স্থির হয়। যতদিন মনের চাঞ্চল্য একেবারে না যায়, ততদিন অনন্য ভক্তি হয় না। যে অবস্থায় মন রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শাদির দ্বারা বিচলিত না হয়, তাহাই অনন্য ভক্তির অবস্থা। যতদিন ফলাফলে লক্ষ্য থাকে, ততদিন কিছুতেই মনের স্থিরতা জন্মে না। অথচ মন স্থির না হইলে পূজার্চনা তো দূরের কথা, কোন কর্মই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না। এই হেতু সাধনদ্বারা মন স্থির করিতে হয়। মন স্থির করিতে পারিলে, সর্ব কার্য সিদ্ধ হয়,—ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। প্রাণের সংযম, অর্থাৎ স্থিরতা হইলে, বাক্য, শরীর ও মনের সংযম হয়। প্রাণ কি?

প্রাণো হি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্যতে লোকঃ সর্বং প্রাণময়ং জগৎ ॥

প্রাণই ভগবান্। ভগবান্ প্রাণরূপে প্রতি ঘটে (জীবে) ও সর্বত্র সমানভাবে বিরাজিত আছেন। প্রাণায়ামই আমাদের মুখ্য ধর্ম। এই হেতু আমাদের প্রত্যেক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে। প্রাণকর্মই আত্মকর্ম। আত্মকর্ম—আত্মযোগ। প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া নিয়মিত হইলে উপরে উল্লিখিত সাত্ত্বিকী ধৃতি লাভ হয়। তখন —শম, দম, তপঃ, শৌচ প্রভৃতি স্বাভাবিক কর্মে পরিণত হয়; অর্থাৎ এসব কর্ম চেষ্টা বা ইচ্ছা করিয়া করিতে হয় না। আত্মকর্মদ্বারা মনকে ব্রহ্মে যুক্ত করিতে পারিলে, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষার ত্যাগ হয়; নতুবা ব্রতপূজাদির সময় মন তণ্ডুলমিষ্টান্নাদি উপকরণের দিকে থাকে। এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রতপূজাদি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে স্থির মন ও শুদ্ধ চিত্তের একান্ত প্রয়োজন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥

অনেক বিষয়ে প্রবৃত্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত মোহজালে সমাবৃত এবং কামভোগে আসক্ত হইলে, নরকে নিপতিত হইতে হয়। পূজাপার্বণে—"সত্ত্বসংশুদ্ধি" অর্থাৎ চিত্তের প্রসন্নতা, বিশুদ্ধতা ও উপরতি এবং দুঃখ প্রভৃতি অবসাদেও চিত্তের দৃঢ়তা অত্যাবশ্যক। হিংসা-দ্বেষ-শূন্যভাবে তদ্গতচিত্ত না হইলে দেবতার প্রসাদলাভ ঘটে না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।

মচ্চিত্ত হইলে তুমি আমার প্রসাদে সমুদয়

সাংসারিক দুঃখ উত্তীর্ণ হইবে। সুতরাং তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হইয়া পূজা ও প্রার্থনা করিতে হইবে। পূজা দ্বিবিধ। বাহ্য ও মানস। মানস পূজা যতির ধর্ম অর্থাৎ যাঁহারা মোক্ষ কামনা করেন। আমাদের ন্যায় সাধারণ সাংসারিক লোকের পক্ষে বাহ্য পূজা বিহিত। ঘট-পট-প্রতিমাদিতে পঞ্চ, দশ বা ষোড়শ উপচারে পূজাকে বাহ্য পূজা বলে। বাহ্য পূজা হইতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে, মানস পূজার অধিকার জন্মে। মানস পূজার অর্থ —মনে মনে পূজা। শান্ত, দাস্য অথবা সখ্য,— যে কোন ভাবে, নিজের ইষ্টে ঈশ্বরত্ব আরোপ পূর্বক অথবা বিরাট ঈশ্বরের কোন এক শক্তিকে ধ্যেয়মূর্তিরূপে হৃদাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতে হয়। ইহাতে ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি উভয়ই পরিবর্জনীয়। তবে যাঁহারা সাধারণ গৃহস্থ—পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়-স্বজন লইয়া ঘরসংসার করেন, তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা অসম্ভব। তাঁহারা প্রার্থনা করেন,—

"বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্"।
এবং "বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।"

মা আমাদের কল্পতরু। আমাদের অদেয় তাঁহার কিছুই নাই। আমরা ধন, পুত্র, কলত্র—যাহা চাই, তাহাই পাইতে পারি, যদি আমরা তাহা পাইবার উপযুক্ত হই, আর তাহাতে যদি অন্যের কোন অনিষ্ট না ঘটে।

পরলোকে সুরেশচন্দ্র মজুমদার

গত ২৭শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট, ১৯৫৪) বৃহস্পতিবার, ৬৬ বৎসর বয়সে খ্যাতনামা দেশসেবক শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের আকস্মিক মৃত্যুতে দেশে এবং বিদেশে যাঁহারা এই দৃঢ়চরিত্র চিরকুমার অক্লান্ত কর্মযোগীটিকে জানিতেন তাঁহারাই শোকবিহ্বল হইয়াছেন। মুদ্রণ-শিল্প ও সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অত্যদ্ভুত সাফল্যই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের একমাত্র কথা নয়। দেশসেবার আরও বহুতর ক্ষেত্রে সুরেশ বাবুর মনীষা, অধ্যবসায় এবং কর্মোদ্যমের ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। উদ্বোধন কার্যালয়ের সহিত তাঁহার বহু বৎসরের সংযোগ ছিল। সেই সূত্রে সুরেশ বাবুর উদার চরিত্র ও পরদুঃখকাতরতার আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁহার ন্যায় মানবহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, নিরভিমান, আড়ম্বরহীন দেশসেবকের অভাব বাস্তবিকই অপূরণীয়। বঙ্গজননী ও ভারতমাতার এই কৃতী পুত্রের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

বিবিধ সংবাদ

সংস্কৃত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ—লেবাননের বিখ্যাত কবি ওয়াদি কারিস বোস্তানি ছয়খানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। উহাদের নাম—রামায়ণ, মহাভারত, ভগবদ্গীতা, শকুন্তলা, নলদময়ন্তী এবং পুরাণ। সম্প্রতি ভারতসরকার ছয় হাজার ষ্টার্লিংএ অনুবাদের পাণ্ডুলিপিগুলি কিনিয়া লইয়াছেন।

লণ্ডনে ভারতীয় শিল্পীদের সমাদর—লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইন্স্টিট্যুটে বর্তমানে কমনওয়েলথ শিল্পীদের যে দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী

অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে কয়েকজন ভারতীয় শিল্পী অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতের শিল্পকলা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের শিল্পীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার হইয়াছে। গত ২রা জুলাই লণ্ডনস্থ অষ্ট্রেলীয় হাইকমিশনার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বর্তমান প্রদর্শনীতে যে সকল ভারতীয় শিল্পী অংশ-গ্রহণ করিযাছেন তাঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন পি, চন্দ্র দে। মিঃ দের চারখানি ছবি প্রদর্শিত হইতেছে। অপর একজন ভারতীয় শিল্পীর নাম হইল জে অধিকারী। এই প্রদর্শনীতে তাঁহার তিনখানি ছবি প্রদর্শিত হইতেছে। অন্যান্য ভারতীয় শিল্পীদের নাম হইল—ওম্ স্বরূপ (একখানি ছবি), এফ. এন. সুজা (চারখানি ল্যাণ্ডস্কেপ), দুর্গা লাল (দুইখানি ছবি), এ. টমাস (দুইখানি ছবি), এবং এস. কে. বাখড়ে (যাঁহার 'ক্রুসিফিকশন' নামক কাঠ খোদাইয়ের কাজটি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করিয়াছে)। —ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস্।

সমুদ্রগর্ভে যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি—গত ২৯শে আগষ্ট, ইতালীর সান্‌ফ্রতোসোর নিকট অগভীর উপসাগরে সমুদ্রমগ্ন নাবিক ও ধীবর প্রভৃতির স্মৃতিতে জলের ৩৫ফুট নিম্নে জনৈক ইতালীয় শিল্পী-নির্মিত ভগবান্ যীশুর একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। আটফুট উচ্চ এবং ৮০ টনেরও অধিক ওজনের দণ্ডায়মান মূর্তিটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। জলগর্ভে যীশুর মূর্তিস্থাপন ইতিহাসে এই প্রথম। সকলে আশা করিতেছেন, উক্ত স্থানটি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণের নিকট একটি তীর্থ হইয়া উঠিবে।

হাওড়া 'বিবেকানন্দ রোভার্সক্রু'—এই প্রতিষ্ঠানের ১৩৬০ সালের অষ্টাদশ বার্ষিক সুলিখিত কার্যবিবরণী পাঠে আমরা আনন্দিত হইলাম। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য স্কাউটধর্মের দশটি নিয়মকে বাস্তব-জীবনে প্রয়োগ করিয়া জনসেবা করা। বর্তমানে ইহার সভ্যসংখ্যা ৪৯। আলোচ্য বর্ষে সভ্যগণের শান্তিনিকেতন ভ্রমণ, গড়পা গ্রামে রাস্তা-নির্মাণ ও সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়টির উৎকর্ষ-সাধন, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পুণ্য-ভূমি জয়রামবাটীতে সেবাকার্য, কলিকাতা Blood Bankএ রক্তদান, গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি কার্য উল্লেখযোগ্য। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

সাঁত্রাগাছিতে অনুষ্ঠান—সাঁত্রাগাছি (হাওড়া) পাবলিক লাইব্রেরী সাহিত্য-সমিতির উদ্যোগে রামরাজা পূজামণ্ডপে সম্প্রতি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি সভা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং মাতৃবন্দনা করেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

সাতরাগাছি ইনষ্টিটিউট-প্রাঙ্গণে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর রেলকর্মী ও নিকটবর্তী গ্রামের সর্বসাধারণের সহযোগিতায় গত ২রা জ্যৈষ্ঠ বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে সারাদিন ধরিযা শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর আনন্দ-উৎসব পালিত হইযাছে। উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল ভজনগীতসহ নগর-পরিক্রমা, বিশেষপূজা ও হোম, ধর্মসভা ও কীর্তন। পূজাদি নির্বাহ করেন শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতি ছিলেন শ্রীকুমুদবন্ধু সেন। বিশিষ্ট অতিথিরূপে বক্তৃতা করেন শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও ব্রহ্মচারী শ্রদ্ধাচৈতন্য।

চন্দ্রকোণায় অনুষ্ঠান—চন্দ্রকোণা শহরে (মেদিনীপুর) গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ দশহরা দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী যুগপৎ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, পূজাপাঠহোমাদি, রামনাম সঙ্কীর্তন, সভা, ছায়াচিত্রসহযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি হয়। প্রায় ছয় শত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভবানন্দ, এবং বেলুড়মঠের স্বামী বিশ্বদেবানন্দ, স্বামী মুকুন্দানন্দ ও স্বামী সুশান্তানন্দ যোগদান করেন।

জাগো যোগি !

ভোগাস্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গতরলাঃ প্রাণাঃ ক্ষণধ্বংসিনঃ
স্তোকান্যেব দিনানি যৌবনসুখস্ফূর্তিঃ প্রিয়াসু স্থিতা।
তৎ সংসারমসারমেব নিখিলং বুদ্ধ্বা বুধা বোধকা
লোকানুগ্রহপেশলেন মনসা যত্নং সমাধীয়তাম্ ॥

—ভর্তৃহরি, বৈরাগ্যশতকম্, ৩৪

সাগরের বুকে তরঙ্গের নৃত্য দেখিয়াছ কি ? কত উঁচু মাথা তুলিয়া এক একটি ঢেউ নাচিয়া আসে, কিন্তু কতক্ষণই বা থাকিতে পারে ? চকিতে সেই সমুন্নত রূপ ভাঙিয়া পড়ে, ঢেউ নিরবয়ব জলে মিলাইয়া যায়। বিষয়ভোগসুখও এইরূপই। যখন আসে, কত উচু হইয়াই আসে, কত শক্তি কত আনন্দ কত আকর্ষণই না বিস্তার করে, কিন্তু ধরিয়া রাখা যায় না, অস্থির তরঙ্গভঙ্গের মতো তাহাদেরও প্রকৃতি যে ভাঙিয়া পড়া, মিলাইয়া যাওয়া।

দেহের মধ্যে প্রাণের নৃত্যবিলাস কী অদ্ভুত! শিরায় উপশিরায় রক্তের প্রবাহ, লক্ষ লক্ষ জীব-কোষে সুসংহত জীবনীশক্তির পরিবিস্তার, শ্বাসপ্রশ্বাসের বিরামহীন আকর্ষণ-বিকর্ষণ, সহস্র সহস্র স্নায়ুমণ্ডলীতে বিস্ময়কর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আশ্চর্য সহযোগিতা—এই সকলই প্রাণের লীলা। কিন্তু হায়, এ লীলা বরাবর উপভোগ করা যায় না। সহসা রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পড়ে। অকস্মাৎ একদিন প্রাণের নৃত্য থামিয়া যায়।

প্রিয়ার সাহচর্যে যৌবনের সুখের দিন কাহার না কাম্য? কিন্তু সেদিনগুলির সংখ্যা কতই না অল্প! দিনের প্রকাশের দিকে চাহিতে না চাহিতেই দিনান্তের কৃষ্ণ অন্ধকার চক্ষুকে আচ্ছন্ন করে। শিথিল জরা ক্রূর হাসিয়া চকিতে উৎফুল্ল যৌবনের গলা চাপিয়া ধরে।

এই তো সংসার। ভাবা যায় কতই না সার—মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা বলে, সঙ্‌ই শুধু সার। শুধু আলেয়ার আলো—মরুপ্রান্তরে জলের ভ্রম—কায়াহীন ছায়া। নিখিল সৃষ্টি জুড়িয়া এই নিঃসার 'সঙ্‌'-সার খেলা চলিয়াছে। যদি চোখ থাকে তো ধরিতে পারিবে, বুদ্ধি থাকে তো বুঝিতে পারিবে।

জাগো বোধিসত্ত্ব! সংসার-প্রহসন-বিড়ম্বিত শত শত ক্লান্ত পথিক তোমারই দিকে চাহিয়া আছে। তাহাদিগের ভাগ্য-লাঞ্ছনা দেখিয়া সহানুভূতিতে তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ হউক। ক্ষণিক সুখসম্ভোগের মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইবার সময় তো তোমার নাই। এই জীবনে, এই দেহেই সত্য লাভ করিবার বিপুল আগ্রহ তোমার সমগ্র মনঃপ্রাণকে মাতাইয়া রাখুক।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

"টাকা মাটি, মাটি টাকা"

তখন মনে হইয়াছিল ইহা একজন অত্যুগ্র-উৎসাহশীল অধ্যাত্ম-সাধকের ব্যক্তিগত মানস-প্রতিচ্ছবি—একান্তই সীমাবদ্ধ উহার পরিধি। বৈরাগ্য সকলের জন্য নয়—কঠোর বৈরাগ্য আরও অল্পজনের। টাকার মূল্য যে একেবারেই মৃত্তিকা, মাটি ও টাকা দুয়েরই মর্যাদা যে একই- এই দুঃসাহসিক কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে পারেন বলুন, কিন্তু সমাজের রাম-শ্যাম-মালতী-মাধবীকে ইহা শুনাইবার প্রয়োজন নাই, শুনাইলে বরং ক্ষতি আছে, সম্পদ্-বৃদ্ধিতে ঔদাস্য সমাজপ্রগতির মারাত্মক প্রতিবন্ধক। শ্রীরামকৃষ্ণও ইহা অস্বীকার করিতেন না; ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ মানুষের সম্মুখযাত্রার এই চারিটি ধাপ-সংযুক্ত সনাতন ধর্মের বহু-পরীক্ষিত সর্বসম্মত ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া দিলে তাঁহাকে 'স্থাপকায় চ ধর্মস্য' বলিয়া প্রণাম করিতাম না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের বাণী শুনিয়াও তাই আমরা তখন ভয় পাই নাই। জানিতাম, তিনি নিজে 'ষোল টাং' করিয়াছেন, আমাদের এক টাং বা দু', তিন, সাড়ে তিন টাং করিলেই চলিবে। "টাকা মাটি, মাটি টাকা"—উক্তির শিক্ষা তাই নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগের কোন কথাই তখন উঠে নাই। অবাধ বিত্তসঞ্চয়ের সহিত ধর্ম-জীবনের কোন বিরোধ নাই ইহাই বুঝিয়াছিলাম এবং এই জন্য নেড়ামাথা সন্ন্যাসীদের মঠের ন্যায় পুত্রকলত্রাধিশ্রিত গৃহে গৃহেও শ্রীরামকৃষ্ণ-ঠাকুরের আসন স্থাপন করিতে সঙ্কুচিত হই নাই।

কিছু ভুল বুঝিয়াছিলাম। অন্তর্যামী হাসিতে-ছিলেন—একদিন যেমন আতঙ্কাভিভূত ভাবী বিবেকানন্দের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন, সেইরূপ।* তাঁহার সামান্য একটি উক্তিরও যে গভীর অর্থ আছে, তাঁহার সাধন-জীবনের প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপের যে গূঢ় উদ্দেশ্য আছে তাহা তিনি তখনই খ্যাপন করিতে ব্যস্ত হন নাই। আজ বোধ হয় আমরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি অশ্বত্থামার তূণীরে অলস-ভাবে-পড়িয়া-থাকা বাণটি স্বয়ং ব্রহ্মাশির অস্ত্র—যখন অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা ঈপ্সিত জয়লাভ ঘটিয়া উঠে না তখন মন্ত্রপূত করিয়া উহা প্রয়োগ করিলে পলকে মহাশক্তি জ্বলিয়া উঠে, মহাবীর অর্জুনকেও ভয় পাইতে হয়। ধনতৃষ্ণা-মত্ত পৃথিবী প্রাচীনকাল হইতে অনেক সদুপদেশ শুনিয়াছে—'দান কর', 'পরদ্রব্যে লোভ করিও না' 'তীর্থ-দেবসেবা-ব্রাহ্মণসেবা-লোকহিতে ব্যয় কর' ইত্যাদি ইত্যাদি। পৃথিবীর লোক কখনো কিছু শুনিয়াছে, কখনো একেবারেই শুনে নাই; সবটা

* "তিনি সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণ পদ আমার অঙ্গে সংস্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে—অতি নিকটে! সামলাইতে না পারিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ওগো তুমি আমার একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!' অদ্ভুত পাগল আমার ঐকথা শুনিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং হস্ত দ্বারা আমার বক্ষ স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'তবে এখন থাক্, একেবারে কাজ নেই, কালে হবে।' (স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি, 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', ৫।৪)

শুনিয়াছে এমন ব্যক্তি খুব বিরল। বিত্তের প্রতি স্বাভাবিক স্পৃহা মানুষকে সদুপদেশ কাজে লাগাইতে দেয় না। সরিষায় ভূত ঢুকিয়া থাকে। মানুষ পর-লোকের ভয়ে, পৌরোহিত্যের চাপে, নীতির খাতিরে কিছু দান করে, কিন্তু নিজের কোলে শতগুণ ঝোল টানিয়া রাখে। দানে প্রচুর ফাঁকি রহিয়া যায়। দান করিয়াও দাতার ধন-স্বার্থ সম্পূর্ণ-ই বজায় থাকে। বিত্তবানদের এই স্বভাব যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা সহিয়া যাইতেন। ভাবিতেন, আহা উনি কিছু তো দিয়াছেন—নিজের টাকা আছে, জমান্ না, ক্ষতি কি? আবার না হয় পরে কিছু চাওয়া যাইবে—আরও কিছু তখন পাওয়া যাইবে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এইরূপ একটা বোঝাপড়া চলিয়া আসিতেছিল।

কিন্তু 'অজীর্ণ' তখন সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর ঘরোয়া অসুখ মাত্র, কিছু টোটকা দুচার দিন ব্যবহারেই সারিয়া যায়; মারাত্মক সান্নিপাতিক ব্যাধিরূপে উহা তখনও সমাজের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে নাই। তখনকার ধনতৃষ্ণা ও আজিকার যুগের বিত্তস্পৃহা—এই দুইয়ে বিপুল পার্থক্য। ধন উপার্জনের ও সঞ্চয়ের তখন একটা বাঁধাধরা রাস্তা ছিল। উদ্যম-শীলরা সেই রাস্তায় গিয়া অভিলষিত সম্পদের অধিকারী হইত। কিন্তু হাজার হাজার লোক বিরাট প্রাসাদ, যানবাহন, দাসদাসী, বিবিধ ভোগসম্ভারের কথা ভাবিত না—ভাবিত, 'ও সব যে দু দশজনের তাহাদেরই থাকুক। একদিক দিয়া তাহারা তো সমাজের শক্তি, শোভা বটে। আমরা—সাধারণেরা চাষবাস কুটীরশিল্প লইয়া মোটাভাতকাপড় ও সাদা-সিধা আশ্রয়ে সন্তুষ্ট থাকিব।' ধনোপার্জনের প্রচলিত রাস্তায় না গিয়া যাহারা অস্বাভাবিক উপায়ে ঐশ্বর্য আহরণের চেষ্টা করিয়াছে তখনকার ইতিহাসে তাহাদের নাম কলঙ্কিতই হইয়া আছে যেমন, সুলতান মাহ্‌মুদ।

আজ কিন্তু অন্য দিন আসিয়াছে। আজ কাঞ্চনাসক্তি মানুষের অন্যান্য সকল আসক্তিকে গৌণ স্থান দিয়া ব্যষ্টির ও সমষ্টির মনে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। টাকাই আজ মানুষের ধ্যান, জ্ঞান, লক্ষ্য। টাকা রোজগারের কোন লোকসম্মত বিবেক-সঙ্গত পথও নির্দিষ্ট নাই। ন্যায্য অন্যায্য যে কোন উপায়ে সোনারূপার তাল করায়ত্ত করিতে পারিলেই হইল। এই তৃষ্ণা শুধু মসনদধারী একা সুলতান মাহ্‌মুদের নয়—সমাজের প্রত্যেক স্তরে অধিষ্ঠিত সহস্র সহস্র লোকের। জীবনের মান উন্নয়নের স্লোগান আওড়াইয়া বিত্তাধিকারের কী দুর্দম্য আকাঙ্ক্ষা, কী অবিশ্রান্ত চেষ্টা! কে কত অপরকে দাবাইয়া, বঞ্চিত করিয়া কত বৃহৎ মোহরের থলি দখল করিতে পারে ইহাই রঙ্গমঞ্চের উত্তেজনা-বহ দৃশ্য। জীবন-মান-উন্নয়নেরও কোন মান নাই। যাহাদের বঞ্চিত জীবনের মান উঠানো একান্তই দরকার তাহারা নীচুতেই পড়িয়া থাকে। বিত্তবানেরা তাহাদের কথা সহজেই ভুলিয়া যান—নিজেদের ভোগ-পরিধি বাড়াইয়া চলিতে চলিতে তাঁহাদের নীচুতে তাকাইবার সময়ই বা কোথায়? বাড়ী—একখানা, দু'খানা, দশখানা দশরকমের স্থাপত্যে; গাড়ী—একটি, দুটি, পাঁচটি পাঁচপ্রকার মডেলের; অশন, বসন, ব্যসনের শত সহস্র বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার; ব্যাঙ্কের মোটা অঙ্ক—তবুও তাঁহাদের 'জীবনের মান' লক্ষ্যে পৌছায় নাই! চাই—চাই আরও চাই। এই 'মান-উন্নয়নের' শৃঙ্খলহীন দৌড়কে কেহ আজ শাসন করিতে পারে না—কোন ঐতিহাসিক ইহাকে দস্যুতা বলিয়া গালি দেয় না। ইহা আজ মানুষের বরণীয়তম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত। ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে অর্থের প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করে না, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ পরিকল্পনাতেও ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় আদর্শে অর্থের বর্তমান সর্বগ্রাসী প্রধানত্ব কখনও স্বীকৃত হয় নাই, ধর্মসঙ্গত বিত্তসংগ্রহেরই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। কাঞ্চনের এবং কাঞ্চনলভ্য ভোগসম্ভারের প্রতি উন্মত্ত তৃষ্ণা

আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে শিখিয়াছি। এই তৃষ্ণার ব্যাপক প্রসারের ফলে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে কী ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে তাহা আজ আমাদের চোখের সম্মুখেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

যাহারা অর্থসঞ্চয়ের সিঁড়িতে অনেক নিম্ন-সোপানে পড়িয়া আছে—মধ্যবিত্ত, অল্পবিত্ত, বা সর্বহারার দল—তাহারা শীর্ষোপনীত বড়লোকদের গালি দেয়, কিন্তু বড়লোক হওয়ার অভিলাষটিকে সারাপ্রাণেই নিজেরা পোষণ করে। একজনকে বড়লোক হইতে গেলে যে দশজনকে দারিদ্র্যভোগ করিতেই হইবে, বঞ্চিতরাও যদি ভাগ্যক্রমে বাড়ী-গাড়ী টাকার থলির মালিকানা লাভ করে তাহারাও যে অপর শত শত বঞ্চিত সৃষ্টি করিবে, উহাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার কথাও তখন মনে থাকিবে না—এই অর্থ নৈতিক সত্যটি তাহারা হৃদয়ঙ্গম করে না। ফলে কাঞ্চন-তৃষ্ণা একটি সাংঘাতিক গুপ্ত রোগের মতো সমগ্র সমাজ-মনে বাসা বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। বাহিরের দেহে কখন কি ভাবে কোথায় উহা কি বিস্ফোটকের জন্ম দিবে কেহ জানে না। সামান্য তোকমারির পটিতে সে দুষ্টব্রণ হয়তো ফাটিবে না। সময়মত শক্তিমান প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন।

কিছু স্পষ্ট কথা, সাহসের কথা বলিবার বোধ করি তাই সময় আসিয়াছে। যাহারা শুনিবে তাহারা সকলেই হয়তো মাদকের নেশায় সম্বিৎ-হারা কিন্তু তবুও নেশা কাটাইবার ব্যবস্থায় দেরি করা উচিত নয়। হয়তো দুচার জনের অর্ধজাগ্রত কানে একটি আধটি কথা প্রবেশ করিবে—হয়তো তাহাদের হুঁশ ফিরিবে। সেই দুচারজনকে দেখিয়া আরও দশ বিশ জন জাগিয়া উঠিবে।

ব্রহ্মশির অস্ত্র অশ্বত্থামারই তূণে আছে। সেই দুঃসাহসিক বাণী ভারত-সন্তান ব্যতীত অপর কেহ উচ্চারণ করিতে পারিবে না। বিত্ত যে মানুষের চরম ও পরম সন্ধান নয়, সে কথা অধ্যাত্ম-ভারত তাহার বেদ-উপনিষদ্-স্মৃতি-পুরাণে একদিন নানাভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগে-নৈকে অমৃতত্বমানশুঃ—"ধন দ্বারা নয়, প্রজ্ঞাবুদ্ধির দ্বারা নয়, ত্যাগের দ্বারাই কেহ কেহ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।" মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন—যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাং কথং তেনামৃতা স্যামিতি—"ভগবন্! এই সমগ্র পৃথিবী যদি বিত্তদ্বারা পূর্ণ হইয়া আমার অধিকারে আসে তাহা হইলে, আমি কি সেই সামর্থ্যে অমর হইতে পারিব?"

নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ, অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি। "যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না না, তাহা হইবার নয়। যেমন সংসারে প্রচুর ভোগোপকরণ সংগ্রহ করিয়া লোকে আরামে থাকে সেইরূপই পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন তুমি লাভ করিতে পারিবে মাত্র, বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই।" আমাদের পুরাণে যযাতির কথা আছে। সহস্র বৎসর যৌবনের বিবিধ ভোগসুখে মত্ত থাকিয়াও তিনি পরিতৃপ্তি লাভ করেন নাই। পরিশেষে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

ন জাতু কামাঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

"উপভোগের দ্বারা কামনার শান্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃত পড়িলে আগুন যেমন আরও জ্বলিয়া উঠে সেইরূপ ভোগ বাড়িতে বাড়িতে বাড়িয়াই চলে।"

ভারতবর্ষের জীবনে আধ্যাত্মিকতা বলিয়া পৃথক্ একটি কক্ষ কখনো ছিল না। মানুষের সমস্ত জীবনটাই 'আধ্যাত্মিক' করিয়া তুলিবার রীতি তখন জীবন-প্রণালীর মধ্যে ছিল। উপরোক্ত উদ্ধৃতি-গুলির দৃষ্টিভঙ্গী তাই শুধু সন্ন্যাসীরাই সাধিতেন না, গৃহস্থরাও অভ্যাস করিতেন। গৃহস্থের পক্ষে ধনোপার্জন ও সঞ্চয় নিন্দনীয় ছিল না—নিন্দনীয়

ছিল বিত্তসর্বস্বতার মনোবৃত্তি, লোভ, অপরকে বঞ্চিত করিয়া স্বাধিকার রক্ষা। বিত্ত মানুষের জীবনের অন্যতম অভীষ্ট কিন্তু একমাত্র অভীষ্ট নয়, অপরের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিলেই সঞ্চয়ের সার্থকতা—এইটিই ভারতীয় আদর্শ। এই আদর্শের প্রচার ও প্রয়োগ ব্যাপকভাবে ভারতীয় সমাজে এক সময়ে হইয়াছিল। বিত্ত তখন সমাজের মঙ্গল ছিল—মানুষের কলহ ও হিংসার উৎস ছিল না। বিত্তকে আজ আবার তাহার যথার্থ স্থানে ফিরাইয়া আনিতে হইলে ভারতের ঐ আদর্শকে পুরোভাগে আনিতে হইবে। এইজন্য 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—উক্তির মহা-শক্তিকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। মনে করিব না উহা শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সাধনার ক্ষেত্রেই মাত্র প্রযোজ্য, উহা শুধু একটি আধ্যাত্মিক বুলি—আমাদের ব্যবহারিক জীবনে উহার কোন সার্থকতা নাই। না—না—না। মন্দাকিনী-ধারা যদি ভাগীরথী হইয়া মর্ত্যে নামিয়া আসিয়াই থাকে তাহা হইলে ষাট সহস্র সগর-সন্ততির তৃষ্ণা না মিটিলে বৃথাই সে অবতরণ। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতা পেটিকায় বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্য সঞ্চিত হয় নাই। বিকারগ্রস্ত পৃথিবীর কাঞ্চন-জ্বর উপশমিত করিবার জন্য 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—সকলকেই শুনাইতে হইবে। বিত্তহীনকে বলিবনা বিত্ত চাহিওনা ; বলিব—চাও, কিন্তু বিত্তের মূল্য ভুলিও না। ভুলিলে তুমিও যখন বিত্তবান হইবে তখন তোমারও মাথা বিগড়াইয়া যাইবে। বিত্তবানকে বলিবনা,—তুমি টাকার থলিগুলি সাগরের জলে ফেলিয়া দাও। বলিব,—মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্, তোমার লোভকে সংযত কর দশজনের সর্বনাশ করিয়া নিজের পুঁজিবৃদ্ধির অধর্ম ত্যাগ কর, টাকা ছাড়াও জীবনের অপর আর দশটা বৃহৎ বরণীয় আছে সেগুলিরও অনুশীলন কর।

দরিদ্রের জীবন-মান উন্নয়ন, জাতীয় সম্পদবৃদ্ধি, শিল্পবাণিজ্যের প্রসার,—জাতির ঐহিক উন্নতিমূলক এইসকল পরিকল্পনার সহিত 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—আদর্শের কোন বিরোধ নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন—

> যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
> হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

"যাঁহার অহঙ্কার-ভাব নাই, বুদ্ধি যাঁহার আসক্ত নয়, তিনি সমস্ত লোক হনন করিয়াও বস্তুতঃ হনন করেন না এবং তাহার ফলে কর্মবন্ধনও প্রাপ্ত হন না।"

দৃষ্টির পরিশুদ্ধি থাকিলে বাহিরের কর্ম মানুষের মনকে বাঁধিতে পারে না। যে কর্মের পশ্চাতে থাকে স্বার্থপরতা, লোভ, দম্ভ, বিদ্বেষ সে কর্ম ব্যষ্টি ও জাতিকে অবনত করে। ভারতবর্ষের বাণী মানুষকে এই দিকে অবহিত হইতে বলিয়াছে। সংসারের উন্নতি অবশ্যই কাম্য কিন্তু মানুষের আত্মাকে মারিয়া ফেলিয়া নয়। এমন কৌশলে আমাদিগকে জাগতিক অভ্যুদয়ের ব্যাপৃতি গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে জাগতিকতা আমাদের মনুষ্যত্বকে না গ্রাস করিয়া বসে। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—সেই কৌশল-বিধায়ক নির্দেশ, বিত্ত-পরিশোধনের শক্তিমন্ত্র। বিশ্বপ্রসারী বিত্ততৃষ্ণারূপ যে মারাত্মক ব্যাধি মানুষকে—মানুষের সত্য-শিব-সুন্দরের সাধনাকে আজ ধ্বংস করিতে বসিয়াছে সেই ব্যাধি কাটাইতে গেলে দুর্বল দুই চারটি নীতিকথায় কুলাইবে না! তাই শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ তীব্র ভৎর্সনা—'টাকা মাটি, মাটি টাকা।' যাহাকে এতই রমণীয় মনে করিতেছ, যাহার জন্য এতই আত্মবিভ্রান্ত হইয়াছ, জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি বিসর্জন করিতে বসিয়াছ—দেখ, তাহার মূল্য নিরূপণ করি। তাহার মূল্য পদতলের এই হেয় মৃত্তিকা! মানুষের বিবেক যখন একেবারেই ঘুমাইয়া পড়ে তখন অনুনয়, মিনতিতে সে বিবেক জাগে না ; জাগে কঠোর ভৎর্সনাতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু একটু করিয়া আমাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছেন সঞ্চয়-পেটিকা-গোপনেচ্ছু আমাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিতে। অদ্ভুত পাগলের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। শুধু 'এক টাং' করিয়া পালাইলে চলিবে না। হাসপাতালে নাম লেখানো হইয়াছে, ব্যাধি—আমাদিগের কাঞ্চন-জ্বর আরোগ্য না হইলে ছুটি নাই। আমাদিগের হাতেও ত্রেকেটে তাক্ না উঠিলে তাঁহার নিজের তবলার বোল সাধা সার্থক হইবে না। 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' তাই শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা নয়, আমাদেরও সাধনা।

বেলুড়মঠে দুর্গাপূজা

গত আশ্বিন সংখ্যায় আমরা শ্রীকুমুদবন্ধু সেন লিখিত 'বেলুড়মঠে প্রথম দুর্গোৎসব'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। অনেক পাঠক-পাঠিকার নিকট আমরা ইহার জন্য অভিনন্দিত হইয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠের অধ্যাত্মসাধন-রীতির একটা দিকের বিশেষ পরিচয় উক্ত লেখাটি হইতে পাওয়া যায়। ধর্মের যেমন একটা তাত্ত্বিক (metaphysical) দিক আছে, তেমনি উহার আর একটি দিক হইতেছে ক্রিয়া (rituals)। ক্রিয়াকে একেবারে বাদ দিলে ধর্ম বাস্তব জীবনের সহিত সংস্পর্শশূন্য হইয়া একটি নীরস দার্শনিক বিচারমাত্রে পর্যবসিত হইতে পারে। উহা তখন মানুষের অধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে বিপদ। প্রত্যেক ধর্মেই কিছু না কিছু উপাসনামূলক ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। হিন্দুধর্ম বরাবর মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া এই ধর্মে ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান অনেক বেশী। তত্ত্ব এবং ক্রিয়ার সামঞ্জস্যরক্ষাই হিন্দুধর্মের আদর্শ। হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসে কখনও কখনও অবশ্য এই সামঞ্জস্য ব্যাহত হইয়াছে দেখিতে পাই। হয়তো তত্ত্ব পিছনে পড়িয়া গিয়া আচারবাহুল্যে মানুষ মত্ত হইয়াছে, অথবা ক্রিয়াকে অনাদর করিয়া শুষ্ক তত্ত্ববিচারে সে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, এইরূপ সঙ্কটকালে কোন শক্তিশালী আচার্য আবির্ভূত হইয়া ভারতীয় ধর্মজীবনের এই গরমিল দূর করিয়া দিয়াছেন—যেমন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষানুযায়ী তাঁহার এই বিষয়ে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল। স্বামীজীর বিবিধ বক্তৃতা ও রচনাবলীতে ইহার সম্যক্ দিগ্‌দর্শন পাওয়া যায়। বেলুড়মঠে যেভাবে তিনি দুর্গাপূজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাতে হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্মের দিকে কি ধরনে তিনি প্রাণসঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। রাজসিক আড়ম্বর পরিবর্জন করিয়া শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে শুদ্ধভাবে দেব-দেবীর আরাধনা—ইহাই স্বামীজী চাহিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেলুড়মঠ এই আদর্শ লইয়াই দুর্গাপূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সংসার-কামনা-বর্জিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের সাত্ত্বিকীপূজার পরিবেশ সত্যই দেখিবার মতো। এবারও সহস্র সহস্র নরনারী মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে দশভুজার ত্রিদিবসব্যাপী সেই মহাপূজা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। কত শ্রদ্ধা, কত সংযম নিষ্ঠা সতর্কতা, কত শিক্ষা যত্ন মমতার প্রয়োজন হয় মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিৎসত্তার আবির্ভাব ঘটাইতে—তাহাই দর্শকগণ অনুভব করেন বেলুড়মঠের পূজামণ্ডপে বসিয়া।

বেলুড়মঠের যে সকল শাখাকেন্দ্রে এবার প্রতিমায় দুর্গোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল সে সকল স্থানের পূজাও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত। এ সকল পূজাও যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, 'হাঁ, ঠিক মায়ের পূজা দেখিলাম বটে।'

স্মরণে

গত ২৯শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) অপরাহ্নে কলিকাতা নীলরতন সরকার হাসপাতালে বাঙ্গলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও লেখক এবং বহুশ্রদ্ধা-ভাজন দেশহিতব্রতী, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের পরলোকগমনে আমরা স্বজন-বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। বাঙলাদেশের শিক্ষিত জনসাধারণ এই তেজস্বী কর্মীকে সহজে ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার ৬৩ বৎসরের জীবন যেমন একদিকে অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনা ও জন-সেবাদ্বারা সমুজ্জ্বল, অপর দিকে তেমনি উহাতে লক্ষ্য করিবার ছিল তাঁহার ব্যক্তিগত মানস-প্রগতি, দৃঢ়চিত্ততা, আবার আর্তের প্রতি কোমল সহানুভূতি, বন্ধুবাৎসল্য, উদার লোকব্যবহার। স্বামী বিবেকা-নন্দের বৃহৎ বাঙলা জীবনী সত্যেন বাবুর অন্যতম সাহিত্য-কীর্তি। সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি উদ্বোধনে চিন্তাশীল প্রবন্ধাদি লিখিয়া আসিতে-ছিলেন। গতবৎসর (১৩৬০) আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় স্বামী প্রেমানন্দ সম্বন্ধীয় তাঁহার মনোজ্ঞ স্মৃতিকথা আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ বিশেষ সমা-দরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদ্বোধনে সত্যেন বাবুর শেষ রচনা শ্রীশ্রীমা শতবর্ষজয়ন্তীসংখ্যায় প্রকাশিত—'সারদাদেবী'-নামক স্মৃতিকাহিনী। প্রবন্ধের শেষ কথাগুলি—

"যার স্নেহ ক্ষমা আশীর্বাদ বিনা চেষ্টায় অর্জিত সম্পদের মত পাওয়ার পর, আর কিছুর জন্যে কাঙালপনা কোনদিন করিনি। তাঁর পদপ্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়েছিলাম, জীবনের সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের পুণ্যক্ষণগুলি স্মরণ করে আজো চিত্ত-মন-বুদ্ধি ক্ষোভহীন তৃপ্তিতে ভরে আছে।"

প্রার্থনা করি জগদম্বা তাঁহার এই স্নেহধন্য বিশ্বাস-বলিষ্ঠ সন্তানটিকে তাঁহার অভয় পাদপদ্মে চিরশান্তি দান করুন।

শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তীর সমাপ্তি-উৎসব

১৩৬০ সালের পৌষ হইতে ১৩৬১ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত (ডিসেম্বর, ১৯৫৩—ডিসেম্বর, ১৯৫৪) ভারতে এবং বিদেশে একবৎসর ব্যাপী শতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় জয়ন্তী সমিতি কর্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছিল কার্যক্ষেত্রে এ পর্যন্ত উহা আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজ্যেই শত শত শহরে ও গ্রামে জনগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শনার্থ উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সকল উৎসবের মাধ্যমে ভারতীয় নারীর মহিমোজ্জ্বল আদর্শ দিকে দিকে আলোচিত ও প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীসারদাদেবী-শতবর্ষজয়ন্তীর সমাপ্তি-অনুষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ বেলুড় মঠ ও কলিকাতায় উদ্‌যাপিত হইবে। কাজের সুবিধার জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সমিতি ১৬৩ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে তাঁহাদের একটি কার্যালয় (টেলিফোন: ২৪-৩০৩৬) খুলিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের আগামী জন্মতিথি—৩০শে অগ্রহায়ণ (১৬ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার) হইতে একাদশ দিন বেলুড় মঠে উৎসবাঙ্গীভূত নানা অনুষ্ঠানাদি ব্যতীত কেন্দ্রীয় সমিতি নিম্নোক্ত কর্ম-সূচীও পরিনির্বাহ করিবেন।

(ক) সর্বভারতীয় চারুকলা, কারুশিল্প এবং সংস্কৃতি প্রদর্শনী।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪, রবিবার হইতে ২রা জানুয়ারী, ১৯৫৫, রবিবার পর্যন্ত ১৬৩, লোয়ার সার্কুলার রোডে এই প্রদর্শনী খোলা থাকিবে।

(খ) রচনা প্রতিযোগিতা।

শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা-বিষয়ক এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ, নেপাল, পাকিস্তান, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ যোগদান করিতে পারিবেন। ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা, উর্দু, অসমীয়া, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাতী, তামিল, তেলেগু, মালয়লম, কান্নাড়া, সিন্ধী, কাশ্মিরী, মনিপুরী,

খাসী, নেপালী, বার্মী, সিংহলী এবং সংস্কৃত—এই সকল ভাষার প্রবন্ধ গৃহীত হইবে। ইংরেজী রচনা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। স্নাতকোত্তর (Post Graduate) ছাত্র-ছাত্রীগণের জন্য ইংরেজী রচনার (৫০০০ শব্দের বেশী নয়) বিষয়ঃ—'ভারতীয় ধর্মজীবনে নারীর অবদান (শ্রীশ্রীমা-সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষার বিশেষ উল্লেখ সহ)'। এই প্রতিযোগিতার পুরস্কারের মূল্য ঃ—(১ম) ২০০৲ টাকা (২য়) ১৫০৲ টাকা (৩য়) ১০০৲ টাকা। কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের জন্য ইংরাজী রচনার (৪০০০ শব্দের মধ্যে) বিষয়ঃ— 'ভাবতনারীর আদর্শ-মূর্তি—শ্রীমা সারদাদেবী' পুরস্কারের মূল্য ঃ—(১ম) ১০০৲ টাকা (২য়) ৭৫৲ (৩য়) ৫০৲ টাকা।

সংস্কৃত রচনা (৩০০০ শব্দের মধ্যে) কেবল চতুষ্পাঠী ও কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের জন্য। বিষয়ঃ—'শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা' পুরস্কার-মূল্য ঃ—(১ম) ৫০৲ টাকা (২য়) ৪০৲ টাকা (৩য়) ৩০৲ টাকা।

অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় রচনা-প্রতিযোগিতা কেবল স্কুলের বিদ্যার্থি-বিদ্যার্থিনীগণের জন্য। বিষয় ঃ—'শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা'; (শব্দসীমা—৩০০০) প্রত্যেকটি ভাষার জন্য পৃথক পৃথক পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিবে। বালক ও বালিকাগণের জন্য পুরস্কার আলাদা।

পুরস্কার-মূল্য (প্রত্যেক ভাষার) বালক প্রতিযোগিগণের জন্য ঃ—(১ম) ৩০৲ টাকা (২য়) ২০৲ টাকা। বালিকা প্রতিযোগিনীগণের জন্য ঃ (১ম) ৩০৲ টাকা (২য়) ২০৲ টাকা। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪। কোন্ শ্রেণীর রচনা কোথায় পাঠাইতে হইবে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যালয়ে (উপরোক্ত ঠিকানায়) অনুসন্ধনীয়।

(গ) সর্বভারতীয় মহিলা সঙ্গীত সম্মেলন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সম্মেলনের অধিবেশন বসিবে।

(ঘ) মহিলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলিবে। ২৫শে ডিসেম্বর সিনেট হলে পৃথক একটি ছাত্র ছাত্রী দিবসের উদ্‌যাপনও পরিকল্পিত হইয়াছে।

(ঙ) শোভাযাত্রা।

২৬শে ডিসেম্বর সকালে কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে বিভিন্ন দলের শোভাযাত্রা কলিকাতা ময়দানে উপস্থিত হইবে। তথায় শ্রীমা সারদাদেবীর শুভাবির্ভাবের তাৎপর্য সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হইবে।

পাদপূরণ

'অনিরুদ্ধ'

সব লেখা সাঙ্গ হলে স্থান যাহা ফাঁক রয়ে যায়
কোনও কিছু দিয়া তাড়াতাড়ি অবকাশ পুরাই হেলায়।
সকল প্রাপ্তির শেষ, তবু মোরে ডাকে যে অ-পাওয়া
সে পাদপূরণআশে ভগবান তোমারে কি চাওয়া?

ব্যাকুলতা ও ত্যাগ

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

(সহকারী অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন)

ভগবান যীশুখ্রীষ্টের কয়েকটি উপদেশ সকল দেশের সাধকদের কাছে চিরকাল সমান শ্রদ্ধা লাভ করবে। অপূর্ব সে উপদেশগুলি।

যীশুখ্রীষ্ট বলতেন—শিশুদের কাছে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত ; শিশুর মতো সরল না হলে, পবিত্র না হলে, ভগবানলাভ হয় না। বাইবেলে আছে—Blessed are the pure in heart, for they shall see God (পবিত্র-হৃদয় লোকেরাই ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরকে দর্শন করবে।)

অষ্টপাশে আমরা আবদ্ধ। এই বন্ধন হতে মুক্তিই আমাদের আদর্শ। বন্ধনমুক্ত হলে বালক-অবস্থা হয়। মোহ, অহঙ্কার, অভিমান ত্যাগ করে আমাদের বালকবৎ হতে হবে। তাই ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলতেন,—পাশবদ্ধ জীব, পাশ-মুক্ত শিব।

বালকের স্বভাব—সরলতা, পবিত্রতা, শরণাগতি ও নিভরতা। ঠাকুরের জীবনে বালকের এই গুণগুলি ফুটে উঠেছিল। তিনি ছিলেন বালকের মতো সরল, বালকের মতো পবিত্র ও একান্ত নির্ভরশীল। যিনি যীশুখ্রীষ্টের 'পিতা', তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামপ্রসাদের 'মা'।

সাধকদের জীবনে দেখা যায়, ঈশ্বরলাভের পথে বহু বিঘ্ন আসে। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট—এঁদের জীবনে দেখা যায়, 'মার' ও 'শয়তান' এসে প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। ঠাকুরের জীবনেও এইরকম প্রলোভন এসেছে, কিন্তু ঠাকুর তা সহজে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। মা তাঁকে অষ্টসিদ্ধি দিতে চাইছেন—কিন্তু ঠাকুর কেঁদে কেঁদে মায়ের কাছে বলছেন—মা আমি তোর দুর্বল ছেলে, আমায় প্রলোভন দেখিয়ে মুগ্ধ করিসনে। আমি অষ্টসিদ্ধি চাইনে, নাম যশ চাইনে তোর পাদপদ্মে নিশ্চলা ভক্তি দে। যাঁরা সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনে এই প্রলোভনের পরীক্ষা এসেছে। স্বামীজীর জীবনেও দেখা যায়,—ঠাকুর তাঁকে অষ্টসিদ্ধি দিতে চাইছেন, কিন্তু স্বামীজী তা প্রত্যাখ্যান করছেন।

যাঁরা গুরুর আদেশ-পালনের জন্য নিয়মরক্ষা হিসেবে সামান্য একটু জপধ্যান করেন, তাঁদের জীবনে এ পরীক্ষা আসে না। তবে যাঁরা ঠিক ঠিক আন্তরিক ভাবে ভগবানলাভের জন্য সাধনা করেন, তাঁদের প্রত্যেককে এ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। অনেকে উপদেশ শুনে যায়, কিন্তু ধারণাশক্তি কই ? কাজে পরিণত করে কতটুকু ? একটুও না,—তাই আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় না।

ভগবানলাভ কি সহজ কথা! তার জন্য কত খাটতে হয়, ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে হয় ; দেখা যায় দেশশুদ্ধ লোক মুখে 'সীয়ারাম' 'সীয়ারাম' জপ করে যাচ্ছে—কিন্তু সেই সীতাদেবীর জীবনেই কত দুঃখ, তাঁকে কত কষ্ট সহ্য করতে হল, অশোকবনে কত কাঁদতে হল—এ কথা কেউ একবারও ভাবে না, মা ঠাকুরুণ, তাই বলতেন শ, ষ, স,—অর্থাৎ সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর।

* * * *

ব্যাকুলতা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ উল্লেখ করতেন চাতকপাখীর কথা। চাতকপাখী স্বাতী নক্ষত্রের জল ছাড়া পান করে না। নদ নদী সাগর পড়ে

কাটিহার (পূর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বক্তার ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত।

আছে, কিন্তু সে সর্বদা আকাশের পানে হাঁ করে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছে।

একজন তার গুরুকে প্রশ্ন করেছিল, কি রকম অবস্থা হলে ভগবদ্দর্শন হয়; গুরু তাকে নদীতে স্নান করাতে নিয়ে গিয়ে জলের ভেতর চেপে ধরলেন। শ্বাস নেবার জন্য যখন শিষ্যের প্রাণ আঁটুপাটু করতে লাগলো তখন গুরু তাকে বললেন—যখন ভগবানের জন্যে এমনি প্রাণ ছটফট করে, তখন তাঁর দর্শন পাওয়া যায়।

একটি ঘরে একটা চোরকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। চোর জানতো তার পাশের ঘরে এক থলে মোহর আছে। চোর তার বন্দী অবস্থার দুর্দশা ভুলে গেছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা আহার নিদ্রা ভুলে গেছে। সবটুকু মন পড়ে আছে সেই মোহরের থলেটার ওপর। আমাদের অন্তরস্থ আত্মা সেই মোহরের থলে। সেই আত্মাকে পাবার জন্যে চোরের মতো প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা দরকার।

তুলসীদাস বলেছেন, জরু জমীন আর টাকা এই তিন টান বিষয়াসক্ত করে রেখেছে মানুষকে। ঠাকুরও ঠিক তিন টানের কথা বলেছেন, যা হলে ভগবানকে পাওয়া যায়। সতীর পতির ওপর টান, কৃপণের ধনের ওপর টান ও বিষয়ীর বিষয়ের ওপর টান। এই তিন টান এক হলে তবে তাঁর দর্শন মেলে।

ঠাকুরের ব্যাকুলতাও ছিল তিন স্তরের। প্রথম —মা আমায় দেখা দাও, আমি সাধনহীন জ্ঞানহীন, আমায় দেখা দাও। যখন আরও তীব্রতা এলো, তখন পোস্তায় গিয়ে আকুল হয়ে মুখ ঘষড়ে কাঁদতেন মা মা করে। লোকে মনে করত, হয়তো তাঁর মা মারা গেছেন, কেউ বলত, শূল ব্যথায় বিকল হয়ে কাঁদছে। আরও যখন তীব্রতা এলো, তখন মায়ের খড়্গ নিয়ে নিজের গলায় বসাতে গেলেন। এই বিরহ যখন বেশী হয় তখন এমনি অবস্থা হয়; বৃন্দাবনে রাধা তাই বলেছেন—"মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব।"

ঠাকুর তারপর মায়ের দর্শন পেলেন, কিন্তু তাঁর সাধনা সেইখানেই শেষ হল না সাধারণ সাধকের মতো। তিনি জগদ্‌গুরুরূপে এসেছিলেন, তাই সুদীর্ঘ বারো বছর দক্ষিণেশ্বরে চলল বিভিন্ন মতের ও পথের সাধনা। এলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী, এলেন তোতাপুরী, ইসলাম ধর্মের গুরু, ও খ্রীষ্টান ধর্মের গুরু; ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ইসলাম মতে ও খ্রীষ্টান মতে সাধনা করে মুসলমান বা খ্রীষ্টান হয়ে যাননি, তিনি হিন্দুই রয়ে গেলেন।

ঠাকুরেব আরও একটি বৈশিষ্ট্য—তিনি এসেছিলেন মাতৃভাব প্রচার করতে, তাই অন্যান্য অবতারের মতো পত্নীকে ত্যাগ না করে তাঁকে সাধনার পথে ঠিক ঠিক সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সে এক অপূর্ব অধ্যায়।

সাধারণতঃ যখন কোনও ছেলের ভগবানে মতি হয়, তখন সংসারের মায়েরা কি করেন? তাড়াতাড়ি তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ঠাকুরের মা-ও ঠিক তাই করেছিলেন। যখন ঠাকুর ভগবানলাভের জন্যে ব্যাকুল, সেই সময় তিনি গোপনে ঠাকুরের বিবাহের আয়োজন করতে লাগলেন। গোপনে, কেননা জানতে পারলে ছেলে যদি পালিয়ে যায়! কিন্তু ঠাকুরের কাছে এ খবর গোপন রইল না। যখন চন্দ্রাদেবী মেয়ে খুঁজে মনের মতো পাত্রী পাচ্ছেন না, তখন একদিন ঠাকুরই বলে দিলেন,—দেখগে, জয়রামবাটীতে মুখুজ্যেদের মেয়ে কুটো বেঁধে রাখা আছে। 'কুটো বাঁধা' কথাটা আজকাল অনেকেই বোঝে না। আগে নিয়ম ছিল, গাছের প্রথম ফলটি দেবতার উদ্দেশ্যে কুটো বেঁধে অথবা একটা ন্যাকড়ার ফালি বেঁধে চিহ্নিত করে রাখা হ'ত। সারদাদেবীও ঠাকুরের জন্যে চিহ্নিত হয়ে আছেন একথা ঠাকুর জানিয়ে দিলেন।

* * * *

একদিন পূজ্যপাদ মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সঙ্গে কাশীতে ৺বিশ্বনাথ দর্শনে গেছি। মহারাজ মন্দিরে ঢুকেই দেখেন একজন ঝাড়ুদার মন্দিরের বারান্দা ঝাড়ু দিচ্ছে। মহারাজ ঝাড়ুদারের কাছ থেকে ঝাড়ুটা নিয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্দির-প্রাঙ্গণ একটু ঝাঁট দিলেন। সামান্য একটি ঘটনা, কিন্তু কি অপূর্ব শিক্ষাই না আমাদের দিয়ে গেলেন। ভগবানের কাছে যেতে হলে দীনের মতো যেতে হয়, সব অহঙ্কার শূন্য হয়ে দীন হীন শরণাগত হতে হয়—মহারাজের আচরণে এই কথাটিই ফুটে উঠেছে। মহাপুরুষদের জীবনের অতি সাধারণ ঘটনার ভেতর দিয়েও তাঁদের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। ঠাকুরের সাধক জীবনে আমরা পাই এই দীন ভাব। ঈশ্বরের শ্রীচরণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, দীনহীন—কাঙাল, কৃপার ভিখারী!

কিন্তু জগতের লোক ভগবানকে কেউ চায় না; তারা বিষয় নিয়ে মত্ত। স্ত্রীপুত্র পরিজন অর্থ—এই সব নিয়ে ব্যস্ত। এ সেই জাগা ঘরে চুরি! রামপ্রসাদ বলতেন—

"আমি এই খেদে খেদ করি, তুমি মাগো থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।" 'জাগা ঘরে চুরি' অর্থাৎ যে মন দিয়ে ভগবানকে ভালবাসবো সেই মন স্ত্রী পুত্র বন্ধু প্রতিবেশী, বিষয় সম্পদ এই সবে ছড়িয়ে আছে। এই ছড়ানো মনকে একত্র করে ঈশ্বরমুখী করা একপ্রকার অসম্ভব। ঠাকুর তাই বলতেন,—সরষের পুঁটুলি খুলে ছড়িয়ে গেলে সবটুকু সরষে আর ফিরে পাওয়া যায় না। দরজার ফাঁকে, ইঁদুরের গর্তে কোথাও না কোথাও ঢুকে পড়ে, তাকে আর পাওয়া যায় না।

ঠাকুর এই প্রসঙ্গে একটা নতুন কথা আমাদের বলেছেন, কাঁচা আমি ও পাকা আমি। আমি কর্তা, আমার ঘর বাড়ী জমি টাকা, এই বোধ—কাঁচা আমি; আমি ভগবানের দাস—এটি পাকা আমি। আমাদের কাঁচা আমি ত্যাগ করে পাকা আমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

*　*　*　*

সকল ধর্মের উৎপত্তি বিষাদ থেকে। গীতা চণ্ডী ভাগবতই এর প্রমাণ। আমরা গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখি অর্জুনের ক্ষাত্রশক্তির প্রকাশ—"সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।" (হে অচ্যুত উভয় সেনাদলের মধ্যে আমার রথটি স্থাপন কর)। সারথি কৃষ্ণ সেখানে রথ স্থাপনা করলেন। কিন্তু সমযোদ্ধাদের দেখতে গিয়ে অর্জুন তাদের ভেতর নিজের আত্মীয় বন্ধুদের দেখে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হলেন। যুদ্ধের ইচ্ছা দূর হয়ে গেল। এই হ'ল বিষাদ। আমি আমার এই চিন্তা থেকে অর্থাৎ ভোগের চিন্তা থেকে বিষাদের উৎপত্তি হয়। গীতায় এটিকে যোগ বলা হয়েছে, কারণ ভোগে বিতৃষ্ণা হওয়ায় অর্জুন ভগবানকে সে সম্বন্ধে নিবেদন করে আত্মসমর্পণ করলেন—

"কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ,
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে,
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

(চিত্তের দীনতাদোষে আমার শৌর্যাদি স্বভাব অভিভূত, ধর্ম-বিষয়ে আমি বিমূঢ়। শিষ্যরূপে আমি আপনার শরণাগত, যাহা আমার পক্ষে নিশ্চিত শ্রেয়ঃ তাহাই আমাকে বলুন।) তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ধর্মোপদেশ দিলেন।

চণ্ডীতেও সমাধি বৈশ্য ও রাজা সুরথ দুজনেই ভোগী। কিন্তু বৈশ্য সংসারের নানাপ্রকার অশান্তিতে বিষাদগ্রস্ত হয়ে মেধস মুনির কাছে এসেছে। রাজা সুরথও হৃতরাজ্য; তাঁরও বিষাদ অর্থাৎ ভোগে বিতৃষ্ণা হয়েছে। তাই তাঁদের ধর্মপথের আরম্ভ। শ্রীমদ্ভাগবতে রাজা পরীক্ষিৎ যখন জানতে পারলেন, তাঁর সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে, তখন ভোগে নিস্পৃহ হয়ে শুকদেবের কাছে ভাগবত কথা শুনলেন।

ভগবান বুদ্ধও জরা, রোগ ও মৃত্যু দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—আমারও এমন হবে? গোপারও এমন হবে? (গোপাকে তিনি এতই ভালবাসতেন।) ছন্দক বলল,—হবে। বুদ্ধ বিষাদগ্রস্ত হলেন ও একজন সন্ন্যাসীকে দেখে পথ স্থির করে ফেললেন।

এর থেকে আমরা এই শিখি যে, ভোগে নিস্পৃহ না হলে ধর্মাচরণ হবে না। সংসারে নানা রকম দুঃখ শোক আছেই। কিন্তু তাতে ম্রিয়মান না হয়ে আমাদের বুঝতে হবে যে সংসার অসার। কোনও কারণেই আমাদের অধর্মের পথে যাওয়া উচিত নয়। স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা-রূপে কি কষ্টই না ভোগ করেছেন!

আমাদের ত্যাগ করতে হবে। নিস্পৃহ আর নিরভিমান হতে হবে। ত্যাগের পরাকাষ্ঠা ঠাকুর দেখিয়েছেন। স্বামীজী তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে বিছানার তোষকের তলে একটি টাকা রেখেছিলেন। ঠাকুর তার স্পর্শও সহ্য করতে পারেন নি। তিনি কেবল মনে নয়, কাজেও ত্যাগ করেছিলেন। তবে ঠাকুর যা করেছিলেন, আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কাজেই তিনি বলেছেন, আমি ষোল টাং করেছি তোরা এক টাং কর। আর তাও যদি না পারিস্ আমার উপর ভার দে, বকল্‌মা দে।

অমৃতায়ন

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
(লালগোলারাজ)

দেব দানবেরা মিলে সাগর-সলিলে মন্থন করে যবে,
ওঠে তীব্র গরল, অমৃতফল কমলার বৈভবে।
আছে দেবের ভাগ্যে লিখা
সেই বিজয়-লক্ষ্মী টীকা
জ্বলে দানবের মনে হিংসা-দহনে বিষের বহ্নিশিখা—
যত অসুরের দল করে কোলাহল জীবনের পরাভবে।

সেই আদিম প্রভাতে, মরণের সাথে, দিশাহারা সংগ্রাম
চলে কোন্ অমরার সুধাভাণ্ডার-সন্ধানে অবিরাম!
তাই বিষের পাত্রখানি
নিজ কণ্ঠে লইল টানি'
সেই জগতের নাথ শিব ভোলানাথ,—বিস্ময় মনে মানি',
এই বিশ্ব নিখিল তাই রাখে নীল-কণ্ঠ তাঁহারি নাম!

কবে জড়ের মাঝারে প্রাণ-সঞ্চারে মূর্ত হইল কায়া—
প্রাণে জাগিল বেদনা, মানস-চেতনা কে গো সেই মহামায়া
চাহি' ঊর্ধ্বলোকের পানে—
সে কী উন্মন আহ্বানে,—
বাহি' যুগ যুগ ধরি' সাধনার তরী অমরার সন্ধানে,
আসে বিদ্যুৎসম আলো নিরূপম ভেদিয়া কুহেলি ছায়া।

তাই, মর-দেহ-লোকে করুণা-আলোকে, কখন আসিবে নামি'—
সেই দিব্য-বিভূতি?—জানায় আকুতি নিখিল মুক্তিকামী!
এই মানসের খেলা শেষে,
যেথা আঁধারে আলোক মেশে—
সেই স্বরগের সুধা খুঁজিবে বসুধা অতি-মানসের দেশে!
শুধু তারি আয়োজনে, মনের গহনে, চেতনা উর্ধ্বগামী।

তবু আজো জাগে ক্ষণে মানবের মনে বিক্ষোভ, সংশয়—
পূজি' অসুর-বৃত্তি, লভিল তৃপ্তি—জীবনের সঞ্চয়!
হায়, জানে না বিষের জ্বালা—
সে কী তীব্র বহ্নি ঢালা—
আজি পাগল মহেশ অঘোরের বেশ কণ্ঠে কপাল মালা—
গাহে ভস্মের মাঝে মহাকাল সাজে মরণের মহাজয়।

কেন ভুলে যাই মোরা সেই সে অ-ধরা আলোক-স্বপ্নখানি?
গড়ি' দানব মূরতি জীবনের গতি পঙ্কিল পথে টানি।
কেন অমৃত' প্রয়োজনে,
সাড়া জাগিয়া ওঠে না মনে—
যদি দিব্য সুধায়, মানস ক্ষুধায়, খুঁজে ফিরি ক্ষণে ক্ষণে,
এই দেহ মণিপুরে অন্ধ অসুরে, নাশিতে হইবে, জানি।

শিক্ষার ভিত্তি

(এক)

'বনফুল'

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি' বক্তৃতা]

সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের সহিত এই সভায় মিলিতে পারিয়াছি এই সামান্য ঘটনাটুকু মানবজাতির অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে অসামান্য বলিয়া মনে হইবে। একদা যে মানব-পশুরা দেখা হইলেই পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিয়া নিজেদের শৌর্য প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত ছিল কোন্ শিক্ষা বলে কিসের প্রেরণায় তাহারা মিলিত হইবার শক্তি লাভ করিল? বস্তুতঃ মিলিত হইবার শক্তি অর্জন করিয়াই মানব প্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছে।

নানা রূপে, নানা ভঙ্গীতে, নানা সুরে, নানা প্রয়োজনে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই মিলনের সাধনা করিয়াছে এবং অবশেষে এমন এক মিলনাকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে যাহা সুলভ নহে, যাহা সভা-সমিতিতে মেলে না, যাহা তপস্যাসাধ্য। ইহার জন্য কবি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তপস্বী কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন। এই মিলনের নাম কেহ দিয়াছেন মুক্তি, কেহ নির্বাণ, কেহ পরম মিলন, কেহ উপলব্ধি। এই মিলনের আগ্রহ যখনই যাহার মনে জাগে তখনই এই বাহিরের বিশ্ব, দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক প্রয়োজনের উপকরণ-সম্ভার তাহার নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়, এমনকি অনেক সময় বাধাও মনে হয়। সর্ব দেশের শ্রেষ্ঠ মানব-মনীষা যে মিলনের জন্য সাধনা করিয়াছেন তাহা বহুর সহিত মিলন নয়, তাহা একের সহিত মিলন। তাহা সত্যের সহিত মিলন। কথাটা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। যে মিলনের বাসনা একদিন বহুলোককে একত্রিত করিয়াছিল সেই মিলনের যখন চরম অভিব্যক্তি ঘটিল, তখন তাহা হইতে 'বহু'টা বাদ পড়িয়া গেল। শ্রেষ্ঠ মনীষা তখন বহুর মধ্যে সেই একেকে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন যাহা শাশ্বত, যাহা অবিনশ্বর, যাহা বন্দী করেনা, যাহা মুক্তি দেয়। মানবের মধ্যে যতক্ষণ পশু প্রবল থাকে ততক্ষণ তাহার বিভিন্ন সামাজিক প্রচেষ্টা তাহাকে যে ভোগ-স্বর্গ রচনায় প্রবৃত্ত করে তাহার মনীষা আর একটু উন্নত হইলেই সেই স্বর্গ কারাগারে পরিণত হয়।

আমরা অধিকাংশই সাধারণ মানুষ। এই মিলনের প্রকৃত মর্ম আমাদের অনেকেরই নাগালের বাহিরে। আমরা অনেকের সহিত মিলিত হইয়াই আনন্দ লাভ করিতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে আনন্দ লাভ করিতে পারি কি? আমরা হাটে-বাজারে মিলি, সভা-সমিতিতে মিলি, ট্রেনে-জাহাজে মিলি, ধর্ম-ক্ষেত্রে মিলি, রাজনীতি-ক্ষেত্রে মিলি, সাহিত্যক্ষেত্রে মিলি, বিদ্যামন্দিরে মিলি। মিলনের নানা ক্ষেত্র আমরা প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু মিলনের প্রকৃত আনন্দ আমরা লাভ করিতেছি কি? আমাদের জীবন কি আনন্দময়, শান্তিময়? যদি সত্যকথা বলিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, না আমরা সুখী নই, আমাদের জীবন আনন্দহীন, অশান্তিপূর্ণ। আমরা বাহিরে একটা সুখের ভান করিতেছি মাত্র, ভিতরটা আমাদের পুড়িয়া যাইতেছে, যখন আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটাও পড়িতেছে তখনও আমরা দন্ত বিকশিত করিয়া বলিতেছি, চমৎকার লাগিতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে তো বটেই, আমাদের ধর্মক্ষেত্রেও এই ভান, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাই, সর্বত্রই আমরা মুখোশ পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মুখোশের প্রয়োজনে কাঁদিতেছি, হাসিতেছি, অপমানিত বা সম্মানিত হইতেছি। ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর নিকটও সর্বতোভাবে হৃদয় উন্মুক্ত করিতে পারিতেছি না।

তাই আমাদের শিক্ষার কথা যখনই চিন্তা করি তখনই মনে হয়, শান্তি এবং আনন্দই যদি জীবনের কাম্য হয় তাহা হইলে শিক্ষার বনিয়াদটা কিরূপ হওয়া উচিত? আর একটা প্রশ্নও মনে জাগে—শিক্ষার লক্ষ্য আত্ম-বিকাশ, না, সামাজিক উন্নতি? প্রতিটি ব্যক্তিকে যদি আধুনিক পদ্ধতিতে আত্ম-বিকাশের সুযোগ দেওয়া যায় তাহা হইলেই যে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে এমন কোন কথা নাই। সমগ্রভাবে সমাজের উন্নতি ঘটিলে প্রতিটি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যে সম্যকরূপে সম্মানিত হইবে না, ইতিহাসেই তাহার বহু প্রমাণ আছে। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বশালী ব্যক্তি আধুনিক সমাজে টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই, সক্রেটিস্, জোয়ান অব আর্ক, পদ্মিনী, রাণাপ্রতাপ, নেপোলিয়ন, লেনিন, মহারাজ নন্দকুমার, বাংলাদেশের অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত বীরেরা, মহাত্মা গান্ধী, আব্রাহাম লিংকন্, এরূপ অসংখ্য উদাহরণ আছে। ব্যক্তির

সহিত সমাজের বিরোধ যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সমাধান না করিতে পারিলে শান্তির আশা নাই। এ সমস্যা যুগে যুগে নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে, কারণ শত শত শতাব্দীর তথাকথিত শিক্ষা অধিকাংশ মানুষের পশুত্বকেই নূতন পরিচ্ছদ পরাইয়াছে। এখনও মানবসমাজের অধিকাংশ লোকই পশু-স্তরের উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। বস্তু-বিজ্ঞানচর্চার ফলে যে প্রগতি আমরা অর্জন করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য এই পশুত্বেরই প্রসাধন ও বিনোদন, এতদপেক্ষা মহত্তর কোনও লক্ষ্যে সমগ্রভাবে এখনও আমরা পৌঁছিতে পারি নাই। বিজ্ঞানচর্চার আদি ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা নির্বিঘ্নে পশুজীবন যাপন করিবার জন্যই একদা সমাজ স্থাপন করিয়াছিল এবং সেই সমাজের সুখসুবিধা বর্ধনের জন্যই বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়। সেই অতীত যুগেও ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব ছিল। যে কোনও দ্বন্দ্বে শক্তিরই জয় হয়। সে সমাজেও যাহারা বুদ্ধিমান শক্তিমান ছিল, তাহারা দলপতি, যাদুকর, চিকিৎসক, পুরোহিত প্রভৃতি হইয়া অন্য সকলের উপর আধিপত্য করিত। এই যাদুকর পুরোহিতের দলই কালক্রমে সমাজপতি, দিগ্বিজয়ী বীর, রাজা-মহারাজা-সম্রাট-ফারাও, সিজার-জার-ডিক্টেটারে রূপান্তরিত হইয়া দীর্ঘকাল মানবসমাজকে শাসন করিয়াছে, এখনও করিতেছে। এখন নামটা শুধু বদলাইয়াছে, সাধারণ লোককে সাময়িক ভাবে মুগ্ধ অথবা সন্ত্রস্ত করিবার মন্ত্রেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে ; মূল ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তেমনই আছে। ডেমোক্র্যাসিও বহুর উপর কয়েকটিমাত্র লোকের আধিপত্য ছাড়া কিছু নয়। জনগণ যেসব ব্যক্তিকে শাসনকর্তারূপে নির্বাচন করেন তাঁহারা সব সময়ে নির্বাচন-যোগ্য ব্যক্তিও নহেন, নানারূপ কায়দা-কৌশল করিয়া, শক্তি ও বুদ্ধির নানাবিধ জটিল জাল সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা নির্বাচিত হন।

এই সব আধিপত্যকে মানুষ কিছুদিন মানিয়া লইতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু এ জাতীয় আধিপত্যে সে সুখে থাকে না। তাহার ব্যক্তিত্বের সহিত ইহার অহরহ বিরোধ ঘটে। এই বিরোধের ফলে হয় সে পরাজিত হয়, না হয় বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতির ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া অবাঞ্ছিত আধিপত্যের অবসান ঘটায়। ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজের দ্বন্দ্ব আমাদের অশান্তির একটা প্রধান কারণ। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হইবে? ব্যক্তিত্বকে নিষ্পিষ্ট করিয়া একরঙা একটা সমাজস্থাপন করাই কি আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হইবে? না, প্রতিটি ব্যক্তির বিশেষ সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আমরা শিক্ষার আয়োজন করিব? ব্যক্তি ও সমাজের ঐক্য ঘটিলেই কি শান্তি সুলভ হইবে? এসব সমস্যা আলোচনা করিবার পূর্বে ব্যক্তিত্ব জিনিসটা কি তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রতিটি মানুষই একটি বিশেষ সত্তা, আলাদা জগৎ। জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহাকে দ্বিবিধ সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়। প্রথম সংগ্রাম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে। এ সংগ্রাম জীবন-মরণ সংগ্রাম। এ সংগ্রামে পরাজয় মানে মৃত্যু। তাহার দ্বিতীয় সংগ্রাম সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে। এই উভয়বিধ কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার যোগ্যতা অথবা অযোগ্যতা সে মাতৃজঠর হইতেই সংগ্রহ করিয়া আনে। শুধু পিতা-মাতার নয়, বিস্মৃত পূর্বপুরুষদের যোগ্যতা অযোগ্যতা শক্তি দুর্বলতারও উত্তরাধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। যে বংশে তাহার জন্ম দেহে মনে চরিত্রে সেই বংশের ছাপ লইয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এই ছাপ এড়াইবার উপায় নাই, আমড়ার বীজ হইতে আমড়াগাছ হইবে—আম বা আপেলগাছ হইবে না, অ্যালসেশিয়ান দম্পতীর বংশে অ্যালসেশিয়ানই জন্মিবে, বুলডগ্ জন্মিবে না। বংশের বৈশিষ্ট্য লইয়াই প্রত্যেককে জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের

সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার এই উত্তরাধিকার বিনষ্ট হইতে পারে, সমৃদ্ধ হইতে পারে, ঈষৎ পরিবর্তিত হইতে পারে, কিংবা যেমন ছিল তেমনি থাকিতে পারে। কিন্তু এই উত্তরাধিকারের প্রভাব অতিক্রম করিবার উপায় নাই। জুঁইগাছে গোলাপ কখনও ফুটিবে না। একদল বিজ্ঞানী অবশ্য বলেন যে, শিক্ষা এবং পরিবেশের প্রভাবে বংশ-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করিয়া দেওয়া সম্ভব, কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এ বিশ্বাস পোষণ করেন না, কারণ পরীক্ষাদ্বারা তাহা সমর্থিত হয় নাই। সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, বংশের প্রভাব অতিক্রম করা সহজ নয়। হয়তো ইহাই প্রালব্ধ বা fate ; এই প্রালব্ধ প্রতিটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র। বিচিত্র উপায়ে প্রতিটি প্রাণী এই স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। সহোদর ভ্রাতা ভগ্নীরাও বংশের উত্তরাধিকার সমভাবে লাভ করে না, কারণ যে genes পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্য বহন করিয়া জন্মকালে ভ্রূণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহারা প্রবেশ করিবার পূর্বে প্রতিবারই বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বাহক হয়, প্রতিবারই তাহাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য এবং স্বাতন্ত্র্য থাকে। তাই সহোদর ভ্রাতা ভগ্নীদের ভিতর স্বাতন্ত্র্য ও সাদৃশ্য দুইই প্রতীয়মান। যমজরাও সম্পূর্ণরূপে এক নয়, তাহাদের মধ্যেও পার্থক্য আছে।

এইরূপ এক একটি বিশিষ্ট সত্তা লইয়া আমরা প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করি সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে। সমাজ ও প্রকৃতি আবার প্রত্যেকটি সত্তাকে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ফেলিয়া নূতন রূপ দান করে। একই কাদার তাল কেহ হয় হাঁড়ি, কেহ হয় সরা, কেহ হয় মূর্তি। মানব সমাজের যত বয়স বাড়িতেছে আমাদের তথা-কথিত সভ্যতার জটিলতাও তত বাড়িতেছে এবং প্রতিটি মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আরও জটিল, আরও বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। মনঃসমীক্ষণ করিয়া মানবমনের বিভিন্ন স্তরের যেসব খবর সিগমুণ্ড ফ্রয়েড আমাদের দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর এবং আতঙ্কজনক। প্রতিটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা-অক্ষমতা, রুচি-আদর্শ, ন্যায়-অন্যায়বোধ এত বিভিন্ন, এত বিচিত্র, প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি হইতে এত স্বতন্ত্র যে, কোনও একটি বাঁধাধরা নিয়মাবলীর খাঁচায় সুখে শান্তিতে বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। প্রতিটি ব্যক্তি আপনার স্বতন্ত্র কল্পনায় মনে মনে এক একটি আদর্শ জগৎ সৃষ্টি করিয়া রাখে এবং বাস্তবে তাহা মূর্ত দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করে। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলেই অশান্তি। এই অশান্তির চিহ্ন আমরা সমাজে সর্বদা নানাভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। বর্তমানের নিন্দায় সকলেই পঞ্চমুখ। কেহ অতীতের দিকে চাহিয়া হা-হুতাশ করিতেছেন, ভবিষ্যৎকে মনোমত করিয়া গড়িবার জন্য কেহ বৈধ, কেহ বা অবৈধ উপায় অবলম্বনে উদ্যত, অনেকে আবার মনের প্রবল ভাবসমূহকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া মানসিক রোগাক্রান্ত হইয়াছেন।

অশান্তি দূর করাই যদি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এই সব বিষয়ে আমাদের অবহিত হইতে হইবে। প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে যদৃচ্ছ-ভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ দিলেও কিন্তু শান্তির আশা নাই। কারণ প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্ব যদি স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে চায়, সমাজের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না, এবং সমাজের অস্তিত্ব না থাকিলে সাধারণ মানুষ শান্তিতে বাস করিতে পারিবে না। দুই একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষ হয়তো পারিবেন। শান্তিলাভের আশাতেই সমাজের সঙ্ঘ-বদ্ধ শক্তির সহায়তা লাভ করিবার জন্য আমরা ব্যক্তিগত সুখ খানিকটা বিসর্জন দিই, কিন্তু মুশকিল হইয়াছে বিসর্জন দিয়া সুখী হই না। ব্যাপারটা অনেকটা যেন Tax দেওয়ার মতো হইয়া দাঁড়ায়। এই অসন্তুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে

পাই স্বার্থবিসর্জনের বিনিময়ে যে পরিমাণ সুখ সুবিধা লোকে প্রত্যাশা করে সে পরিমাণ সুখ সুবিধা তাহারা পায় না। মিউনিসিপালিটিতে আমিও Tax দিই, মিউনিসিপালিটির মেম্বরও দেন। আমার বাড়ির সম্মুখস্থ রাস্তা কিন্তু মেরামত হয় না, নালা পরিষ্কার হয় না, মেম্বরের বাড়ির চতুর্দিক কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তখন মন বিষাইয়া ওঠে এবং সুযোগ পাইলে নিজেই মেম্বর হইবার চেষ্টা করি। চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইলে অশান্তির মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়। সমাজের ব্যাপারেও ঠিক অনুরূপ পুনরাবৃত্তি হয়। সমাজেও দেখি কয়েকটি বিশেষ ধরনের লোক বিশেষ নীতি বা কৌশল অবলম্বন করিয়া বেশী সুবিধা লাভ করিতেছেন। অধিকাংশ লোকই তখন সেই বিশেষ কৌশল বা নীতি আয়ত্ত করিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়েন। বর্তমান যুগে তো বটেই, অতীতের পুরাণ ইতিহাসেও ইহার বহু প্রমাণ মিলিবে। পুরাণের গল্পে দেখি দানবেরা দেবত্ব লাভের জন্য সমুৎসুক, ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য লোলুপ, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র হইতেছেন, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ হইয়া ধর্ম-প্রচার করিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম যখন জনপ্রিয় হইয়া উঠিল তখন দেখি বেদ-পন্থীরা দলে দলে বৌদ্ধ হইতেছেন, বৌদ্ধধর্ম যখন অধঃপতিত হইল মুসলমানরা আসিলেন, তখন দেখিলাম এই বৌদ্ধরাই আবার ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতেছেন। মুসলমান রাজত্বের অবসানে আমাদের দেশে যখন ইংরেজের আগমন ঘটিল তখন আমরা নুৎসুদ্দি হইলাম, খ্রীষ্টান হইলাম, ইয়ং বেঙ্গল হইলাম ওই একই প্রেরণায়। তাহার পর কেরাণীকুল সৃষ্টি করিবার জন্য যখন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হইল—যে শিক্ষার মূল মন্ত্রটি বাঙালীর ছড়ায় আজও অমর হইয়া আছে—'লেখাপড়া শেখে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই'—তখন আমাদের মনে এই ধারণাটা পুরাপুরি বসিয়া গেল যে অর্থোপার্জনের জন্যই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, শিক্ষার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। এই অর্থকরী শিক্ষার রূপও যখন যেমন বদলাইয়াছে আমরাও তখনই তেমনি ঝুঁকিয়াছি। প্রথম যুগে যখন কয়েকটা ইংরেজি শব্দ জানিলেই চাকুরি মিলিত তখন আমরা ডিক্‌শনারি মুখস্থ করিতেও ইতস্তত করি নাই। তাহার পর আসিল ডিগ্রীর যুগ, ধুয়া উঠিল কোনক্রমে বি. এ পাশ করিলেই জীবনসমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, আমরা দলে দলে গ্র্যাজুয়েট হইলাম। তাহার পর ঝোঁক পড়িল আইন-শিক্ষার উপর, চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষার উপর, টেকনিকাল শিক্ষার উপর। পূর্বে আমরা কেরাণী, হাকিম, অধ্যাপক হইয়াছিলাম, এইবার দলে দলে উকিল, ডাক্তার ও এনজিনিয়ার হইতে লাগিলাম, দেশী ডিগ্রীর উপর বিলাতী ডিগ্রীর অলঙ্কার চড়াইয়া সামাজিক পশার প্রতিপত্তিও বাড়াইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মনে হইতেছে এ মোহও কাটিয়া আসিতেছে। এখন আরম্ভ হইয়াছে হিন্দী শিখিয়া নেতা এবং আধ্যাত্মিক ভেলকি দেখাইয়া গুরু হইবার যুগ। দেখা যাইতেছে এ বাজারে রাজনৈতিক নেতা অথবা আধ্যাত্মিক গুরু হইতে পারিলে নানাপ্রকার সুখ-সুবিধা পাওয়া যায়।

অর্থাৎ বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, আধিভৌতিক সুখ-সুবিধার জন্য যুগে যুগে আমরা নানারঙের আলেয়া অথবা নানা ঢঙের মরীচিকার পিছনে ছুটিতেছি, কিন্তু আমাদের সুখও মিলিতেছে না, শান্তিও নাই। এই অশান্তি ও অসন্তুষ্টি যে আজই আবির্ভূত হইয়া আমাদের দগ্ধ করিতেছে তাহা নয়, এ আগুন বরাবরই আছে। একটা 'হালের উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি। ১৩০৬ সালে —চুয়ান্ন বৎসর পূর্বে—যে কালের দিকে চাহিয়া আমরা এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া থাকি— "আহা, সে সময় কি সুখই ছিল"—সেই সময় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়

একটি সারগর্ভ প্রবন্ধে লিখিতেছেন—"আমাদের সমাজে একটা নৈরাশ্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমরা বড় একটা আশায় বুক বাঁধিয়া এতকাল আশ্বস্ত ছিলাম, যেন সে আশা আমাদের চূর্ণ হইয়াছে। আমরা এতদিন ধরিয়া যাহার মুখ চাহিয়াছিলাম সে যেন আমাদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে। এখন কেবল অতৃপ্ত বাসনার আর অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বিষাদধ্বনি কোথাও অস্ফুটভাবে কোথাও পরিস্ফুটভাবে সমুদ্গত হইতেছে। এই আকালিক বিষাদের, এই নৈরাশ্যের মূল কি?" বলা বাহুল্য, এই নৈরাশ্যের মূল কারণ ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সহিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরোধ। আমরা অশান্তি যে কেবল সজ্ঞানে ভোগ করিতেছি তাহা নহে, আমাদের নিজ্ঞ্জান মনও নানারূপ অশান্তির হেতুকে আত্মসাৎ করিয়া নানা-ভাবে ভারাক্রান্ত হইতেছে। আধিভৌতিক অভাবও এই অশান্তির একমাত্র কারণ নহে। সমাজে এমন লোক মোটেই বিরল নহেন যাঁহাদের কোনও অভাব নাই, যাঁহারা যশস্বী, ধনী, পদস্থ কিন্তু যাঁহাদের জীবন অশান্তিতে পরিপূর্ণ। পারিপার্শ্বিকের সহিত কেহই যেন খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারিতেছি না, প্রত্যেকেই যেন কণ্টকশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি।

সমাজের ও রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তিকে খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা সমাজ-পত্তনের কিছুকাল পরেই আরম্ভ হইয়াছে। সমাজপতি ও রাষ্ট্রনেতারা অনেক পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছেন ব্যক্তির সহিত সমাজ বা রাষ্ট্র একমত না হইলে সে সমাজ বা রাষ্ট্র বেশী দিন টেকে না। এই খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা মুখ্যত দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। একদল সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দিয়া ব্যক্তিকে তদনুসারে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছেন, ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া সমাজ-চেতনা, রাষ্ট্র-চেতনা অথবা বিশেষ-কোনও-উদ্দেশ্য-চেতনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। তজ্জন্য কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন। একজন নিয়ন্তার নির্দেশে সমস্ত সমাজ বা রাষ্ট্র ক্রীতদাসের মতো কাজ করিয়াছে। দ্বিতীয়দল ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রকে অধিকসংখ্যক ব্যক্তির মতানুসারে গঠন করিতে চাহিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট লিংকনের ভাষায় এই দলের আদর্শ,—Government of the people, by the people, for the people কিন্তু কোনও ব্যবস্থাতেই ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের সুখশান্তি পাওয়া যায় নাই। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ক্রমশ যেন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে আমরা যেন ক্রীতদাস ছাড়া কিছু নই, আমাদের মালিকরা আমাদের কপালে যেন Free citizen এই লেবেলটা নিজেদের আত্মপ্রসাদের জন্য কেবল আঁটিয়া দিয়াছেন। বহুকাল পূর্বে সমাজে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। ধনীরা টাকা দিয়া বাজার হইতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো দাস-দাসীও কিনিয়া আনিতেন। মানবতার শোচনীয় অপমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া আমরা এ প্রথা অবলুপ্ত করিয়াছি। এখন কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙিয়াছে, এখন আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে যন্ত্রসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই দাস-প্রথা নব কলেবরে আবির্ভূত হইয়া আমাদের মানসিক শান্তি হরণ করিয়াছে, আমাদের আত্মসম্মানও আর নাই। সেই প্রাচীনকালের ক্রীতদাস অপেক্ষাও আমরা যেন বেশী অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায় আমরা কেহই আর সুস্থ সবল প্রাণরসে সঞ্জীবিত স্বাধীনচেতা মানব নহি, আমরা একাধিক যন্ত্রের এবং যন্ত্র-নায়কের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। এই যন্ত্র আমাদের শক্তি, স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান, সমাজ, সম্পদ সমস্ত নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্যটুকুও আমাদের নাই, আমাদের বুদ্ধিও বিকৃত হইয়াছে, যান্ত্রিক অত্যাচারের স্বপক্ষে যুক্তি আহরণ

করিয়া আস্ফালনও আমরা করিতেছি বটে, কিন্তু নির্জ্জান মন এই সব অপমান ক্ষোভ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে এবং আমাদের নানারূপ উৎকট অভব্য অসঙ্গত আচরণে তাহা প্রায়শই প্রকাশিত হইতেছে। পুরাতন দাস-প্রথা যেমন নূতন রূপে আসিয়াছে যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে আমাদের পুরাতন সমাজও তেমনি নব-রূপ ধারণ করিয়াছে। কবি Cowper বলিয়াছেন—Man, in Society is like a flower blown in its native bud. এ-রকম সমাজ আমাদেরও হয়তো একদিন ছিল কিন্তু এখন আর নাই। আমাদের সে সমাজ ছিল পল্লীতে, সে সমাজের কিছু কিছু আভাস প্রবীণ লেখকদের লেখা হইতে পাই। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিপিনচন্দ্র পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, দীনেন্দ্র নাথ রায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনাতে সে সমাজের রমণীয় চিত্র আঁকা আছে। শরৎচন্দ্র যে পল্লীসমাজের ছবি আঁকিয়াছেন তাহারও বাহিরের রূপটা বদলাইয়া গিয়াছে। প্রকৃত সমাজ বলিতে যাহা বোঝায় সে সমাজ বহুপূর্বেই অবলুপ্ত হইয়াছে। এখন সমাজপতি নাই, সামাজিক নিয়মও কেহ মানে না। দশবিধ সংস্কারের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এমন কি বিবাহও আজকাল সামাজিক নিয়মে নিষ্পন্ন হয় না, বয়স্ক যুবকদের খেয়াল খুশী অনুসারে হয় এবং প্রায়শই নিয়ন্ত্রিত হয় আর্থিক মানদণ্ডে। তথাকথিত সভ্য-সমাজে কিশোরী কন্যার বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মনুর বিধান বহুপূর্বেই অচল হইয়াছে। বয়স্ক যুবকেরা বিবাহ করিতে চান না, কিন্তু তাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়া যান নাই। বিবাহ করিলে যে সব সুখ-সুবিধা-আনন্দ পাওয়া যায় তাহা তাঁহারা কোনও দায়িত্ব বহন না করিয়াই উপভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছেন। আমরা প্রতিবেশীর খবর রাখা আজকাল প্রয়োজন মনে করি না। প্রতিবেশীও আমাদের খবর রাখা অনেক সময় অপছন্দ করেন। যে সব ছোটখাটো সামাজিক উৎসব পুরাকালে আমাদের পরস্পরকে নানা বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিত সে সব উৎসব সভ্য সমাজ হইতে ক্রমশ উঠিয়া যাইতেছে। যে সব দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্বে আমরা মিলিত হইতাম, সে সব দেবতা এখন অন্তর্হিত, বহু হিন্দুঘরে আজকাল ঠাকুরঘর পর্যন্ত নাই। কয়েকটি উৎসব এখনও অবশ্য সাড়ম্বরে প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেগুলিতে সামাজিকতার কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না। দেখি অহঙ্কারের আস্ফালন, টাকার মহিমা, দরিদ্রের সঙ্কুচিত অপ্রতিভতা, পরশ্রীকাতর অক্ষমের ক্ষোভ; দেখি অকারণ অপব্যয়, অশ্লীল উন্মাদনা, অসংযত আচরণ। বহুকাল পূর্বে বড় দুঃখে দুর্গাপূজা উপলক্ষে লিখিয়াছিলাম—

"দিবসে নিশীথে যাহার স্বপ্ন
তন্ময় চিতে নিত্য হেরি,
ওঠে জয়গান জগৎ জুড়িয়া
যাহার দীপ্ত মূরতি ঘেরি
যাহার পূজায় কত বলিদান,
কতনা আরতি, মন্ত্র কত
কত ঋত্বিক, কত পুরোহিত,
কত আয়োজন লক্ষ শত
আকার তাহার যেমনই হউক
নানাভাবে করি টাকারই পূজা
হোক না তাহার যেমন চেহারা
বংশীবদন বা দশভুজা
অয়ি মৃন্ময়ি অতসী-বরণি,
ভিখারী-ঘরনি শিবানি, অয়ি,
রূপার তলায় চাপা পড়ে গেছ
তোমার পূজার মন্ত্র কই।
টাকার পূজায় মত্ত সবাই
তোমার পূজাও টাকার পূজা
লক্ষ্য নহ গো উপলক্ষই
ওগো মৃন্ময়ি হে দশভুজা।

সুদখোর ওই হারু-পোদ্দার
বাড়িতে তাহার পূজার ধুম
গর্জন করে লাউডস্পীকার
পাড়ার লোকের নাহিক ঘুম।
তাহার নিকট কর্জ করিয়া
পূজার বাজার করেছি সব
অর্থ নহিলে জমে কি জননী
তোমার পূজার এ উৎসব ?
অর্থ পুড়িছে আতস বাজীতে,
আলোক মালায় জলিছে টাকা
ঘণ্টার রবে টাকাই বাজিছে
প্রণাম না করে যায় কি থাকা ?
বড় সাহেবেরে সেলাম বাজাই
রাজারাজড়ায় প্রণাম করি,
হারুর বাড়িতে তেমনি জননি
তোমারেও নমি হে শঙ্করি।
অর্থাৎ কিনা হারুকেই নমি
কারণ তাহার টাকা যে আছে
দুর্গা কৃষ্ণ যাই সে পূজিবে
আমরা নমিব তাহারই কাছে।

দুর্গাপূজায় তিনদিন ধরিয়া অনাবিল আনন্দে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এখন আর আমরা মিলিতে পারি না। সকলে পাশাপাশি বসিয়া এক পূজামণ্ডপে মায়ের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হই না। গ্রামের পুরোহিত, গ্রামের শিল্পী, গ্রামের গোয়ালা, গ্রামের ময়রা, গ্রামের কবিরা সে পূজায় অংশ লইবার সুযোগ পায় না। ট্রেনে বা এরোপ্লেনে করিয়া আমরা কাশী হইতে পণ্ডিত, কলিকাতা হইতে মিষ্টান্ন ও প্রতিমা, শান্তিনিকেতন অথবা বোম্বাই হইতে গায়ক-গায়িকা আমদানি করি এবং তাহা অসম্ভব হইলে রেকর্ড বাজাই। যন্ত্রসভ্যতা আমাদের গ্রামকে ধ্বংস করিয়াছে। সে গ্রাম আর নাই, সে গ্রাম্য সমাজও আর নাই। গ্রামের ধনীরা আজকাল শহরে আসিয়াছেন। গ্রামে তাঁহারা গণ্যমান্য ছিলেন, শহরে তাঁহারা নগণ্য, তবু আসিয়াছেন। সুযোগ পাইলে অনেকে ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করিতেছেন।

যন্ত্রসভ্যতা আমাদের প্রাচীন সমাজের মাধুর্যকে অবলুপ্ত করিয়াছে কিন্তু ভিতরের গলদগুলিকে দূর করিতে পারে নাই; পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রী-কাতরতা এখনও ঠিক তেমনি আছে, যন্ত্রসভ্যতার কল্যাণে তাহার বাহিরের ঢংটা কেবল বদলাইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপ নাই, কিন্তু খবরের কাগজ আছে, ক্লাব আছে পার্টি আছে, সভা-সমিতি আছে এবং ইহাদের মধ্যে বেণী ঘোষালরাও আছেন। পরনিন্দা পরচর্চা এখন পল্লীসমাজেই নিবদ্ধ নাই, তাহা বিশ্বব্যাপী হইয়াছে। আমরা প্রতিবেশীর খবর রাখি না কিন্তু কোরিয়ার খবর রাখি, আমেরিকা ইংলণ্ডের খবর রাখি, চীনের রুশিয়ার খবর রাখি, ফরেন পলিসি লইয়া উত্তপ্ত আলোচনা করি। গ্রামের বা স্বদেশের সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প বা শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা আমাদের ততটা লজ্জিত করে না কিন্তু বিদেশী সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প বা শাস্ত্র সম্বন্ধে দুই চারিটা বুকনি ছাড়িতে না পারিলে বর্তমান সভ্যসমাজে অপাংক্তেয় হইতে হয়। বুকনি সংগ্রহ করিবার সুযোগও আজকাল মেলে, আজকাল প্রকৃত পণ্ডিত দুর্লভ কিন্তু পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের অভাব নাই।

অর্থাৎ যন্ত্রসভ্যতা আমাদের সমাজের বাহিরের রূপটা বিনষ্ট করিয়াছে, কিন্তু আমাদের চিত্তকে উন্নত করিতে পারে নাই, বরং তাহা নীচাশয় স্বার্থপর ব্যক্তিদের কার্যকলাপকে বৃহত্তর পরিধিতে পরিব্যাপ্ত হইবার সুযোগ দিয়াছে। যে 'ঘোঁট' পূর্বে সঙ্কীর্ণ সমাজে নিবদ্ধ থাকিত তাহা এখন নানাবিধ আন্দোলনের জয়-ঢাক বাজাইয়া পৃথিবীর শান্তিকে বিঘ্নিত করিতেছে। আমরা কেহই স্থির থাকিতে পারিতেছি না। স্থির থাকিবার উপায়ও নাই। প্রত্যহ খবরের কাগজের উত্তেজক হেড

লাইন, দৈনিক তিন চারবার সিনেমায় চিত্ত চাঞ্চল্যকর নৃত্যগীতের এলাহি আয়োজন, রেডিওর শূন্যপথে আক্রমণ, আমাদের ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে।

যে শিক্ষা আমাদের স্বস্থ করিতে পারিত সে শিক্ষাও আর নাই। শিক্ষক এখন আর শিক্ষক নন, তিনি বেতনভোগী মজুর মাত্র। সাহিত্যও আজকাল ব্যবসায়ের পণ্য।

যাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাঁহাদের সহিত রসিক-সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আর নাই। যখন ছাপাখানা ছিল না তখন গ্রন্থকর্তা নিজের পুস্তক স্বহস্তে সযত্নে লিখিয়া রসিক পণ্ডিতসমাজকে পড়িয়া শুনাইতেন। পুস্তক ভাল হইলে লোকে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত, টুকিয়া রাখিত, পূজা করিত। ছাপাখানার কল্যাণে আজকাল ভাল বই, খারাপ বই একই বেশে সজ্জিত হইয়া বাজারে বাহির হয়, তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকও সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করে এবং বিজ্ঞাপনের কৌশলে প্রথম শ্রেণীর পুস্তকের পাশে সম-গৌরবে স্থান পায়। সমাজেও দেখি আজকাল গণিকা ও সতী সাধ্বী একই বেশে পাশাপাশি বসিয়া রহিয়াছেন। যন্ত্রসভ্যতার সাম্যবাদ মুড়ি-মিছরিকে একাসনে বসাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম, ছাপাখানা হওয়াতে এ যুগের সাহিত্যিকদের আর একটা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। পূর্বে কবির সহিত রসিকের সরাসরি যোগ ছিল। কবি নিজের লেখা রসিককে পড়িয়া শুনাইতেন, তাহা লইয়া রসিকের সহিত সামনসামনি আলোচনা করিতেন, লেখা ভাল কি মন্দ, কোথায় সুর জমিয়াছে কোথায় বেসুরা বাজিয়াছে সহৃদয় আলোচনার দ্বারা তাহা স্পষ্ট হইত। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগে এক মহা আপদ জুটিয়াছে, সমালোচক বলিয়া একদল স্বয়ম্ভূ পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বেরসিক, কিন্তু ইঁহারা রসের ক্ষেত্রেই মুরুব্বিয়ানা করিয়া বেড়ান। কাহার লেখা সংবেদনপূর্ণ, কাহার লেখায় দরদ আছে, কাহার লেখায় প্রগতির পদধ্বনি শুনা যাইতেছে, কোন লেখক প্রতিক্রিয়াশীল, সাহিত্য রাজ্যে কে সম্রাট কে মন্ত্রী, কে উজির, কে গোমস্তা এই সব লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামান এবং বড় বড় প্রবন্ধ লেখেন। শুনিয়াছি ইঁহাদের সুনজরে পড়িবার জন্য গ্রন্থকার ও গ্রন্থব্যবসায়ীদের নাকি বহুবিধ কসরৎ করিতে হয়, পুস্তক ভেট দিতে হয়, খোশামোদ করিতে হয়, আরও অনেক কিছু করিতে হয়, তবে নাকি তাঁহারা সদয় হইয়া তাঁহাদের রচনার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন। যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না এই সব একদেশদর্শী আত্মম্ভরিতাপূর্ণ রচনা সাধারণ্যে প্রচারিত হইবার সুযোগ পাইত না। প্রকৃত রসিকরাই তখন কাব্য-সাহিত্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। এখন সে ভার পড়িয়াছে কতকগুলি মতলববাজ ব্যবসায়ীর উপর। সুতরাং এই ধরনের প্রবন্ধ ছাপা হয়, রেডিওতে নিনাদিত হয়। ফলে, বহুলোক সৎ সাহিত্যের সন্ধান হইতে বঞ্চিত হন।

সাহিত্যিকের তৃতীয় বিপদ প্রকাশক। প্রকাশক মুখ্যতঃ ব্যবসায়ী। যে বই বেশী বিক্রয় হয় তিনি সেই বই-ই ছাপিতে চান। উত্তেজক যৌন-কাহিনী, গরম গরম পলিটিকাল প্রপাগ্যাণ্ডা, ডিটেক্‌টিভ কাহিনী, সরস গাল-গল্প প্রভৃতিরই চাহিদা বেশী, ভাল প্রবন্ধ, কবিতা বা ছোট-গল্পের বই বাজারে চলে না শুনিয়াছি। অভিনীত না হইলে নাটকও চলে না। যাঁহারা নাটক অভিনয় করেন বা করান তাঁহারাও ব্যবসাদার এবং অনেক ক্ষেত্রে অসাধু। কোন ভদ্র নাট্যকারের পক্ষে তাঁহাদের ব্যবহার বরদাস্ত করা কঠিন। সুতরাং যাঁহাদের নাটক লিখিবার প্রতিভা আছে তাঁহারা নাটক লিখিতেই চান না। সাহিত্যসাধককে বাধ্য হইয়া তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতে হয়, এমন বই লিখিতে হয় যাহা প্রকাশক-গ্রাহ্য। বলা-বাহুল্য,

সে সব পুস্তক সব সময় সুসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। ইহাতে প্রকৃত সাহিত্যসাধকের ক্ষোভ হয়, রসিক-সমাজও ক্ষুণ্ণ হন। সাহিত্য সমাজের যে কল্যাণ সাধন করিতে পারিত তাহা পারে না।

যন্ত্র সভ্যতার আরও দুইটি 'অবদান' বর্তমান সভ্য সমাজের চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে—সিনেমা ও রেডিও। সুপ্রযুক্ত হইলে হয়তো ইহারা মানব সভ্যতার কল্যাণ-সাধন করিতে পারিত কিন্তু বর্তমান যুগে তাহা হইবার উপায় নাই। কারণ প্রত্যেক যন্ত্রের পিছনে যে যন্ত্রপতিরা বর্তমান, মানবজাতির কল্যাণ-সাধন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিজেদের স্বার্থসাধন। অধিকাংশ মানবকে শোষণ করিয়া তাঁহারা নিজেরা শক্তিমান হইতে চান। পূর্বে খাইবার পাশ দিয়া বহিঃশত্রুরা আসিয়া এ দেশ জয় করিয়াছিল, এখন তাহারা আসিতেছে যন্ত্রের ভিতর দিয়া। মানুষ পশুকেই জয় করিতে পারে, মানুষকে পারে না। এই সব যন্ত্র তাই অধিকাংশ মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামাইয়া দিতে চায়। পূর্বে পাশ্চাত্য বণিকরা চীনাদের অকর্মণ্য করিবার জন্য জোর করিয়া তাহাদের আফিঙের নেশা ধরাইয়াছিল, আমাদের দেশের চাষীকে দরিদ্র করিয়া ধানের ক্ষেতে নীলের চাষ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, কারণ নেশাগ্রস্ত বা দরিদ্র জাতিকে শোষণ করা বা শাসন করা সহজ। শোষণ এবং শাসন করিরার জন্য এখন তাহারা নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে—যন্ত্রের পন্থা। আর্ট পরিবেশনের ছলে সিনেমা এবং রেডিওর মারফৎ তাহারা যাহা পরিবেশন করিতেছে তাহা সেই আর্ট নয় যাহা আমাদের সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান দেয়, তাহা সেই আর্ট যাহা আমাদের কামনাকে মোহিনীবেশে সাজাইয়া আমাদের সর্বনাশ করে। পূর্বে দুই চারি জন ধনী কামুক বাইজী-বিলাসের সুযোগ পাইতেন। যন্ত্রের কল্যাণে সকলেই এখন সে সুযোগ পাইয়াছেন। আমাদের অজ্ঞাত-সারেই আমরা সকলেই ক্রমশ অক্ষম কামুক পশু হইয়া যাইতেছি। শাসক ও শোষকদের সুবিধা বাড়তেছে।

এই সব যন্ত্র আমাদিগকে আর একটি মূল্যবান সম্পদ হইতেও বঞ্চিত করিতেছে। মহৎকে সুন্দরকে শ্রেষ্ঠকে গুণীকে শ্রদ্ধা করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা সভ্য মানবচরিত্রের একটি প্রধান সম্পদ। যন্ত্রযুগের পূর্বে মহৎ সুন্দর শ্রেষ্ঠ গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যলাভ করা সহজ ছিল না। তাঁহাদের সম্বন্ধে তাই সাধারণ লোকের ঔৎসুক্য ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। প্রকৃত জিজ্ঞাসুরা, অকপট ভক্তেরা তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। যন্ত্র এখন সমস্তই সুলভ করিয়া দিয়াছে। তাই দেখি রেডিওতে যখন কোন গুণী সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন বা কোনও বিখ্যাত পণ্ডিত সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়িতেছেন, তখন আমরা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সে সব শুনি না, রেডিওটা খুলিয়া দিয়া অসঙ্কোচে হাসি-গল্প-তামাসায় মাতিয়া উঠি। যদি বহু কষ্ট সহ্য করিয়া বহু সাধনা করিয়া উক্ত গুণীদের সমীপবর্তী হইতে হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মুখে আমরা এতটা বেসামাল হইতাম না। ইহাতে উক্ত মনীষীদের বিশেষ ক্ষতি হয় না, হয় আমাদের। সবকিছুকেই যন্ত্রের সহায়তায় অতি সহজে আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া আমরা কিছুই ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, আমরা বুঝিতেও পারিতেছি না যে পাইলেই গ্রহণ করা যায় না, গ্রহণ করিবার জন্য সাধনা দরকার। পল্লবগ্রাহীসুলভ একটা মিথ্যা অহঙ্কারের মুখোশ পরিয়া আমরা সবজান্তা সাজিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে, আমাদের নির্জ্জন মনে কিন্তু আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানি এবং তাহা আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের অশান্ত করিয়া তোলে।

যন্ত্রসভ্যতার অর্থনৈতিক দিকটা তো আরও

ভয়ঙ্কর। পল্লীসমাজ ভাঙিয়া গিয়াছে, ভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা শহরে আসিয়াছি, কুটিরশিল্প অবলুপ্ত, পেশা এখন আর বংশগত নাই, ব্রাহ্মণ জুতার দোকান খুলিয়াছে, মুচী অধ্যাপনা করিবার চেষ্টায় পরীক্ষা পাশ করিতেছে, ময়রার ছেলে ডাক্তার হইতে চায়, বৈদ্যের পুত্র এনজিনিয়ার হইয়াছে, তবু কিন্তু কাহারও অন্ন জুটিতেছে না, ঘরে বাহিরে দোকানে ফ্যাকটরিতে সর্বত্রই অশান্তি। সকলেই আমরা ছটফট করিতেছি—পূর্বযুগে দাসচালকদের চাবুকের আঘাতে ক্রীতদাসরা যেমন ছটফট করিত নূতন যুগের অভিনব ক্রীতদাস আমরা ঠিক তেমনি ভাবেই ছটফট করিতেছি—অনেকে হয়তো বুঝিতে পারিতেছি না এক অদৃশ্য Simon hegvee আমাদের চাবকাইতেছে। পূর্বে ক্রীতদাসরা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিত, কোনও কোনও সহৃদয় প্রভু ক্রীতদাসকে স্বাধীনও করিয়া দিতেন, এখন কিন্তু দাসত্বের যে নাগপাশে আমরা আবদ্ধ তাহা হইতে মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। তাই অশান্তি আরও বড়িয়াছে। কোনরকম 'ইজ্‌মে'ই আর মন প্রবোধ মানিতেছে না। সমাজ রাষ্ট্র সমস্তই যেন কারাগাররূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রতিবেশীকে মনে হইতেছে শত্রু, ধার্মিককে মনে হইতেছে ভণ্ড, পণ্ডিতকে মনে হইতেছে বেকুব, ধনীকে মনে হইতেছে শোষক। কোথাও শান্তি নাই।

আধুনিক অশান্তির চেহারাটা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বিবৃত করিলাম। পরবর্তী প্রবন্ধে বলিবার চেষ্টা করিব আমাদের শিক্ষার দ্বারা এ অশান্তি নিবারণ সম্ভব কি না। নূতন কিছু বলিবার স্পর্ধা করি না। নূতন বলিয়া কিছু আছে কি? আমরা পুরাতনকেই বারংবার নূতন করিয়া আবিষ্কার করি। বেদান্তকে সাংখ্যকে থিওরি অব রিলেটিভিটির আলোকে প্রত্যক্ষ করিয়া চমকিত হই। অতি আধুনিক আণবিক বোমার স্বরূপ যে বেদব্যাসের কল্পনাতে অন্তত ছিল তাহার প্রমাণ পাই ব্রহ্মশির বা পাশুপত অস্ত্রের বর্ণনায়।

অশান্তি মানবসমাজের অতি পুরাতন ব্যাধি। অতীতকালে যাঁহারা চিন্তানায়ক ছিলেন তাঁহারাও এ ব্যাধির প্রতিকার-চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রয়াস যে নিষ্ফল হয় নাই তাহার প্রমাণ অতীতের গৌরবময় ইতিহাস। আধুনিক যুগে আমাদের শিক্ষার বহুবিধ সংস্কারের কথা শুনি—উড সাহেবের ডেসপ্যাচ, গোখলের বিল, স্যাডলার কমিশন, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার, স্বাধীন ভারতেরও শিক্ষার নানাবিধ সংস্কারের আয়োজন চলিতেছে, কিন্তু আমার মনে হয় আসল ব্যাপারটার উপর যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। খাদ্যদ্বারা ক্ষুধা নিবারিত হয়—প্রাচীন বলিয়া এ সত্য আমরা বর্জন করি নাই। প্রাচীন পণ্ডিতগণ অশান্তি নিবারণেরও একটা প্রতিকার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরবর্তী প্রবন্ধে তাহার স্বরূপ বিচার করিবার প্রয়াস পাইব।

ক্রমশঃ

"আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলে না, কেবল উহা গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতে জানে। এইরূপ অবস্থামূলক বা অস্থিরতা-বিধায়ক শিক্ষা কিংবা যে শিক্ষা কেবল 'নেতি'ভাবই প্রবর্তিত করায় সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

পরিচয়

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

"আদি মানবের সন্তান আমি
দেবতার চেয়ে অভিজাত,
সত্যেরে আমি সম্ভ্রমে নমি
মিথ্যারে করি পদাঘাত।
ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি
বিশ্বেরে নাহি করি ভয়,"—
মানুষের কাছে নাহি মানুষের
এর চেয়ে বড় পরিচয়।

"মানুষ জাতির স্বজাতি যে আমি
মানুষ আমার বোন্ ভাই ;
মানুষেরে ভালবাসি দিবানিশি
সেবা করি তার গুণ গাই।
মানুষে মানুষে হিংসা নিত্য
কঠোর চিত্তে করি জয়"—
মানুষের কাছে নাহি মানুষের
এর চেয়ে বড় পরিচয়।

"মানুষ-ধর্ম আমার ধর্ম
অপর ধর্ম কিছু নাই,
মানুষের যাহা করণীয় আমি
সদা তারি পিছু পিছু ধাই।
জীব-নারায়ণে সেবি প্রাণপণে
সংযমে করি অরি জয়,—"
মানুষের কাছে নাহি মানুষের
এর চেয়ে বড় পরিচয়।

ধর্ম

শ্রীমতী লীলা মজুমদার

একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক একবার বলেছিলেন যে, হিন্দুরা ধার্মিকভাবে খায় দায়, শোয় ঘুমোয়, চলে ফেরে; ধার্মিকভাবে চিন্তা করে, পুণ্য করে, পাপ করে। কথাটার মধ্যে অনেকখানি শ্লেষ আছে বলা বাহুল্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এতটা সত্যও আছে যে, মনে গিয়ে আঘাত করে। এই হিন্দুরা যারা মিথ্যাকথা বলে থাকে, প্রবঞ্চনা করে, পরনিন্দা করে কিন্তু অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়াবার যাদের সৎসাহস নেই, তারাই নাকি ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করে, কথাটার একমাত্র অর্থ করা যেতে পারে যে, নিজেদের কাজের দায়িত্ব বহন করবার সাহস পর্যন্ত হিন্দুদের নেই, ধর্মের দোহাই দিয়ে কোনও মতে সেটুকুকে এড়িয়ে যেতে পারলেই হ'ল। সেইজন্য এদেশের সমাজকে সংস্কার করা এত

কঠিন। ভিতর থেকে আপদ কিছুতেই বিদায় হয় না, বাইরে থেকে আইন্ করে জবরদস্তির সাহায্যে তার কণ্ঠরোধ করে রাখা হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে এমন জাতির ও এমন ধর্মের কতটুকু মূল্য ?

আসল কথা হ'ল ধর্ম শব্দের অর্থ নিয়ে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হ'য়ে গেছে। কতকগুলি আচার নিয়মের ফিরিস্তি দিয়ে কি আর একটা ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় ? এমন কি ধর্ম বলতে শুধু মানুষের সঙ্গে তার সৃষ্টিকর্তার সম্বন্ধটুকুও বোঝায় না। ধর্মের প্রয়োগ আরও ব্যাপকভাবে হওয়া চাই ? ধর্ম মানে একটা সম্পূর্ণ জীবনের ধারা, জীবনধারণের পদ্ধতি। যে আর্য প্রপিতামহরা নিয়মনিগড়ে আমাদের গোটা জীবনটাকে বেঁধে দিয়েছিলেন, তাঁরা ধর্ম শব্দের এই অর্থটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব করে দেওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু কালের ফেরে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ধর্মের নিয়ম পালনটি শুধু টিকে রইল, মাঝখান থেকে ধর্মই কোথায় খসে পড়ল।

ফলে এখন কাউকে 'ধার্মিক' আখ্যা দিলেই চোখের সামে সর্বপ্রকার আনন্দের শত্রু, চোখবোঁজা একজন ভণ্ডের চিত্র ভেসে ওঠে। আজকাল ধার্মিক বলতে আর ধর্মপরায়ণকে বোঝায় না। এমন কি অনেকের মতে ধর্মই হ'ল পৃথিবীর অর্ধেক দুঃখের প্রধান কারণ। ধর্ম বলতে যদি শুধু আনুষ্ঠানিক, ধর্ম বোঝায় তা' হ'লে এ কথাটার মধ্যেও অনেকখানি মর্মান্তিক সত্য আছে।

কিন্তু ধর্মের একটা বৃহত্তর সংজ্ঞা আছে যা'র প্রয়োগে একজন নাস্তিকও একদিক দিয়ে যতই না দীন হ'ক, অপরদিকে ধর্মপরায়ণ আখ্যার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। যে জিনিসকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছে, তাকে যারা অবলম্বন করে, তারা ধার্মিক। যা'রা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা দণ্ডায়মান হয়, তারা ধার্মিক। যা'রা শত্রুকে ক্ষমা করে, দুঃখীকে দয়া করে, স্বার্থকে ত্যাগ করে তারা সকলেই ধার্মিক। মনুষ্যত্বকে যা প্রস্ফুটিত ক'রে তোলে, তাই ধর্মের অঙ্গ। যা জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করতে, গুণীকে সম্মান করতে সহায়তা করে, সেও ধর্মের অঙ্গ। ধর্মের এই সংজ্ঞাকে সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়া যায় না, নব নব উদয়াচলে নিয়ত সে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে।

আমরা ধর্মের এই অর্থকে ভুলে গিয়েছি ব'লে ধর্ম আমাদের কাছে কতকগুলি পুঁথিগত মন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়, বেঁচে থাকার একটা প্রণালী না হ'য়ে কতকগুলি ফুল গঙ্গাজল বেলপাতার একটা অর্থশূন্য ক্রিয়ামাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ভাবি ধর্মকে অবলম্বন করলে বুঝি সংসারের সব আনন্দগুলিকে বর্জন করতে হবে। বুঝি বন্ধুবান্ধব, সুখ সখ সব ছাড়তে হবে, বুঝি একটা অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে।

বলা বাহুল্য, এই বৃহত্তর অর্থে ধর্মকে গ্রহণ করলে স্বার্থসেবাকে খানিকটা কমিয়ে আনতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, কেবল এমন ধর্মই সমাজের কল্যাণের হেতু হয়। অপর সকলের দ্বারা সকল মঙ্গলের অন্তরায় যে আত্মপ্রসাদ, তাকে ছাড়া আর কিছুকে লাভ করা যায় না।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষরাও ধর্মের এই বড় অর্থই গ্রহণ করেছেন। পরমহংসদেব গির্জা দেখলেই নমস্কার করতেন, সাধু দেখলেই আলিঙ্গন করতেন, অনাসক্তকে দেখলেই মাথা নত করতেন ? অনেকে তাই হাসাহাসি করত। ভালোকে ভালো বলবারও যেমন আমাদের সাহস নেই, মন্দকেও তেমনি মন্দ বলবার আমাদের সৎসাহস নেই! অসৎ কাজ ক'রে আমরা বলি যে, আজকাল সকলেই এমন ক'রে থাকে, যেন পাঁচজনে অন্যায় করলেই অন্যায়টা কমে যায়। আর অসৎ কাজের ফলে যদি ঘরে অর্থ-সমাগম হয়, তা' হ'লে মুক্তকণ্ঠে আমরা ঐ কীর্তিমানের বুদ্ধির প্রশংসা ক'রে থাকি, এবং

বারংবার বলি অন্যায় কাজ করতে হ'লে যে সাহসের প্রয়োজন হয়, অনেকেরই সে সাহস নেই ব'লে তারা সৎপথে থেকে যাচ্ছে। এমন কি ধর্মে আমাদের এতই অনাস্থা, যে কেউ যদি নিজের চেষ্টায় নিজের অবস্থার উন্নতি ক'রে থাকে, তখুনি আমাদের সন্দেহ হয় নিশ্চয় অসৎ উপায় অবলম্বন করেছে, নইলে, কি আর বড়লোক হ'তে পারত। আবার নিজের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য বাইবেল থেকে নজির দিয়ে বলি, যীশু বলেছিলেন যে বরং একটা স্থচের ছিদ্র দিয়ে একটা উট গলে যাবে, তবু ধনী লোকের স্বর্গে প্রবেশ করা হবে না।

পুরুষপরম্পরায় আমরা বলে আসছি যে, ধর্মের সঙ্গে পার্থিব সুখ খাপ খায় না, অতএব সময় থাকতে ধর্মটিকে ত্যাগ ক'রে বিষয় আশয় রক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা ঢের ভালো। এবং ধর্ম যদি করতেই হয়, বেশ কোশাকুশি ফুল জল দিয়ে এক কোণে বসেই পড়গে না, তা'র চেয়ে বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। তা'তে সংসারের অনিষ্ট হ'তে পারে।

ধর্ম যে বেঁচে থাকবারই পদ্ধতি, সংসারযাত্রা নির্বাহ করবারই প্রণালী—সে কথা কই কেউ ত' আজকাল বলে না।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্‌-এ

(এক)

শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকীর ঢেউ আকাশে বাতাসে লেগেছে। এই পুণ্য অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীমায়ের বহু কৃতী সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ সন্তান শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে জড়িত তাঁদের অনেক স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ ক'রে নিজেরা ধন্য হয়েছেন এবং ভক্তদেরও ধন্য করেছেন। কয়েকজন বন্ধু, বিশেষ করে, দু'একজন সন্ন্যাসী মহারাজও আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আমার যা জানা আছে তা লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করেছিলেন। এতদিন তা করা হয়নি, কিন্তু এখন ভাবছি আমি যত দীনই হই না কেন, শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি উপলক্ষ করে এই শুভ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আমিও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবো। তবে শ্রীশ্রী-মায়ের চরণে আশ্রয় নেবার পূর্বের ঘটনাগুলি না লিখলে অনেক কথাই বলা হবে না, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রধান তীর্থস্থান বেলুড়মঠে আমার প্রথম দিনের অভিযানের ইতিহাস দিয়েই সুরু করবো। *

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে (১৯১৫ খ্রীঃ) কলকাতায় সিটি কলেজে ভর্তি হই। সেই প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়তে পড়তে এক ছুটির দিনে ইচ্ছা হলো বেলুড়মঠে বেড়াতে যাব। দুই বন্ধুও সঙ্গী হলেন। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে আমরা তিন বন্ধু মঠে গেলাম।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীর ঘরের

* মনে পড়ে অত্যন্ত ছেলেবেলায় একদিন সন্ধ্যায় আমাদের গ্রামের বাড়ীতে অনৈক ভদ্রলোক আমার পিতাকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, মশায় একটা পাগলা বামুন কি কাণ্ডটাই না করলে। ক্রমে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক গল্প করলেন। সেই প্রথম আমি ঠাকুরের নাম শুনেছিলাম। আরও মনে পড়ে, স্বামীজীর দেহত্যাগের খবর যখন সাপ্তাহিক কাগজে বের হলো তখন গ্রামের সবচেয়ে শিক্ষিত ভদ্রলোকটি কাগজ পড়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলেছিলেন,—সর্বনাশ হয়েছে। আমি বালকসুলভ কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি হয়েছে? তিনি বললেন, তুই এখন বুঝবি না, বড় হলে বুঝবি দেশের কি সর্বনাশ হলো।

১৯১৫ সালে যখন ম্যাট্রিকুলেশন টেষ্ট পরীক্ষা দিই তখন পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ ময়মনসিংহে আসেন। ওখানে আমি স্বামী প্রেমানন্দজীকে প্রথম দর্শন করেছিলাম—তবে কথাবার্তা কিছু হয়নি।

পাশের ঘরে একটা তক্তাপোশে শুয়ে ছিলেন। গায়ে একখানা চাদর মাত্র ছিল। আমরা যখন ঢুকলাম তখন আমার পূর্ব পরিচিত জনৈক ভদ্রলোক আমাকে কানে কানে বললেন,—"ইনিই বাবুরাম মহারাজ, এঁকে প্রণাম কর।" আমার ভিতরে তখন ভীষণ সমস্যা। শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজকে এত ভাল লেগেছে যে প্রাণ চাইছে প্রণাম করতে, কিন্তু সংস্কার বলছে—ইনি কি ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ কিনা না জানলে আমি প্রণাম করবো না। শেষ পর্যন্ত সংস্কারই জয়ী হলো। আমি প্রণাম করলাম না, আর আমার পূর্ব পরিচিত বন্ধুটিও জোর করেই প্রণাম করাবেন! এই অবস্থায় আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "উনি ব্রাহ্মণ কিনা না জানলে আমি কিছুতেই প্রণাম করবো না।" এদিকে এই কথা শুনেই পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ লাফিয়ে তক্তাপোশ থেকে নামলেন এবং একহাতে আমাকে ধরে টানতে টানতে নীচে পূবের দিকের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমার মাথার উপর (ব্রহ্মতালুতে) চুমু খেলেন। সে কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমার মনে হলো এক মুহূর্তে জীবনের ধারা যেন সম্পূর্ণ বদলাতে লাগলো। আমি অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলাম। কিছুতেই কান্না থামাতে পারলাম না। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বললেন,—"আর কাঁদছিস্ কেন? কান্না শেষ।" তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন,—"চল্, তোকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাই।" এই বলে আবার টানতে টানতে ঠাকুর-ঘরের সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেলেন এবং এক পা সিঁড়ির উপর দিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। ঠিক এই সময়ে আমি শুনতে পেলাম যেন মিলিটারী বুট পরে তালে তালে পা ফেলে এলে যেমন একটা গুরুগম্ভীর ভাব মনে আসে ঠিক সেইভাবে কে যেন আসছেন। যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে যিনি নেমে এলেন তাঁকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখেই মনে হলো, এভাবের বিরাট লোক আমার জীবনে কখনও দেখিনি, যেন সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট আমার সম্মুখে উপস্থিত! ইনিই শ্রীশ্রীমহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ। আমাদের কাছে এসে বাবুরাম মহারাজকে বললেন—"বাবুরাম দা, ছেলেটার মাথাটা খেলে?" বাবুরাম মহারাজ উত্তর করলেন,—"মহারাজ, তুমি এই ছেলেটাকে গ্রহণ করো।" এই বলে তিনি আমাকে দুহাতে ঠেলে দিলেন শ্রীমহারাজের কাছে। শ্রীমহারাজ আমাকে বাম হাতে জড়িয়ে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—"পারবি?" আমার ভিতর থেকে জবাব বের হলো—"আপনি কৃপা করলে নিশ্চয়ই পারবো।" এই যে 'কৃপা' ইত্যাদি কথা আমার মুখ দিয়ে বের হলো তার সঙ্গে যেন আমার পূর্বেকার জীবনের কোন সামঞ্জস্য নেই। এই মহাপুরুষদ্বয়ের স্পর্শে আমি অনুভব করলাম জীবনের ভিতরটা যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এঁদের কি অসম্ভব আপন মনে হলো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শ্রীমহারাজ আমার ব্রহ্মতালুতে আঙ্গুল দিয়ে একটা কি যেন লিখলেন। আমি প্রণাম করলাম। আস্তে আস্তে তালে তালে পা ফেলে তিনি আবার উপরে উঠে গেলেন।

কলকাতার হোষ্টেলে ফিরে এলাম। জীবনের ভিতরে একটা মানুষ মরে যেন আর একটা মানুষ জন্মালো। চিন্তা এবং কর্মধারা সম্পূর্ণ ওলট পালট হয়ে গেল, আর ভিতরে একটি নাম দিন রাত ঘড়ির কাঁটার মত চলতে লাগলো। রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও বুঝতে পারছি—নাম চলছে। কৃপা জিনিসটা যে কি আমি এই মহাপুরুষদ্বয়ের কৃপাতেই বুঝতে পারলাম। তারপর থেকে সুবিধে পেলেই মঠে যেতাম। আত্মীয়স্বজন, এমন কি পিতামাতাকেও অত্যন্ত দূর মনে হতে লাগলো। ছুটি হলে দেশে যেতাম না। এই অবস্থায় একদিন উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে গেলাম। তখন তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। শ্রীশ্রীমহারাজ ও শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজকে অত্যন্ত আপন মনে হতো।

তাঁদের কাছেই যেতাম। কাছে বসে থেকে তাঁদের দেখেই অত্যন্ত আনন্দ পেতাম। কোন প্রশ্ন করা অথবা কিছু প্রার্থনা করা—এসব আসতো না। যাহোক্ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে যাওয়া হল। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে মাটিতে বসে আছেন দু'পা ছড়িয়ে। যেই চৌকাঠের কাছে গেছি, দেখলাম ঘরে আর কেউ নেই। শ্রীশ্রীমা এক হাতে ঘোমটা একটু খুলে বললেন,—"ওখান থেকেই প্রণাম করো।" আমার মনে ভীষণ দুঃখ হলো, কিন্তু কি করবো, মা তো ঘরে ঢুকতে দিলেন না, কাজে কাজেই আমি চৌকাঠের উপর প্রণাম করেই চলে এলাম। পথে বের হয়ে খুবই কাঁদলাম। হোষ্টেলে এসেও কাঁদলাম। শুধুই মনে হলো মা যেন আমাকে দূরে তাড়িয়ে দিলেন—কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়—এই কথা মনে হলো।

দু' তিন দিন পর আবার উদ্বোধন আফিসে গিয়েছি। উপরে গিয়ে দেখলাম শ্রীশ্রীমা পূর্বদিনের মতোই দু'পা লম্বা ক'রে ছড়িয়ে বসে আছেন। এবার আমি সাহস করে চৌকাঠ পার হয়ে গেলাম। ঘরের ভিতর ঢুকে মেজেতে মাথা ঠুকে প্রণাম করলাম। কেন জানি না শ্রীচরণ স্পর্শ করার সাহস হলো না। শ্রীশ্রীমাও ঘোমটা খুলে একটু দেখলেন। আমিও চলে এলাম। পথে বের হয়ে সেদিনও মন খুব খারাপ হয়ে গেল। অনুশোচনা হতে লাগলো কেন সাহস করে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করলাম না। যাক্, হোষ্টেলে ফিরে এলাম। এবার সংকল্প করলাম আর একবার উদ্বোধনে যাবো এবং এবার শ্রীশ্রীমায়ের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করবো। এবার বোধ হয় তার ঠিক পরদিনই বা একদিন মাঝে বাদ দিয়ে গেলাম। উদ্বোধন আফিসে ঢুকে বারান্দা দিয়ে উপরে যাবো, হঠাৎ পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজ আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন,—"এই ছোকরা, তুই কোথায় যাচ্ছিস?" আমি বললাম,—"মাকে প্রণাম করতে উপরে যাচ্ছি।" তিনি বললেন,—"তুই ত কাল এসেছিলি, আবার আজ এসেছিস? প্রত্যেক দিনই মাকে প্রণাম করতে যাবি নাকি?" আমি বললাম,—"কেন যাবো না? আমি চললাম উপরে।" তিনি আমায় আর বাধা দিলেন না। আমি উপরে গেলাম। এবারও শ্রীশ্রীমা ঠিক পূর্ব দু' দিনের মতোই বসেছিলেন। আমি ঘরে ঢুকে মেজেতে লম্বা হয়ে পড়ে আমার মাথাটা তাঁর শ্রীচরণে রেখে প্রণাম করলাম। সেই স্পর্শের কি অদ্ভুত গুণ! 'মা কৃপা কর', 'মা কৃপা কর' বলে আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলাম। কিছুতেই যেন আমাকে সামলাতে পারছিলাম না। শ্রীশ্রীমা হাত দিয়ে তাঁর ঘোমটা ফেলে দিলেন, আর অতি সকরুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন,—"এসে যখন পড়েছ, আর ভাবনা কিসের? কেঁদো না, কান্না তো ফুরিয়ে গেল এখন হাসবে।" আমি কিন্তু ঠিক তেমনই কাঁদতে লাগলাম। মনে হলো যেন অনেক জন্মের জমাট দুঃখ কান্নার ভিতর দিয়ে গলে বের হয়ে আসছে। আমার কান্না শুনে দু'একজন সাধু, এমন কি পূজনীয় সারদানন্দ স্বামীজীও উপরে এলেন। আমাকে এ অবস্থায় দেখে আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেলেন। শ্রীশ্রীমা কিন্তু বার বার বলতে লাগলেন—"কান্না ফুরিয়ে গেল, এখন হাসবে।"

কিছু পরে শ্রীশ্রীমাকে প্রণামান্তর নীচে গিয়ে পূজনীয় সারদানন্দজীকে প্রণাম করে হোষ্টেলে ফিরলাম। তারপর মাঝে মাঝে সময় পেলে উদ্বোধনে গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে আসতাম। ১৯১৭ সালের পূজার ছুটিতে দেশে (মৈমনসিং) কয়েকদিন কাটিয়ে আসবো বলে শিয়ালদহ ষ্টেশনে সন্ধ্যায় গাড়ীতে উঠেছি। রাণাঘাটে সি আই ডি ডিপার্টমেণ্টের দুজন লোক আমাকে Defence of India Act অনুসারে আটক করে এবং কলকাতায় নিয়ে আসে। ২৫দিন

রাজনৈতিক বন্দীরূপে কারাবাসে ছিলাম। ঐ সময়ে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত কৃপা প্রত্যক্ষ করি। ২৫ দিন পরে ছাড়া পাই। শ্রীশ্রীমাকে ঐসব অলৌকিক দর্শনাদির কথা নিবেদন করতে চাইলে তিনি বললেন—"আমি সব জানি।"   (ক্রমশঃ)

প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ

(শ্রৌত ও স্মার্ত উপাসনার সামঞ্জস্য)

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

[প্রতীকোপাসনা—প্রতীকের পরিচয়]

এক্ষণে আমরা প্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় আলোচনা করিব। "দেবতাদৃষ্ট্যা সংস্কৃত্য উপাস্যমানানি অনাত্মবস্তূনি প্রতীকানি" (বৈঃ ন্যায়মালা, ৩।৩।৩৪ অধিঃ)—'দেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কার করিয়া যে অনাত্মপদার্থসকল উপাসিত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বলে 'প্রতীক'। যেমন 'শালগ্রাম' একটি শিলাপিণ্ডমাত্র, সুতরাং অনাত্মপদার্থ, কিন্তু 'ইনিই বিষ্ণু'—এইপ্রকার দৃষ্টিদ্বারা সংস্কার করিয়া তাহাকে উপাসনা করা হয় বলিয়া 'শালগ্রাম'কে বলি প্রতীক। এই প্রকারেই ধাতু, পাষাণ, কাষ্ঠ, বা মৃত্তিকাদি-দ্বারা নির্মিত চতুর্ভুজ বা দশভুজাদি সমন্বিত অনাত্মভূত মূর্তিসকলকে তত্তৎ কালী বা দুর্গাদি দেবতাদৃষ্টিদ্বারা সংস্কার করিয়া উপাসনা করা হয় বলিয়া উক্ত চতুর্ভুজ বা দশভুজাদি সমন্বিত প্রতিমাসকল হয় প্রতীক। এইরূপেই জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যখন সামগান করা হয় 'শস্ত্র'নামক স্তোত্রবিশেষ পাঠ করা হয়, তখন সেই অনাত্মভূত সাম প্রভৃতিকে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদৃষ্টিতে (ছাঃ ১।৬।১) সংস্কার করিয়া উপাসনা করা হয় বলিয়া উক্ত 'সাম' প্রভৃতি প্রতীক। এই প্রতীকসকল অবলম্বনে যে উপাসনা, তাহাই প্রতীকোপাসনা।

[প্রতীকাবলম্বনা শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয়, তাহার বিভাগ, সাধনক্রম ও ফল]

এই প্রতীকোপাসনাসকল দুইভাগে বিভক্ত, যথা—**কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা** এবং **কর্মাঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা**। শালগ্রামে বিষ্ণুদৃষ্টিদ্বারা উপাসনা, নামে ব্রহ্মদৃষ্টিদ্বারা উপাসনা (ছাঃ ৭।৫।১) মনে ব্রহ্মদৃষ্টিদ্বারা উপাসনা (ছাঃ ৩।১৮।১), আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টিদ্বারা উপাসনা (ছাঃ ৩।১১।১) ইত্যাদিস্থলে শালগ্রাম, নাম, মন ও আদিত্য ইত্যাদি প্রতীকসকল 'সাম' প্রভৃতির ন্যায় কোন যজ্ঞের অঙ্গ নহে। সেই হেতু এইসকল প্রতীককে বলে—**কর্মানঙ্গভূত প্রতীক**। ব্রহ্মদৃষ্টিদ্বারা সংস্কার করিয়া তদবলম্বনে যে উপাসনা, তাহাই কর্মানঙ্গভূত প্রতীকোপাসনা। আর সাম, ঋক্, ও উদ্গীথ (ইহা সামের অংশবিশেষ) ইত্যাদি হইতেছে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অঙ্গ। সেই যজ্ঞাঙ্গসকলকে অগ্নি, পৃথিবী প্রভৃতি ও মুখপ্রাণ ইত্যাদি দৃষ্টির দ্বারা সংস্কারপূর্বক তদবলম্বনে যে উপাসনা, তাহাই **কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনা**। কর্মানঙ্গভূত ও কর্মাঙ্গভূত এই উভয়প্রকার প্রতীকোপাসনাই

যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার ন্যায় অদৃষ্ট উৎপাদন করত সাধককে ফলপ্রদান করে। সেই ফলসকল শ্রুতিতে তত্তৎ উপাসনার বিধানকালেই পঠিত হইয়াছে, যথা—'নাম ব্রহ্মোপাসনা'তে—নামের যত দূর গতি, সাধকেরও ততদূর যথেচ্ছগমন অর্থাৎ বেদ ও সকলপ্রকার বিদ্যাতে পারদর্শিতা (ছাঃ ৭।১।৪-৫)। 'মনো ব্রহ্মোপাসনা'তে—যশ, কীর্তি, বেদজ্ঞানজনিত তেজোলাভ ইত্যাদি (ছাঃ ৩।১৮।৬)। এইরূপে কর্মানঙ্গভূত বিভিন্নপ্রকার প্রতীকোপাসনাতে বিভিন্ন ফল শ্রুত হয়। কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনাসকল জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের সামগান ইত্যাদি অঙ্গসকলের অনুষ্ঠানকালে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহারা সেই জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞেরই সমৃদ্ধি সম্পাদন করে (ছাঃ ১।১।১০)। কোন কোন স্থলে এই উপাসনাসকলের তদতিরিক্ত ফলও শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, যথা—'ঊর্ধ্ববর্তী ও অধোবর্তী লোকসকল তাহার ভোগ্য হয়' (ছাঃ ২।২।৩) ইত্যাদি। কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনাতে বিশেষ এই যে, যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ঋত্বিক্ (পুরোহিত) কর্তৃক এইগুলি অনুষ্ঠিত হয় এবং যজমান দক্ষিণাদ্বারা উহার ফল ক্রয় করিয়া লন (উত্তর মীঃ দঃ ৩।৪।১৩ অধিঃ)। কিন্তু কর্মানঙ্গভূত প্রতীকোপাসনাতে যজমান নিজেই উহার অনুষ্ঠান করেন এবং ফললাভও হয় তাঁহারই।

এই উভয়প্রকার প্রতীকোপাসনাতেই আর একটি বিশেষ এই যে—কর্মের ন্যায় অদৃষ্ট উৎপাদন দ্বারা ফলপ্রদান করে বলিয়া বিভিন্নফলকামী ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা ও সামর্থ্যানুযায়ী বহু প্রতীকোপাসনার অনুষ্ঠান করিতে পারেন ; এক ফল কামনায় কিয়ৎক্ষণ একটি প্রতীকাবলম্বনে উপাসনা করিয়া অন্য ফল কামনায় অন্য প্রতীকাবলম্বনে কিয়ৎক্ষণ উপাসনা করিতে পারেন। অহংগ্রহোপাসনার ন্যায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত (উঃ মীঃ দঃ ৪।১।১৮ আপ্রয়ণাধিঃ) একটি উপাসনাতেই উপাসককে নিবিষ্ট থাকিতে হয় না। উত্তরমীমাংসা দর্শনের ৩।৩।৩৫ কাম্যাধিকরণে এবং ৩।৩।৩৬ যথাশ্রয়ভাবাধিকরণে এই কর্মাঙ্গভূত ও কর্মানঙ্গভূত প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার আছে।

[অধ্যাসোপাসনা ও সম্পদুপাসনা]

শাস্ত্রে যে অধ্যাসোপাসনা ও সম্পদুপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা এই প্রতীকালম্বনা উপাসনারই প্রকারভেদ। প্রত্যেকটি প্রতীকোপাসনাই এই উভয়প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সাধকের মানসিক সামর্থ্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের উপর এই উপাসনাদ্বয় নির্ভর করে। ধ্যানকালে সাধক যখন শালগ্রামাদি প্রতীকরূপ অধিষ্ঠানটির চিন্তাই প্রধানভাবে করে, তখন বিষ্ণু প্রভৃতি আরোপ্যের চিন্তা অপ্রধান হইয়া পড়ে, এই প্রকার যে উপাসনা তাহাকে বলে **অধ্যাসোপাসনা**। আর সাধকের মানসিক সামর্থ্য উন্নতিলাভ করিলে প্রতীকরূপ অধিষ্ঠানটির চিন্তা যখন তাহার নিকট অপ্রধান হইয়া পড়ে এবং স্বীয় ইষ্টদেবতারূপ আরোপ্যের চিন্তাটিই প্রধান হইয়া উঠে, তখন এই উপাসনাকে বলা হয় **সম্পদুপাসনা**। লক্ষ্য করিতে হইবে, এই সম্পদুপাসনাতে প্রতীকরূপ অধিষ্ঠানটি অপ্রধান হইয়া পড়িলেও সাধক তখনও তাহাকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারে না, উপাসনাকালে তাহা অনুবৃত্ত হইতেই থাকে। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও ঐ প্রতীকটিকে অবলম্বন না করিলে তাহার মন ঐ প্রতীকে আরোপিত ইষ্টের দিকে ধাবিত হইতে পারে না। [সাধকের মানসিক সামর্থ্যের আরও উন্নতি হইলে এই সম্পদুপাসনা কি প্রকারে অহংগ্রহোপাসনাতে পরিণতি লাভ করে, তাহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব]। যাহা হউক ইহাই হইল শ্রৌত উপাসনাসকলের মোটামুটি পরিচয়।

[স্মার্ত উপাসনা ও শ্রৌত উপাসনার সহিত তাহার সম্বন্ধ]

এখন আমরা আমাদের প্রস্তাবিত বিচার্য বিষয়ের অবতারণা করিব। বেদের অপর নাম শ্রুতি এবং শ্রুতিভিন্ন যে সকল শাস্ত্র, তাহাদিগকে বলে স্মৃতি। স্মৃতি আবার দুই প্রকার—বেদ-বিরুদ্ধ স্মৃতি, যথা সাংখ্যাদি শাস্ত্র এবং বেদের অবিরুদ্ধ স্মৃতি, যথা—পুরাণ ও তন্ত্র ইত্যাদি। ইদানীন্তনকালে এই পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে বিহিত বিষ্ণু, শিব, দুর্গা ও কালী ইত্যাদি নানা দেব-দেবীর পূজা আমরা তত্তৎ প্রতিমাবলম্বনে করিয়া থাকি। তত্তৎ দেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উপাসিত হয় বলিয়া এই অনাত্মভূত প্রতিমাসকল যে প্রতীক, ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আর প্রতীকাবলম্বনে যে উপাসনাসকল অনুষ্ঠিত হয়, তাহারা যে দেবতাসাক্ষাৎদ্বারা মোক্ষপ্রদ নহে, পরন্তু অদৃষ্টদ্বারে তত্তৎ অভীষ্ট ফলপ্রদ, ইহাও আমরা প্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনাকালে প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং সন্দেহ হয়—বর্তমানকালে পুরাণাদির অনুসরণ করিয়া প্রতিমারূপ প্রতীকাবলম্বনে নানাপ্রকার দেবদেবীর পূজারত আমরা মোক্ষপ্রদ কোন বিদ্যার অনুশীলন করিতেছি, অথবা করিতেছি না? আমরা কি ইহলৌকিক কোন প্রকার কামনা পূরণের জন্যই 'নাম ব্রহ্মোপাসনা' ইত্যাদির ন্যায় এই প্রতীকোপাসনাসকলের অনুষ্ঠান করিতেছি? কেহ হয়তো বলিতে পারেন—"তুমি বৈদিক উপাসনা-সকলকে এই স্মার্ত উপাসনাসকলের সহিত জড়াইতেছ কেন? বেদে যাহা থাকে থাকুক, পুরাণাদি স্মৃতিতে বর্ণিত উপাসনাসকলের সহিত তাহার সম্পর্ক কি? বৈদিক প্রতীকোপাসনাসকল মোক্ষপ্রদ না হইলেও, পুরাণ ও তন্ত্রাদি স্মৃতিতে বর্ণিত এই উপাসনা সকল অবশ্যই মোক্ষপ্রদ, যেহেতু সেই স্থলে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে, যথা—'যং সমভ্যর্চ্য বিপ্রেন্দ্রঃ পরং মোক্ষং লভেদ্ ধ্রুবম্' (বৃঃ নারদীয় পুরাণ ৩২।৪৫; 'গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব মমসাধনাৎ' (মহানিঃ তন্ত্র ৪।৫), ইত্যাদি। সুতরাং তুমি আবার অনর্থক একটা হাঙ্গামার সৃষ্টি করিতেছ কেন?" তাঁহাকে বলিব—অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অপৌরুষেয় বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল এবং তাহাদের উপর নির্ভরশীল স্মৃতি প্রভৃতি পৌরুষেয় শাস্ত্রসকল এই বিষয়ে আমাদের কোন সহায়তাই করিতে পারে না। সুতরাং যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা আমরা গ্রহণ করিতেই পারি না। অতএব বেদের সহিত না জড়াইয়া উপায় কি বল? দেখ, ভগবান্ মনু বলিতেছেন—

"আর্ষং ধর্মোপদেশংচ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ।" (মনুসং ২২।১০৬)

"আর্ষ (ঋষিগণদৃষ্ট বেদ) এবং ধর্মোপদেশকে (বেদমূলক স্মৃতি ইত্যাদিতে বর্ণিত উপদেশসকলকে) যিনি বেদের অবিরোধী তর্কের দ্বারা (—পূর্ব ও উত্তর মীমাংসাসম্মত যুক্তির দ্বারা) বিচার করেন, তিনি ধর্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে।" সুতরাং কর্মানুষ্ঠানে পূর্বমীমাংসার এবং উপাসনা ও জ্ঞানানুশীলনে উত্তর মীমাংসার গতি অপ্রতিহত। অতএব উত্তর মীমাংসার আলোকে এই স্মার্ত উপাসনাসকলের বিচার ব্যতিরেকে তাহাদের প্রামাণ্য ও বেদানুগামিতা নির্ণয়ের প্রতি অন্য কোন উপায়ই নাই। "অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি" (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১৫) ইত্যাদি সূত্রে আচার্য বাদরায়ণ "প্রতীকালম্বনে উপাসনা-কারীর ক্রমমুক্তিও হয় না"—ইহা বলিয়াছেন। সেই হেতু স্মার্ত উপাসনাসকল মোক্ষপ্রদ কিনা এবং কি প্রকারে তাহারা জীবের মোক্ষ সম্পাদন করে, তাহা অবশ্যই বিচারযোগ্য। এই উপাসনাসকল যদি

উত্তরমীমাংসান্যায়ের অবিরোধী হয়, তাহা হইলেই আমরা বুঝিব, তাহারা বেদবিরুদ্ধ নহে। আর তাহা হইলেই তাহারা আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় হইবে, নতুবা নহে।

[বিচারের অবয়ব]

আমরা যে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার অবয়বসকল এই প্রকার—

বিষয়– প্রতিমাদি প্রতীকালম্বনে উপাসনা।

সংশয়—উত্তরমীমাংসা বলেন, 'প্রতীকোপাসনা মোক্ষপ্রদ নহে,' কিন্তু পুরাণাদি স্মৃতিসকল বলেন, 'তাহা মোক্ষপ্রদ।' সেই হেতু সংশয় হয়– প্রতীকোপাসনা মুক্তিপ্রদ অথবা নহে।

পূর্বপক্ষ—উত্তর মীমাংসার বিরোধী হওয়ায় প্রতীকোপাসনা মুক্তিপ্রদ নহে।

সিদ্ধান্ত—নিম্নোক্ত যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণসকলের বলে উত্তরমীমাংসার অবিরোধী হওয়ায় প্রতিমারূপ প্রতীকালম্বনে আরব্ধ হইলেও স্মার্ত উপাসনা সকল ইংলৌকিক তত্তৎ কামনা স্বর্গ, ক্রমমুক্তি ও সাযুজ্যমুক্তি-রূপ ফলপ্রদ।

ফলভেদ—পূর্বপক্ষে, পুরাণাদি সর্বথা ত্যাজ্য। সিদ্ধান্তে—বেদের অবিরোধী হওয়ায় তাহারও সর্বতোভাবে গ্রহণীয়।

[সংশয়ের হেতুভূত উত্তরমীমাংসা সূত্রটির অর্থ]

উত্তরমীমাংসার যে সূত্রটি হইতে প্রতীকোপাসনা হইতে মুক্তি বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সেই সূত্রটির অর্থ প্রথমে অনুধাবনযোগ্য। সূত্রটি এই—**অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থাদোষাত্তৎক্রতুশ্চ** ॥ ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১৫]

পদচ্ছেদ—অপ্রতীকালম্বনান্, নয়তি, ইতি, বাদরায়ণঃ, উভয়থা, অদোষাৎ, তৎক্রতুঃ, চ।

সূত্রার্থ—অপ্রতীকালম্বনান্—প্রতীক্ অবলম্বন না করিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে, [ব্রহ্মলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে আগত অমানবপুরুষ (ছাঃ ৫।১০।২) ব্রহ্মলোকে] **নয়তি**—লইয়া যান; [সকল প্রকার উপাসককে লইয়া যান না] **ইতি**—ইহা,

বাদরায়ণ—আচার্য বাদরায়ণ [মনে করেন। যদি বলা হয় ইহা স্বীকার করিলে, "অনিয়মঃ সর্বাসাম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৩১) এইস্থলে যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যারূপ প্রতীকালম্বনা বিদ্যা এবং দহরাদি বিদ্যারূপ অপ্রতীকালম্বনা বিদ্যা—এই সকলপ্রকার বিদ্যাতেই উপাসকের দেবযানমার্গে গমন হয় বলা হইয়াছে, তাহার বিরোধ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] **উভয়থা অদোষাৎ**—কোন উপাসককে লইয়া যান এবং কোন উপাসককে লইয়া যান না, এই উভয়প্রকার ব্যবস্থা স্বীকৃত হইলেও কোন দোষ হয় না। (—উক্ত 'অনিয়মঃ সর্বাসাম্' এই সূত্রোক্ত ন্যায় প্রতীকোপাসককে বিষয় করে না, তদ্ভিন্ন সকল উপাসকই তাহার বিষয়। সেই হেতু কোন বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব। আস্থা, উক্ত সূত্রোক্ত ন্যায় যে প্রতীকোপাসককে বিষয় করে না, তাহার নিয়ামক কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **তৎক্রতুশ্চ**—যিনি তাঁহার (—সগুণ ব্রহ্মের) ক্রতু—উপাসনা করেন, তিনি তৎক্রতু। [যিনি যাঁহার উপাসনা করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ। সেই হেতু সগুণব্রহ্মের উপাসক দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করত সগুণব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু 'নাম ব্রহ্মোপাসনা' (ছাঃ ৭।১।৫) ইত্যাদি—প্রতীকোপাসনাতে প্রতীকে আরোপিত হন বলিয়া ব্রহ্ম হইয়া পড়েন অপ্রধান, নামাদি প্রতীকের কিন্তু প্রাধান্য থাকে। সেই হেতু তদুপাসক আর

ব্রহ্মক্রতু (—ব্রহ্মোপাসক) হইতে না পারায় তাঁহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় না—ইহাই ভাব। পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাবিদ্‌গণ ব্রহ্মোপাসক না হইলেও বিশেষ শ্রুতিবচন বলে তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গমন স্বীকৃত হয়, ইহাই অন্যান্য প্রতীকোপাসনা হইতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রভেদ]।—ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকাবলম্বনে।

[পূর্বপক্ষ]

এক্ষণে পূর্বপক্ষী বলেন— আচার্য বাদরায়ণের মতানুযায়ী তবে তো নিশ্চিত হইল যে প্রতিমারূপ প্রতীকাবলম্বনে আমরা যে উপাসনা করি, তাহা ব্রহ্মলোকে প্রাপক না হওয়ায় ক্রমমুক্তিরও হেতু নহে। সদ্যোমুক্তি তো দূরের কথা।

[স্মার্ত উপাসনাতে সিদ্ধান্ত বর্ণনারম্ভ]

উত্তরমীমংসাতে প্রদর্শিত এতদ্বিষয়ক যুক্তিসকলের প্রয়োগ করত এক্ষণে আমরা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছি। সিদ্ধান্তী বলেন—পুরাণাদিতে বর্ণিত প্রতিমাদি প্রতীকাবলম্বনে অনুষ্ঠিত এই উপাসনাসকল সাধকের কামনা ও ক্রমপরিণত মানসিক সামর্থ্যানুসারে কর্মাঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা হইতে কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা এবং অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মোপাসনাতে পরিণতি লাভ করে। কি প্রকারে তাহা হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—

[কর্মাঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা স্মার্ত উপাসনা]

মানবজীবন অনন্ত কামনাতে পূর্ণ। সেই কামনার পূর্তির জন্য সে যেমন লৌকিক উপায়সকল অবলম্বন করে, তদ্রূপ অলৌকিক উপায়েরও সহায়তা গ্রহণ করে, ইহা তাহার স্বভাব। প্রাচীনকালে নানা কামনার পূরণের জন্য সে বৈদিক যজ্ঞাদির আশ্রয় গ্রহণ করিত, ইদানীন্তন কালে সে ঐ বৈদিক যজ্ঞেরই স্থানাপন্ন স্মার্ত নানাবিধ দেবদেবীর পূজা ও উপাসনা প্রভৃতিরই আশ্রয় গ্রহণ করে। ধনধান্য পশু পুত্রাদি ও দেহান্তে স্বর্গলাভের জন্য সে দুর্গোৎসবাদির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হয়। এই দুর্গোৎসবাদির কালে সেই অর্চনার সাঙ্গতা সম্পাদনের জন্য সে যে শ্রীশ্রীগণেশ ও বিষ্ণু ইত্যাদি নানা অঙ্গ দেবতার অর্চনা করে তাহাই কর্মাঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা উপাসনা। কারণ প্রধান পূজার অনুষ্ঠানকালে শ্রীশ্রীগণেশাদির প্রতিমাতে যে ধ্যানাদি পূর্বক অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রধান যে দুর্গোৎসব কর্ম—তাহার সাঙ্গতা ও সমৃদ্ধি সম্পাদন করে। আবার স্থানবিশেষে উক্ত দেবার্চনাসকলের কোন অবান্তর ফল থাকিলে, তাহাও সম্পাদন করে। এই অর্চনাসকল পুরোহিত কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপে এই উপাসনাসকলে অদৃষ্টদ্বারে ফলোৎপাদন ইত্যাদি বৈদিক কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনার ধর্মসকলই পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ধ্যানাদিযুক্তভাবে এতদৃশ দেবার্চনাসকলকে কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনাই বলিতে হইবে। কোন কোন ব্যক্তি নিষ্কাম বা বিষ্ণুপ্রীতিকাম হইয়াও এই দুর্গোৎসবাদির অনুষ্ঠানও করেন। তাহার ফলে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদির ন্যায় এই শ্রীশ্রীদুর্গার্চনা প্রভৃতিও অনুষ্ঠাতার চিত্তের শুদ্ধতা সম্পাদন করে। তাদৃশস্থলেও শ্রীশ্রীগণেশাদির উপাসনা কর্মাঙ্গভূত প্রতীকোপাসনারূপ স্বীয় স্বরূপ পরিত্যাগ করে না, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। যাহা হউক এইরূপে প্রতিমারূপ প্রতীকালম্বনা উপাসনাসকলের কর্মাঙ্গভূত স্বরূপ প্রদর্শিত হইল।

[কর্মানঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা স্মার্ত উপাসনা]

এক্ষণে আমরা প্রতিমারূপ প্রতীকালম্বনা উক্ত উপাসনাসকলেরই কর্মানঙ্গভূত স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছি। উপরে যে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবের কথা বলিয়াছি—তাহাকেই কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা উপাসনা বলা যাইতে পারে, কারণ শ্রীশ্রীদুর্গার অর্চনাই সেই স্থলে প্রধান, অন্য কোন দেবার্চনার তাহা অঙ্গ নহে। অধিকারিভেদে এই কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা স্মার্ত উপাসনা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—**সকামীর উপাসনা** এবং **মোক্ষকামীর উপাসনা**। বেদ ইত্যাদিতে পারদর্শিতা, যশ ও কীর্তি ইত্যাদি তত্তৎ কামনা পূরণের জন্য যেমন 'নাম ব্রহ্মোপাসনা' (ছাঃ ৭।১।৫) ইত্যাদি কর্মানঙ্গভূত প্রতীকোপাসনাসকল অনুষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ নানাপ্রকার কামনা পূরণের জন্য কর্মানঙ্গভূত এই স্মার্ত প্রতীকোপাসনাসকল অনুষ্ঠিত হয়, যথা—

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দনাৎ॥

(আহ্নিকতত্ত্বে ১৬৩ পৃঃ ধৃত মৎস্যপুরাণ বাক্য)

'আরোগ্যকামী ব্যক্তি ভাস্করের, ধনকামী বহ্নির, জ্ঞানকামী শঙ্করের এবং মোক্ষকামী বিষ্ণুর উপাসনা করিবেন।' একই পরম দেবতার নাম রূপ ও গুণভেদে এই বিভিন্নতা—ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। এই বিষয়ে শাস্ত্র বলেন—

"এক এব পরানন্দো নির্গুণঃ পরমাৎ পরঃ।
স তু বিজ্ঞানভেদেন বহুরূপধরোঽব্যয়ঃ॥ (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।৬৮)

অর্থ স্পষ্ট। শ্রুতিও বলেন—"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"—'একই সংস্বরূপকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ [নামরূপযোগে] বহুপ্রকারে বর্ণনা করেন," ইত্যাদি। যাহা হউক পুত্রকামীর স্কন্দার্চনা, মহামারী-শান্তিকামীর রক্ষা-কালিকার্চনা ইত্যাদি দেবার্চনাসকল এই কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা উপাসনারই অন্তর্গত, কারণ অন্য কোন প্রধান দেবার্চনার অঙ্গরূপে ইহারা অনুষ্ঠিত হয় না। বৈদিক কর্মানঙ্গভূত উপাসনাসকলের ন্যায় ইহারাও অদৃষ্টোৎপাদন দ্বারাই উপাসককে ফল প্রদান করে। তবে তজ্জাতীয় বৈদিক উপাসনা হইতে এই স্মার্ত উপাসনার প্রভেদ এই যে, স্বয়ং অসমর্থ হইলে যজমান ইহা ঋত্বিক্ দ্বারাও সম্পাদন করাইতে পারেন। বৈদিক এই জাতীয় উপাসনাসকল কিন্তু সাধকের নিজেরই অনুষ্ঠেয়।

[মোক্ষকামীর কর্মানঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা স্মার্ত উপাসনা]

শালগ্রাম ও প্রতিমা ইত্যাদি প্রতীকাবলম্বনে আরব্ধ হইলেও সংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-কামীর এই উপাসনা সাধকের মানসিক সামর্থ্যের ক্রমবিকাশবশতঃ কি প্রকারে ক্রমশঃ অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যাতে (—অহংগ্রহোপাসনাতে) পরিণত হইয়া তাঁহার মোক্ষের হেতু হয়, ইহাই আমরা এক্ষণে পূর্বমীমাংসার ২।৪।২ শাখান্তরাধিকরণ এবং উত্তরমীমাংসার ৩।৩।১ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণের *

* পূর্বমীমাংসার শাখান্তরাধিকরণে বেদের বিভিন্ন শাখা হইতে একই কর্মের বিভিন্ন অঙ্গকলাপের যে একত্র সমাবেশ হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর উত্তরমীমাংসার সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণে বেদের বিভিন্ন শাখাতে পঠিত তত্তৎ উপাসনার অঙ্গকলাপ যে একত্র সংগৃহীত হইয়া উপাসনাতে প্রযুক্ত হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদনুসরণে একই উপাসনাতে অবিরুদ্ধ অঙ্গসকল বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয় বর্ণনা করিতেছি।

সিদ্ধান্ত-অবলম্বনে বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিব। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"জপশ্চ পরমং নিত্যং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
কোটিসূর্যসমং তেজো ধ্যায়েদাত্মনি নির্মলম্॥
শালগ্রামশিলারূপং প্রতিমারূপমেব বা।
যৎ যৎ পাপহরং বস্তু তত্তদ্বা চিন্তয়েদ্ হৃদি॥" (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।১৬৩-৬৪)

"জপকালে হৃদয়মধ্যে কোটিসূর্যসমপ্রভ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মক নিত্য নির্মল পরম তেজকে ধ্যান করিবে। [তাহাতে অশক্ত হইলে] শালগ্রামশিলারূপ অথবা প্রতিমারূপ পাপনাশক বস্তুসকলকে হৃদয়ে চিন্তা করিবে।" লক্ষ্য করিতে হইবে এই স্থলে পরমজ্যোতির ধ্যানে অসমর্থ সাধকের জন্য শালগ্রামাদি প্রতীক ব্যবস্থাপিত হইল। শুধু যে শালগ্রামাদিরূপ দুই একটি প্রতীক শাস্ত্রে এতাদৃশ সাধকের পক্ষে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা নহে, বহুপ্রকার প্রতীকেরই ব্যবস্থা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে কয়েকটি এই—সূর্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, ভূমি, নিজের দেহ (—হৃদয়াকাশ), সকল প্রাণী (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৪১), প্রতিমা, দ্বিজ, এবং চিত্র (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।৩৩), ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন প্রতীকে পূজার প্রণালীও বিভিন্ন (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৪২-৪৪)। এই প্রতীকসকলের মধ্যে প্রতিমা সম্বন্ধী বিশেষটিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রতিমা আট প্রকার, যথা—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২৭।১২)

"প্রস্তরনির্মিত, কাষ্ঠনির্মিত, স্বর্ণাদি ধাতুনির্মিত, মৃত্তিকা বা চন্দনাদি লেপনের দ্বারা প্রস্তুত, চিত্রপট, বালুকার দ্বারা নির্মিত, মনোময়ী এবং হীরক ও স্ফটিকাদি মণির দ্বারা নির্মিত, এই আট প্রকার প্রতিমা স্মৃতিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।" এইস্থলে এই **মনোময়ী** প্রতিমার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহাকে অবলম্বন করিয়া বহু কথাই পরে আমাদিগকে বলিতে হইবে। যাহা হউক জ্যোতির্ধ্যানে অসমর্থ সাধক যে জপকালে মাত্র প্রতীকটিরই ধ্যান করিবেন, তাহা নহে, তাহাতে শ্রীভগবানের স্থূলরূপ আরোপ করত ধ্যান করিতে হইবে, তৎযথা—

"মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মধ্যানপ্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে॥" (মহানিঃ তন্ত্র ৫।১৩৯)

'মনের ধারণার জন্য, শীঘ্র নিজের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য এবং সূক্ষ্মধ্যানে যোগ্যতাসম্পাদনের জন্য তোমাকে স্থূল ধ্যানের কথা বলিতেছি।'

"ন তদ্যোগযুজা শক্যং নৃপ চিন্তয়িতুং যতঃ।
ততঃ স্থূলং হরে রূপং চিন্তয়েদ্বিশ্বগোচরম্॥" (বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৫৫)

'হে রাজন্, যোগাভ্যাসকারী ব্যক্তি প্রথম প্রথম সেই অরূপাখ্য পরমরূপ যেহেতু চিন্তা করিতে পারে না, সেইহেতু শ্রীহরির বিশ্বাত্মক স্থূলরূপ চিন্তন করিবে', ইত্যাদি। অনন্তর উক্ত শাস্ত্রেই শ্রীহরির বিশ্বাত্মক স্থূলরূপ কি কি তাহার বর্ণনা করিয়া প্রতীকে শ্রীহরির কিপ্রকার মূর্তির ধ্যান করিতে হইবে, তাহা বর্ণিত হইতেছে—

"যচ্চ মূর্তং হরে রূপং যাদৃক্ চিন্ত্যং নরাধিপ।
তচ্ছ্রূয়তামনাধারা ধারণা নোপপদ্যতে॥

প্রসন্নবদনং চারুপদ্মপত্রোপমেক্ষণম্।
সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জ্বলম্॥
কিরীটহারকেয়ূরকটকাদিবিভূষিতম্।
শার্ঙ্গশঙ্খগদাখড়্গচক্রাক্ষবলয়ান্বিতম্॥" (বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৭৯-৮৪) ইত্যাদি।

"হে নিরাধিপ, শ্রীহরির যে মূর্ত রূপ যে প্রকারে চিন্তা করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ করুন, যেহেতু কোন আধার ব্যতিরেকে মনের ধারণা সম্ভব নহে। তাঁহার মুখ প্রসন্নতাযুক্ত, চক্ষু সুন্দর পদ্মপত্র সদৃশ, কপোলদেশ অতি সুন্দর এবং ললাটফলক সুবিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল। তিনি কিরীট, হার, কেয়ূর ও কটকাদি অলঙ্কারে বিভূষিত, তাঁহার হস্ত শৃঙ্গনির্মিত ধনুক, শঙ্খ, গদা, খড়্গ, চক্র এবং অক্ষমালাযুক্ত" ইত্যাদি। প্রতীকে তাঁহাকে এই প্রকারে ধ্যান করিয়া কি প্রকারে অর্চনা করিতে হইবে তাহা বলিতেছেন—

"পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ।
গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভি র্ধূপদীপোপহারকৈঃ॥" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।৩।৫৩) ইত্যাদি।

অর্থ স্পষ্ট। ইহাই হইল মোক্ষকামী সাধকের প্রতীকালম্বনা ব্রহ্মোপাসনা। প্রথম প্রথম সাধকের নিকট তাহার অবলম্বিত প্রতীকটিই প্রধানভাবে প্রতিভাত হয়, আরোপ্য দেবতা তখন তাহার নিকট হন অপ্রধান। ধ্যান সে বিশেষ করিতে পারে না, তবে চেষ্টা করিতে থাকে। বাহ্য জপই হয় তাহার সাধ্যায়ত্ত। সুতরাং সাধকের এই প্রকার অবস্থায় তাহার ধ্যেয় আরোপ্য রূপটি অপ্রধান থাকায়, তাহার এই উপাসনাকে **অধ্যাসোপাসনা** বলিতে হইবে। [স্মরণ রাখিতে হইবে—মানসচিন্তার অর্থাৎ ধ্যানের প্রাধান্য না থাকিলে যৎকিঞ্চিৎ জপসহ তাদৃশ দেবার্চনাকে উপাসনা বলা যাইবে না। কতকগুলি উপচার-নিবেদন-প্রধান যে দেবার্চনা, তাহা যজ্ঞাদির ন্যায় কর্মমাত্র]। যাহা হউক এতাদৃশ সাধক তখন—

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

"ভগবদ্বিষয়ক কথা শ্রবণ, তাঁহার নামগুণ কীর্তন, তাঁহার গুণ স্মরণ, পিতা, আচার্য ও গুরু প্রভৃতির পাদসেবন, প্রতিমার পূজন, বিগ্রহকে নমস্কার, স্বীয় ইষ্টের প্রীতিকর কর্মের অনুষ্ঠানাত্মক দাস্যভাব, সখার ন্যায় ব্যবহারাত্মক সেবা এবং আত্মনিবেদন—এই নয় প্রকারে ভক্তির অনুশীলন করত সখ্য দাস্য ও বাৎসল্যাদি ভাবালম্বনে প্রীতিসম্পাদনে যত্ন করিতে থাকে।"

[মোক্ষকামীর কর্মানঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা স্মার্ত সম্পদুপাসনা]

এই প্রকারে বাহ্য রূপ ও বাহ্য পূজাদির অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের মানসিক সামর্থ্য ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া তাহাকে অন্তর্মুখী করিতে থাকে। তখন তাহার বাহ্যমন্ত্রজপ মানস জপে এবং বাহ্যপূজা মানস পূজাতে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে সেই মানস জপ এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—

"অষ্টাক্ষরমহাবাক্যমিত্যাদীনাঞ্চ যো জপঃ।
স্বাধ্যায়শ্চ সমাখ্যাতো যোগসাধনমুত্তমম্॥
* * *
জপস্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকোপাংশুমানসৈঃ।
জপেষ্বেতেষু বিপ্রেন্দ্রাঃ পূর্বাৎ পূর্বাৎ পরোবরম্॥ (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।৯০,৯৩)

"অষ্টাক্ষর মহাবাক্য ইত্যাদি মন্ত্রসকলের * যে জপ তাহাই স্বাধ্যায় নামে কথিত হয়, তাহাই যোগের উত্তম সাধন। সেই জপ বাচিক উপাংশু ও মানসভেদে ত্রিবিধরূপে কথিত হয়। হে বিপ্রেন্দ্র, এই সকলের মধ্যে পূর্ব পূর্বটি হইতে পরবর্তীটি শ্রেষ্ঠ।" স্পষ্টভাবে মন্ত্রটির উচ্চারণ করত যে জপ, তাহাকে বলে 'বাচিক জপ'। নিজের শ্রবণযোগ্য, অথচ অপরে শ্রবণ করিতে পারে না—এই প্রকারে উচ্চারণ করত যে জপ, তাহাকে বলে 'উপাংশু জপ'। যাহাতে ওষ্ঠ, জিহ্বা ইত্যাদির এতটুকুও কম্পন হয় না, অথচ মনে মনে স্পষ্টভাবে জপ চলে, তাহাকে বলে 'মানস জপ'। এই মানস জপই সর্বশ্রেষ্ঠ। মানস পূজা বিষয়ে শাস্ত্রে এই প্রকার বর্ণনা আছে—

"আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্তয়েৎ।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥
প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে হৃদিস্থাং পূজয়েচ্ছিবাম্।" ইত্যাদি (মুণ্ডমালাতন্ত্র)
"সর্বাসু বাহ্যপূজাসু অন্তঃপূজা বিধীয়তে।
অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্যকোটিগুণং ভবেৎ॥" (ভূতশুদ্ধিতন্ত্র)
"নিত্যান্তর্যজনং কৃত্বা সাক্ষাদ্ব্রহ্ম মায়া ভবেৎ।" (শাক্তানন্দতরঙ্গিনী)

অর্থ স্পষ্ট। যাহা হউক অতি আদর ও যত্নসহকারে বাহ্য পূজা ও জপাদি করিতে করিতে সাধক ক্রমশঃ অন্তর্মুখীন হইয়া যেন স্বীয় অন্তরেই প্রবিষ্ট হইতে থাকেন। তখন বাহ্য প্রতিমাদিরূপ প্রতীকে সাধক যে শঙ্খচক্রাদিধারী স্বীয় ইষ্টদেবতাকে আরোপ করত অর্চনা করিতেছিল, এক্ষণে নিজ হৃদয়পদ্মেই তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে থাকেন। তখন—

'যোগী জিতেন্দ্রিয়গ্রামস্তানি ধৃত্বা দৃঢ়ং হৃদি।
আত্মানং পরমং ধ্যায়েৎ সর্বধাতারমচ্যুতম্॥
* * *
শ্রীবৎসবক্ষসং দেবং সুরাসুরনমস্কৃতম্।
অষ্টারে হৃৎসরোজেঽন্তর্দ্বাদশাঙ্গুলবিশ্রুতম্॥" (বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।১৩৪-৩৬)

"জিতেন্দ্রিয় যোগী ইন্দ্রিয়সকলকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া সকলের নিয়ামক অবিনাশী পরমাত্মাকে ধ্যান করিবেন। * * যাঁহার বক্ষে শ্রীবৎস-চিহ্ন বিদ্যমান যিনি দেব ও দানবগণ কর্তৃক নমস্কৃত তাঁহাকে স্বীয় হৃদয়মধ্যে অষ্টদলপদ্মে দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিতরূপে ধ্যান করিবেন।"

* অনেকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন—'মন্ত্র কি?' তাহার প্রয়োগই বা কি প্রকারে করিতে হয়, ইত্যাদি। প্রস্তাবিত প্রবন্ধে আলোচ্য না হইলেও এই প্রশ্নসকলের সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "প্রয়োগসমবেতার্থস্মারকাঃ মন্ত্রাঃ (মীমাংসান্যায়প্রকাশ)—'প্রয়োগকালে অনুষ্ঠানের উপযোগী 'অর্থের' যাহা স্মারক, তাহাকে বলে মন্ত্র। এই 'অর্থ' শব্দটির অর্থ—সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। মন্ত্র হয়, সেই দেবতার বাচক। বস্তুতঃ যে দেবতার মন্ত্র, সেই দেবতাই হন সেই মন্ত্রের অর্থ। সুতরাং উপাসনায় প্রয়োগকালে যে তদুপযোগী স্বীয় ইষ্টদেবতার স্মারক শব্দ, তাহাই মন্ত্র। শাস্ত্র বলেন—"মন্ত্রার্থং দেবতারূপং চিন্তনং পরমেশ্বরি। বাচ্যবাচকভাবেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ।" অর্থ স্পষ্ট। মন্ত্রজপ করিবার সময় সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থ যে দেবতা, সেই দেবতাকে চিন্তা করিতে হয়, ইহাই মন্ত্রের প্রয়োগ। সেই দেবতার স্বরূপ কি, তাহা সেই দেবতার ধ্যানমন্ত্রে শাস্ত্রে পঠিত হইয়াছে, যেমন "প্রসন্নবদনং চারুপদ্মপত্রোপমেক্ষণম্" ইত্যাদি বিষ্ণুর ধ্যান, উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত প্রত্যেকটি বীজমন্ত্রের অর্থমধ্যেই একটি প্রার্থনাও সূচিত হয়। যেমন 'দুঁ' এইটি ৺দুর্গাদেবীর বীজ, ইহার অর্থ—"দ দুর্গাবাচকং দেবি, উকারশ্চাপি রক্ষণে। বিশ্বমাতা নাদরূপা কুর্বর্থো বিন্দুরূপকঃ॥" (বরদাতন্ত্র)—'দ' শব্দটি দুর্গার বাচক, উকারটির অর্থ-'রক্ষণ'। নাদটির অর্থ—বিশ্বমাতা, বিন্দুটির অর্থ—'কর'। তাহাতে উক্ত বীজটির অর্থ হইল—"হে বিশ্বমাতা দুর্গা, আমায় রক্ষা কর।" এইরূপে প্রত্যেক বীজমন্ত্রেরই তত্তৎ বাচ্য দেবতা ব্যতিরেকে এইপ্রকার একটি প্রার্থনাত্মক অর্থও আছে।

বলা বাহুল্য উদাহরণরূপে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান ও উপাসনা বর্ণিত হইলেও স্বীয় ইষ্টদেবতার ধ্যানই এখানে বিবক্ষিত। শাস্ত্রও তাহাই বলেন, যথা—মহাপুরুষম্ অভ্যর্চেৎ মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।৩।৪৯)—"নিজের উপযোগী ও অভিপ্রেত মূর্তিতে মহান্ পুরুষ শ্রীভগবানের অর্চনা করিবেন।" এইরূপে সাধক স্বীয় দেহমন্দিরে মনোময়ী প্রতিমাতে (শ্রীভাঃ ১১।২৭।১৩) শ্রীভগবানের অর্চনা করিতে আরম্ভ করেন। তখন "হৃদি ভাবেন চৈব হি" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।২৭।১৫)—ভাবময় (—মনোময় মনঃকল্পিত) উপচার সকলের দ্বারা স্বীয় হৃদয়ে তাঁহাকে অর্চনা করিতে থাকেন, বাহ্য উপচারের আড়ম্বর ক্রমশই তাঁহার কমিয়া আসিতে থাকে। তখন তিনি—

"হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥" (মহানিঃ তন্ত্র ৫।১৪৩)

"হৃদয়স্থ অষ্টদল কমল তাঁহাকে আসনরূপে প্রদান করিবে, সহস্রার পদ্ম হইতে ক্ষরিত অমৃতদ্বারা তাঁহার চরণযুগলে পাদ্য এবং মনকে অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করিবে" ইত্যাদি প্রকারে সাধক মানস উপচার সহযোগে অন্তর্যজনে † প্রবৃত্ত হন।

তখনও কিন্তু সাধক প্রতীককে একবারে ত্যাগ করিতে পারেন না, কিন্তু হৃৎপদ্মেই স্বীয় ইষ্টদেবতার ধ্যান ও অর্চনাতে তাঁহার প্রীতি ক্রমশঃ অধিকতর হইতে থাকে। এইরূপে যে প্রতীকে তিনি ইষ্টদেবতাকে আরোপ করিয়া এতদিন অর্চনা করিতেছিলেন, সেই প্রতীকটি হইয়া পড়ে অপ্রধান এবং তাহাতে যাঁহাকে আরোপ করিতেছিলেন, সেই স্বীয় হৃৎকমলমধ্যগত ইষ্টদেবতা হইয়া পড়েন প্রধান। তাঁহাকেই ক্ষণকালের জন্য বাহিরে অনায়ন করত যৎকিঞ্চিৎ ফলমূলাদি নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে লইয়া সাধক নিজ অভ্যন্তরেই প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। এইরূপে সাধক অধ্যাসোপাসনার স্তর অতিক্রম করিয়া **সম্পদুপাসনার** স্তরে প্রবেশ করিলেন—এক্ষণে তাঁহার নিকট অধিষ্ঠান প্রতীকটি অপ্রধান হইয়া আরোপ্য উপাস্যই প্রধান হইয়া পড়িল। কিন্তু প্রতীকটিকে তখনও তিনি একেবারে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তখনও তাঁহার এই উপাসনা 'কর্মানঙ্গভূতা প্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যারই অন্তর্গত থাকিতেছে, বুঝিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

পূর্ব পৃষ্ঠার পাদটীকার শেষাংশ—

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের দিকে সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রত্যেক মন্ত্রেরই প্রয়োগকালে সেই মন্ত্রের ঋষি দেবতা ও ছন্দের স্মরণ করিতে হয়। সেই বিষয়ে শ্রুতি এই—"যদার্ষেয়ং তমৃষিং, যাং দেবতাম্ অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দেবতাম্ উপধাবেৎ। যেন ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাৎ, তচ্ছন্দঃ উপধাবেৎ" (ছাঃ ১।৩।৯—১০)—'সেই মন্ত্রের যিনি ঋষি, সেই ঋষিকে এবং যে দেবতার স্তব করা হইবে সেই দেবতাকে চিন্তা করিতে হইবে। যে ছন্দের দ্বারা স্তব করিবেন, সেই ছন্দকে চিন্তা করিতে হইবে।' "যো হবা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবত ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বা অধ্যাপয়তি বা স্থাণুং বর্চ্ছতি, গর্ত্তং বা প্রতিপদ্যতে, তস্মাৎ এতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাৎ" (১।২।৮ দেবতাধিকরণ শারীরকভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য।) ইহার অর্থ "যিনি ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না জানিয়া মন্ত্রের দ্বারা যজনা করেন, অথবা অধ্যাপনা করেন, তিনি স্থাবর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, অথবা নরকে পতিত হন। সেই হেতু প্রত্যেক মন্ত্রেই এই সকলকে জানিতে হইবে অর্থাৎ প্রয়োগ করিতে হইবে। মন্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে আরও অনেক জ্ঞাতব্য আছে, তাহা বর্ণনার স্থল ইহা নহে। আমরা এখানে উপাসনার দার্শনিক দিকটিরই আলোচনা করিতেছি।

† অন্তর্যজনের বিস্তৃত বিবরণ "মহানির্বাণে"র ৫ম উল্লাসে ১৭৩ শ্লোক হইতে এবং "কাল্যার্চন চন্দ্রিকা"তে ২৭০ এবং ২৮৩ ইত্যাদি পৃষ্ঠাতে দ্রষ্টব্য।

আরতি

শান্তশীল দাস

আঁখিজলে মোর সকল বেদনা
বন্ধু হে, মুছে দিও।
দিয়েছ যা তুমি আমার জীবনে,
সে যে চির বরণীয়।

দুঃখ দিয়েছ, দিয়েছ বেদনা ;
তাই দিয়ে করি তব আরাধনা ;
হৃদয়-প্রদীপ জ্বালিয়ে তোমার
আরতি করি গো প্রিয়।

তোমার দানের মাঝারে বন্ধু,
নাহি কোন সংশয় ;
আঁধারের বুকে চলি হাসিমুখে
অন্তরে নিরভয়।

দেখি দিকে দিকে আলোকে-আঁধারে,
বন্দনা-গান ওঠে চারি ধারে ;
তারই সাথে মোর নীরব আরতি
ও-চরণে তুলে নিও।

সময় ও সুকৃতি

জ্যোতির্ময়ী দেবী

অনেকদিন আগের কথা। ১৩৩৬ সালে কাশীতে ছিলাম কিছুদিন। কেমন করে রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সাধুর সঙ্গে একটু পরিচয় হয়ে গেল। তারপর তিনি একদিন আমার হাতে একখানি শ্রীশ্রীমায়ের কথা এনে দিলেন। নতুন বেরিয়েছে। দাম দিতে গেলাম ; হাসলেন, বল্লেন আমার জন্যই এনেছেন। নিলাম। পড়লামও।

আজ মনে হয়, সেদিন কি এমন করে পড়েছিলাম ?—পড়েছিলাম তো, কিন্তু এমন মন নিয়ে নয় ! যা' আজকে ক্ষুব্ধভাবে ভাবে, ১৩২৭ সাল অবধি মায়ের দেহ ছিল, আমরা কেন মানতে পারিনি ? কেন দেখা হয়নি ? ১৩১০ সালে দক্ষিণেশ্বরে তো গিয়েছিলাম। রামকৃষ্ণ কথামৃতও পড়েছিলাম উদ্বোধনে। বাড়ীতে 'কথামৃত' ছিল ; বড়রা পড়তেন। সাধু সন্তদের যাওয়াআসাও বাড়ীতে ছিল—অবশ্য জয়পুরের বাড়ীতে, কলকাতায় বড় থাকা হ'ত না। ক্ষেত্রীর পথে জয়পুরে স্বামী বিবেকানন্দও গেছেন, বাড়ী তাঁর চরণস্পর্শে পবিত্র হয়েছিল। কিষণগড়ে স্বামী কল্যাণানন্দ, স্বামী অসীমানন্দজীর সঙ্গেও গুরুজনদের পিতা পিতৃব্যদের দেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ কেন দর্শন করতে আসেননি উদ্বোধনে ? তাঁরা কি তাঁর কথা কারো কাছে শোনেননি ? ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর তিনি ৩৪ বছর বেঁচেছিলেন—তবু তাঁকে আমরা কেউ দর্শন করতে পারিনি !

জ্ঞানীরা বলেন সময় না হলে এবং সুকৃতি না থাকলে সাধুসঙ্গ হয় না। সেইটেই ঠিক মনে হয়। সময় আমাদের আসেনি। দর্শনের সুকৃতিও ছিল না। তাই আমাদের ক্ষোভ মেটাতে হয় যেন শুধু 'মায়ের কথা' পড়েই। এবং পড়েই সঙ্গলাভ করতে চায়।

সেদিনও তো যেদিন সেই সাধুটি বইখানা

দিয়েছিলেন এমন করে পড়িনি! আজ উদ্বোধন পড়ি মাসের পর মাস, কত লোকের কত স্মৃতিকথা বেরোয়, কত সাধুসঙ্গের বিবরণ বেরোয়—আমাদের জীবন ছিল, জ্ঞান হয়েছিল কিন্তু সে-সব দুর্লভ সঙ্গলাভ ঘটেনি। একেই বলে সময় ও সুকৃতি না আসা।

এরও আগে কিন্তু সর্বপ্রথম ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে আমরা শ্রীমতী সারদামণি দেবীর জীবনকথা পড়ি, এবং আশ্চর্য হয়ে দেখি, সে লেখার লেখক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। আশ্চর্য হবার কারণ আমাদের ছিল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের লোক, তিনিই এমন সুন্দর সহজভাবে ও শ্রদ্ধাসহকারে (তিনি ভক্তদলীয় লোক নন) সকল লেখকের আগে সকল পত্রিকার আগে ঐ চমৎকার সরল ভাষায় ঐ মহীয়সী মহিলার সরল জীবনটি আমাদের সামনে ধরে দিলেন। তা' প্রবাসী তো সব বিষয়েই অগ্রণী ছিল, এতেও 'প্রবাসী'কেই 'অগ্রণী' দেখলাম। 'শ্রীমতী সারদামণি দেবী'ও যেন প্রবাসী দ্বারাই প্রথম প্রচারিত হলেন নিজের ভক্তদের গণ্ডী ছাড়িয়ে সকল সমাজের সকল সম্প্রদায়ের লোকের কাছে।

এবং আজ যখন তারও আগের কথা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আগে কেমন করে সকলের কাছে পৌঁছয় সে আলোচনা দেখি 'সমসাময়িকের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ পরমহংস বই'য়ে, তাতেও দেখি—সেই সেদিনেও ব্রাহ্মসমাজই ঐ 'দক্ষিণেশ্বরের সাধু'কে আশ্চর্য হয়ে সকলের কাছে প্রচার করেছিলেন তাঁদের পত্রিকায়, তাঁদের উপাসনামন্দিরে মিলন সভায়,—বাড়ীতে ষ্টীমারে কত জায়গায়। ব্রহ্মবাদী একেশ্বরবাদী তাঁরা ঐ সরল বহুদেববাদী হিন্দুকে শ্রদ্ধা করেছিলেন, ভালবেসেছিলেন। এবং তাঁর কথামৃত শুনে আশ্চর্য হয়ে কাগজে লিখেছিলেন।

কিন্তু পরমহংসদেবকে তো তাঁরা দেখেছিলেন জেনেছিলেন কথা শুনেছিলেন, যে কথার অপূর্ব রস আজো তাঁকে না দেখেও যেন সমান সরস আছে, মাকে তো কেউ দেখেননি কেউ জানেননি। এই সরল মহীয়সী মহিলাটিকেও রামানন্দ বাবুর রচনাতেই আমরা যেন প্রথম দেখতে পেলাম। এবং আশ্চর্য হয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁর ঐ পরম পুরুষের সহধর্মিণীত্ব উপলব্ধি করলাম।

তবু সে যেন বই পড়া বা মহৎ লোকের জীবন চরিত পড়া। সেদিনেও কোন আকাঙ্ক্ষা জাগেনি তাঁর কথা আরো জানবার অথবা না জানার জন্য কোনো ক্ষোভও মনে জাগেনি। কতদিন পরে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর সময়ে নানা উৎসব সভা মেলার মাঝে "শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয়খণ্ড" কিনলাম। সেদিন সহসা মনে পড়ল মা এতদিন ছিলেন আমাদের জ্ঞান হওয়ার পরেও! কেন দেখা হ'ল না? এমন যে মানুষটি এমন অসাধারণ পুরুষের স্ত্রী আমাদের দেশে আমাদের কালে একেবারে ঘরের পাশে ছিলেন, তাঁকে জানার দেখার সুযোগ হলনা, এযেন পরম দুঃখের ক্ষোভের বিষয় মনে হতে লাগল। মনে হ'ল—তবে কি সুকৃতিই মানুষকে পথ দেখায়?

হয়ত তাই সত্য। একটু অন্য কথা বলি। ১৩২৫ সালের কথা। সহসা ভাগ্য বিপর্যয় হয়ে শ্বশুরবাড়ীর পাট উঠিয়ে জয়পুরে পিত্রালয়ে ফিরে এলাম। মা বাবা অত্যন্ত শোকার্ত, কাতর। মাঝে মাঝে দু'একজন সাধু সন্ত আসাযাওয়া করতেন বাড়ীতে। বাবা তাঁদের বাড়ীতে আনলেন, যদি মনে শান্তি বা সান্ত্বনা আসে। যদি এই শোক বিমূঢ়তা থেকে মন অন্যদিকে একটু সরে আসে।

এক বৈষ্ণব সাধু বুধরামজী নামে অতি মহাত্মা লোক আসতেন বাড়ীতে। বাবাকে বল্লেন, 'আমি আপনার মেয়েকে কিছু মন্ত্র দেবো ওর মনে যাতে শান্তি ও সান্ত্বনা আসে।'

ওঁরা আমাকে বল্লেন।

বয়স কম। প্রথম আঘাত। প্রচণ্ড বিপর্যয়-হওয়া আকস্মিক-বিক্ষিপ্ত স্থানচ্যুত জীবন। যতবা ক্ষোভ অন্যের ওপর ততবা ক্ষোভ অভিমান ভগবানের ওপর। মনে হল যেন অকারণে অযথাভাবে একা আমারই উপর এই ভাগ্যের অত্যাচার হয়েছে। ভাগ্য, কর্ম, জন্ম জন্মান্তরের কর্মফল কিংবা জীবন-মৃত্যুর সবটাই এই পৃথিবীর এই রকম সাধারণ নিয়ম—অত ভাববার বয়স ধৈর্য কিছুই ছিল না। মন নিজের দুঃখ আর নিজের বিচারবুদ্ধির অহঙ্কারে পরিপূর্ণ।

মাকে বললাম, 'না মা, দীক্ষা বা মন্ত্র কিছুই আমাকে শান্তি বা সান্ত্বনা দিতে পারবে না। বিশ্বাস নেই আমার।'

আবার বুধরামজী বললেন, 'শুধু সামান্য জপ। বিশেষ কিছু করতে হবে না।'

আমি আবার বললাম, 'না। কি জানি যদি জপ না ভালো লাগে, নিয়ে মিথ্যাচারী হব না।'

শান্ত বৈষ্ণব সাধু নিরস্ত হলেন, আর কিছু বললেন না।

কি ভাবলেন, কে জানে।

আরো একজন সাধু মহানন্দগিরি কিছুদিন বাড়ীতে থাকলেন। কতরকম উপদেশকথা শোনালেন। তিনি কাশী ও হরিদ্বারে থাকতেন। তিনি বাঙালী তান্ত্রিক সাধু—কিন্তু তাঁর কথা সে সব উপদেশ শুনেছি কি? শুনিনি কিছুই। সেসময়ে কান ছিল না, মনের মন ছিল না শোনার। বরং সমালোচনা আলোচনা করেছি তখনকার বয়সবুদ্ধি অনুযায়ী।

ফিরে যাওয়ার দিন তিনি বললেন 'মা একসময়ে তুমি আমাকে মনে করবে।'

অহঙ্কারী মন জবাব দিল না। বিশ্বাসও করল না। অবিশ্বাসও করতে পারলুম না কিন্তু। কিন্তু সাধুবাক্য মিথ্যা হয় না। দীর্ঘকাল পরে হরিদ্বারে গিয়ে তাঁর মিশনে আশ্রয় নিলাম কয়েকদিনের জন্য, তখন মনে পড়ল সেই কথা। তাঁকে মনে করে কত লজ্জিত মনে হ'ল সেদিন, নিজেদের অহংবুদ্ধি মনে পড়ে।

কতদিন পরে কলকাতায় এলাম।

তখনো 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' হাতে আসেনি। রামকৃষ্ণ মঠের কোনো সাধুকেও দেখিনি তখনো। 'শ্রীম'কে দর্শন করতে যাবার ভারী ইচ্ছা হ'ল। 'শ্রীম' ছিলেন আমার মাতামহীর ভগিনীপতি। মাতামহী বোনের কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতেন এবং 'শ্রীম'র কথাও বলতেন।

মাতামহীকে বললাম 'তোমার সঙ্গে আমি একদিন যাব তাঁকে দর্শন করতে।' তখন কলকাতায় পর্দা বেশ। ট্রামে বাসে যাওয়ার প্রথা এত চলেনি। একখানি গাড়ী ভাড়া করে যাওয়া হ'ল একদিন দুপুরে। তাঁর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের স্কুলের বাড়ীতে। বাড়ীর কাজ সেরে বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা হয়েছিল তাঁর বাড়ী পৌছতে।

গিয়ে শুনি, তিনি বিশ্রাম করছেন আহারের পর। দিদিমার বোনের নিকুঞ্জদিদিমাদের কোথায় নিমন্ত্রণ ছিল, তিনি পুত্রবধূসহ তখনি নিমন্ত্রণে যাবেন।

আমরা বললাম, আমরা বসে থাকি, তিনি উঠলে প্রণাম করে দেখা করে বাড়ী ফিরব।

তাঁরা বললেন 'কোথায় বসে থাকবে, আজ বাড়ী যাও।'

অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও অপ্রস্তুত হ'লাম। বাড়ী ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে শ্রীম একখানি 'কথামৃত'তে আমার নাম লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বইখানি পেয়ে খুব আনন্দ হ'ল। কিন্তু মনে যে কোথায় একটু আঘাত লেগেছিল অথবা ক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিভ হয়েছিলাম, আর তাঁর কাছে যেতে যেন ভরসা পাইনি। ভয় হ'ত যদি আমায় ফিরিয়ে দেন, যদি দেখা না হয়। গেলাম না আর।

দীর্ঘদিন পরে তাঁর দেহান্ত হওয়ার পর আর ক্ষোভের সীমা রইল না। নিকুঞ্জদিদিমার সঙ্গে

দেখা করতে গেলাম। বার বার মনে হ'তে লাগল কেন আর আমরা চেষ্টা করিনি, কেন একবার দর্শন করে যাইনি। রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য আত্মগোপনকারী মহাত্মা প্রচারক, আমাদের এমন কাছাকাছি সম্পর্কের লোক, তবু সুযোগ পেলাম না দর্শনের। সেই যে সঙ্কোচ হয়েছিল ফিরে এসে, সেইটা আজ মনে হয়—আমার সহ্য করে আগ্রহের পরীক্ষা ছিল। যদি যেতাম হয়ত কিছু অনির্বচনীয় পেতাম। কে বলবে, কেন এই দর্শন হল না। কেন বুধরামজীর দেওয়া নামটুকু, মন্ত্রটুকু নিইনি, কেন মহানন্দগিরি মহারাজের কথায় মন দিইনি।

আবার ভাবি হয়ত সেদিন কমবয়সের ধর্মে শ্রদ্ধাভরে নাম বা মন্ত্র জপ করতে পারতাম না। 'শ্রীম'র কাছে বিনীত নম্রতায় উপদেশকথা শোনার মন হয়ত সেদিন ছিল না। এবং তারই মধ্যে ভগবানের ইচ্ছায় হয়ত এই দেখা পাওয়া ঘটেনি।

তবু মনের ক্ষোভ যায় না। মনে হয় সুকৃতি ছিল না। সময় হয় নি। এক কথায় কর্ম করি নি দেখা পাওয়ার মত।

এই যে সাধুসঙ্গের সুযোগ না পাওয়া বা না নেওয়া আজ যত সাধুচরিত পড়ি তখনি মনে একটা ক্ষোভ আনে।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'ও পড়তে বসে ঐ এক ধরনের অভাব মনে জাগে। ঐ গত শতাব্দীর কোন্ না জানা গ্রামের পরিবারের মধ্যে লালিতা পালিতা গ্রামের মেয়েটি যাকে বলে শিক্ষা দীক্ষা কিছুই না জানা মহিলাটি কি আশ্চর্য সহজ সরল জ্ঞানে রামকৃষ্ণদেবের অত পণ্ডিত জ্ঞানী শিষ্যদের নিজের ভক্ত শিষ্য শিষ্যাদের সমস্ত সমস্যা-প্রশ্নের মীমাংসা করে দিতেন কেমন করে। কি সহজে অনায়াসে দেশবিদেশের শিক্ষিত অন্য জাতি, অন্য ধর্মাবলম্বী—যে যখন কিছু সহায় নিতে এসেছে শরণাগত হয়েছে, ভিন্নভাষী ভিন্নজাতি সকলকে সমান স্নেহে সমাদরে দীক্ষা দিয়েছেন উপদেশ দিয়েছেন। ভগিনী নিবেদিতা পরম স্নেহের পাত্রী ছিলেন। অন্যান্য বিদেশিনীরাও পরম সমাদরে মায়ের কাছে গৃহীত হয়েছেন। কোথায় বা ভাষার ব্যবধান, কোথায় বা বিজাতীয়তা! মানুষকে এমন করে গ্রহণ করার, এমন উদার ভাবে নেওয়ার ক্ষমতা ঐ গ্রামের পরিবেশে লালিতা মহিলাটি কেমন করে পেয়েছিলেন? এ এক অদ্ভুত আশ্চর্য কাহিনীর মত যেন! 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ সত্য কোন্ অনুভূতি-বলে তিনি পেয়েছিলেন কে জানে!

শিষ্যদের দীক্ষা দেবার ব্যাপারেও দেখি কি অদ্ভুত অনুভূতি দিয়ে যে যেমন যার যা প্রয়োজন ঠিক জানতে পেরেছেন।

একজন বললেন, 'মা আপনার সব ছেলেই তো সমান। যে বিয়ে করবার জন্য মতামত চেয়েছে তাকে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন, আর যে সংসার ত্যাগ করতে চায় তাকে ত্যাগের উপদেশ দিচ্ছেন। আপনার তো উচিত যেটি ভালো সেই উপদেশই দেওয়া, সেইপথেই সকলকে নিয়ে যাওয়া··· ।'

মা বললেন, 'যার ভোগবাসনা প্রবল, আমি নিষেধ করলেই কি সে শুনবে? আর যে সুকৃতি বলে বহু পুণ্যফলে এইসব মায়ার খেলা বুঝতে পেরে তাঁকেই একমাত্র সার ভেবেছে তাকে সাহায্য করব না একটু! সংসারে কি দুঃখের শেষ আছে?'

মার উক্তি,—'দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। ·····

দোষ কারো দেখো না। শেষে দুষিত চোখ হয়ে যায়।'

'মানুষকে ভালবাসলে দুঃখকষ্ট পেতে হয়। ভগবানকে ভালবাসলে মানুষ ধন্য হয়ে যায়, তার দুঃখকষ্ট থাকে না।'

'দেখ, সেবাপরাধ একটি আছে বটে। সেটি হচ্ছে সেবা করতে করতে অধিকার পেয়ে নিজের অহংবুদ্ধি বেড়ে গেলে সে তখন পুতুলের মত নাচাতে চায়।··· ·· সেবার ভাব আর থাকে না।

(কথাটি যেন সর্বত্রই প্রয়োগ করা যায়। শুধু মহাপুরুষ সেবায় নয়, সমস্ত প্রতিষ্ঠান-ক্ষেত্রেই এই রকম দেখা যায় ; সেবক নাম নিয়ে প্রভুত্বের প্রতাপ।)

মা ছোট কথা, সাধারণ উপমা দিয়ে কতজনকে কত কথা বলেছেন, কে বা তার হিসাব রেখেছে, কে বা মনে রেখেছে। তবু দু চার জন যে সেগুলি মনে রেখেছিলেন তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঐ মহীয়সী মহিলাটির কত সহজ জ্ঞান ছিল সাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্য। তিনি যাঁর সহধর্মিণী ছিলেন তাঁরই মত সে কথা সহজ সরল অথচ গভীর।

পথভ্রষ্টা নারীও তাঁর অপার করুণা থেকে বঞ্চিত হয়নি। অন্য শোকার্তা নারী এসে কেঁদে পড়েছেন, অশৌচ রয়েছে, পলকের জন্য লোকসংস্কার মনে এলো, মা পরমকরুণাভরে সংস্কার-বুদ্ধিকে সরিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

দেখিনি তাঁকে আমরা—কারো কাছে কথা শুনিনি তাঁর। শুধু মায়ের কথা পড়া হল। তবু যেন তাতেই ঝলকে ওঠে তাঁর সহজ অনুভূতি-ভরা কথা। মনে হয় সাধারণ লোকেরা কি বুঝবে তাঁকে? অসাধারণই অসাধারণকে বোঝেন না! বেলোয়ারী কাঁচ রঙের পর রং বদলাচ্ছে। যে যে ভাবে দেখছে, গ্রহণ করছে তার কাছে সেই রং ফুটে উঠছে মনে হয়। শ্রীশ্রীমায়ের কথা যেন ভাবসমুদ্র, যিনি যেমন মানুষ তিনি তেমনি দেখছেন।

মনে দুঃখ জাগে। মনে হয়, সেই সময়ে যদি দেখা হত আমরা কি ভাবে নিতাম, অথবা তিনিই বা কি ভাবে নিতেন? দেশ দেশান্তরের লোকেরা কি পেয়েছিলেন? আমরা কেন তিনি বেঁচে থেকেও কিছু পেলাম না? ঠাকুরকে দেখার ভাগ্য করিনি কেননা জন্মাইনি, কিন্তু মা তো ছিলেন!

আবার মনে হয়, যুগ যুগান্তর ধরে যে মহাপুরুষ, মহামানব, অবতার এলেন চলে গেলেন—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য মহাপ্রভু, যীশু, মহম্মদ। পৃথিবী ভরে দেশে দেশে যেন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রইল তাঁদের অমর কথা চিরকাল ধরে। যাঁদের জীবন-চরিত রচনা আজো শেষ হয়নি, কখনো হবে না। যাঁদের অমর বাণীর টীকা ভাষ্য আজো রচনা করে চলেছে মানুষের পর মানুষ—তাঁদেরও আমরা কেউ দেখিনি। তবু তো তাঁরাও অপরিচিত নন, অজানা নন, 'দুঃখের রাতে নিখিল ধরা যখন করে বঞ্চনা'—তখনি সংশয় হয়—তাঁদের বাণী সমস্ত দুঃখ বেদনার উপর অমৃতপ্রলেপ বুলিয়ে দেয়।

ক্ষোভ মুছে যায়। মনে হয়, তবু তো এই যুগেই এই রামকৃষ্ণ-শতাব্দীর কালেই জন্মেছি, এখনো আকাশে বাতাসে জলে স্থলে তাঁর কথামৃত মিশিয়ে আছে, চোখের দেখার চেয়ে কম কি করে বলি? মনের দেখার রূপে যেন আমাদের যুগের অণুপরমাণুতেও তো ভেসে বেড়াচ্ছে। এও রইল চিরকালের রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের লীলার মত, দশ অবতারের কথার মত—পুরাণ, ভাগবত, রামায়ণ মহাভারতের মত টীকার পর টীকা—ভাষ্যের পর ভাষ্য—অনুবাদের পর অনুবাদ—হয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে মিশিয়ে যাবার জন্য। এ যুগের এই রামকৃষ্ণ কথামৃত, এই মহৎ চরিতামৃত, এই সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর লোকোত্তর জীবন-কথামৃত মানুষের অনায়াসবোধ্য। যেন গাছের ফলের, নদীর জলের মত, আলো বাতাসের মত এঁর এই কথামৃতের ধর্মও অনায়াস-প্রাপ্য, অনায়াস-সাধ্য।

এই দেখাও তো কম সুকৃতি নয়!

আগের যুগের রাম রাজপুত্র ছিলেন, পিতৃসত্য পালনের জন্য পরম দুঃখ স্বীকার করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও রাজকন্যার পুত্র, কম উৎপীড়িত অত্যাচারিত হন নি। করুণাময় শাক্যসিংহও রাজপুত্র ছিলেন, স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করেছিলেন। এঁরা সকলেই রাজবংশের, রাজপুত্র, সাধারণের কাছ থেকে এঁরা সুদূর, অনেক অন্য স্তরের। এ

যুগে মহাপ্রভু ও রামকৃষ্ণ আমাদের সাধারণ ঘরেরই অতি জানাশোনা আপনার জনের মত, চেনা জনের মত যেন আমাদের আঙিনার মাঝে এসে দাঁড়ালেন। আচণ্ডাল নরনারী পরম বিস্ময়ে ও আশায় তাঁদের মনের মধ্যে বরণ করে নিল। বিপুল ঐশ্বর্য বিলাসময় রাজবংশের রাজপুত্রদের মহান্ ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধনা, শৌর্যবীর্যের বিরাট আদর্শের কাহিনী এবারে নয়। এবারে আর এক রকম ভাবের করুণাময় সাধনা—'জীব শিব' সেবার প্রেমের সাধনা। পুরানো কথাই নতুন করে শুনল মানুষ। সকল মানুষের জন্য এই কথামৃত। বিশ্বাসী, সংশয়ী জিজ্ঞাসু, অলস আমাদের সকলের শরণদাতা। নাম ও নামী একের সাধনা। মধ্যযুগের ভক্ত নানক কবীর দাদু মীরা বাঈয়ের মত গানের ভজনের প্রেমের সেবার সহজ সাধনা। এ যুগের মানুষের সহজসাধ্য।

কথামৃতের কথায় বলি, 'মা কারুর জন্য মাছের ঝোল রান্না করেন, কারুর জন্য মাছ ভাজা করেন, কারুর জন্য বা ঝাল রান্না করেন, অম্বল রাঁধেন। যার যা ভাল লাগে, পেটে সহ্য হয়।'

কবীরের ভজনে শুনি—

'সাধো সহজ সমাধ ভলী।
গুরু পরতাপ যো দিন জাগী, দিন দিন অধিক চলী।
যাঁহা যাঁহা ডোলো কো পরিক্রমা, যো কুছ করো সো সেবা।
যব সোও তব করো দণ্ডবৎ পূজো ঔরন দেবা।'

মুক্তিসাধনার আরেক দিক

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্-এ

'ব্যক্তির মুক্তি'-শীর্ষক প্রবন্ধে (উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৬০) এইটিই দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, ব্যক্তির মুক্তিবাসনা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে পরিবার, সমাজ এবং বিশ্বকে আলিঙ্গন করতে চাওয়াই স্বাভাবিক, যদি না ব্যক্তি আত্মপ্রতারণার পথে চলেন এবং ঐশী শক্তির প্রতি অনাস্থাবান্ হন। উক্ত আলোচনায় সত্য-সাধক এবং মুক্তি-সাধকের স্বাভাবিক চিত্ত-প্রসারের দিকটাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্তও সেই দিক থেকেই করা হয়েছে। কিন্তু এইটি মুক্তিসাধনার একটি সত্য, একমাত্র সত্য নয়; মুক্তিসাধনার আরেকটি দিকও সমভাবেই স্বাভাবিক এবং সত্য। মুক্তিসাধনায় যেমন একটা অনন্ত চিত্তপ্রসারের দিক আছে তেমনি একটি আত্ম-মুখীনতার দিকও আছে। এই দ্বিতীয় দিকটি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা কোরব।

বুদ্ধের মুক্তি-বাসনা বিশ্বমুক্তিকেই চেয়েছিল; উপনিষদের প্রার্থনা, গায়ত্রীর ছন্দোপাসনা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে 'বহু'র ধীশক্তিকেই প্রার্থনা করেছিল—একথা ঠিক, কিন্তু মুক্তিসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা (সংকীর্ণ ব্যক্তি-মুক্তি বা উদার বিশ্বমুক্তিই হোক)—মানুষকে কোন্ পথে নিয়ে চলবে ?—এর দুটি সম্ভাব্য পথ। প্রথম পথ ঈশ্বরে বিশ্বাসী মনের, দ্বিতীয় পথ সন্ধানী এবং বিচারশীল মনের। দ্বিতীয় পথটির বিষয় 'ব্যক্তির মুক্তি' প্রবন্ধে আলোচনা করা হয় নি। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, বিশ্বাসের সবটুকুই অন্ধ। বিশ্বাস বিচারের ঊর্ধ্বে এমন একটা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত যাতে বিচারের প্রশ্নই উঠে না এবং বিচারের প্রয়োজনীয়তাও নেই। বিচার সত্যে পৌঁছবার একটি উপায় মাত্র; যেখানে সত্য নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়েই আছে সেখানে বিচারের কথা অবান্তর, নিষ্প্রয়োজন। যে কলকাতায়ই আছে তার তমলুক থেকে কলকাতায় যাবার জন্য

পথগুলো নিয়ে বিচার করবার এবং কলকাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার প্রশ্নই ওঠে না। 'ঈশ্বর আছেন' এই সত্য যাঁর কাছে নিশ্চিত তাঁর পথ অন্যদের চেয়ে ভিন্ন রকমের হবে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। ঈশ্বরে নির্ভরতাই হবে তাঁর মুক্তি-সাধনার একমাত্র পথ। এই পথের কথাই গীতায় বলা হয়েছে ঃ—'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত'।

এই 'তম্' এ-তে যাঁর বিশ্বাস তাঁর সাধনার পথ তো ওখানেই স্থির হয়ে গেল। সাধনার পথ তিনি যেখান থেকেই চলতে শুরু করে থাকুন না কেন—ব্যক্তি-মুক্তির সংকীর্ণ স্তর থেকেই হোক্ বা বিশ্ব-মুক্তির উদার স্তর থেকেই হোক্—তাঁর পথ তো নিশ্চিত হয়েই আছে, এপথে বাধা নেই, বিঘ্ন নেই, কারণ সংশয় নেই, রয়েছে বিশ্বাস—'নেহাভিক্রম-নাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে'। এই নিশ্চিত পথ সাধককে কোথায় নিয়ে যাবে? এর উত্তর আমরা দিতে পারি শুধু শ্রুতি থেকে এবং সত্যদ্রষ্টার সত্যদর্শনের বাণী থেকে। সাধক যেখানে ঈশ্বরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে চলছেন সেখানে ঈশ্বরই তো মুক্তিদাতা ······'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া-মেতাং তরন্তি তে'। ঈশ্বরে বিশ্বাসী মুক্তির সাধক ঈশ্বর-কৃপায় মায়ার অতীত হলেন, পূর্ণ সত্যকে লাভ করলেন। তাঁর সাধনার আরম্ভে ব্যক্তিই থাকুক আর বিশ্বই থাকুক, তিনি সত্য ও জ্ঞানকে লাভ করলেন। কিন্তু এই চরম প্রাপ্তিতেই তো তাঁর সাধনার পরিণতি পূর্ণ হল—তিনি নিজেকে জানলেন, বিশ্বকে জানলেন, তৃপ্ত হলেন। এখানে তো আর নূতন করে বাসনার উদ্ভব নেই। নিজের জন্যই হোক বা বিশ্বের জন্যই হোক সেই বাসনা সাধনলব্ধ জ্ঞানে বিলীন হয়েছে, তাই মুক্তির সাধনাও শেষ হয়েছে। জ্ঞানের সেই পরাকাষ্ঠা থেকে তিনি দেখলেন তাঁর চাওয়ার কিছুই নেই, নিজের জন্যও না, বিশ্বের জন্যও না—তিনি দেখলেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

বলা বাহুল্য, এখানে যে বিশ্বাসের কথা রাম-কৃষ্ণদেব বলেছেন, তা কুসংস্কারের তথাকথিত বিশ্বাস নয়। কুসংস্কার বা সন্দিগ্ধ মনের গোঁজা-মিলের বিশ্বাসচঞ্চল, ঘটনায় টলমল, বিচারের আঘাতে তা একদিন নিজের ছদ্মরূপ প্রকাশ করবে। যে বিশ্বাসের কথা ওপরে আলোচিত হয়েছে, সে বিশ্বাসে হয়তো জন্ম জন্মান্তরের বিচার, অভিজ্ঞতা ও সত্যানুভূতির দান ছিল, কিন্তু সে বিশ্বাস বিচারমাত্রের উর্ধ্বে এবং বিচারের 'চোখ' তার আর দরকার হয় না—সে বিশ্বাস নিশ্চিত জ্ঞানে সত্যকে কোথাও জেনেছে, এই জানা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ভাসামনের (Surface mind) কাছে পরিচিত হোক আর নাই হোক। 'আমি আছি'—এ কথায় বিশ্বাস করবার জন্য কি আর আমার বিচারের প্রয়োজন হয়? তেমনি 'ঈশ্বর আছেন', এই বিশ্বাসও অনেকের স্বতঃসিদ্ধ। তাঁদেরই জন্য উক্ত সাধনা।

ব্যক্তির মুক্তিবাসনা যে স্বভাবতই বিশ্বমুক্তির বাসনায় প্রসারিত হয় তাহা বলা হয়েছে এবং বিশ্বাসী মনের এই মুক্তি-সাধনা যে একদিন ঈশ্বরকৃপায় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্যক্তিগত বা বিশ্বসম্বন্ধীয় সকল প্রকার বাসনা থেকেই মুক্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক সে বিষয়ও বলা হয়েছে।

মুক্তিসাধনার দ্বিতীয় পথ ও সম্ভাবনাটি আরম্ভেই মনকে আত্মমুখী এবং অন্তর্মুখী করতে চাইবে, ইহা'ই স্বাভাবিক। এই দ্বিতীয় পথের সাধনা যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী মনের নয় এবং বিচারপন্থী মনের তা পূর্বেই বলা হয়েছে। গৌতম ছিলেন এই শ্রেণীর সাধক। গৌতম চেয়েছিলেন বিশ্বমুক্তি কিন্তু পথের সন্ধান করতে গিয়ে তাঁকে বসতে হ'ল ধ্যানে এবং আত্মবিশ্লেষণে। নিজ মুক্তি পথের মাধ্যমেই বিশ্বমুক্তির সাধক বিশ্বমুক্তি-পথের প্রথম সন্ধান খুঁজবেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। অজ্ঞ কি অজ্ঞকে পথ দেখাতে পারে? প্রেরণার

আরম্ভে ব্যক্তিই থাকুক আর বিশ্বই থাকুক, এই পথের সাধনা মনকে সংগৃহীত করে আনবে অন্তরের সত্য সন্ধানে, আত্ম-সন্ধানে, ইহা আমরা অনুমান করতে পারি। 'আত্মানং বিদ্ধি'ই একদিন এই সাধনার পথে হয়ে দাঁড়াবে প্রধান মন্ত্র।

আত্মজ্ঞানলাভে এবং তল্লব্ধ মুক্তিতে সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানীর অবস্থা কি প্রথম শ্রেণীর ঈশ্বরে বিশ্বাসী সাধকের চরম প্রাপ্তি থেকে ভিন্ন হবে? না, উভয়েই পূর্ণ জ্ঞান ও প্রাপ্তিতে বাসনা মুক্ত হবেন—স্বসম্পর্কীয় এবং বিশ্বসম্পর্কীয় বাসনামুক্ত। সাধনার পথেই নিজের জন্য বা বিশ্বের জন্য মুক্তিবাসনা। জ্ঞানলাভে উভয় প্রকার বাসনারই লয়, শুধু পরম সত্যদর্শন। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন থেকে যায়, 'তবে বিশ্বের উপায়?'—বিশ্বস্রষ্টাই বিশ্বের উপায় করেছেন, প্রতি হৃদয়ে সেই একই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন, পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন—মহাজনদের জীবনের উদাহরণ বিশ্বের সম্মুখে রেখে, 'মহাজনেন যেন গতঃ সঃ পন্থা।'

পূর্ব প্রবন্ধের আলোচনায় যে বলেছিলাম ব্যক্তির মুক্তি-সাধনা আত্মপ্রতারণার পথে না চললে বিশ্বমুক্তির সাধনাতেই এক হয়ে যাবে, বর্তমান প্রবন্ধে সে সত্য অস্বীকৃত হয়নি। শুধু মনে রাখবার বিষয় এইটুকুই যে 'সাধনা' সম্পর্কেই কথাটি সত্য। সাধনলব্ধ জ্ঞান বা সাধনোত্তীর্ণ জ্ঞানী সম্পর্কে এইটুকুই বলা চলে যে, পূর্ণ জ্ঞান প্রতিষ্ঠায় তাঁর সর্ব বাসনাই লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁর 'চাওয়া' যত বড়ই হোক্ না কেন। এখানে জ্ঞানী পূর্ণভাবে সেই পরম ঐশ্বরীয় সত্তার সঙ্গে একীভূত এবং বিশ্বলীলার স্রষ্টা। এখানেই উত্তর পাওয়া যাবে সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভেও কেন জগতের দুঃখ দূর হয়নি! পথ দু'টি দেখতে ভিন্ন হলেও চরম প্রাপ্তিতে এক—'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।' সাধক-জীবনে ব্যক্তি-সাধকের 'কাঁচা আমি' আর 'পাকা আমি' কে উপলক্ষ করে যে সাধনসম্পর্কীয় বাসনা জেগেছিল তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় 'বিশ্বরূপের' বিশ্ববাসনায় বা বিশ্বলীলায়। 'খোদার ওপর খোদকারী' আর যেই করতে যান, জ্ঞানী করবেন না। জ্ঞানী হয়ে যান সত্যদর্শনে নির্বাক, মৌন দ্রষ্টা—যদি তাঁর ভাষা বা কর্ম দৃষ্ট হয়, সে কর্ম বা ভাষা সেই 'বিরাটে'র ভাষা বা কর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানেই একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায় হিমালয়ের ধ্যানমগ্ন সত্যদ্রষ্টা ঋষির জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে পূর্ণজ্ঞানী অথচ কর্মরত যোগীর জীবনে।

প্রকৃত সত্য এই যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং সত্য সন্ধানী বিচারী উভয়েই পূর্ণজ্ঞানলাভে ব্যক্তি-সম্বন্ধীয় বা বিশ্বসম্বন্ধীয় সব বাসনা থেকেই পূর্ণভাবে মুক্ত হন—'বিশ্বের ভাবনা করেন বিশ্বেশ্বর'—ব্যক্তির অজ্ঞান দশাতেই উদার বা অনুদার 'ছটফট'! প্রবন্ধ দুটিতে আলোচিত সত্যের এই সিদ্ধান্তই দাঁড়ায় যে, ব্যক্তিবাসনার লয় হয় বিশ্ববাসনায় এবং তারও লয় হয় পরম ঐশ্বরীয় সত্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠায়।

"একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে যেতে গেলে পাকা সিঁড়িতে উঠা যায়, একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে উঠা যায়, এক গাছা দড়ি দিয়ে, একটা বাঁশ দিয়েও উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধরতে হয়। ঈশ্বরলাভ করতে হলে একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীসারদা-স্বরূপ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস, বিদ্যাবিনোদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুভ জন্মশতবার্ষিকীতে স্বতই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে—মা কে? তাঁর স্বরূপ কি আমরা বুঝেছি?

উদ্বোধন কার্যালয়ের কর্মচারী চন্দ্রমোহন দত্ত শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, 'মা, আপনাকে কত দূর দেশ থেকে কত লোক দর্শন করতে আসে। আপনি তো ঘরের ঠাকুরমার মতন পান সাজেন, সুপারি কাটেন, কখনও বা ঘর ঝাঁট দেন। আপনাকে দেখে তো কিছুই বুঝতে পারি না।' মা উত্তর দেন, 'চন্দ্র তুমি বেশ আছ। আমাকে তোমার বুঝবার দরকার নাই।'

একদিন রাধারানীর মা (পাগলী মামী) শ্রীশ্রীমাকে বাপান্ত করে গালাগালি দেন; এই চন্দ্রমোহনই শ্রীশ্রীমার মুখে একথা শোনেন: 'কত মুনি-ঋষি আমাকে তপস্যা করেও পায় না, তোরা আমাকে পেয়ে হারালি।'

অপর একদিন চন্দ্রমোহন শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে হাত বুলাতে চাওয়ায় তিনি বলেন, 'আমার পায়ে হাত বুলোতে হবে না। আমার শরতের পায়ে হাত বুলালেই আমার পায়ে হাত বুলানো হবে।'

শ্রীশ্রীমার এই তিন প্রকার উক্তির তাৎপর্য যথাক্রমে এইরূপ হতে পারে:—(১) পারমার্থিক ক্ষুধা না জাগলে তাঁকে বুঝবার চেষ্টা বৃথা। (২) তপস্যায় তাঁকে লাভ করা যায় না, মাত্র তাঁর কৃপাবলেই তা সম্ভব। (৩) শিবজ্ঞানে জীবসেবার ফলে, অর্থাৎ নরের মধ্যে নারায়ণের অনুভূতি জাগলে তাঁকে পাওয়া যায়।

ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীমাকে একদিন প্রশ্ন করেন, 'তুমি কেমন মা?' মা বলেন, 'আমি সত্যি মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়, সত্য জননী।'

শ্রীশ্রীমার স্বরূপের পূর্ণ পরিচয় তাঁর এই উক্তিমধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সাধক কবির ভাষায় "নিখিল-মাতৃহৃদয়সাগর-মন্থনামৃত-মূরতি"। স্বভাবে সহজ, করুণায় কোমল, স্নেহে সীমাহীন—অনন্ত শক্তি, অপার করুণা, অসীম ক্ষমার জাগ্রৎ প্রতীক।

মাকে তাঁর জননী শ্যামাসুন্দরী জন্মকালেই চিনেছিলেন 'জগদ্ধাত্রী'-রূপে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁর সম্বন্ধ জন্ম জন্মান্তরীণ—'যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।' পাত্রী সন্ধান-কালে ঠাকুরও যেমন শ্রীশ্রীমার সন্ধান বলে দেন, শ্রীশ্রীমাও পূর্বাহ্নে দেখিয়ে দেন, ঠাকুরই তাঁর পতি:

"এতলোক কারে চাহ করিবার বিয়া।
অমনি দেখান বালা তুলি দুই কর।
সন্নিকটে সমাসীন প্রভু গদাধর॥"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি)

ঠাকুর বলেছিলেন, 'ও সারদা—সরস্বতী। জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে। ও ছাই-চাপা বিড়াল।' ঠাকুরের চোখে মা ছিলেন 'দয়াময়ী', 'আনন্দময়ী'—তাঁর ধ্যানগঠিতা মানসী প্রতিমা। 'ষোড়শী'-রূপে মার পূজা করে তাই ঠাকুর জপমালাসহ তাঁর সব সাধনার ফল মার চরণে অর্পণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের চোখে মা ছিলেন 'জ্যান্ত দুর্গা' —'কালীর অবতার, সরস্বতী মূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা। উপরে শান্তভাব, কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি।' শ্রীশ্রীমাও ঠাকুরের গৃহী ভক্ত

হরিশচন্দ্রের ব্যাপারে তা বুঝিয়েছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট 'মহামায়ী'-রূপে তিনি ১০৮টি পদ্মফুলে পূজা গ্রহণ করেছেন। স্বামী সারদানন্দ (যাঁকে শ্রীশ্রীমা মাথার মণিরূপে জ্ঞান করতেন) মার মধ্যে 'মহাশক্তি'র প্রকাশ দেখে তাঁর কৃপার দ্বারে দ্বারী হয়েছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে অভেদজ্ঞানে বলতেন, 'টাকার এ পিঠ আর ওপিঠ।' স্বামী অদ্ভুতানন্দকে ঠাকুর বলেছিলেন—'তুই যার ধ্যান করছিস্, সে নহবতে রুটি বেলছে, দেখ্‌গে যা।' শ্রীশ্রীমার ডাকাত বাবা ও তার পত্নী তাঁকে বলেছিল—'তুমি তো সাধারণ মানুষ নও। আমরা তোমাকে 'কালী'রূপে দেখলুম। পাপী বলে আমাদের কাছে তুমি রূপ গোপন করছ।' বিষ্ণুপুর স্টেশনে এক পশ্চিমা কুলি শ্রীশ্রীমাকে চিনেছিল 'তু মেরী জান্‌কী' ব'লে। সাধু নাগমহাশয় তাঁর দয়ায় মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'বাপের চেয়ে মা দয়াল।' ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বসুর চোখে শ্রীশ্রীমা ছিলেন, 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী।' শৈশবে মাতৃহারা এক বালক মার চরণস্পর্শে ভাবসমাধি লাভ করে পর পর তাঁর মধ্যে 'ঠাকুর', 'মা-কালী' ও 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি' দর্শন করে। দক্ষিণেশ্বরে মার প্রথম আগমনকালে জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় এক চটিতে শ্রীশ্রীভবতারিণীর দর্শন পেয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, 'আমি তোমার বোন হই।' সর্বদেবীস্বরূপা সারদাদেবীর রূপের ধারণা কে করতে পারে?

দেবমানব শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় শ্রীশ্রীমাও দেবী-মানবী ছিলেন—একাধারে নারী ও নারায়ণী। উপরোক্ত প্রসঙ্গগুলি তাঁর নারায়ণী-স্বরূপের পরিচায়ক। নারীজীবনে শ্রীশ্রীমা ছিলেন সেবাপরা দুহিতা, স্নেহশীলা ভগিনী, পতিপ্রাণা সহধর্মিণী এবং সন্তানবৎসলা জননী। কন্যারূপে দরিদ্র জনক-জননীর সংসারে তাঁর অকুণ্ঠ সেবাব্যাপৃতির কথা, ভগিনীরূপে কনিষ্ঠ সহোদরগণের সকল আবদার সহ্য ক'রে নিবিড় স্নেহ ও সহিষ্ণুতায় তাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করবার কথা আর পত্নীরূপে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ও আচরণের অপূর্ব কাহিনী অনেক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

শ্রীশ্রীমার অনুপম মাতৃত্ব সকল ভাবকে ছাপিয়ে উঠেছে। নিঃসন্তানা শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের ইচ্ছায় মায়িক অবলম্বন হিসাবে শ্রীমতী রাধারানীর প্রতি-পালন ভার গ্রহণ করেন। তাঁর মাতৃত্বের পূর্ণ পরিণাম প্রকাশ পায় ঠাকুরের লীলা সংবরণের পর। জাতি, ধর্ম, বর্ণ—সুপুত্র বা কুপুত্র—বিচার না করে দিনের পর দিন তাঁর সমীপে আগত অগণিত পুত্রকন্যাদের যে অমায়িক মাতৃত্বের রসাস্বাদে তিনি তৃপ্ত ও শান্ত করেছিলেন, ধর্মজগতের ইতিহাসে তার তুলনা নেই বললে চলে। তাঁর নিকট গৃহস্থ ও ত্যাগী ভক্তের সমান আদর ছিল—অনেক ক্ষেত্রে ত্যাগী অপেক্ষা গৃহস্থ ভক্ত সমধিক স্নেহলাভ করেছে। সংসার জ্বালায় জ্বলে শান্তি-লাভের আশায় যারা তাঁর পাদমূলে ছুটে আসত, আসামাত্র বুঝত শ্রীশ্রীমা বৎসহারা গাভীর ন্যায় তাদের প্রতীক্ষা করছেন—পথশ্রান্ত কাহাকেও স্বহস্তে পাখাবীজনে রতা—ব্যস্তসমস্তভাবে ভক্ত অতিথিদের আহার্যের সুব্যবস্থার শেষে দীক্ষাদি দানে তাদের প্রাণের পিপাসা মিটাচ্ছেন। ভক্তগণ শুনতো শ্রীশ্রীমা নিত্যস্নানের পর জগদম্বার উদ্দেশ্যে করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে বলছেন—"মা জগদম্বে! জগতের কল্যাণ কর।" তাঁর আচরণ দেখে তারা সবিস্ময়ে বুঝত যে, তিনি মাত্র তাদের গর্ভধারিণীরও অধিক স্নেহপরায়ণা জননী নন, ভবপারেরও কাণ্ডারী বিশেষ!

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পর তাঁর অসমাপ্ত জীবোদ্ধার ব্রত মাকে পালন করতে হয়েছিল। গুরুরূপে তিনি দেশকাল পাত্র অনুযায়ী অর্থাৎ 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন', 'যখন যেমন তখন তেমন', 'যাকে যেমন তাকে তেমন' রূপ

ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। মার দীক্ষাদানে অনুষ্ঠান-বাহুল্য ছিল না। ঠাকুরের নিত্যপূজার পর প্রার্থীকে ঠাকুরের ছবির সম্মুখে নিজের বাম অথবা সম্মুখভাগে বসিয়ে আচমনাদির পর মন্ত্র দান করতেন। দীক্ষার স্থান অস্থানও অনেক সময় বিচার করেন নাই। প্রার্থীর অন্তরের ব্যাকুলতা দেখলেই মা তাকে কৃতার্থ করতেন। করুণাময়ী কারও চোখের জল দেখতে পারতেন না। অন্তর্যামিনী প্রার্থীর জন্মসংস্কার বুঝে তদনুযায়ী মন্ত্র দিতেন। ভিন্ন গুরুর নিকট দীক্ষিত কেহ কেহ তাঁহাকে উপগুরুরূপে লাভ করেছে। স্বপ্নযোগেও মার কাছে কাহারও মন্ত্রলাভ ঘটেছে। কাহাকেও মা ঠাকুরের নামের মন্ত্র গুরুমন্ত্ররূপে ইষ্টমন্ত্রের পূর্বে জপ করতে বলেছেন। কোনও ভক্ত মন্ত্রলাভের পর ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতি করতে না পারায় মন্ত্র ফেরত দিতে আসলে মা তাকে অভয় দিয়ে বলেন—"তোমাকে কিছু করতে হবে না—আমি আছি।" মা অনেক শিষ্যকে দীক্ষা-দান কালে, "আমি জন্মজন্মান্তরে যা কিছু পাপ করেছি, সব তোমায় অর্পণ করলুম"—এই সম্প্রদান-বাক্য পাঠ করিয়ে তাদের পাপতাপ বরণ করেছেন। মা বলতেন,—"বাবা কি বলবো, এমন সব লোক আসে যারা না করেছে এমন কাজটি নাই। আমায় এসে মা বলে ডাকে, ভুলে যাই। যে যার যোগ্য নয় তার চেয়ে বেশী এখান থেকে নিয়ে যায়। কেউ পায়ে হাত দিলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, আবার কেউ হাত দিলে যেন বোলতা কামড়ায়।" মন্ত্রদান সম্পর্কে বলেছেন—"মন্ত্রের ভিতর দিয়ে গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়—শিষ্যের পাপ গুরুতে আসে। তাই তো মন্ত্র দিয়ে পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি।" পূজার বিধান জানতে চাইলে বলেছেন—"যাঁর পূজা করবে, তাঁর মূর্তির সামনে বা তাঁর উদ্দেশ্যে উপকরণ রেখে প্রণাম করবে। ভাবেই পূজা সিদ্ধ হবে।" জপধ্যান-সম্পর্কে বলেছেন—"ধ্যানজপ তাঁকে লাভ করবার জন্য। স্নান করে ভগবানকে প্রত্যহ প্রণাম করবে—প্রত্যেক কাজে মনে মনে তাঁকে স্মরণ করবে। এতেই জপধ্যানের কাজ হবে। যখন সময় পাবে একমনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। খুব ভোরে আর রাত্তিরে ঘুমাবার আগে যা পার তাই করো।" অপর এক ক্ষেত্রে বলেছেন—'জপতপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়। কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না।" কোনও ভক্তকে মা বলেছেন—"ঠাকুরকে ডাকবে, যা কিছু খাবে তাঁকে নিবেদন করে খাবে। তাতে রক্ত পরিষ্কার হবে, মন পবিত্র হবে, দেহ নির্মল হবে।" মন সব সময় জপধ্যানে বসতে চায় না কেন জিজ্ঞাসা করলে মা বলেন—"কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ তো আছে, তেমনই মনের অবস্থা হয়। কখনো ভাল, কখনো মন্দ। এটা প্রকৃতির নিয়ম। মনের যেমন অবস্থাই হোক না কেন, সকাল সন্ধ্যা বসতে ছাড়বে না। মন ভাল অবস্থায়ও সকল সময় বসতে চায় না, আবার চঞ্চল অবস্থার মধ্যেও কখনও কখনও বেশ বসে যায়। কোন্ মুহূর্তে যে হবে তা বলবার যো নাই।" ধ্যানের সময় গুরুমূর্তি ও ইষ্টমূর্তি দুইটাই আসলে কি করা কর্তব্য জানতে চাইলে মা বলেন—"প্রথম প্রথম এ রকম হলেও পরে দেখবে একটি মূর্তিই আসবে। যে মূর্তিটি আসে তাকেই ধরে থাকবে।" কোনও ভক্ত প্রশ্ন করলেন 'মা, মনের মধ্যে ভালো মন্দ চিন্তা ওঠে, তার কি হবে?" মা বললেন—'এর জন্য ভেবো না। কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়, যদি না কাজে করে। আর আর যুগে মনের সংকল্পেই পাপপুণ্য হতো। কলিযুগে সৎচিন্তা মনে হলে তার উত্তম ফল হবে।" সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমা বেশী কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন না। সাধারণ ক্ষেত্রে তিনি সকালসন্ধ্যায় অন্ততঃ ১০৮ বার মন্ত্রজপ ও স্মরণমননের উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন—"খুব জপ করবে * * *

কোন ভয় নাই আমি আছি। রোজ এক অধ্যায় গীতা পড়বে—মনে মনে সংকল্প করে যে তাঁর প্রীতির জন্য পড়ছি। যেদিন সময় হবে না, অন্ততঃ দু'চার শ্লোক পড়ে নেবে। কোন একটা আসন ঠিক করে নেবে যাতে বেশীক্ষণ বসতে পারো—অন্ততঃ দু তিন ঘণ্টা। যখন দেখবে পা ঝিন্ ঝিন্ করছে, তখন পা বদলে নেবে।" কোনও ত্যাগী ভক্ত মাকে জানান—"মা খুব হাঁপানিতে ভুগছি, কিছু ভাল লাগছে না।" মা অমনি বললেন—"বাবা, ব্যাধি ও তপস্যা একই জিনিস—তপস্যার মত ব্যাধিতেও কর্মক্ষয় হয়।" প্রশ্ন হ'ল—"মা, আপনাদের পাদপদ্মে বিশ্বাস কি করে হয়?" মা জানলেন—"বিশ্বাস কি সোজা কথা, বাবা! বিশ্বাস শেষের কথা—বিশ্বাস হলেই তো হয়ে গেল।" গুরু ও ইষ্টে অভেদজ্ঞান যে এই বিশ্বাস অর্জনের উপায় শ্রীশ্রীমা তা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন।

শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর অভিন্ন হলেও বাহ্যদৃষ্টিতে ভিন্ন বোধ হ'ত। ঠাকুর ছিলেন সন্ন্যাসভাবপ্রধান—মার জীবন ছিল গার্হস্থ্যভাবপ্রধান। ঠাকুর বেশীর ভাগ কাল আত্মীয়-স্বজন হ'তে দূরে দেবমন্দিরে কাটিয়ে গিয়েছেন—মা অধিকাংশ কাল পিত্রালয়ে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বাস করেছেন। মুদ্রাস্পর্শে ঠাকুরের হাত বেঁকে যেত, তিনি যন্ত্রণাবোধ করতেন—মা টাকাকে 'লক্ষ্মী' জ্ঞানে বাক্সে রাখতে বা বাক্স থেকে বার করতে মাথায় ঠেকাতেন। অথচ ঠাকুরের ন্যায় অর্থের উপর তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। ঠাকুর নিম্নভূমিতে মন রাখার জন্য 'জলখাব', 'তামাক খাব' রূপ একটা বাসনা রাখতেন—মা'র মনকে সংসারমুখী করবার অবলম্বন ছিল কন্যারূপা রাধারানী। স্বামী প্রেমানন্দ বলতেন গৃহীদের গার্হস্থ্যধর্ম শেখাবার জন্য শ্রীশ্রীমার আবির্ভাব।" গৃহস্থ ভক্তকে মা বাপ-মার সেবাকেই সব চেয়ে বড় ধর্ম বলেছেন। সৎকাজে মুক্তহাত লোককে ভাল বললেও নামপ্রচার বা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন না। গৃহীমাত্রকে তিনি অপচয় হতে সতর্ক করতেন। বলতেন, "অপচয়ে মা লক্ষ্মী কুপিতা হন।" তাদের বার তিথি মেনে চলতে বলতেন। শান্তি-স্বস্ত্যয়নে বা পূজার অঙ্গরূপে চণ্ডীপাঠ বিধিপূর্বক না হ'লে কুফল ঘটে বলেছেন। স্ত্রীশিক্ষায় বিশেষ ক'রে সূচীকর্মাদি শিল্পকার্যে মা স্ত্রীলোকদের যথেষ্ট উৎসাহিত করতেন—তবে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা বা তথাকথিত স্ত্রীস্বাধীনতা সমর্থন করতেন না। অবস্থাবৈগুণ্যে অবিবাহিতা কুমারী, স্বামীপরিত্যক্তা অথবা নিগৃহীতা নারী এবং বালবিধবাদের শ্রীশ্রীমা লেখাপড়া ও কাজকর্ম শিখে মানুষের পরিবর্তে ভগবানকেই জীবনের অবলম্বন করতে শিক্ষা দিয়েছেন। সদ্ভাবে ও স্বাধীনভাবে চিরকুমারী-জীবন-যাপনে সমর্থ দেখলে তিনি জোর ক'রে তাকে সংসারী করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। চালচলনে বা আচরণে স্ত্রীলোকের নির্লজ্জভাব শ্রীশ্রীমার বিরক্তিকর ছিল।

শ্রীশ্রীমা স্থূল মায়িক দেহ ত্যাগ করলেও আজও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় অ-মায়িক শরীরে বিদ্যমান। আজও তিনি ভক্তহৃদয়বাসিনী হয়ে নানা ভাবে ভক্ত সন্তানকে দর্শন ও শিক্ষাদানে কৃতার্থ করছেন। বিশ্বাস থাকলে ভক্ত মাত্রেই তাঁর নিত্য লীলার স্বরূপ বুঝে কৃতার্থ হবে।

সমালোচনা

সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ —শ্রীঅতুলানন্দ রায়, বিদ্যা-বিনোদ। প্রকাশক—শ্রীমুকুন্দলাল দে, দি সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯।২, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৫। পৃষ্ঠা—২৪৪+২৬, মূল্য—৪৲।

গ্রন্থকার ঠাকুরের সাধনজীবন বৎসর-অনুযায়ী সাজাইয়া সংলাপ-প্রধান ভঙ্গীতে উহা সরসভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পড়িতে উপন্যাসের মতন চিত্তাকর্ষক লাগিবে, বিশেষতঃ নূতন পাঠক-পাঠিকার নিকট। একটি স্নিগ্ধ ভক্তিভাব বইখানির আগাগোড়া অনুস্যূত। শ্রীমৎ তোতাপুরীর বিদায়-কালে গুরুশিষ্যের কথোপকথনটি খুবই মিষ্ট লাগিল। (২৩৯ পৃঃ)

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের দু একটি ঘটনা গ্রন্থকার সরাসরি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়া একটু রদবদল করিয়া ঐগুলি লিখিয়াছেন। একটি নূতন কথাও দেখিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর নাকি মাতার নিকট শৈশবকালে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, কোনও দিন কাষায় কৌপীন ধারণ করিবেন না। (১৮ পৃঃ)। তাই গ্রন্থে বেদান্তসাধনের সময় ঠাকুর কাষায় কৌপীন ধারণ করেন নাই। উপনয়নের সময় কি করিযাছিলেন তাহার উল্লেখ নাই।

গ্রন্থকারের এই মন্তব্যটি আমাদের ভাল লাগে নাই: "মৃত্যুকাল পর্যন্ত যিনি (ঠাকুর) সপরিবারে খাঁটি গৃহীর জীবন যাপন করলেন।"

আরও কয়েকটি স্থান হয়তো অনেকে পছন্দ করিবেন না। যথা—(ক) "রামকুমারের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল রানী রাসমণির অচেতন দেহ"—(৪৭ পৃঃ)।

(খ) দাস্যভাব সাধনকালে ঠাকুরের শ্রীযুত মথুরের সহিত মেছুয়া বাজারে গমন (১০০-১১৫ পৃঃ)।

(গ) শেয়ালে ঠাকুরের দুগাল চাটচে (১২১ পৃঃ)।

(ঘ) ঠাকুরের পাছা বাজিয়ে বিবাহ করিতে যাওয়া (১২৭ পৃঃ)।

(ঙ) আসর ভরতি লোকের সামনে ঠাকুরের ভাঁড়ামি (১৯১ পৃঃ)।

(চ) নির্বিকল্প সমাধির পরেই মুখে "একগাল ক্ষীরের পুলি" (২২৭ পৃঃ)।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম কে দিয়াছিলেন ইহা লইয়া লেখকের একটি গবেষণাত্মক প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম প্রাক্-দক্ষিণেশ্বর জীবনে যে রামকৃষ্ণ ছিল না, গদাধর চট্টোপাধ্যায় ছিল—এই বিষয়ে একটি অবিসংবাদিত প্রমাণ হইতেছে তাঁহার স্বহস্তলিখিত একটি পালাগানের পুঁথিতে শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায় বলিয়া স্বাক্ষর। ঐ স্বাক্ষর 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে ছাপা হইয়াছে। এই জন্য বহুতর যুক্তির উপস্থাপনা সত্ত্বেও অতুলানন্দ বাবুর সিদ্ধান্তে সংশয় রহিয়াই যায়।

—শ্রীমায়াময় মিত্র

বেদান্তানুভূতিকারিকা— গ্রন্থকার: শ্রীকালীকুমার মিশ্র, এম্-এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থ। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত শিক্ষাপ্রসার, বোরহাট, বর্ধমান, পৃষ্ঠা—৫০; দক্ষিণা—"তত্ত্বোপলব্ধি"।

সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ এই পুস্তকে লেখক অদ্বৈতবেদান্তমতানুযায়ী ব্রহ্মের স্বরূপ, এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানে দর্শনাদি বিধি সম্ভব নয়। ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত কর্মের সমুচ্চয় হইতে পারে না। কেবল চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তিতে কর্মের উপযোগিতা। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম কেবল শ্রুতিগম্য। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য নয়। সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসক ও

বৌদ্ধ মত পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিয়া খণ্ডন-পূর্বক অদ্বৈতবেদান্তমত সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করিয়াছেন। শেষে এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ইহা বলিয়া বিচারের দ্বারা দ্রষ্টৃদৃশ্য বিবেকজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ কৃতার্থ হয়। পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র হইলেও রচনা কৌশল বশত বেদান্তশাস্ত্রের প্রায় সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে উক্ত হওয়ায় গ্রন্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে এইরূপ গ্রন্থের রচনা বা প্রচার এযুগে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রচয়িতাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

—শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী

নরদেবতা বা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন নাট্য (পঞ্চাঙ্ক নাটক)—শ্রীনীলমণি সান্যাল-প্রণীত। ১২নং কুমোরপটী লেন, টিন বাজার, শ্রীরামপুর হইতে গ্রন্থকারকর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৯৬, মূল্য দেড় টাকা।

অবতার-পুরুষের পবিত্র চরিতকথা যে ভাবেই আলোচনা করা যাক্ তাহাতেই মঙ্গল সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সমস্ত জীবনী নাট্যাকারে প্রকাশে অত্যন্ত সংযম ও সাবধানতা প্রয়োজন, নচেৎ তাঁহাদের লোকোত্তর জীবন পাঠকসমাজে বিকৃতরূপ ধারণ করিতে পারে। আলোচ্য নাটকের রচয়িতা এই বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই। যে পুণ্যশ্লোক ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে পিতৃত্বে স্বীকার করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়, তিনি গ্রাম্যসমাজে কিরূপ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহার পরিচয় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" পাঠে জানা যায়। কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার মুখ দিয়া 'ব্যাটাচ্ছেলেরা', 'গৈলের গরু', 'গুয়োটা' প্রভৃতি অশিষ্ট বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞ গ্রাম্য পণ্ডিতগণের চরিত্রচিত্রণও যথোচিত হয় নাই। বাচস্পতি ও তাঁহার সহধর্মিণীর কলহ ঠিক যেন ঝাড়ুদার ঝাড়ুদারনীর ঝগড়া। মনে হয় গ্রন্থকার নাটকে রসসৃষ্টির জন্য ও নাটকখানিকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়াছেন। নাটকে গানগুলিরও ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র বেশ ভালই লাগিল।

বর্ষপঞ্জী, ১৩৬১ (অষ্টম বর্ষ)—সম্পাদক : শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত। প্রকাশক—এস, আর, সেনগুপ্ত এণ্ড কোং, ২৫এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা—১৩। মূল্য চার টাকা।

সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি ও চলতি ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্যক্ পরিচিতির জন্য বর্ষপঞ্জীর প্রয়োজনীয়তা আজকাল অনেকেই উপলব্ধি করেন। আলোচ্য বর্ষপঞ্জীখানিতে অনুসন্ধিৎসুগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার মতো বিষয়বস্তুর অভাব নাই। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের সম্পাদনা-সহায়তায় 'বীমা বিবরণী', 'খেলাধূলা' ও 'শিল্পবাণিজ্য' বিষয়ক অধ্যায়গুলি বেশ মর্যাদাসম্পন্ন হইয়াছে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'সালতামামী' পড়িয়া আনন্দলাভ করিলাম। 'ব্যক্তি পরিচয়' অধ্যায়টিকে আরও পুষ্ট করা উচিত, ইহা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইল। ভারতেতর দেশসমূহের অতি-খ্যাতিমান্ ব্যক্তিগণেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরবর্তী সংস্করণে সংযোজিত হইলে পুস্তকখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত ; প্রকাশক—শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সেক্রেটারী, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি। ৩, গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা—৮৬ ; মূল্য দুই টাকা।

১৩৩২ সালে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থখানির ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ। এই গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে ভক্তরাজ মহারাজের (স্বামী সদাশিবানন্দ) সঙ্গে লেখকের যে সমস্ত প্রসঙ্গের আলোচনা হয়, তাহাই সরল অনাড়ম্বর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

৺কাশীধামে অদ্বৈত আশ্রম ও সেবাশ্রমের সূত্র ও গোড়াপত্তনের ইতিহাস লেখক সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে জ্ঞাতব্য অনেক কিছুই আছে।

শ্রীশ্রীমা সারদামণি—শ্রীঅনিল কুমার চক্রবর্তী-প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান :—এম. এল. দে এণ্ড কোং, ১৩.১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২; মূল্য—॥০ আনা।

ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা শ্রীশ্রীমায়ের চরিত-কথাটি তাহাদের উপযোগীই হইয়াছে। বইখানিতে মাত্র ১৮টি পৃষ্ঠা আছে, এত ক্ষুদ্র না করিয়া পুণ্যজীবনের আরও কিছু ঘটনা ইহাতে সন্নিবেশ করা উচিত ছিল। পড়িতে পড়িতে এক স্থানে একটি অসঙ্গতি দৃষ্ট হইল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছেলেবেলার নাম ছিল 'গদাধর', মা বাবা আদর করিয়া ডাকিতেন 'গদাই' বলিয়া, 'গদা' নয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সানুবাদ)—সম্পাদক :—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। প্রাপ্তিস্থান : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ এবং ৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা—৩। ১৯২ পৃষ্ঠা; মূল্য বার আনা।

এই ক্ষুদ্র পকেট চণ্ডীখানিতে মুখবন্ধে চণ্ডীতত্ত্ব ও চণ্ডীর বিষয়বস্তুর আলোচনা এবং তৎপরে চণ্ডীপূজাবিধি, অর্গলাস্তোত্র, কীলকস্তব, কবচ, সপ্তশতীরহস্যত্রয় ও পুরশ্চরণের বিধি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূল শ্লোকগুলি প্রথমে ও পরপৃষ্ঠায় সরল বঙ্গানুবাদ থাকায় সাধারণ পাঠকগণ বোধসৌকর্য লাভ করিবেন। শেষাংশে চণ্ডীপাঠের ফল, দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত সংযোজিত করিয়া সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়াছেন। মূল শ্লোকগুলির মত অন্য স্তব স্তোত্রগুলিরও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইলে গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইত।

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

সত্যসম্বেদন ও সত্যদর্শন—ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রী-সত্যদেব-প্রণীত; সাধনসমর কার্যালয়, ২০১, মুক্তরামবাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭; পৃষ্ঠা—২৬৬; মূল্য—২॥০ টাকা।

পুস্তকখানি কতকগুলি ধর্ম ও দর্শনমূলক প্রবন্ধের সংকলন। ভারতীয় সমাজ সংক্রান্ত কয়েকটি লেখাও আছে। প্রত্যেকটি রচনা শাস্ত্র-প্রতিষ্ঠ বিচারধারা অনুসরণ করিয়াছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লেখকের একটি স্বচ্ছ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী লেখাগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী শুধু বুদ্ধি-প্রসূত নহে, তত্ত্বানুভূতি এবং সরস ভক্তির দ্বারা অনুপ্রেরিত। ধর্মসাধনানুরাগী পাঠক প্রবন্ধগুলি পড়িয়া উপকৃত হইবেন। 'জাতিপরিবর্তন' 'অবান্তর জাতিভেদ' এবং 'বিবাহ বিচার' এই তিনটি প্রবন্ধ হিন্দুসমাজের সময়োচিত সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রভূত আলোকসম্পাত করে।

টি বি. সহজ বোধ্য ও সহজ সাধ্য—ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ১৫৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১৯১; মূল্য—৫৲ টাকা।

বাঙলাদেশে দ্রুত প্রসারশীল টি. বি বা যক্ষ্মা-রোগের মারাত্মক বিপদ সম্বন্ধে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যবিদ্ এবং সমাজ-সেবকগণ উত্তরোত্তরই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন। এই ভীষণ কালব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার অন্যতম উপায় হইতেছে সময়োচিত সাবধানতা। আলোচ্য পুস্তকটি জনসাধারণের কাছে টি বি রোগের একটি সহজ, সুস্পষ্ট, বৈজ্ঞানিক পরিচিতি উপস্থাপিত করিয়া উপরোক্ত সাবধানতা অবলম্বনে প্রচুর সহায়তা করিবে। জ্ঞানই শক্তি। যক্ষ্মাসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে উহার প্রতীকারের অনেক শক্তি পাওয়া যায়। বহুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসক-গ্রন্থকার দশটি অধ্যায়যুক্ত এই বইখানির মাধ্যমে সত্যই টি, বিকে যেভাবে সহজবোধ্য ও

সহজসাধ্য করিয়া দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দিত করি। সাধারণ পাঠক পাঠিকা ব্যতীত পল্লীঅঞ্চল বা মফঃস্বল শহরের চিকিৎসকগণও এই বহুতথ্যপূর্ণ বইটি পড়িয়া প্রভূত উপকৃত হইবেন। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর। ২০টি চিত্র আছে। গ্রন্থের উপযোগিতার তুলনায় মূল্য খুব বেশী নয়।

পঞ্চপ্রদীপ (কবিতার বই)—শ্রীরণজিত রায় চৌধুরী-প্রণীত ; চৈতন্যপুর, (বর্ধমান) পৃষ্ঠা—১৭৬ ; মূল্য ২৲ টাকা।

পল্লীবাসী যুবক-কবির ইতঃপূর্বে প্রকাশিত দুইটি কাব্যগ্রন্থ প্রখ্যাত অনেক সাহিত্য-রথীর সমাদর লাভ করিয়াছিল। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্র হইতে আহৃত নানা বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত বর্তমান গ্রন্থের কবিতাগুলিও কবিতামোদীগণের ভাল লাগিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"কবিতাকে আবার জনবল্লভ করতে হ'লে—

১। ছন্দে লিখতে হবে ২। বিষয়বস্তু সকলের পরিচিত হওয়া চাই ৩। ভাষা প্রচলিত বঙ্গভাষা হওয়া চাই ৪। আয়তন অযথা দীর্ঘ না হয় ৫। কবিতায় যে কোন একটা হৃদয়াবেগ থাকা চাই ৬। গঠন অনবদ্য হওয়া চাই। ছন্দে মিলে ভাষায় আদৌ অঙ্গহানি না থাকে।

'পঞ্চপ্রদীপের কবিতাগুলিতে রচয়িতা কাব্য-রচনার এই মান রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

আবাসিক শিক্ষা—রহড়া (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। পিতৃমাতৃহীন, দরিদ্র বালকগণের জন্য এই আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ১৯৫২-৫৩ সালের কার্য-বিবরণী পাঠে প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা এবং সুষ্ঠু পরিনির্বাহে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আশ্রমে ১৯৫৩ সালে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৫৩। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, শিল্প, ব্যবহারিক—এই বিভাগ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতেই ক্রমবর্ধমান প্রসার ও উন্নতি উল্লেখযোগ্য। মাধ্যমিক বিভাগের ১৯৫২ এবং ১৯৫৩ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার উত্তীর্ণের হার ১০০%। শিল্প বিভাগের জন্য ২৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে কতকগুলি প্রয়োজনীয় যন্ত্র-পাতি ক্রয় করা হইয়াছে। প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রীত আশ্রমসংলগ্ন একটি দ্বিতল গৃহ সমেত ৩½ একর জমি যথোপযুক্ত পরিষ্করণ ও সংস্কারাদির পর গত ১০ই অক্টোবর (১৯৫৩) পশ্চিম বঙ্গের পুনর্বাসনমন্ত্রী মহোদয়া শ্রীমতী রেণুকা রায়ের দ্বারা শিশুবিভাগের ছাত্রাবাসরূপে উদ্‌ঘাটন করা হয়। ইহাতে ৭৫টি ছাত্র থাকিতে পারিবে। ১৯৫২ সালে গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা ছিল ১৪৮০, ঐ সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১৯৫৩ সালে দাঁড়ায় ১৭০৬তে। খেলাধূলা, ব্যায়াম, সঙ্গীত, অভিনয় ও উদ্যান-কার্যে ছাত্রগণ আলোচ্য বর্ষে প্রশংসার পরিচয় দিয়াছে।

দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ১৯৫৩ সালের কার্য-বিবরণী পাঠে জানা গেল, আলোচ্য বর্ষে ২১২টি বালক এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিয়াছে। ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মিগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পরিচালিত বিদ্যাপীঠের আদর্শ অতি মহান্, ইহা উত্তরোত্তর সেই আদর্শের দিকেই আগাইয়া চলিয়াছে। যে-কোন পরিদর্শকের দৃষ্টি পড়ে ছেলেদের চারিত্রিক উৎকর্ষ, নৈতিক বিকাশ, সুন্দর স্বাস্থ্য, নিয়মানুবর্তিতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর। ১৯৫৩ সালে ১৫ জন

স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৪ জন উত্তীর্ণ হয়। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রদের প্রতিনিধিমণ্ডলী ও সেবাসমিতির কার্য সমস্ত বিভাগেই প্রশংসনীয়। সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক হস্তলিখিত 'বিবেক' ও 'কিশলয়' পত্রিকা দুইটি নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছে। 'পাটনা কিশোর দল' পরিচালিত সারা বিহার রচনা-প্রতিযোগিতায় একটি ছাত্র দ্বিতীয় স্থান এবং চারজন বালক 'ভারত-স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়া সোসাইটি, কলিকাতা' ও 'দেওঘর নবীন সঙ্ঘে'র চিত্রাঙ্কন-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছে। ছাত্রগণ-পরিচালিত সমবায়-ভাণ্ডার হইতে জনৈক ছাত্রকে মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তিদান ইহার পরিচালন-কৃতিত্বেরই পরিচয় দেয়। গ্রন্থাগারের ৬২৬৫ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৮০ খানি নূতন কেনা হয়। ২০টি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে আংশিক এবং পূর্ণ সাহায্য বাবদ ৫০৭০৲ টাকা আলোচ্য বর্ষে ব্যয় করা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবে বিহার রাজ্যপাল শ্রী আর, আর, দিবাকরের সভাপতিত্বে এবং ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার শ্রী কে, রমণের সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিহার কলেজ সমূহের ইনস্পেক্টরদ্বয় শ্রী পি, এস্, বর্মা ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার বিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন ও ছেলেদের কর্তব্য সম্বন্ধে নানা জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন।

মাঙ্গালোর দক্ষিণ কানাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 'বয়েজ হোম্'এর তৃতীয় বর্ষের কার্য-বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। জাতিবর্ণনির্বিশেষে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণের বিনাব্যয়ে উপযুক্ত আহার-বাসস্থান, পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের বন্দোবস্তসহ সুশিক্ষার ব্যবস্থা-উদ্দেশ্যে মাত্র তিন বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার জনপ্রিয়তা বেশ বাড়িয়াছে। ১৯৫৩ সালের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ উচ্চ শিক্ষারত ৯জন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০ জন, গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের ১ জন এবং কর্ণাটক পলিটেক্‌নিক্ বিদ্যালয়ের ১ জন—মোট ৩১ জন ছাত্র আশ্রমে ছিল। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিকল্পে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুসহস্রনাম ও ললিতসহস্রনাম আবৃত্তি শেখান হয়। আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত সাপ্তাহিক ধর্মক্লাস এবং অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি পালন করা হইয়াছিল। ছাত্রগণের সংখ্যাধিক্য অপেক্ষা গুণবিকাশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এই ছাত্রাবাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ইহার পরিচালনায় সন্তুষ্ট হইয়া আলোচ্য বর্ষে ২৫৫৫৲ টাকা এবং মাঙ্গালোর পৌর সমিতি ২৫০৲ টাকা দিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

(১) **পত্রাবলী** (প্রথম ভাগ)—**স্বামী** বিবেকানন্দ, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ;—৩০ খানি নূতন পত্র সংযোজিত হইয়াছে। মূল্য—৫৲; উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে—৪॥০ টাকা।

(২) **স্বামী তুরীয়ানন্দ**—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী-শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর (হরি মহারাজ) বিস্তারিত জীবন-কথা। পৃষ্ঠা—৩৪০ (ডবলক্রাউন ১৬ পেজি); মূল্য—৪৲

(৩) **প্রার্থনা ও সঙ্গীত**—স্বামী তেজসানন্দ সঙ্কলিত। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া) পৃষ্ঠা—৯১; মূল্য—১৲

ভগবদ্বিষয়ক সংস্কৃত ও বাঙলা স্তব-স্তুতি-ভজনাদি সম্বলিত সার্বজনীন প্রার্থনা ও সঙ্গীত পুস্তক। কয়েকটি কোরাস গানের স্বরলিপিও আছে। পুস্তকখানি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ উপযোগী হইবে।

(৪) **বিবেকানন্দ-বাণী** (অসমীয়া সংস্করণ)—অনুবাদক শ্রীমহাদেব শর্মা। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, শিলং (আসাম), পৃষ্ঠা—৭০; মূল্য—॥০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছে শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর শতবার্ষিকী জয়ন্তী – সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিগত ২৩শে এপ্রিল হইতে ১৫ই মে পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শত-বার্ষিকী জয়ন্তী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি স্থানের উৎসববিবরণী দেওয়া হইল।

(১) রাজকোট :—২৩শে হইতে ২৫শে এপ্রিল তিন দিন ব্যাপী রাজকোটে উৎসব হয়। ২৩শে তারিখের সভায় বক্তৃতা করেন স্বামী অবিনাশানন্দ, সৌরাষ্ট্রের অন্যতম মন্ত্রী দয়াশঙ্কর ভাই ডাভে, শ্রীহরকান্তভাই শুক্ল, শ্রীদিনুভাই মানকড়। ২৫শে মহিলা সভায় সভানেত্রী হন শ্রীমতী বীরমতী ত্রিবেদী এবং শ্রীশ্রীমার জীবনী ও বাণী লইয়া আলোচনা করেন শ্রীমতী নন্দিনীবেন কুন্তানী, অধ্যাপিকা সবিতাবেন সোলাঙ্কি।

(২) মোরভি :—২৭শে এপ্রিল শ্রীওয়াই জি মেরুর পরিচালনায় এবং স্বামী অবিনাশানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীনাথালাল ডাবে, শ্রীএ এন্ খন্না প্রভৃতি বিশিষ্ট বক্তার সমাবেশে মোরভির উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

(৩) সুরেন্দ্রনগর :—২৮শে এপ্রিল সুরেন্দ্র-নগরের উৎসব-সভায় সভাপতি ছিলেন শ্রীএস্ এম্ ডুডানি, আই-এ-এস্। বক্তাদের মধ্যে শ্রীলালুভাই আচার্য, এম্ এল্ এ, শ্রীচুনীলাল যাজনিক ও ও শ্রীকীরচন্দ্‌ভাই কোঠারীর নাম উল্লেখযোগ্য।

(৪) ভাবনগর :—২৯শে এবং ৩০শে এপ্রিল দুই দিন ব্যাপী ভাবনগরের উৎসব জনসাধারণের প্রাণে সাড়া আনিয়া দেয়।

(৫) ভেরাভল :—২রা মে ভজন ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে উৎসব সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

(৬) জুনাগড় :—৩রা মে শ্রীহরিপ্রসাদ ত্রিবেদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীশ্রীমার জীবনের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে বক্তৃতা দেন শ্রীপ্রভুলাল কে ডাভে এবং শ্রীপ্রেমচাঁদ সি মাণ্ডব্য।

(৭) পোরবন্দর :—৪ঠা মে অনুষ্ঠানে সভা-পতিত্ব করেন ব্যারিষ্টার শ্রীশিবসিংজী মেরুভা ঝালা।

(৮) জামনগর :—৫ই ও ৬ই মে দুই দিন জামনগরে উৎসব হয়। প্রথম দিনের সভায় সৌরাষ্ট্রের রাজপ্রমুখ জামসাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। দ্বিতীয় দিন বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে, বক্তৃতা দেন বিচারপতি শ্রীবালকৃষ্ণভাই ত্রিবেদী।

(৯) দ্বারকা :—৮ই মে দ্বারকায় মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান্ শ্রীশঙ্করলাল গান্ধীর পৌরো-হিত্যে একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(১০) ভুজ :—১০ই মে ভুজে উৎসব-উপলক্ষ্যে একটি মহিলা সভা হয়, সভানেত্রী হন শ্রীতারাবেন্ এস্ ঘাটগে। ১১ই মে কচ্ছের শাসনকর্তা শ্রীএস্ এ ঘাটগের পরিচালনায় সাধারণ সভার অনুষ্ঠান বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

(১১) মাণ্ডবী :—১২ই মে মাণ্ডবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়।

(১২) মুন্দ্রা :—১৩ই মে মুন্দ্রার উৎসবসভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় পৌরসভার অধ্যক্ষ।

(১৩) অন্‌জার :—১৪ই মে অন্‌জারে শ্রীশ্রীমায়ের পূজাদি ও শেঠ শ্রীমানসীভাই রাজার নেতৃত্বে একটি সভা হয়। অনুষ্ঠানান্তে পরিচালকবৃন্দ কাণ্ড্‌লাতে উৎসব-সভার আয়োজন করেন।

(১৪) গান্ধীধাম :—১৫ই মে গান্ধীধামে সাড়ম্বরে উৎসবের পর শতবার্ষিকী জয়ন্তীর নির্ধারিত কার্য-সূচীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইন্দ্রিয়সংযম

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥
বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ॥
ইন্দ্রিয়াণাম্ভ সর্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥
বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনূম্॥

মনুসংহিতা. ২।৯৩, ৯৭, ৯৯-১০০

ইন্দ্রিয়সমূহ যদি বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে তবে তাহার ফলে যে মানুষের নানা দোষ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে কেহ যদি দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারে তাহা হইলে চরিত্রে যে দৃঢ়তা আসে তাহা দ্বারা সে পরমা সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

বেদাধ্যয়নই বল, দান বা যজ্ঞই বল, অথবা ব্রত আর তপস্যাই বল কিছুই কিছু নয় যদি ইন্দ্রিয়লালসা প্রবল থাকে। নির্বাধ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা যাহার স্বভাবকে দুষ্ট করিয়া দিয়াছে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত।

ইন্দ্রিয়সংযমে যেন কোন আপস না থাকে। জলপূর্ণ চর্মপাত্রের কোন কোণে সামান্য একটি ছিদ্র থাকিলেও যেমন সেই ফুটা দিয়া সমস্ত জল বাহির হইয়া যায় সেইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তো কথাই নাই, একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ও যদি উচ্ছৃঙ্খল হয় তো সেই বিকারই মানুষের প্রজ্ঞা (সৎজ্ঞান) নষ্ট করিতে যথেষ্ট।

ইন্দ্রিয়সংযমই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। উপবাসাদি যোগ দ্বারা শরীরক্ষয় না করিয়া বরং ইন্দ্রিয়গ্রামকে যদি সংযত করিতে পার তাহা হইলে মনও শান্ত হইবে এবং সকল পুরুষার্থ সহজে সিদ্ধ করিতে পারিবে।

কথাপ্রসঙ্গে

অরণ্যে

অরণ্যে পথ হারাইয়াছি।

অসংখ্য বৃক্ষ-লতা-গুল্মাকীর্ণ ভয়াবহ অন্ধকারাবৃত হিংস্রজন্তুসমাকুল লোকপ্রসিদ্ধ অরণ্যে নয়, দুর্বোধ্য পদ এবং অসম্বদ্ধ বাক্যের দিগ্বলয়হীন জটিল শব্দারণ্যে। যে শব্দকে নানা দেশের নানা শাস্ত্রে স্বয়ং ভগবানের মহিমা দেওয়া হইয়াছে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া কত হিতকর তত্ত্ববিদ্যা, দর্শন, কত মনোহারী সাহিত্য, কাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে সেই শব্দই যখন অর্থ-উদ্দেশ্য-সঙ্গতি-মাধুর্যহারা হইয়া শুধু অসার আড়ম্বরের সৃষ্টি করে তখন উহা আর মানুষের ক্ষেমাস্পদ নয়, বরণীয় নয়—উহা তখন বিভীষিকা, শত অনর্থের সম্ভাবনার নিলয় 'অরণ্য'। লৌকিক অরণ্যে পথভ্রান্ত হইলে দেহের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে, শব্দারণ্যে যখন দিগ্‌ভ্রম হয় তখন মনকে, বুদ্ধিকে, হারাইতে বসি।

শব্দ দিয়া যে অরণ্য রচনা করা যায়, সেই অরণ্যে পথ হারাইয়া মানুষের ঘোরতর অনিষ্ট যে ঘটিতে পারে একথা প্রাচীনকালের মানব-মিত্রগণ জানিতেন। তাঁহাদের সতর্কতার বাণী অনেক পুরাতন পুঁথিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

"অনেক শব্দ লইয়া মাথা ঘামাইওনা, উহাতে লাভ তো শুধু বাগিন্দ্রিয়ের ক্লান্তি।" (রাজা জনকের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির উক্তি, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪।৪।২১) *

"নারদ।—কত তো পড়িলাম, ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ ইতিহাস পুরাণ ব্যাকরণ গণিত দৈববিদ্যা ভূবিদ্যা তর্কশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র নিরুক্ত শিক্ষা-কল্প-ছন্দ ভূততন্ত্র গারুড়তন্ত্র ধনুর্বেদ জ্যোতিষ নৃত্যগীতবাদ্যশিল্পবিজ্ঞান, কিন্তু কই, শান্তি তো হইল না। সত্যের সন্ধান তো পাইলাম না। শুধু কতকগুলি শব্দের বোঝা বহিয়া মরিতেছি।

সনৎকুমার।—হাঁ ঠিকই, যদ্বৈ কিঞ্চৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ,

নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ

—যাহা কিছু এত অধ্যয়ন করিয়াছ সবই কতকগুলি বুলি মাত্র।"

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৭।১।২,৩)

মুণ্ডক-উপনিষদের কথা মনে পড়ে—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, না মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন; "বহু শাস্ত্রপাঠের দ্বারা, নানা গ্রন্থের নানা ব্যাখ্যানশক্তি দ্বারা, অনেক শ্রবণের দ্বারা আত্ম-সত্যকে লাভ করা যায় না।" আবার আর এক স্থানে মুণ্ডক-উপনিষদের ঋষি ধমকাইয়া উঠিতেছেন, "মেলা কথা বলা ছাড়"—অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। আচার্যশঙ্কর খুলিয়াই বলিলেন,—

শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।
অতঃ প্রযত্নাজ্‌ জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাত্তত্ত্বমাত্মনঃ॥

(বিবেকচূড়ামণি, ৬০)

"বহু শব্দের আড়ম্বরযুক্ত শাস্ত্র মহারণ্যবিশেষ, উহা শুধু চিত্তকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া ঘুরাইয়া মারিবে। অতএব যথার্থ জিজ্ঞাসু হইয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে আত্মতত্ত্বের বিষয় জানিয়া লওয়া উচিত।"

তখন যাঁহারা শাস্ত্র লিখিতেন তাঁহাদের আন্তরিকতা ছিল, গভীরতা ছিল; যেটুকু লিখিতেন বুঝিয়া লিখিতেন, যে বিষয়ে নিজেদের পরিষ্কার ধারণা না থাকিত সে বিষয়ে বিদ্যা জাহির করিবার মূর্খতার কথা ভাবিতে পারিতেন না। কিন্তু তথাপি সেই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেও বুধজনদের কত সাবধান-বাণী! জলের প্রবাহ কোথায় কি আবর্ত সৃষ্টি করিতেছে কে জানে, হুশিয়ার হইয়া সাঁতার কাটা ভাল। শব্দের সম্ভার চলিয়াছে, কখন উহা অরণ্যের আকার ধারণ করে—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা নিরাপদ।

কিন্তু একালে? একালে তত্ত্বের খোঁজ বড় বেশী কেহ করে না—শব্দের সাজ দেখিয়াই সকলে খুশী। যে যত দুরধিগম্য শব্দ দিয়া যত বেশী অর্থহীন বাক্য

লিখিতে বা বলিতে পারিবে তাহার তত বিদগ্ধতা। সত্য একালে বিদূর—সমীপে, চারিপাশে শব্দেরই মেলা। শব্দারণ্যে আমরা পথ হারাইয়াছি।

সেকালে বড় দুঃখে ঋষি অষ্টাবক্র আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"নানা মহর্ষি, সাধু ও যোগীদের নানা মত শুনিয়া এবং কোনও মতের সহিত কোনও মতের মিল নাই দেখিয়া কাহার না মনে সাধুসন্তের ব্যাখান ও উপদেশের উপর বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়? কাহার না চুপচাপ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়?"[২] সেকালে—সেই ব্যাস-বশিষ্ঠ-কপিল-কণাদ-মনু-পরাশরের কালেও শব্দের দুর্গতির জন্য এত দুঃখ, এত লজ্জা, এত শঙ্কা! আর একালে? শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবই বলুন :—

"এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছলো। আচার্য হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তাঁর নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি, ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেমভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস ক'রে নিতে হবে। এই কথা শুনে অবাক। বেদে যাঁকে 'রসস্বরূপ' বলেছে তাঁকে কিনা নীরস বলে! এতে এই বোঝা যায় যে, ঈশ্বর যে কি জিনিস সে ব্যক্তি কখনও অনুভব করে নাই।

একজন বলেছিল, 'আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোঁড়া আছে!' এ কথায় বুঝতে হবে ঘোড়া আদবেই নাই, কেননা গোয়ালে ঘোড়া থাকে না।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১।৮।৪, ১।১০।৭)

সা রে গা মা পা ধা নি এই সাত এবং রে গা ধা নি কোমল এই চার—মোট এগারটি স্বর দিয়া সুদক্ষ গায়ক অসংখ্য রূপ ও আকৃতিতে সুরজাল বিস্তার করেন, সঙ্গীতবিজ্ঞানে উহা গৌরব। কাব্যে নাটকে লোকসাহিত্যে শব্দের বৈচিত্র্য ও প্রয়োগনৈপুণ্য বাঞ্ছনীয়, সমাদরণীয়। কিন্তু ধর্মালোচনায়, তত্ত্বোপদেশে শব্দ সম্বন্ধে সতর্কতা প্রয়োজন। এখানে বেশী কথা কওয়া, লম্বা ভারি কথা কওয়া গৌরব নয়, বিপদ—গহন অরণ্যের বিভীষিকা। সাময়িক ধর্মসাহিত্যে এই বিভীষিকা উত্তরোত্তর যেন বাড়িয়াই চলিতেছে। উপদেষ্টা কি যে বলিতে চান, শ্রোতাকে কোথায় যে লইয়া যাইতে চান তাহা অনেক সময়েই যেন বুঝিয়া উঠা যায় না। যেন মনে হয়,—অরণ্যে পথ হারাইয়াছি—শব্দারণ্যে।

দুটি একটি নমুনা—

"দেহ শুদ্ধ না হইলে দেহকে মুক্ত করা যায় না। জীবন্মুক্ত অবস্থা হইতে পারে, কিন্তু পরব্রহ্মলাভ ঘটে না। অর্থাৎ মাতৃঋণ শোধ হয় না, মায়াপাশ ছিন্ন হয় না এবং পঞ্চতত্ত্বের স্বাভাবিক আকর্ষণ অটুট থাকে। এই জন্য সোঽহং ভাব জাগে না।"

* * *

"সৃষ্টি স্ত্রীলিঙ্গ, ইহা পৃথ্বীস্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ডের এক দেশ সৃষ্টি। সৃষ্টির বাহিরেও ব্রহ্মাণ্ড আছে। রজঃ সৃষ্টিরূপী স্ত্রীলিঙ্গ। সত্ত্ব—বালরূপ নপুংস লিঙ্গ। তমঃ—পুংলিঙ্গ। অষ্টধাতুতে সৃষ্টি হয়—তাই আট দিক্ ও আট দিক্‌পাল। আকাশে প্রথমে নক্ষত্র, তাহার উর্ধ্বে চন্দ্র, তাহার উর্ধ্বে সূর্য। নক্ষত্র সব মুক্ত আত্মা, জ্যোতিরূপ ইহারা জীবন্মুক্ত পুরুষ। নক্ষত্র খসিয়া পড়ে, মানে আত্মা পৃথিবীতে পতিত হয়। পড়িবার সময় সূক্ষ্ম বায়ু-স্তর পর্যন্ত জ্যোতিরেখা যায়, পরে স্থূল পার্থিব বায়ুমণ্ডলে আসিয়া অন্ধকারে মিশিয়া যায়।"

* * *

"রাত্রে অধিকাংশ মনুষ্য ঘুমাইয়া পড়ে—তাহাদের তেজঃ নক্ষত্রমণ্ডলে যায় ও নক্ষত্রের সহিত কথাবার্তা বলে। ইহাই স্বপ্নাবস্থা। তাই রাত্রে নক্ষত্র এত উজ্জ্বল দেখায়—তেজে তেজ মিলিত হয়। রাত্রি ১২টার পরে প্রায় কেহ জাগিয়া থাকে না, তাই তখন নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল দেখায়। মানুষ জাগিয়া উঠিলে আপন আপন জ্যোতি বা প্রাণ আকর্ষণ করিয়া লয়, তখন নক্ষত্র ম্লান হইয়া পড়ে। এক আত্মারই মুক্ত বিন্দু উর্ধ্বে তারারূপে ও বদ্ধ বিন্দু অধোদিকে নানা প্রকার বদ্ধজীব রূপে বিভিন্ন যোনিতে খেলা করে।"

আধ্যাত্মিক সত্যের জগতে যত সরল পথে অগ্রসর হওয়া যায় ততই মানুষের পক্ষে মঙ্গল। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষরা যুগে যুগে মানুষকে সহজ সরল পথেরই সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। আজ যদি মানুষের বুদ্ধি নানা স্বয়ংসিদ্ধ 'দ্রষ্টার' আবিষ্কৃত বহু জটিল

২ নানামতং মহর্ষীণাং সাধূনাং যোগিনাং তথা।
দৃষ্টা নির্বেদমাপন্নঃ কো ন শাম্যতি মানবঃ॥

(অষ্টাবক্রসংহিতা, ৯।৫)

শব্দ এবং তাক্-লাগানো কল্পনায় দিশাহারা হইতে থাকে তাহা হইলে 'হে ঈশ্বর, আমার বন্ধুদের হাত হইতে আমাকে বাঁচাও' যীশুখ্রীষ্টের এই প্রসিদ্ধ প্রার্থনার অনুকরণে আমরাও যেন প্রার্থনা করি—'হে সত্যস্বরূপ ভগবান, শব্দের উৎপীড়ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।'

কাঠগড়ায় ব্রাহ্মণ

আচার্য যদুনাথ সরকার কিছুকাল পূর্বে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় 'হিন্দু একতা কি স্বপ্ন?' (Hindu Unity—a dream?) নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের বহুবিধ বিচ্ছিন্নতার মূলে উচ্চতর বর্ণের গর্ব ও অত্যাচার কতটা দায়ী তাহা ঐতিহাসিকদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিবার সময় লেখক এক জায়গায় বলিয়াছেন—

"বস্তুতঃ, আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যাঁহারা জাতিভেদ-প্রথাকে ভগবানের অপরিবর্তনীয় বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়া উহাতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রহিয়াছেন—তাঁহারাই হইতেছেন হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু।"

কথাগুলি বড়ই রূঢ়। কত গভীর দুঃখে অশীতিবর্ষপ্রায় মনীষী ঐতিহাসিকের কলম দিয়া এই কঠিন কথাগুলি বাহির হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুধর্মের বিকাশ ও সংরক্ষণে ব্রাহ্মণের অবদান কি তাহা বহুশ্রুত প্রবীণ অধ্যাপক ভাল করিয়াই জানেন, কিন্তু প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ্যের সেই গৌরবের দিক্‌টি একরূপ অনুক্তই রহিয়াছে। আমাদের মনে হয়, তাহাতে প্রগতিশীল আধুনিক পাঠক-পাঠিকাগণকে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটি আংশিক এবং ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবার সুযোগ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার ফল শুভ নয়। স্বামী বিবেকানন্দও ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কঠিন কথা বলিয়াছিলেন—কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের মহিমা বার বার তিনি উচ্চকণ্ঠে খ্যাপন করিতে ভুলেন নাই।

"ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণত্বই যে মানুষের আদর্শ তাহা শঙ্করাচার্য তাঁহার গীতাভাষ্যের প্রারম্ভে অতি চমৎকারভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ অবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল ব্রাহ্মণ্যের সংরক্ষণ ও প্রচার করিবার জন্য। ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠজন, ব্রহ্মবিৎ, পূর্ণ আদর্শপুরুষ এই ব্রাহ্মণকে অবশ্যই থাকিতে হইবে। তাঁহাকে কিছুতেই হারানো যায় না। জাতিপ্রথার সমস্ত গলদ সত্ত্বেও আজ আমরা জানি যে ব্রাহ্মণদিগকে এই গৌরব আমাদিগকে দিতে অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অন্যান্য জাতির তুলনায় তাঁহাদেরই মধ্য হইতে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বসম্পন্ন বহুতর লোকের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা তো সত্য কথা। আমরা নির্ভীকভাবে এবং নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদের দোষগুলি নির্দেশ করিব কিন্তু তাঁহাদের প্রাপ্য যে কৃতিত্ব তাহাও নিশ্চিতই তাঁহাদিগকে দিতে হইবে।

ব্রাহ্মণকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবার সময় বিচারকগণ স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিলে হিন্দুধর্মের কল্যাণ হইবে। তামিলনাদে দ্রাবিড় সংস্কৃতির এখন বিজয়ভেরী বাজিতেছে। ব্রাহ্মণ সেখানে ক্রমশই কোনঠাসা হইয়া পড়িতেছেন। ভারতীয় জাতির একতানতা এবং বলিষ্ঠতার দিক দিয়া ইহা শুভ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'গোরা' উপন্যাসে বিনয়ের মুখ দিয়া ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ, যার ভয় নেই, লোভকে যে ঘৃণা করে, দুঃখকে যে জয় করে, অভাবকে যে লক্ষ্য করে না, যে পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ, যে অটল, যে শান্ত, যে মুক্ত—সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ চায়—সেই ব্রাহ্মণকে যথার্থভাবে পেলে তবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। আমাদের সমাজের প্রত্যেক বিভাগকে, প্রত্যেক কর্মকে সর্বদাই একটি মুক্তির সুর জোগাবার জন্যেই ব্রাহ্মণকে চাই—রাঁধবার জন্য এবং ঘণ্টা নাড়বার জন্যে নয়—সমাজের সার্থকতাকে সমাজের চোখের সামনে সর্বদা প্রত্যক্ষ করে রাখবার জন্যে ব্রাহ্মণকে চাই। এই ব্রাহ্মণের আদর্শকে আমরা যত বড়ো করে অনুভব করব, ব্রাহ্মণের সম্মানকে তত বড়ো করে তুলতে হবে। সে সম্মান রাজার সম্মানের চেয়ে অনেক বেশি। এ দেশে ব্রাহ্মণ যখন সেই সম্মানের যথার্থ অধিকারী হবে, তখন এ দেশকে কেউ অপমানিত করতে পারবে না।"

ব্রাহ্মণত্বের আদর্শটিকে অব্যাহত ও সক্রিয় রাখিয়া উহার কদর্থ এবং অপব্যবহারকে কি করিয়া দূর করা যায় ইহারই দিকে এখন মনোযোগ দেওয়া

বিধেয়। প্রাচীন সংকীর্ণতা গোঁড়ামি প্রভৃতি দূর করিয়া নূতন সমাজ অবশ্যই গড়িতে হইবে—কিন্তু সেই গঠনের জন্য কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণের উপর যেন প্রাণদণ্ডাদেশবিধান না করিয়া বসি।

প্রণিধানের বিষয়

গত ১০ই অক্টোবর নয়াদিল্লীর হিন্দু মহাসভা-ভবনে 'ইউনাইটেড্ চার্চ অব নর্দার্‌ন্ ইণ্ডিয়া'র ধর্মযাজক রেভারেণ্ড স্যামুয়েল সপরিবারে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিবার সময় যে উক্তি করিয়াছেন (দৈনিক বসুমতী, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৪) তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানের বিষয়।'

"রেভাঃ স্যামুয়েল হিন্দুধর্ম গ্রহণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁহার পিতামহ খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মিশনারী স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করিয়া ধর্মযাজকের ব্রত গ্রহণ করেন। তিনিও মিশনারী স্কুলে পড়াশুনা করিয়া ধর্মযাজক হন এবং বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়ান। এই সময়ে তিনি বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁহাকে হিন্দুধর্মের খারাপ দিকগুলি দেখান হয় এবং হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার মনে বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

অতঃপর তিনি বলেন যে, এই সময়ে তাঁহাকে বিভিন্ন হিন্দু প্রতিষ্ঠান বিশেষ করিয়া আর্যসমাজের বিরোধীদের সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহাদের যুক্তিতর্কের জবাব দিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া 'সত্যার্থ প্রকাশ' ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য পড়িতে হয়। ফলে তিনি হিন্দুধর্মের উজ্জ্বল দিকগুলির সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু হরিজনদের খ্রীষ্টান করিয়া তিনি তাঁহাদের আদৌ কোন মঙ্গল করিতেছেন না। তিনি বুঝিতে পারেন যে, খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের ফলে লোকের মন হইতে জাতীয় মনোভাব দূর হইয়া যায়। রেভঃ স্যাময়েল বলেন, দীর্ঘ দিনের মিশনারী জীবন যাপনের পর আমি ঘোষণা করিতেছি, বিদেশী মিশনারীরা দেশের জাতীয়তা-বিরোধী শক্তি।"

এদেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের পশ্চাতে অনেক কলঙ্কের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজও যেমন সেই কলঙ্কের ভাগী, বৈদেশিকরাজশক্তি-পরিপুষ্ট খ্রীষ্টান মিশনারীরাও তদ্রূপ তাহার অংশীদার। এই ইতিহাসকে চাপা দিয়া কোন লাভ নাই। হিন্দুসমাজকে নিজেদের বিগত ভুল ভ্রান্তিগুলি সম্বন্ধে এখন পূর্ণভাবে সচেতন হইতে হইবে। কিছুদিন পূর্বে লোকসভায় ডক্টর কাটজু হিসাব দিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরীকরণের পরিমাণ নাকি পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কি করিয়া ইহা সম্ভবপর হয় তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। দেখিতে পাই, ভারতীয় খ্রীষ্টানসমাজের কেহ কেহ মাঝে মাঝে অনেক যুক্তিতর্ক বিন্যাস করিয়া সংবাদপত্রে লিখিয়া থাকেন যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা যদি বাড়ে তো হিন্দুদের চিৎকার করিবার কি আছে। খ্রীষ্টান থাকিয়াও তো ভারতীয় থাকা যায় যথা অমুক বিখ্যাত অধ্যাপক, অমুক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ইত্যাদি। তাঁহারা ইংরেজ রাজত্বের সময় এত খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ করিতে ভরসা পাইতেন না। এখন 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রে পাইতেছেন। যাহা হউক রেভারেণ্ড স্যামুয়েলের উপরোক্ত উক্তিই তাঁহাদের প্রকৃষ্ট জবাব। ভারতবর্ষে পাশাপাশি বহু ধর্মের লোক বাস করিয়া আসিয়াছে, ইহা কিছু নূতন কথা নয়, হিন্দুধর্মের গভীর উদারতার জন্যই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু যাহাদিগকে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ খ্রীষ্টধর্মে আনয়ন করেন তাহাদের মনে যে হিন্দুর দেবদেবী মন্দির উপাসনা শাস্ত্র সমাজের উপর একটি ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ উপ্ত হয় এবং তাহা দ্বারা ভারতের জাতীয় সংহতি শিথিল হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য খ্রীষ্টান পাদ্রীগণের ধর্মান্তরীকরণ চেষ্টা সর্বপ্রযত্নে বন্ধ হওয়া আবশ্যক।

"যে শিক্ষার দ্বারা ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি স্মৃতি

স্বামী শান্তানন্দ

১৯০৪ সালের কথা। পূজনীয় জিতেন মহারাজ (স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী) ও আমি মাঝে মাঝে বালিতে খেয়াপার হয়ে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হতাম। পঞ্চবটীতে অথবা ঠাকুরের ঘরে আমাদের রাত্রিযাপন হত। রামলাল দাদা মা কালীর লুচিপায়েস প্রসাদ যা পেতেন তা থেকে কিছু কিছু আমাদের দিতেন। তাতেই কোনও রকমে আমাদের হয়ে যেত। পরদিন থাকত সাধারণতঃ রবিবার। দুপুরে মা কালীর প্রসাদ পেয়ে বিকালে আমরা বাড়ী ফিরে যেতাম। রামলালদাদা একদিন বল্লেন, তিনি কামারপুকুরে যাবেন। ঠাকুরের জন্মস্থান আমরা কখনও দেখিনি, দেখবার খুবই ইচ্ছা ছিল। আমরা বল্লাম, "তবে আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।" যাওয়ার দিন স্থির হল। যাত্রার পূর্বদিন রাত্রে আমরা দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের ঘরে রাত কাটালাম। কিন্তু অনিবার্য কি এক কারণে সেবারে রামলালদাদার কামারপুকুর রওনা হওয়া সম্ভব হল না। পরদিন সকালে রামলালদাদা কি একটা জিনিস পৌঁছে দেবার জন্য আমাকে বরানগরে মহেন্দ্র কবিরাজের নিকট পাঠালেন। মহেন্দ্রবাবুর পূর্বে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত ছিল। বাড়ীতে পৌছলে মহেন্দ্রবাবু আমাকে তাঁর ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন, ঠাকুরঘরে প্রবেশ ক'রে সেখানে ঠাকুরের পার্শ্বে মাকে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ইনি কে?" ইতিপূর্বে মায়ের ছবি আমি কোথাও দেখিনি বা তাঁর কথাও কোথাও শুনিনি। মহেন্দ্রবাবু বল্লেন, "ইনি আমাদের মা।" প্রশ্ন করলাম, "ইনি কি জীবিতা আছেন? থাকলে কোথায় এখন আছেন?" মহেন্দ্রবাবু বল্লেন, "জয়রামবাটীতে আছেন।" রাত্রে ঠাকুরের ঘরে স্বপ্নে মাকেই দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু 'মা' বলে তখন জানতাম না। স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তির সঙ্গে মায়ের ছবিখানি অবিকল মিলে যাওয়ায় আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝতে পারলাম।

এর পর থেকেই মাকে চাক্ষুষ দেখবার জন্য মন খুব ব্যাকুল হতে লাগল। কিছুকাল পরে আমরা উভয়ে জয়রামবাটী ও কামারপুকুর যাব মনস্থ করে দিন স্থির করলাম। ট্রেনে বর্ধমান, সেখান থেকে গরুর গাড়ীতে উচালন এবং সেখানে রাত্রিযাপন ক'রে পরদিন বেলা প্রায় এগারটার সময় কামারপুকুর পৌছলাম। কামারপুকুরে তখন লক্ষ্মীদিদি থাকতেন। তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আমরা পূর্ব থেকেই চিনতাম। আমাদের পেয়ে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন, পরিতোষ ক'রে দুপুরে শ্রীশ্রীরঘুবীরের প্রসাদ খাওয়ালেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের জানাশুনা বেশ ঘনিষ্ঠই ছিল। তাই সন্ধ্যেবেলা তিনি সংকোচ না ক'রে ঠাকুরের ঘরে বৃন্দে সেজে পায়ে ঘুঙুর পরে শ্রীকৃষ্ণলীলার অনেক অংশ অভিনয় ক'রে দেখালেন। আমাদের খুব আনন্দ হল।

লক্ষ্মীদিদির নিকট বিদায় নিয়ে পরদিন সকালে ন'টা নাগাদ আমরা জয়রামবাটীতে উপস্থিত হলাম। মা তখন প্রসন্নমামার পুরান ঘরের দাওয়ায় রান্না করছিলেন। যতদূর মনে পড়ে আমরা আলাদা আলাদা এক এক জন ক'রে দর্শন করতে তাঁর কাছে গেলাম। আমি যেতে মা আমার সঙ্গে পূর্বপরিচিতের ন্যায় আলাপ করতে লাগলেন এবং অনেককাল পরে নিজের ছেলেকে কাছে পেলে যেমন আনন্দ হয়, মা ঠিক সেরূপ আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। কী যে স্নেহমাখা স্বরে তিনি আলাপ করলেন তার

আর তুলনা মেলে না। আমরা মায়ের জন্য একটি কাপড় এবং বর্ধমান থেকে কিছু মিহিদানা নিয়ে গিয়েছিলাম। মা খুব আনন্দের সঙ্গে সেসব গ্রহণ করলেন। পথের অনিয়মে এই সময় আমার পেটের অসুখ হল। অসুখ শুনে মা পরদিন সকালে কি টোটকা ওষুধের ব্যবস্থা করলেন এবং খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধেও বাচবিচার করলেন। আমি শীঘ্রই সেরে গেলাম।

পূজনীয় জিতেন মহারাজ মার কাছে দীক্ষা নেবেন এরূপ সংকল্প নিয়েই জয়রামবাটী গিয়েছিলেন। আমার কিন্তু মাকে দর্শন করার ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোনও অভিপ্রায় ছিল না। মা একদিন আমাকে বল্লেন, "তোমার দীক্ষা হয়েছে ?" বল্লাম "না।" জিজ্ঞাসা করলেন, "দীক্ষা নেবে ?" বল্লাম "ওকথা জানি না, ভাবিওনি।" মা বল্লেন, "তবে নাও।" পরদিন সকালে পূজার ঘরে পূজার পর মা আমায় মন্ত্র দিলেন। আনন্দে শরীরটি যেন অন্যরকম হয়ে গেল। পূজনীয় জিতেন মহারাজকেও মা ঐদিনই দীক্ষা দিয়েছিলেন। দীক্ষান্তে আর কয়েকদিন জয়রামবাটীতে বাস করে, এবং তারকেশ্বরে তারকনাথকে দর্শন ক'রে আমরা সেবার দেশে ফিরলাম।

কিছুদিন পরে গৃহত্যাগের জন্য বড় অস্থির হয়ে পড়লাম। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পঞ্চবটী থেকে ফিরে এসে ঠাকুরের ঘরটিতে বসেছি। এই সময় কলিকাতার সিদ্ধেশরী-মন্দিরের কাছে একজন তান্ত্রিক থাকতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আসতেন, লোকে তাঁকে বাক্‌সিদ্ধ বলে মনে করত। ঠাকুরের ঘরের সামনে দক্ষিণপূর্ব বারান্দায় সেদিন তিনি বসেছিলেন। রামলালদাদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ছেলেটি ঘরবাড়ী ছেড়ে সাধু হবে মনে করছে ; ভাল হবে কিনা বলুন তো ?" তিনি বল্লেন, "না, ওর সাধু হওয়া ভাল নয়।" আমাকে লক্ষ্য করে রামলালদাদা বল্লেন—"ওহে কী বলছে, শুনছ ?" আমি শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। চিন্তিত হয়ে একদিন কালীঘাটে গেলাম—মায়ের আদেশের জন্য বসে রইলাম। অনেক রাতে মনে কিরূপে একদৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে—বাড়ী ছেড়ে সাধু হবার সময় হয়েছে। মনে আর কোনও সংশয় রইল না। অতঃপর একদিন আমরা তিন-জনে (আমি, পূজনীয় জিতেন মহারাজ ও স্বামী গিরিজানন্দ) পঞ্চবটীতে মিলিত হয়ে জয়রামবাটী যাওয়ার দিন স্থির করলাম।

জয়রামবাটী পৌছে মাকে সাধু হবার অভিপ্রায় নিবেদন করলাম। তাই শুনে মা আমাদিগকে বাড়ীর বিষয় সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—বাড়ীতে কে কে আছে, সাধু হলে কোনও অসুবিধা হবে কিনা ইত্যাদি। আমাদের উত্তর শুনে সেদিন তিনি কোনও মতামত প্রকাশ করলেন না। বল্লেন, "কাল সব বলব।" 'মা কি বলেন'—এই আশা আগ্রহ ও উদ্বেগ নিয়ে আমরা রাতটা কাটালাম। রাত্রি প্রভাতে আমাদের সে চিন্তা দূর হল। নাপিত ডাকিয়ে, মা আমাদের মস্তক মুণ্ডন করতে বল্লেন এবং কাপড় চাদর গেরুয়ায় রং করার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সমাপনান্তে তাঁর নিকট প্রার্থনা ক'রে স্বহস্তে আমাদের তিনজনকে গেরুয়া কাপড় দিলেন, আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন "ঠাকুর তোমাদের সন্ন্যাস রক্ষা করুন।" আর বল্লেন "সাধুদের কার কি সন্ন্যাস নাম আছে আমার সব জানা নাই। তোমরা ৺কাশী গিয়ে তারকের (স্বামী শিবানন্দ মহারাজ) নিকট হ'তে নাম নিও, আমি পত্র লিখে দিচ্ছি। (এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থের পৃঃ ৪২৯-৩০ দ্রষ্টব্য)

১৯০৯ সালে মাকে দেখবার জন্য কাশী থেকে আমি উদ্বোধনে এলাম। 'উদ্বোধনের' বাড়ী তখন নূতন তৈরী হয়েছে। মাত্র দিন পনের হল মা ঐ

বাড়ীতে এসেছেন। এসে শুনলাম মায়ের বসন্ত হয়েছিল এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। পূজনীয় শরৎ মহারাজ তাই আমার বল্লেন—"দূর থেকে মাকে প্রণাম ক'রে এসো।" সেরূপভাবেই আমি প্রণাম করলাম। কিন্তু মা যখন বল্লেন 'আমার পায়ের কাপড়টা একটু তুলে দাও তো', তখন আর পূজনীয় শরৎ মহারাজের কথা রাখতে পারলুম না। প্রসঙ্গক্রমে মা বল্লেন—"তোমাদের সেবার (কাশী) যাবার পর আমি ভাবতাম ছেলেরা কোথায় গেল, খেতেটেতে পাচ্ছে কিনা। সেজন্যে ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে বলতাম ঠাকুর, তুমি ওদের দেখো আর চারটি চারটি খেতে দিও।"

কিছুদিন পরে মা সেরে উঠলে পূজনীয় শরৎ মহারাজ আমাকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করালেন। মায়ের শরীর দুর্বল বলে আমরা ঠাকুরঘরের মেজে মুছে দিতে চাইতাম। 'না, না, আমিই পারব' বলে মা কিন্তু করতে দিতেন না। তাই ফল ছাড়ান, পুষ্পপাত্র সাজান ইত্যাদি অবশিষ্ট কাজ আমরা কিছু কিছু করে দিতাম। ঠাকুরের সেবার কাজ যতটা সাধ্যে কুলায় ততটা মা নিজেই করতেন; অপরের সাহায্য পারতপক্ষে নিতেন না। ভক্তদের প্রণাম করান, তাদের প্রসাদ বিতরণ করান এসব কাজের ভার তখন ছিল আমার উপর। সাধারণতঃ শনিমঙ্গল বারের বিকালে ভক্তরা মাকে প্রণাম করতে যেতেন। সমস্ত শরীর চাদরে মুড়ি দিয়ে শুধু পা'দুটি বের ক'রে ঠাকুরের দিকে মুখ ক'রে মা তক্তাপোশখানির উপর বসতেন। গরম হলে কেউ এসময় তাঁকে হাওয়া করত। কোনও ভক্তের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তিনি সবার শেষে প্রণাম করতেন। প্রশ্নকর্তা মেয়ে হলে অথবা বালক ভক্ত হলে মা ঘোমটা তুলে তাদের সঙ্গে কথা কইতেন অন্যদের বেলা ঘোমটা দিয়েই অনুচ্চস্বরে উত্তর দিতেন। প্রয়োজনমত একটু জোর গলায় মায়ের উত্তরটি উচ্চারণ ক'রে আমরা জিজ্ঞাসুকে শুনিয়ে দিতাম। প্রণামের পর ভক্তরা নীচে গিয়ে বসতেন—আমরা তাঁদের প্রসাদ দিতাম, দর্শনার্থীর তুলনায় একদিন প্রসাদ ছিল কম। আমি বল্লাম, "প্রসাদ তো! একটু একটু ক'রে দিলে এতেই কুলিয়ে যাবে।" মা বল্লেন, "না না, আগে পেটে খেলে তবে তো শ্রদ্ধাভক্তি হবে। তুমি বাজার থেকে মিষ্টি কিনে আন। আমি প্রসাদ ক'রে দিচ্ছি।" তাঁর কথায় মিষ্টি আনা হল। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়ে প্রসাদ ক'রে দিলে সে মিষ্টি যথারীতি ভক্তদের বিতরণ করা হল।

* * *

একদিন খুব দূর (সম্ভবতঃ শিলং) থেকে এক ভক্ত এসেছেন মাকে দর্শন করবার জন্য। মা তখন সবেমাত্র তেল মেখেছেন। গঙ্গায় নাইতে যাবেন। দূর থেকে এসেছেন ভেবে পূজনীয় শরৎ মহারাজ বল্লেন—"নিয়ে যাও; দূর থেকে প্রণাম করিয়ে আনবে। তেল মেখেছেন কাজেই পাদস্পর্শ না করে যেন।" ভক্তটি কিন্তু প্রণাম করতে গিয়ে দুহাতে মায়ের পা'দুটি জড়িয়ে ধরল। বলতে লাগল—"মা, আমার কী হবে; আমায় কৃপা করুন" ইত্যাদি। "হ্যাঁ হবে" "হ্যাঁ হবে" মা বার বার এরূপ প্রবোধ দিতে থাকলেও ভক্তটি সহজে পা ছাড়লেন না। আমিও বল্লাম—"মা তেল মেখেছেন; স্নানে যাবেন দেরি হয়ে যাচ্ছে" ইত্যাদি। কিন্তু কার কথা কে শুনে! অনেক প্রবোধ দেবার পর ভক্তটি তখন মার পা ছাড়ল। স্নানে যেতে অনেক দেরি হয়ে গেল। পূজনীয় শরৎ মহারাজ আনুপূর্বিক সব কথা শুনে বল্লেন—"মায়ের অসুবিধা হচ্ছিল, তুমি জোর করে পা ছাড়িয়ে দিলে না কেন।" মনে মনে ভাবলাম—অসুবিধা তো হচ্ছিল কিন্তু ভক্ত-ভগবানের ব্যাপার আমিই বা কি বুঝব।

* * *

১৫।১৬ বছরের একটি ছেলে বাড়ী ছেড়ে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে পালিয়ে আসে। ছেলেটির

বাড়ী মেদিনীপুরে। কিছুদিন পরে ছেলটিকে ফিরিয়ে নেবার জন্য তাঁর বাবাও যোগোদ্যানে যায়। যোগোদ্যানের যোগবিনোদ মহারাজ বাপ ছেলে দু'জনকেই মাকে দর্শন করবার জন্য উদ্বোধনে পাঠিয়ে দেন। মা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"পালিয়ে পালিয়ে এস কেন?" ছেলেট বল্লে—"আমাদের পাড়ায় মাঝে মাঝে সংকীর্তন হয়। কীর্তন করতে করতে আমি ঠাকুরকে দেখতে পাই আর অচৈতন্য হয়ে পড়ি। সেই অচৈতন্য অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকি। বাবা তাই আমায় মারেন! সেজন্যই পালিয়ে আসি।" মা সেকথা শুনে তার বাবাকে ধমক দিলেন;—বল্লেন—"তোমাদের কুলে এমন ছেলে জন্মেছে, তোমরা ধন্য। এমন ছেলেকে তোমরা মার?"

* * *

একদল বৈষ্ণবভক্ত গান শুনাবেন বলে উদ্বোধনে এসেছেন। নীচে পূজনীয় শরৎ মহারাজের ঘরে গান (কীর্তন) আরম্ভ হল। মা উপরে দোতালার বারন্দায় বসে গান শুনছেন—সঙ্গে অন্য মহিলারা। গানের আসরে পূজনীয় শরৎ মহারাজ রয়েছেন, আমরাও আছি। গান যখন বেশ জমে উঠেছে তখন গায়কদের কেউ কেউ ভাবে বিহ্বল হয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে জড়িয়ে ধরল। পূজনীয় শরৎ মহারাজ আদৌ বিচলিত হলেন না; কথাবার্তা কিছুই বল্লেন না। পূর্বের মত নির্বিকার হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে ভাবের উপশম হল। কীর্তন শেষ হলে মাকে বল্লাম—"মা ওদের ভাবটাব যা হয়েছিল সেসব কি ঠিকঠিক?" মা কিন্তু তাতে গুরুত্ব দেননি। বল্লেন, "সংসারী লোক একটু ভাব চাপতে পারে না; সহজে বিহ্বল হয়ে পড়ে! ওসব কিছু নয়!"

* * *

১৯১২ সাল। কাশীতে কিরণবাবুদের নবনির্মিত বাড়ীতে মা অবস্থান করছেন। সঙ্গে অন্যদের মধ্যে দেবব্রত মহারাজও (পরে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) রয়েছেন। একদিন খবর এল দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জকে মারবার জন্য বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে তবে তাঁর কিছু হয়নি। মা শুনে বল্লেন—"ওতো ভালমানুষ, ওকে আবার বোমা মারা কেন?" কিছুক্ষণ পরেই আবার খবর এল পূর্বে বোমার মামলার সঙ্গে যারা যারা জড়িত ছিল তাদের তলব করা হচ্ছে। পুলিস দেবব্রত মহারাজকে (ইনিও পূর্বে বোমার মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন) অনুসন্ধান করছে। সকলেই এ সংবাদে ভয় পেলেন মহারাজরা তক্ষুনি দেবব্রত মহারাজকে অন্যত্র চলে যেতে বল্লেন। ঘটনা যতই গুরুতর হোক না কেন মা কখনও ভয় পেতেন না। এ সমাচার শুনেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। বরং দৃঢ়ভাবে বল্লেন—"কী হয়েছে? ওতো এখন কিছু করে না। এরা সব ভয় পাচ্ছে কেন?" দেবব্রত মহারাজ কিন্তু অপরের অসুবিধা হবে আশঙ্কা করে সিমলায় তাঁর ভাইয়ের কাছে চলে গেলেন।

শ্রীশ্রীমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "যাদের দীক্ষাগুরু ও সন্ন্যাস-গুরু ভিন্ন তারা কাকে ধ্যান করবে?"

শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন,—দীক্ষাগুরুই গুরু। দীক্ষা থেকে জ্ঞানবৈরাগ্য হয়ে সন্ন্যাস হয়। দীক্ষাগুরুকেই ধ্যান করবে।"

"তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল; তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিনে

শ্রীশৈলেশ

(শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে লিখিত)

ওগো মা জননী,
বিশ্ববন্দ্যা, শুভংকরী, স্নেহময়ী ত্রিলোক-পালিনী।
তমোঘন বিশ্বমাঝে অভ্যুদিতা করপুট
প্রেমময়ী ক্ষমা,
হে বিশ্বজননী আজি তব শত জন্মদিন
অয়ি মনোরমা!
নব জ্ঞানবার্তা লয়ে একদিন এ শুভ লগনে
এসেছিলে নেমে।

তব জন্মগ্রাম
কুসুমিত বনানীর তরুচ্ছায়ে হেরি অভিরাম!
কোকিলের কুহুরবে, শিখি-কেকা-ধ্বনি-স্বনে
আনন্দ স্পন্দনে,
কম্পমান আম্রতরু সৌরভবিহ্বল রাতে
তোমারে আহ্বানে;
তব লাগি কুঞ্জদ্বার মুক্ত আজো। বসন্ত পঞ্চমে
অলি গুঞ্জরণে।

আজো যেন শুনি
তব জন্মদিবসের হিল্লোলিত মহামৌন ধ্বনি।
কুললক্ষ্মী-মুখশ্বাসে কুটীরে কুটীরে ওঠে
শঙ্খের মূর্ছনা,
মুখর ভবনে আঁকা বরণ-ডালির পরে
ছন্দে আলিপনা,
হেমন্তে হৈমন্তী নৃত্য নর্মচিত্তে লাগিছে দোলন,
প্রাণের স্পন্দন।

ওগো মা জননী
বিশ্বমাঝে বরাভয় লয়ে তুমি যবে এলে নামি
জাগিয়া উঠিল আশা, রুদ্ধ প্রাণ পেল ভাষা
সারা বিশ্ব ভরি,
পাপীতাপী আর্তজনে অভাগা আলয়হীনে
লভে প্রাণ ফিরি'।
মৃত প্রাণে এল ফিরে ছন্দোময় প্রাণের প্রবাহ
সুখশান্তিবহ।

তোমার আলোকে
উচ্ছ্বসি উঠিল মন্দ্রি অগ্নিপ্রভা দারুণ ঝলকে!
তব জ্যোতিঃপ্রভাখানি দুর্বার প্লাবন স্রোতে
ধ্বংস করি তমঃ,
রিক্ত করি দিল তারে বৈরাগী আশ্বিনালোকে
তোমা নমোনমঃ।
অলোকচুম্বন তুমি আঁকি দিলে পৃথিবীর ভালে
জীবনের তালে।

ওগো জ্যোতির্ময়ী,
সারা বিশ্ব যাপিয়াছে কত যুগ তব পথ চাহি'
আরক্ত নয়নে ঊষা নিত্য মেলিয়াছে আঁখি
চাহি তব পথ,
রক্ত অবগুণ্ঠনেতে করিয়াছে অন্তরাল
সায়ন্তনী রথ,
দেব, ঋষি, মহারাজ সর্ব ত্যজি করিল সাধন
চাহি আগমন।

ওগো মা, জননী
সে সবার প্রার্থনায় এই দিনে আসিয়াছ নামি
জীবনে জীবনে ডাক দিয়ে দিয়ে বারংবার
দিলে পরিচয়;
গীতহীনা রাত্রিটিরে চিরমুখরিত করি
করেছ অক্ষয়
এই ক্ষণে তাই হেরি সবে ফিরে চায়
শিহরিত কায়।

সেই পরিচয়
কেহ জানে কেহ মানে, কেহ তারে কহে নিঃসংশয়।
মানস তরঙ্গতলে প্রস্ফুটিত শতদল
আপন সংস্কারে
আলোড়িয়া তোলে যথা, সেই মত ওঠে কথা
চিত্ত সরোবরে!
সত্য তব পরিচয় "তোরা ত আমার।"—জানি তাই
কোন ভুল নাই।

আজি জন্মদিনে
মোরা লয়ে ভিক্ষাথালি সম্মিলিত তব শ্রীচরণে
যাচি জোড় করপুটে—'মাঙ্গল্যের করস্পর্শে
কর শুভ্রতম
মোদের মানসলোক। অনন্ত-তমিস্র-রাত্রি
হোক্ অবসান!
বহু জন্ম-জন্মান্তের পুঞ্জীভূত ক্লেদ-গ্লানি যত
হোক্ নিষ্কাশিত।"

"ওগো মা শরণ্যা,
আলোকের বর্ত্মে যেতে শাশ্বত সন্ধানে
তুমিই বরেণ্যা।
কর দূর অন্তরায়, সংশয়, অসত্য, মায়া
গ্রন্থি কর ভেদ,
কামনাবাসনা মোর তব তীব্র-অর্চি-ভেদে
করে দাও ছেদ।
দাও মোরে বুঝে নিতে চিদানন্দ স্বরূপ আমার
আপন আত্মার।"

"দীর্ঘ পথ শেষে
আজি এসে উত্তরিনু স্মৃতিময় তব পদপাশে।
ঘুচে যাক্ দুঃখ-নিশা, তৃপ্ত হোক্ সর্ব তৃষা,
সুচিরসঞ্চিত,
দুঃখহীন নিকেতনে জীব-যাত্রা-অবসানে
পশিব নন্দিত।
অনন্ত ক্ষমার তলে দিয়ে ফেলে সর্ব অপরাধ
কর আশীর্বাদ!"

উৎসব ও সংস্কৃতি

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

এক এক যুগে এক একটি কথার চলন একটু বেশী হয়। এযুগে, 'সংস্কৃতি' শব্দটার চলন এতো বেড়েছে যে, ও শব্দটি কিসে ব্যবহার করা হয়, বলার চাইতে কিসে ব্যবহার করা হয় না বলাই বোধ হয় সহজ!

'সাহিত্যে সংস্কৃতি,' 'শিল্পে সংস্কৃতি' 'ধর্মে সংস্কৃতি,' এসব ছাড়াও—'রবীন্দ্র সংস্কৃতি,' 'রামকৃষ্ণ সংস্কৃতি' অথবা 'বৈষ্ণব সংস্কৃতি' ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার চাষও যত বেড়ে গেছে, তেমনই বেড়েছে 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে'র ঘটা।

রাজনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি করে, জগতের দুঃখ দুর্দশা, অবিচার সুবিচার, সংগ্রাম শান্তি, প্রার্থনা দাবী, প্রভৃতি যে কোনো সমস্যা নিয়েই আন্দোলন অনুষ্ঠান হোক, তা'র সঙ্গে একটি করে সাংস্কৃতিক উৎসব থাকাই চাই।

লোক আকর্ষণ করবার এইটিই সহজ উপায়!

কারণ—সাধারণ মানুষ কিছুতেই হিতকথা শুনতে চায় না, সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। চিনির আবরণে ঔষধ গেলাবার নীতি হিসেবেই সাংস্কৃতিক উৎসবের ঘটা এতো বেশী বিস্তৃতি লাভ করেছে। রোগগ্রস্ত জাতির ঔষধের প্রয়োজন যে সব সময়!

'সংস্কৃতি' কথাটার ব্যবহার এভাবে আগে ছিলো কি না জানি না, কিন্তু সাংস্কৃতিক উৎসব

এযুগের আবিষ্কার নয়! ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'উৎসব' মানেই সাংস্কৃতিক উৎসব।

তবে তফাৎ এই, এযুগে—'সাংস্কৃতিক উৎসব' যেন সভ্যভব্য শিক্ষিত সমাজের বা বিদগ্ধজনের একচেটে সম্পত্তি, আগে সেটা ছিলো না।

ভারতের যে চিরন্তন সংস্কৃতির ধারা, সে শুধু সভ্যসমাজে শিক্ষিত সমাজে বা বিদগ্ধজনের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সে সংস্কৃতি—তা'র কি ধর্মজীবনে, কি সমাজজীবনে, কি জাতীয় জীবনে, দেহের মধ্যে আত্মার মতোই ওতপ্রোত হয়ে মিশে আছে।

ভারতের সংস্কৃতির চর্চায় অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন ওঠে না, তা'তে সকলের অধিকার। সংস্কৃতির চর্চাই ভারতবাসীর পূজো, ব্রত, নিয়ম!

ভারতের ভাবধারায় উৎসব মানেই শুধু নিছক আমোদ নয়, আবার—ব্রত পূজা মানেই কেবল পরলোকের সুখকামনা নয়, তা'র মধ্যেই রয়েছে, কাব্যের চর্চা, রসের চর্চা, শিল্পকলার চর্চা। উৎসবের দেশ ভারতবর্ষে বারো মাসে তেরো পার্বণ কেন, বারো মাসে বাহান্ন পার্বণ!

একথা সত্যি, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—স্বভাবতই দেশবাসীর প্রকৃতিতে রয়েছে অলসতা। কেবলমাত্র জীবনধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটোনো ছাড়া, আর কোনো কাজ যদি না থাকতো, তা'হলে—এদেশ স্থবির হয়ে পড়তো, এই দেশবাসী জড়ত্ব প্রাপ্ত হতো। নিজেকে আলস্যের পঙ্ককুণ্ড হ'তে টেনে তোলবার শক্তিও খুঁজে পেতো না, প্রেরণাও খুঁজে পেতো না।

আর সত্যি, সাধারণ মানুষের জীবনে আছেই বা কি, যাতে সে নিরুদ্যম হয়ে পড়বে না, স্তিমিত হয়ে যাবে না? দিনের পর দিন কেবলমাত্র জীবন-ধারণের মোটা প্রয়োজন মিটিয়ে একই দিনের পুনরাবৃত্তি করতে করতে বয়েসটাকে বড়ো আর পরমায়ুটাকে ছোট করে আনা, এই তো? এই তো সাধারণ মানুষের জীবন!

যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করছেন, যাঁরা অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধানলাভের আশায় সাধনা করছেন, সেই মুষ্টিমেয় অ-সাধারণদের এই মোটা হিসেবের মধ্যে ফেলছি না, আমি বলছি সাধারণের কথা।

সাধারণের জীবনে উৎসবের প্রয়োজন অপরিহার্য! দৈনন্দিন একঘেয়েমির ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে একটু বৈচিত্র্যের ছোঁওয়া না পেলে বাঁচা শক্ত।

আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহরা একথা বুঝতেন, আর তাঁরা জানতেন—সবাইকে বাঁচতে হবে, আর এক সঙ্গেই বাঁচতে হবে। "আমার সংস্কৃতি নিয়ে আমি আমার মতো করে বাঁচি, তোমার মূর্খতা নিয়ে তুমি তোমার মতো করে বাঁচো" এ অসুন্দর ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলেই, তাঁরা বছরের সমস্ত পথটি আলোকিত করে রেখে গেছেন, একটির পর একটি উৎসবের প্রদীপ জ্বালিয়ে।

সে আলোয় সকলের অধিকার, সে উৎসবে সবাইয়ের নিমন্ত্রণ। মন্দিরে অবস্থিত পাথরের বিগ্রহকে স্পর্শ করবার অধিকার সকলে পেতো না সত্যি কিন্তু মানুষের হৃদয়ে অবস্থিত 'দেবতা'র স্পর্শ পেতো! এটা নিছক ভাববিলাসের কথা নয়। সেকালের পালপার্বণের ইতিহাস যাঁদের জানা আছে, তাঁরাই জানেন, তার মধ্যে ছিলো কি পরিপূর্ণ প্রাণের ভাব!

উৎসব যেন বন্দী হৃদয়ের মুক্তি, জড়তার রুদ্ধ-স্রোতে নতুন প্রাণপ্রবাহ। উৎসবই—জীবন পুঁথির জীর্ণ পাতায় এনে দেয় নতুন রঙের জৌলুস!

ভারত একথা বুঝেছিলো, তাই ভারতে বারো মাসে বাহান্ন পার্বণ!

ভারতের উৎসবই ভারতের প্রাণ। ভারতকে বুঝতে হ'লে তার উৎসব-অনুষ্ঠানের মূলতত্ত্বকে বুঝতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে কী কল্যাণ-মন্ত্র নিহিত রয়েছে এর মধ্যে!

এটা লক্ষণীয় যে ভারতের সমস্ত উৎসবই ধর্মের কাঠামোকে আশ্রয় করে। বসন্ত-উৎসব বা হোলির মতো উদ্দাম, বা দেয়ালীর মতো দুঃসাহসিক উৎসব থেকে শুরু করে, লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, মনসা, মাকাল, ইতু, ভাদু পর্যন্ত সব কিছুই ধর্মের ফিল্‌টারে শোধন করা।

ভারতের সভ্যতা, ভারতের শিল্পকলা, ভারতের সৌন্দর্যবোধ, ভারতের দর্শন, সব কিছুই গড়ে উঠেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে।

ভারত তার দেবতাকে শুধু পূজোর নৈবেদ্যটুকু দেয় না, ভোগের পূর্ণপাত্রটিও দেবতাকে উৎসর্গ ক'রে তবে গ্রহণ করে।

দেবতা সকলেরই হৃদয়ের বস্তু, তাই দেবতাকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হবে তাতে সকলেরই হৃদয়গত যোগ থাকবে—একথা আমাদের পূর্ব পিতামহরা বুঝতেন, তাই ভারতের দেবতা মানুষের সঙ্গে তার সুখে দুঃখে, বিপদে, সম্পদে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সব কিছুতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

এই হচ্ছে—ভারতের সংস্কৃতি।

তা' বলে—এ শুধু 'ঐহিক চিন্তায় উদাসীন' ভারতের পরলোকের পথ পরিষ্কার রাখবার উপায়-মাত্র নয়।

ভালো করে ভেবে দেখলেই দেখা যায়—এই ব্যবস্থার মধ্যে কেমন সূক্ষ্মভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে রাজনীতির কূটকৌশল।

কেদার-বদরী-কৈলাস-মানস থেকে শুরু করে কন্যাকুমারী পর্যন্ত আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের তীর্থক্ষেত্র।

এ তীর্থ সমগ্র ভারতবাসীর।

বিশ্বনাথ কেবলমাত্র উত্তর ভারতের সম্পদ্ নয়, জগন্নাথ কেবলমাত্র ওড়িষ্যার সম্পত্তি নয়, বৃন্দাবন-লীলা-মাধুরী শুধুমাত্র ব্রজবাসীর একচেটে নয়, ওতে সকল প্রদেশের অধিবাসীরই সমান দাবী।

কতো পথক্লেশ সয়ে, কতো গিরি নদী উপত্যকা, কতো মরুকান্তার, কতো নিবিড় অরণ্য-ভূমি, অতিক্রম করে কতো জীবনমরণের সঙ্কট তুচ্ছ করে, যুগ যুগ ধরে মানুষ চলেছে তীর্থ যাত্রায়! সে যাত্রায় রয়েছে যেন এক চিরন্তন-তীর্থ-যাত্রার ধারা।

সে ধারা কখনোই কোনো দুঃখে দুর্যোগে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, রাষ্ট্রবিপ্লবের বিদারণ রেখায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যয়ে যায়নি।

তীর্থ-যাত্রীকে কেউ কখনো বলেনি, বা বলে না—"আমাদের দেশে ঢুকো না,·· আমাদের ধান চাল খেয়ে ফুরিয়ে দিও না।" বরং সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়, সমাদর করে কাছে বসায়, সুবিধের জন্যে ধর্মশালা খুলে রাখে।

আবার তীর্থ-যাত্রীকে অবলম্বন করেই কতো লোকের রুজিরোজগারের পথ খুলে যায়! বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে।

একাধারে প্রাদেশিকতার বিষ দূর করবার এবং অর্থনৈতিক সমস্যা লাঘব করবার এমন সহজ কৌশল এ যুগের রাজনীতিতে সম্ভব?

সর্বসাধারণকে এক করতে, সব প্রদেশকে এক মাল্যে গেঁথে রাখতে, এই যে একটি ধর্মের ডোর, যে ডোরটি দিয়ে জাতীয় বন্ধন সুদৃঢ় হতে পেরেছিলো, সেই বন্ধন-ডোরটির, মূল ভাব-রহস্যকে বিস্মৃত হয়ে, দেবতাকে 'কুসংস্কার' বলে উড়িয়ে দিয়ে আজ আমরা যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্নহয়ে পড়েছি! বন্ধনটা গেছে শিথিল হয়ে।

আজ আমরা জাতিভেদ-প্রথার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি, তাকে উঠিয়ে দেবার জন্যে আইন তৈরি করছি, কিন্তু তলায় তলায় নতুন যে ভেদের সৃষ্টি হচ্ছে, তার কুফলের আশঙ্কায় চিন্তিত হচ্ছি না।

জাতিভেদ ঘুচে যাচ্ছে, শ্রেণীভেদ গড়ে উঠছে।

দাক্ষিণাত্যের কলঙ্কিত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, নিম্নবর্ণ 'পারিয়া'রা ব্রাহ্মণের রাস্তা দিয়ে হাঁটবার

অনুমতি পেতো না, ব্রাহ্মণরা 'পারিয়া'দের রাস্তার ছায়া মাড়াতো না।

আজকের জাতিভেদ-মুক্ত সমাজে, আর ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে, 'দুশো টাকা' বেতনের রাজকর্ম-চারীরা 'তিনশো টাকার পাড়া'য় থাকবার অনুমতি পান না' 'পাঁচশো টাকার পাড়া'র অধিবাসীরা 'তিনশো টাকার রাস্তা'য় পায়ের ধূলো দেওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না।

একদিন যে কোনো হতভাগ্য, কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে একটা ভালো পোষাক জোগাড় করে পরে ফেলে পাঁচজনের সঙ্গে মিশে যাবে, তার জো নেই। সন্দেহ হলেই আপনি তার 'পাড়া'র ঠিকানা চাইবেন, বাস! সেখানেই হাঁড়ির খবর জানাজানি।

আগেকার যুগের সংস্কৃতিতে ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, রসিক অরসিক, ব্রাহ্মণ শূদ্র, সকলের জীবনের ছন্দেই একটা ধ্বনিগত মিল ছিলো, একালে সে মিলটা ঘুচেছে।

পৌষ-পার্বণে সবাইয়ের ঘরে পিঠে পুলি হবে, অরন্ধনে কারো ঘরে উনুন জ্বলবে না, যার সামর্থ্য নেই, সে অন্ততঃ চোদ্দটা দীপ জ্বেলেও 'দীপান্বিতা' পালন করবে, হোলিতে যে যার গায়ে খুসি রং ছিটোবে—এই যে একাত্মবোধ, এটা শুধু ধর্মীয় উৎসবেই সম্ভব।

এই যে আজকাল প্রায়ই এখানে ওখানে বর্ষা-উৎসব পালন হ'তে দেখি—'বর্ষা-আবাহন' 'বর্ষা-মঙ্গল' 'বর্ষা-বিদায়' ইত্যাদি নানা নামে সে উৎসব পালিত হয়। 'ইচ্ছে-অরন্ধনে'র মতো যার যেদিনে সুবিধে।

কিন্তু এ উৎসবও ওই 'শ্রেণী'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ধর্মের কাঠামোহীন এই উৎসবের রস কি কোনো গ্রামীন্ লোক গ্রহণ করতে পারবে, যেমন পারে ঝুলনযাত্রা-উৎসবের, জন্মাষ্টমী-উৎসবের?

একপক্ষে এগুলিও তো ঋতু-উৎসব!

ঋতু-উৎসব ভারতের চিরন্তন উৎসব।

প্রকৃতির ডালায় যখন যে ফুলটি নতুন ফোটে, যে ফলটি নতুন ওঠে, তা'কে নিয়েই একটা না একটা উৎসব। বৈশাখমাসে বাগান ভরে ওঠে রকমারি ফুলে! গাছের ফুল কি গাছেই ঝরবে? নাকি শুধুই হবে বিলাসিতার উপকরণ?

না, তাদের নিয়ে শুরু করো—শিবপুজো, 'পুণ্যিপুকুর', 'হরিরচরণ', লাগাও রাধাকৃষ্ণের ফুলদোল।

আমের মুকুলে শ্রীপঞ্চমীর পূজা, নতুন আম-কাঁঠালে ষষ্ঠীবাটার ঘটা।...সময় বুঝে বুঝে পাজির পাতায় আছেই একটা কিছু। আর নতুন অন্নের আশায় নবান্ন-উৎসব, তার ঘটার তো কথাই নেই।

এ উৎসবকে নিছক গ্রাম্য উৎসব বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই বোধ হয় 'অন্ন' আজ এতো কষ্ট! অন্নই যে জীবনের প্রধান জীবনীরস একথা তো অস্বীকার করা যায় না।

লক্ষ্মীর প্রয়োজনকেই বা অস্বীকার করবার সাহস কার আছে? তবে তাকে নিয়ে উৎসব অর্চনাকেই বা গ্রাম্য বলে বাতিল করা কেন?

উপকারীর উপকারকে উপকার বলে গ্রাহ্য না করাটাই এযুগের ধর্ম বলে হয়তো অন্নপূজা, সম্পদ-পূজা, ঋতুপূজা অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে।

অথচ 'বাহান্ন পার্বণে' অভ্যস্ত চিত্তবৃত্তি নিয়ে আমরা উৎসবের প্রয়োজন অনুভব না করে পারছি না।

তাই যত্রতত্র এতো সাংস্কৃতিক উৎসবের ঘটা!

উৎসবকে সারা বছর ধরে জীইয়ে রাখবার চেষ্টায় মহাপুরুষ খুঁজে খুঁজে তাঁদের জন্ম-জয়ন্তী আর তিরোভাব উৎসব করছি! করছি এটা ওটা সেটা।

আমি কিন্তু এক এক সময় ভাবি—চিরাচরিত পূজাপার্বণ এখন এমন করে উঠে গেলো কেন, বা প্রথামাত্র হয়ে রয়েছে কেন? আগের যুগের পাল-

পার্বণ ব্রত ইত্যাদির প্রথা যাঁরা প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁরা কি সাংস্কৃতিক জ্ঞান বি-বর্জিত ছিলেন ?

বেছে বেছে কেমন সব শুক্লাতিথিতে আর পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় যতো কিছু পূজা অর্চনা !

তার আয়োজন উপচারই বা কি !

ফুল চন্দন, গন্ধ মাল্য, ধূপ ধূনো, আরতি আলপনা—কাব্যিক পরিবেশটি সৃষ্টি করতে অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই।

ধরা যাক—সত্যনারায়ণ পুজো।

তার আয়োজনটি যেন একটি কবিতা !

আমার তো মনে হয়—ওই শির্নী জিনিসটি পূর্ণিমা-সম্মিলনী ছাড়া আর কিছুই নয়। সেকালের লোকেরা মনুষ্যচরিত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন বেশী, তাঁরা জানতেন—আয়োজনের মাঝখানে যদি একটি নারায়ণ স্থাপন করে রাখা যায়, তাহলে অতিথিরা কেউ অভ্যর্থনার ত্রুটি ধরতে সাহস পাবে না, "যেতে সময় হলো না" বলে পাঠিয়ে বাড়ী বসে থাকবে না।

তাছাড়া—উৎসব যেন উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত না হয়, আনন্দের প্রকাশ যেন অসংযমের রূপ না নেয়, সেটাও দেখা দরকার।

সব কিছু উৎসবের মধ্যেই তো লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ?

আক্ষরিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো না সত্য, কিন্তু আন্তরিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো।

কুমারীকালের ব্রত থেকে শুরু করে দুর্গোৎসব পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যেই লোক শিক্ষা। নীতি ধর্ম, ন্যায় অন্যায় বোধ থেকে পুরাণ উপপুরাণ শাস্ত্র ইতিহাস—কোন্ শিক্ষাটি নয় ?

কিন্তু শুধুই কি শিক্ষা ?

আবহমান কাল থেকে সারা ভারতবর্ষে এই উৎসবের মাধ্যমেই ঘটেছে সঙ্গীতের চর্চা, নৃত্যকলার চর্চা ! 'লোক সঙ্গীতে'র মতো একটি পরম সম্পদ, এইসব চলতি উৎসব বা, জন্ম মৃত্যু বিবাহ ইত্যাদি উৎসবকে উপলক্ষ্য করেই রচিত।

'ধানভানতে শিবের গীত' কথাটা অপ্রাসঙ্গিক অর্থে ব্যবহার হলেও মিথ্যা নয়।

বাঙলাদেশের অনেক জেলায়—নবান্নর ধানভানা উপলক্ষ্যে মেয়েরা শিবের বিয়ের পালা গায়।

অবরোধের দেশ ভারতবর্ষে চিরদিনই মেয়েদের অবরোধ শিথিল হয়ে গেছে উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে।

মেয়েরা দল বেধে পথে বেরোয়, গান গাইতে গাইতে 'জল সইতে' যায়। ধায় এখানে ওখানে।

বাঙলা বাদে ভারতের সর্বত্রই মেয়েদের নৃত্য-চর্চার প্রথা রয়েছে, এক একটি উৎসবের অবশ্য-পালনীয় অঙ্গ হিসাবে।

মেয়েলী শিল্পগুলিও এই উৎসবের মাধ্যমেই বিকশিত হবার সুযোগ পায়। আলপনা দেওয়া, ঘট চিত্তির আর দেওয়াল চিত্তির করা, পীঁড়ি রঙানো, শ্রী গড়ানো, বরণডালা সাজানো, মালাগাথা, ইত্যাদি নানা দিক দিয়ে, মেয়েরা তাদের শিল্পী মনকে নানাভাবে নানাছাঁদে নানাব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলবার জায়গা পায়। তাই বলছিলাম—সংস্কৃতির চর্চা এদেশে আবহমানকাল থেকেই ছিলো, ছিলো সাংস্কৃতিক উৎসব।

আর তেত্রিশ কোটি মানুষ এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশেও সাংস্কৃতিক বন্ধনটা ছিলো এক—অখণ্ড !

এযুগের সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন—খণ্ড, খণ্ড।

"মানুষই দেবতা হয়। কর্ম করলে সবই সম্ভব হয়।"

—শ্রীশ্রীমা

দয়াল প্রভু

শ্রীমতী প্রতিময়ী কর, ভারতী

কণ্টকে ঘিরি না রাখিতে যদি
জীবন-মঞ্চখানি,
কামনা-কেয়ার সুরভি কুঞ্জে
না রহিত বিষ-ফণী।

না ফুরাতে আশা নিঠুর মরণ
পরমায়ু না হরিত,
যৌবনবনে স্বপ্নকুসুম
দু'দিনেই না ঝরিত।

ব্যাধির পীড়নে না দমিত যদি
দেহের অমিত বল,
বাধা নিরবধি না ভাঙিত যদি
অহমিকা হিমাচল।

না রহিত যদি এত বঞ্চনা
মিথ্যার ধারাপাত
হিংসা-গরল দ্বেষ-দাবানল
স্বার্থের সংঘাত।

সুখের সাধনা না হইত যদি
আলেয়ার পিছে ছোটা,
ভবের হাটের ভূয়া কারবারে
ভূতের বেগার খাটা।

বিফল না হতো মানুষে মানুষে
মন দেওয়া আর চাওয়া,
ধরি আজীবন করি প্রাণপণ
উজানে তরণী বাওয়া।

চিরসাথীহীন না রহিত যদি
সবারে আঁকড়ি থাকি
জীবনপ্রশ্নে জবাব মিলিতে
কিছু না রহিত বাকি।

মায়ামরীচিকা না সৃজিতে যদি
হে মোর দয়াল প্রভু,
তোমারে কি তবে খুঁজিত মানব
তোমারে চাহিত কভু?

চিন্তা ও অনল

শ্রীদীনবন্ধু মাজি

অনলে সরোষে ডাকি কহে চিন্তাধারা,
নিঠুর হৃদয় তব দয়ালেশ হারা।
স্বর্ণসম নরদেহ জ্বালাও নিমেষে,
ভস্মে হয় পরিণত তব কর্ম শেষে।

হাসিয়া অনল কহে একথা নিশ্চিত,
মৃতদেহ দহি সাধি মানুষেরি হিত।
জীবিত যে তারে বন্ধু কর তুমি দাহ,
বৃথা মোর অপযশ তবে কেন গাহ?

শিক্ষার ভিত্তি

(পূর্বানুবৃত্তি)

(দুই)

'বনফুল'

[বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি' বক্তৃতা]

আমরা এখন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। শুনিয়াছি আমাদের জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করাই বর্তমান রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ভারতবর্ষ জ্ঞানে গরিমায় যখন সত্যই বড় ছিল যখন সে সত্যই স্বাধীন ছিল, তখন তাহার শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ ছিল তাহাই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর একটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়াই আলোচনা আরম্ভ করি। তিনি বলিতেছেন—"কালের কুটিল চক্রে শিক্ষা আজকাল বিজ্ঞান-শিক্ষা, সাহিত্য-শিক্ষা, হাতে-কলমে শিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষা ইত্যাদি নানা উপাধিতে অলঙ্কৃতা হইয়া সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে এবং কোন্ শিক্ষা ভাল কোন্ শিক্ষা মন্দ এই তর্কের কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এই কোলাহলের অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে একেবারেই অক্ষম। শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটা মাত্র শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি এবং সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, স্ফূর্তি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, হীন মনুষ্যত্ব স্ফূর্তিলাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া ওঠে তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া থাকি এবং সেই শিক্ষার আবার একটা ভিন্ন যে পাঁচটা পথ আছে তাহাও আমাদের কল্পনায় আসে না" অর্থাৎ সমাজের কল্যাণে মানুষ নামক ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব যে উপায়ে সম্যক্‌রূপে বিকশিত হয় তাহার নামই শিক্ষা। পূর্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি আজকাল সমাজ বলিয়া কিছু নাই। আমরা নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীতে স্বাধীনতার আস্ফালন করি বটে, কিন্তু আসলে আমরা সকলেই দাস। যন্ত্রপতিরাই পৃথিবীর মানবসমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাহারাই আমাদের প্রভু, ভর্তা এবং শাসনকর্তা। আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে তাঁহাদের উৎসাহ নাই, অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশ যাহাতে না হয়, সকলেই যাহাতে বিরাট যন্ত্রের নাট্‌ বা বল্টুতে পরিণত হয়, সেই দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য। আমেরিকার বিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক ডাক্তার Alexis Carrel তাঁহার Man, the unknown নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলিতেছেন—Modern Society ignores the individual. It only takes account of the human beings. It believes in the reality of the universals and treats men as abstractions. The confusion of the concepts of individual and of human being has led industrial civilisation to a fundamental error, the standardisation of men. If we were all idnentical, we could be reared and made to live and work in great herds like cattle. But each one has his own personality. He cannot be treated like a symbol.

Children should not be placed, at a very early age in schools where they are educated whole sale.

As is well-known, most great men have been brought up in comparative solitude or have refused to enter the mould of the school....education should be the object of unfailing guidance Such guidance belongs to parents. They alone, and more especially the mother, have observed since their origin, the physiological and mental peculiarities whose orientation is the aim of education. Modern society has committed a serius mistake by entirely substituting the school for familial training. The mothers abandon their children to the kindergarten in order to attend to their careers, their social ambitions, their sexual pleasures, their literary or artistic fancies or simply to play bridge, go to the cinema and waste their time in busy idleness. They are thus responsible for the disappearance of the familial group where the child was kept in contact with adults and learned a great deal from them. He learns little from the children of his own age....The neglect of individuality by our social institutions is likewise responsible for the atrophy of the adults...In the immensity of modern cities he is isolated and as if lost. He is an economic abstraction, a unit of the herd. He gives up his individuality. He has neither responsibility nor dignity. Above the multitude stand out rich men, the powerful politicians, the bandits. The others are only nameless grains of dust...."

এই প্রবন্ধটি একটু বেশী করিয়াই উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ ইহাতে আধুনিক শিক্ষার যে সব গলদ এবং তাহার জন্য ব্যক্তিত্ব-বিলোপের যে চিত্র ডাক্তার ক্যারেল অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং যাহা এতটুকু অতিরঞ্জিত নহে ; পুরাকালে আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহার উদ্দেশ্য ছিল এই সব গলদগুলি এড়াইয়া চলা।

সে শিক্ষাপদ্ধতির খুঁটিনাটি আলোচনা করিবার পূর্বে তখনকার সামাজিক গঠন জানা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন যে সে যুগের বিজয়ী আর্যগণ যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা নিজেদের জন্য, বিজিত অনার্যদের জন্য নহে। অনার্যদের প্রথম প্রথম তাঁহারা অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন। নিজেদের সুবিধার জন্য যোগ্যতা অনুসারে তাঁহারা নিজেদের তিন বর্ণে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। ইহার মধ্যে কোনরূপ জোরজবরদস্তি ছিল না। অধ্যাপক Altaker তাঁহার Education in India পুস্তকে লিখিয়াছেন—"There is a general impression that Hindu educationists suppressed personality by prescribing a uniform course of education and enforcing it with iron discipline. Such, however, was not the case. The caste system had not become hide-bound down to 500 B. C. and till that time

a free choice of profession or career was possible both in theory and practice....

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জীবনের আদর্শ কি হইবে তাহা নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট ছিল। সারাজীবন অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও আধ্যাত্মিক চর্চা ছিল ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ, ক্ষত্রিয়ের আদর্শ ছিল শক্তির সাধনা এবং বৈশ্যের আদর্শ ছিল ব্যবসায় বাণিজ্য। প্রত্যেকেই দ্বিজ ছিলেন এবং প্রত্যেককেই উপনয়নের পর গুরুগৃহে জীবনের প্রথম আশ্রম অতিবাহিত করিতে হইত। নিজের নিজের গুণ বা প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য হইতেন। এখন যেমন একই বাড়ির ছেলে কেহ অধ্যাপক, কেহ সৈনিক এবং কেহ দোকানদার, কেহ বা অন্য কিছু হন। অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার Ancient Indian Education পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

In the sphere of economic life and interests the free choice of occupations or the movement of labour, horizontal or vertical was subordinated to the choice of the ideals and ends of life... some occupations were approved for certain castes and condemned for others.

এই সব ব্যবস্থায় শূদ্রদের স্থান ছিল না। আর্যসংস্কৃতির মহত্বকে ম্লান করিবার জন্য অনেকে শূদ্রদের প্রতি তাঁহাদের হৃদয়হীন ব্যবহারের উল্লেখ করেন, এ সম্পর্কে 'শোষক' 'শোষিত' ইত্যাদি নানা শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আর্যদের শিক্ষাপদ্ধতির আদর্শ তাহাদের উদার সংস্কৃতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেজন্য এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

যাঁহাদের তাঁহারা জয় করিয়াছিলেন তাহারাই ছিল শূদ্র অর্থাৎ দাস। তখন বিজিত দেশের লোকেরা দাস বলিয়াই সাধারণত গণ্য হইত, তখন সর্বদেশে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন আমরা যেমন গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়ার স্বাধীনতা স্বীকার করি না, তখনও মানবসমাজ তেমনি দাসদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন না। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় যে নূতন দাসত্ব প্রথার প্রচলন হইয়াছে তাহাতেও দাসদিগের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। ভারতবর্ষীয় আর্যদের স্বপক্ষে তবু একটা কথা বলিবার আছে। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দাসদের উপর যে বর্বর নির্যাতনের বর্ণনা আমরা পাই, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে তাহা পাই না। পুরাণে কাব্যে রামায়ণ মহাভারতে মাঝে মাঝে আছে বটে মুনিরা দাসদের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন, অথবা শুনঃশেফকে যজ্ঞে বলিদান দিবার জন্য কিনিয়া আনা হইয়াছে। পঞ্চপাণ্ডবের অনার্য-দলন, খাণ্ডবদাহন, শ্রীরামচন্দ্রের শম্বুকবধ প্রভৃতি ঘটনাকেও যদি দাসনির্যাতনের পর্যায়ে গণ্য করি তবু অন্যান্য দেশের তুলনায় এমন কি আধুনিক সভ্যযুগেরও দাস-দলনের তুলনায় সে সব নগণ্য। জালিওয়ানবালাবাগের কথা, বিয়াল্লিশের অত্যাচারের কথা, এমন কি আজকাল কেনিয়ায় যাহা হইতেছে তাহার কথা স্মরণ করুন।

আর্যগণ এদেশে আসিয়াই মহাপুরুষ বা দার্শনিক হইয়া ওঠেন নাই। তাঁহারাও এদেশে আসিয়াছিলেন বিজেতাসুলভ মনোভাব লইয়া। কিন্তু এদেশে কিছুকাল বাস করিবার পর তাঁহারা যে ধর্ম যে সভ্যতার পত্তন করেন, যে আদর্শ তাঁহাদের পরবর্তী সমাজ জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, যে আদর্শ সনাতন ভারতীয় আদর্শ নামে পরিচিত তাহাতে শূদ্রদের প্রতি ঘৃণার আভাসমাত্র নাই। পুরাণে কাব্যে এরকম নিদর্শন হয়তো দুই একটা আছে, কিন্তু প্রেমের নিদর্শনও কম নাই।

রামায়ণের যুগে শ্রীরামচন্দ্র শম্বুককে, তাড়কাকে, রাবণকে, বালীকে এবং আরও অনেক রাক্ষস-রাক্ষসীকে বধ করিয়াছেন সত্য, লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাকও কাটিয়া দিয়াছেন কিন্তু ওই রামায়ণযুগেই আমরা পাই গুহক চণ্ডালকে, শবরীকে, রামভক্ত হনুমানকে। মহাভারতের যুগে তো একেবারে পট-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং মহাভারতকার কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নই পুরাপুরি আর্য নহেন, তিনি লোমশ, কৃষ্ণবর্ণ এবং ভয়ঙ্কর। পাণ্ডুজননী তাঁহাকে দেখিয়া মূর্ছা গিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের পিতা ঋষি পরাশর হয়তো আর্য ছিলেন কিন্তু তাঁহার জননী সত্যবতী ধীবরকন্যা। এই সত্যবতী পরে রাজা শান্তনুর ধর্মপত্নীও হইয়াছিলেন। এই মহাভারতেই দেখি, ভীম হিড়িম্বাকে এবং অর্জুন উলূপীকে, চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিতেছেন। রাজা নহুষ রাক্ষস উরগ প্রভৃতিকে পালন করিতেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও দেখি উভয়পক্ষেই অনার্য নৃপতিরা রহিয়াছেন, হীন দাসরূপে নহে, নির্ভরযোগ্য বন্ধুরূপে। গন্ধর্ব, কিন্নর, পন্নগ, দৈত্য, দানব, নাগগণ যদি অনার্য হন তাহা হইলে তাঁহাদের মহিমায় পুরাণ মহাভারত পরিপূর্ণ। একলব্য, অধিরতসুত, দাসীপুত্র বিদুর, জতুগৃহের নির্মাতা শিল্পী পুরোচন, মায়াবী অঙ্গারপর্ণ প্রভৃতি যে সব চরিত্র মহাভারতকার উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহারা কেহই হেয়চরিত্র নহেন। মহর্ষি নারদ কুবের সভার, বরুণ-সভার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে অনার্যদেরই আধিক্য দেখিতে পাই। একথা অবশ্য ঠিক ভীম বক, কির্মীর প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ, শাল্বকে এবং অন্যান্য পাণ্ডবেরা বহু অনার্যকে ধ্বংস করিয়াছেন; কিন্তু ইঁহাদের মহিমা, ইঁহাদের শৌর্য-বীর্য সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সন্দেহ ছিল না, রাবণের স্বর্ণলঙ্কার বর্ণনা, কুবেরের অলকাপুরীর বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় না, তাঁহারা তাঁহাদের ছোট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শাল্ব যে আকাশগামী সৌভপুরীতে চড়িয়া পৃথিবী হইতে প্রায় এক ক্রোশ ঊর্ধ্বে থাকিয়া শরসন্ধান করিতে পারিতেন একথা বেশ সাড়ম্বরেই বর্ণিত হইয়াছে।

মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয় যে অনার্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াই হয়তো অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ব্রহ্মের কল্পনা আর্য ঋষিদের চিত্তে প্রথমে প্রতিভাত হইয়াছিল। কারণ আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই অনার্যগণ সর্বভূতে—এমন কি সর্পে, ব্যাঘ্রে, সর্বপ্রকার হিংস্র অহিংস্র জীবজন্তুতে, বৃক্ষে, প্রস্তরখণ্ডে, আলোকে অন্ধকারে, সর্বত্র দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করিতেন, দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। তাই হয়তো পরবর্তী যুগে আমরা মূর্তিপূজক হইয়াছি. দেবদেবীদের সহিত সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, বৃষ, হংস, পেচক প্রভৃতিরও পূজা করিতেছি।

এই সব হইতে মনে হয় কালক্রমে আর্যদের সহিত অনার্যদের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রীতির সম্পর্ক সত্ত্বেও শূদ্রদের বেদপাঠে অধিকার ছিল না। তাহারও কারণ ঘৃণা নয়, সাবধানতা। আর্য ঋষিদের বিশ্বাস ছিল বেদমন্ত্রের উচ্চারণ যদি নির্দোষ না হয় বিশ্বের অমঙ্গল হইবে। যেহেতু শূদ্রদের মাতৃভাষা বৈদিক ভাষা নয় সেই হেতু তাঁহাদের ভয় ছিল শূদ্রেরা বৈদিক মন্ত্র ভুল উচ্চারণ করিবে এবং তাহা হইলে সমাজের অমঙ্গল হইবে। বৈদিক মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ে তাঁহারা খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। প্রথমে আর্য রমণীগণের বেদপাঠে অধিকার ছিল। গার্গী, মৈত্রেয়ী, সুলভা, বিশ্ববারা প্রভৃতি অনেকেই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। কিন্তু এ দেশে বহুকাল বাসের পর আর্য রমণীগণের আর্যত্ব যখন কমিতে লাগিল, আর্যগণও যখন অনার্য রমণী বিবাহ করিতে লাগিলেন তখন ঋষিরা রমণীদের এবং পতিত আর্যদেরও বেদ-পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। বেদ

তখন তাঁহাদের সভ্যতা শক্তি ও সংহতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ ছিল, বেদের পবিত্রতা রক্ষা করা সে যুগে সমস্ত জাতির আত্মরক্ষারই নামান্তর ছিল। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে এখন যে কারণে মৃত্যুদণ্ড হয় বেদের পবিত্রতা নষ্ট করিলেও সে যুগে ঠিক সেই কারণেই মৃত্যুদণ্ড হইত। ইহাই তখন নিয়ম ছিল, এ নিয়ম পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা রাজারও ছিল না। এইজন্যই শ্রীরামচন্দ্র শম্বুককে বধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু অনার্যদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া কিছুদিন পরে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ পরে দেখিতে পাই অনার্য রাজারাও যজ্ঞ করিতেছেন। অনার্য দানব রাজা বৃষপর্বা কৈলাসের উত্তরভাগে মৈনাক সন্নিধানে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই যজ্ঞেরই দ্রব্যাদি লইয়া অনার্য ময়দানব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে চমকপ্রদ সভা নির্মাণও করিতেছেন, এমন কি অর্জুনের দেবদত্ত নামক শঙ্খটিও বৃষপর্বার যজ্ঞস্থল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পরে দেখি, দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ একজন শ্রেষ্ঠ হরিভক্ত বলিয়া কীর্তিত, নাগরাজ বাসুকী একজন প্রথম শ্রেণীর তপস্বী বলিয়া সম্মানিত, পুরাণকার তাঁহার মস্তকে সমস্ত পৃথিবীর ভার অর্পণ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। পরে দেখি, সমস্ত বলশালী অনার্যগণ আর্য সভ্যতার দীপ্তিতে দীপ্যমান, পুরাণের প্রায় সমস্ত প্রতাপশালী দৈত্যদানবেরা তপস্বী, মহর্ষি উশনা দৈত্যদের গুরু-পদে আসীন হইয়া শুক্রাচার্য নামে খ্যাত। আর্য সভ্যতার প্রথম যুগে দেখি আর্যরা শূদ্রদের ছোঁওয়া অন্নজল গ্রহণ করিতেছেন না। ইহারও কারণ সম্ভবত ঘৃণা নয়, সাবধানতা। শূদ্ররা পরাজিত, শূদ্ররা অপরিচিত, তাহাদের সামাজিক আচার-আচরণও অদ্ভুত, তাহাদের প্রদত্ত অন্নজল গ্রহণ করা তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্যই সমীচীন মনে করিতেন না। প্রথম প্রথম অপরিচিত অনার্য পরিবেশে তাঁহাদের অত্যন্ত সাবধানে চলা-ফেরা করিতে হইত। এমন কি মহাভারতের যুগেও দেখি পাণ্ডবজননী কুন্তী পুত্রদের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছেন, ভাবিতেছেন কোনও মায়াবী নিশাচর তাহাদের কোনও অনিষ্ট করিল না তো! বলা বাহুল্য মায়াবী নিশাচর মানে অনার্য।

প্রথম প্রথম কিছুদিন তাঁহারা অনার্যদের বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তাই সম্ভবত তাহাদের প্রদত্ত অন্নজল গ্রহণ করিতেন না। আধুনিক কালেও তো দেখি ট্রেনে নোটিশ দেওয়া রহিয়াছে—"অপরিচিত লোকের নিকট হইতে খাদ্য. পানীয় এমন কি বিড়ি সিগারেট পর্যন্ত গ্রহণ করিবেন না।" আধুনিক সামরিক আইনও এসব বিষয়ে বিশেষ সতর্ক। এই সতর্কতা কি ঘৃণা ?

বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে ঈষৎ অবান্তর হইলেও আর্যদের সহিত শূদ্রদের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলাম। তাহার কারণ অনেকে মনে করেন আর্যরা শূদ্রদের ঘৃণা করিতেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য কিন্তু অন্যরূপ। প্রথম প্রথম বিজেতাসুলভ মনোভাব হয়তো তাঁহাদের ছিল, কিন্তু কিছুকাল এদেশে বাস করিবার পর যে ধর্ম, যে সংস্কৃতির পত্তন তাঁহারা করিয়াছিলেন, যে শিক্ষার আদর্শ তাঁহাদের চিত্তকে ও সমাজকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল তাহাতে ঘৃণার স্থান নাই। জোরজবরদস্তি বা ঘৃণার শাসন স্বল্পায়ু। ন্যায়ের শাসন, প্রেমের শাসন, উদারতার শাসন দীর্ঘজীবী। যে ধর্মের ভিত্তিতে আর্যগণ এদেশে সভ্যতার পত্তন করিয়াছিলেন তাহা চারি হাজার বৎসরের ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও এখনও সগৌরবে টিকিয়া আছে। অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার The Hindu View of Life পুস্তকে বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক মিস্টার ভিন্সেণ্ট স্মিথের যে অভিমত Oxford History of India হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই—

India, beyond all doubt, possesses a deep fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or political superiority. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners and sect. এই unity, বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই একত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল কারণ তাঁহাদের শিক্ষার মূলমন্ত্রই ছিল একত্বের সন্ধান। ঘৃণার স্পর্শে এই সন্ধান ব্যাহত হইত।

বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রত্যেক আর্যসন্তানের জীবন চারিটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। ব্রহ্মচর্য আশ্রম, আর্যজীবনের প্রথম আশ্রম। এই আশ্রমে আর্য-জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইত। ব্রহ্মচর্যাশ্রম উত্তীর্ণ না হইলে কোন আর্যসন্তানই পরবর্তী গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশের অনুমতি পাইতেন না। কোনও ভদ্র গৃহস্থ তাঁহাকে কন্যাসম্প্রদানই করিতেন না। ভিত্তি মজবুত না করিয়া তাহার উপর হর্ম্য-নির্মাণের পক্ষপাতী তাঁহারা ছিলেন না। সত্য ও ধর্মই সে ভিত্তির প্রধান উপকরণ। সত্যের সন্ধান এবং সে সন্ধানের উপযোগী চরিত্র-নির্মাণই ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রধান লক্ষ্য ছিল। একথা তাঁহারা বলিতেন না যে 'লেখাপড়া শেখে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই'—কোনও মিথ্যা আশ্বাস বা অলীক মোহের উপর সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বর্তমান যুগের দার্শনিক পণ্ডিতগণও আজকাল বলিতেছেন যে শিশুর মনে শিক্ষার ছলে এমন কোনও জিনিস প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত নয় যাহা মিথ্যা, যাহা জীবনের নিকষে যাচাই করিলে মূল্যহীন প্রতিপন্ন হইবে। Alfred North Whitehead তাঁহার—The aims of Education প্রবন্ধে এই কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে বলিয়াছেন। সে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য কি ছিল তাহা ব্রহ্মচর্য এই নামের মধ্যেই স্পষ্ট। ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মকে জীবনে উপলব্ধি করাই মানবজীবনের চরম পরিণতি, সেই পরিণতি লাভ করিবার জন্য যে প্রস্তুতি—তাহাই শিক্ষা। কারণ ব্রহ্মই সত্য, পৃথিবীর বিবিধ বৈচিত্র্য সেই একই সত্যের বিচিত্র প্রকাশ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথিবীর যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা তাহার সত্য রূপ নয়, তাহা মায়াময় রূপ, তাহা মিথ্যা, তাহা ক্ষণস্থায়ী। বহুরূপী বিচিত্র মায়াযবনিকার অন্তরালে যে সত্য, যে ধ্রুব, যে অনাদি অনন্ত অখণ্ড শক্তি বিরাজমান—তাহার নাম ঈশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম, God, Primordial Energy, যাহাই দিন—তাহাকে উপলব্ধি করিবার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। ব্রহ্মকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুসারে উপলব্ধি করিতে হয়—এই উপলব্ধির কোন বাধাধরা একটা পথ নাই, প্রত্যেকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুসারে নিজের পথ নিজেই আবিষ্কার করেন, গুরু তাঁহার সহায়ক মাত্র। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই—মুক্তি। শিক্ষার উদ্দেশ্য মুক্তি-লাভ, চাকরি-লাভ নয়, ডিগ্রি-লাভ নয়, কোন প্রকার ঐহিক সুখ নয়। ঐহিক সুখদুঃখ, ঐহিক জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যু যে জীবনের অনিবার্য পরিণাম একথা তাঁহারা জানিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা বলেন নাই—Eat, drink and be merry, to-morrow you die. কারণ ইহাও তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে এই দেহটাই মরণশীল, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা অনুভব করি তাহাই নশ্বর—আত্মা কিন্তু অমর। এই আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মানু-সন্ধানই মানবজীবনের একমাত্র শ্রেয়ঃ, আত্মানং বিদ্ধি তাই আর্য শিক্ষার প্রধান উপদেশ। Eat, drink করিয়া merry হইতে তাঁহারা মানা করেন নাই, জীবনকে উপভোগ করায় তাঁহাদের সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল, রাজসিক জীবনের বিবিধ বিলাসকে কেন্দ্র করিয়া বহু প্রকার শাস্ত্র ও গ্রন্থ তাঁহারা

প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আমাদের জীবন যে বহুবিধ ক্ষুধায় কাতর এ জ্ঞান তাঁহাদের ছিল। কিন্তু তাঁহারা এইসব ক্ষুধাকে সামাজিক কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই ক্ষুধা-প্রসঙ্গে যে উপদেশ তাঁহারা দিয়াছেন তাহাই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার মূলমন্ত্র। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—জীবনকে ভোগ কর ক্ষতি নাই, কিন্তু আসক্ত হইও না। আসক্তি মানেই বন্ধন এবং বন্ধনের পরিণামই দুঃখ। যে অনন্ত পথের তুমি যাত্রী সে পথে কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে যদি আসক্তির শৃঙ্খল প্রতি পদক্ষেপে তোমার গতি রোধ করে? সুতরাং আসক্তি ত্যাগ কর, যে কোনও প্রকার আসক্তিই, এমনকি ব্রহ্মের প্রতি আসক্তিও দুঃখ-দায়ক। ভোগ কর, কিন্তু ভোগাসক্ত হইও না। আসক্তি তোমার মুক্তি-লাভের বাধা। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বলিতেছেন—The Hindu Code of practice links up the realm of desires with the perspective of the Eternal. It links together the kingdoms of Heaven and Earth.

এই perspective of the Eternal, ভূমার পটভূমিকায় জীবনকে দর্শন, আর্যসভ্যতার মূল সুর। আর্য ঋষি বলিতেছেন—দেহের অবসান ঘটিবে, তোমার বিত্ত, তোমার প্রতাপ, তোমার ঐশ্বর্য, তোমার অলঙ্কার অহঙ্কার সমস্তই লুপ্ত হইবে, কিন্তু তুমি লুপ্ত হইবে না, তুমি অমর, তুমি অনন্ত পথের যাত্রী, তোমার পার্থিব জীবন তোমার অনন্ত যাত্রা-পথের অংশ মাত্র, এই অংশটুকুর সম্বন্ধে মোহ-পোষণ করিও না, আত্মবিস্মৃত হইও না, হইলেই কষ্ট পাইবে।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবং কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়া স্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥
নলিনীদলগতজলমতি তরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥

শঙ্করাচার্যের মোহ-মুদ্গর আর্যশিক্ষার সারমর্ম। জীবন-সম্বন্ধে সত্যদর্শন এবং দুঃখ-নিবারণের প্রকৃত উপায় যে শিক্ষার লক্ষ্য সেই শিক্ষাই তাঁহারা জীবনের প্রথম আশ্রমে আর্যসন্তানগণকে দিতেন। অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছেন—Of all the peoples of the world the Hindu is the most impressed and affected by Death as the central fact of Life He cannot get away from the fact that while man proposes, God disposes. Therefore he feels he cannot take life seriously and scheme for it without a knowledge of the whole scheme of creation.

যাঁহারা মানবজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদেরও অনেকের অভিমত মৃত্যুই সম্ভবত আমাদের প্রথম ধর্ম-শিক্ষক। মৃত্যুই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায় ইহাই কি শেষ? উপনিষদের ঋষি সত্যসন্ধানের নিমিত্ত তাই নচিকেতাকে যমের নিকটে লইয়া গিয়াছেন।

নচিকেতা যমকেই প্রশ্ন করিতেছেন—
মৃত্যুর পরে আছে সংশয় সদাই
কেহ বলে থাকে কিছু, কেহ বলে নাই
হে যম, তৃতীয় বরে আজিকে তোমার কাছে
সত্য কথা শুনিবারে চাই।

যম তাহাকে এই সত্য কথা, সনাতন গূঢ় ব্রহ্মকথা পরে বলিয়াছিলেন, প্রথমে কিছুই বলেন নাই। নচিকেতা সত্য-লাভের প্রকৃত অধিকারী কি না

তাহা যাচাই করিয়া লইবার জন্ত তাহাকে প্রলুব্ধ করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—

শতজীবী পুত্র পৌত্র করহ প্রার্থনা
পশু হস্তী অশ্ব স্বর্ণ দিব চাও যত
বিশাল রাজত্ব লও
নিজ আয়ু চাহ ইচ্ছামত
এর তুল্য অন্যবর যথা ইচ্ছা, নচিকেতা করহ প্রার্থনা,
লও বিত্ত, অমরত্ব, রাজা হও বিশাল রাজ্যের
পূর্ণ কর সকল কামনা
মর্ত্যলোকে দুর্লভ যা সেই সব কাম্য বস্তু
যাহা ইচ্ছা মাগ মোর কাছে
ওই যে রথের পরে বাদ্যযন্ত্র সহ রমণীরা আছে
মনুষ্যের আয়ত্তের অতীত ইহারা
মোর বরে ভোগ কর ইহাদেরও পরিচর্যা-সুখ
মৃত্যু-বিষয়েতে শুধু নচিকেতা হ'য়ো না উৎসুক।

নচিকেতা কিন্তু ভুলিবার পাত্র নন। তিনি বলিলেন—

অনিশ্চিত মৃত্যুশীল এই সব ভোগ্য বস্তু
জীর্ণ করে ইন্দ্রিয়ের শক্তি আর সুখ
জীবনই তো ক্ষণস্থায়ী ; বাহন বা নৃত্য-গীত
চাহি নাকো তোমারই থাকুক।

তখন যম প্রীত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সত্যের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন। প্রথমেই বলিলেন—

নচিকেতা, তুমি প্রিয়, প্রিয়রূপী কামনা সকল
ত্যজিয়াছ বিচার করিয়া
যে বিষয়াকীর্ণ মার্গে বহুলোক হ'ল নিমজ্জিত
তুমি তাহা থাকনি ধরিয়া ;
অবিদ্যা ও বিদ্যা এরা অতি ভিন্নমুখী
বহমান বিপরীত ধারে
নচিকেতা, তুমি জানি বিদ্যা-অভিলাষী
প্রলুব্ধ করেনি শত কামনা তোমারে।
অবিদ্যা অন্তর মাঝে সদা বর্তমান
পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে নিজেদের ভাবে জ্ঞানবান
অন্ধ-নীত অন্ধসম মূঢ় জেনো তারা
ভ্রান্ত পথে সদা ভ্রাম্যমান।

কামনা, বিষয়, অবিদ্যা ও অহঙ্কার ইহারা সত্য-জ্ঞানের ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরিপন্থী। 'ব্রহ্ম' কথাটা শুনিবামাত্র অনেকে চমকাইয়া ওঠেন, মনে মনে বলেন—ও বাবা। অনেকের মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিয়া ওঠে, ভাবেন এইবার ভণ্ডামির পালা শুরু হইল। ইহার কারণ ব্রহ্মকে লইয়া সত্যই অনেক ভণ্ড যুগে যুগে বহুলোককে বিভ্রান্ত করিয়াছে, এখনও করিতেছে। ব্রহ্ম শব্দটাকেই তাহারা অশুচি অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। ব্রহ্ম না বলিয়া যদি বলি truth তাহা হইলে অনেকে হয়তো সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিবেন। কারণ আমরা সকলেই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে truth-এর সন্ধানই করিতেছি। এই truth—এই সত্যই ব্রহ্ম। আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, বস্তুত মানব-মনীষার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার একটি মাত্রই উদ্দেশ্য —truth, সত্য, ব্রহ্ম। মুনি ঋষি সত্যদ্রষ্টারা যে কেবল পুরাকালেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নয়, একালেও তাঁহারা আছেন। একালের সত্য-দ্রষ্টাদের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন তাঁহাদের দর্শনের সহিত সেকালের মুনি ঋষিদের দর্শনের বিশেষ কোন তফাত নাই। যম নচিকেতার নিকট ব্রহ্মের যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি।

আকাশেতে হংস তিনি, অন্তরীক্ষে বসু তাঁর নাম
বেদীতে তিনিই হোতা গৃহে তিনি অতিথি ও দ্বিজ
মানবে দেবেতে সত্যে আকাশেতে তাঁর অবস্থান
জলজ ভূমিজ তিনি সত্যজ অদ্রিজ
মহাসত্য তিনি সুমহান্।
একই অগ্নি ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথা
রূপ-ভেদে বহুরূপ হ'ন
সর্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অনুরূপী
অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন।

একই বায়ু ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথা
রূপ-ভেদে বহুরূপ হ'ন
সর্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অনুরূপী
অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন।
সর্বলোক-চক্ষু-সূর্য অশুচিদর্শনে যথা
না হ'ন মলিন
সর্বভূতস্থিত আত্মা নির্লিপ্ত তেমনি
জাগতিক দুঃখ মাঝে স্বতন্ত্র অ-লীন।

বাসনা কামনা রহিত হইয়া এই ব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়াই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য—ব্রহ্মবিদ্যাই বিদ্যা। কারণ আর্যঋষিগণের মতে সুখশান্তি লাভ করিবার একমাত্র উপায় ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভ করা। ওই যমই নচিকেতাকে বলিয়াছেন—

সর্বভূত অন্তরাত্মা, এক যিনি, নিয়ন্তা সবার
আপনার একরূপে করেন বহুধা
তাঁহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে
অন্যে নয়—তাঁরা পান নিত্য-সুখ-সুধা।
অনিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের চৈতন্য-স্বরূপ,
সকলের মধ্যে এক কাম্য যিনি করেন বিধান
তাঁহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে
অন্যে নয় তাঁহারাই চির-শান্তি পান।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইত। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই আমরা আমাদের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারি, ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকেই নিখিল বিশ্বের সহিত আমাদের সম্পর্ক কি জানিতে পারি, ব্রহ্মজ্ঞানই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আমাদের সাহায্য করে। এই ব্রহ্মজ্ঞান পুস্তক পড়িয়া অথবা বক্তৃতা শুনিয়া লাভ করা যায় না। ব্রহ্ম আমাদের মধ্যেই আছেন কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে সাধনা করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divine within, by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these and be free. This is the whole of religion. Doctrine or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details.

এই ধর্ম-অভিমুখে চিত্তকে উন্মুখ করিয়া তাহার জন্য ব্রহ্মচারীকে প্রস্তুত করাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের লক্ষ্য।

এখন দেখা যাক এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা ছিল। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যক্তিত্বের উন্মেষই ছিল এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, সেইজন্য গুরুর সহিত শিষ্যের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম এবং প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। শিষ্যই গুরুকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবে এবং গুরু যদি শিষ্যকে উপযুক্ত অধিকারী বিবেচনা করেন তবেই তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। এই অধিকার বিচার সে যুগে একটা মস্ত ব্যাপার ছিল। এখন যেমন টাকা দিয়া যে কোনও ছাত্র যে কোনও স্কুলে ভরতি হইতে পারে তখন সে উপায় ছিল না। গুরু শিষ্যকে নির্বাচন করিয়া লইতেন। সে নির্বাচনের মানদণ্ড থাকিত তাঁহার মনে, তাঁহার নিজস্ব বিচারে, বাহিরের কোনও নিয়ম দ্বারা তিনি নিয়ন্ত্রিত হইতেন না। গুরু অসাধু হইলে এরূপ নিয়মে অনেক শিষ্যের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু সে যুগে গুরুরা প্রায়ই অসাধু হইতেন না; যে যে কারণে লোকে সাধারণত অসাধু হয় সে সব কারণ তাঁহাদের জীবনে আসিবারই সুযোগ পাইত না, তা ছাড়া বিদ্যাদান সেকালে অর্থকরী ব্যবসায় ছিল না। যদিও মনুতে, ছান্দোগ্য উপনিষদে, স্মৃতিচন্দ্রিকাতে লেখা আছে শিষ্যের ধনদানের

ক্ষমতা তাহার অন্যতম যোগ্যতা* কিন্তু ধনদানটা শিক্ষাব্যাপারে কখনও প্রাধান্য পায় নাই। বিদ্যা বিক্রেয় পণ্য নহে ইহাই ছিল আদর্শ। আধুনিক যুগেও যাঁহারা বিশেষ কোন গুণীর নিকট বিশেষ কোন বিদ্যা শিখিতে যান তাঁহাদেরও নির্ভর করিতে হয় গুরুর নির্বাচনের উপর। অর্থ বা ডিগ্রী সেখানে কোনই কাজে লাগে না। শিষ্য সেই বিদ্যালাভের অধিকারী কি না তাহাই তাঁহারা বিচার করেন। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে একটা উপমা প্রচলিত আছে। গুরুর অন্তর যেন একটি জ্বলন্ত প্রদীপ; শিষ্য নিজের অন্তর প্রদীপটিকে গুরুর প্রদীপের শিখা হইতে জ্বালিয়া লইবে। কিন্তু প্রদীপ যতই চাকচিক্যশালী বা বহুমূল্য হোক না কেন ভিতরে তৈল বা সলিতা না থাকিলে সে প্রদীপ জ্বলে না। প্রদীপে তৈলসলিতা আছে কিনা তাহার বিচারই অধিকারবিচার। বীজ বপন করিবার পূর্বে কৃষক যেমন জমির গুণাগুণ বিচার করে শিষ্যকে গ্রহণ করিবার পূর্বে গুরুও তেমনি শিষ্যের গুণাগুণ বিচার করিতেন। শিষ্য হইবে শ্রদ্ধাবান, সংযতেন্দ্রিয়, শুশ্রূষু, সে হইবে সাধু, শুচি এবং মেধাবী। মনুতে, ছান্দোগ্যে, গীতায় এবং প্রাচীন শাস্ত্র-পুরাণে শিষ্যের কি কি গুণ হওয়া উচিত তাহা নানা স্থানে নানা ভাবে নানা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। বিদ্যার্থীর পাঁচটি লক্ষণ একটি বহুপ্রচলিত শ্লোকে নিবদ্ধ আছে—

কাকচেষ্টঃ বকধ্যানী শ্বাননিদ্রস্তথৈব চ।
অল্পাহারী গৃহত্যাগী বিদ্যার্থী পঞ্চলক্ষণঃ॥

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ দেব মহাশয় ১৩৫১ সালের পৌষ মাসের প্রবাসীতে 'প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে সুন্দর একটি আলোচনা করিয়াছেন।

সেকালে শিষ্য-মনোনয়নের ব্যাপারে আর একটি জিনিসকে তাঁহারা প্রাধান্য দিতেন—সেটি শিষ্যের বংশ-পরিচয়। এ যুগে এ নিয়ম হয়তো অচল। কিন্তু অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার Ancient Indian Education গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশের মনীষীরাও এখন এই বংশ-বিচারের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন—

"The investigations of Haggerty, Nash and Goodenough show further that the educational status and vocation of the parents have a significant correlation with the level of capacity of the children, as indicated by the Intelligence Quotient. For instance, the children of the professional parents or of those of a higher academic standing, possess on the whole, a higher value of I Q. The implications of such facts cannot be ignored in the scheme of National Education

পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতগণ নানারূপ মানদণ্ড ব্যবহার করিয়া সেকালের আচার্যদের মতোই ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন যে, সকলে সকল রকম বিদ্যার অধিকারী নহেন। ব্রাহ্মণের পুত্রই যে ব্রাহ্মণত্ব লাভের অধিকারী হইবেনই তাহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না, কিন্তু হইবার সম্ভাবনা যে বেশী তাহাও অস্বীকার করা শক্ত। তবে এ কথাও ঠিক যে বর্তমান সমাজের সর্ব স্তরেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্তমান। যাহারা ব্রাহ্মণপ্রকৃতির, যাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযুক্ত তাহাদের বাছিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিবার নির্দেশও পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা আজকাল দিতেছেন। Dr. Alexis Carrel বলিতেছেন যে, বর্তমান চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অবাঞ্ছিত দুর্বল লোকদের মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া সমাজকে এক শোচনীয়

* প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি—শ্রীবিমলাচরণ দেব—প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৫১।

অস্বাভাবিক অবস্থায় ফেলিয়া দিয়াছে। পূর্বে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে যে সব দুর্বল লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সুস্থ সবলদের জন্য স্থান করিয়া দিত এখন বিজ্ঞানের জন্য তাহা হইবার উপায় নাই। তিনি বলিতেছেন—Many inferior individuals have been conserved through the efforts of hygiene and medicine. We cannot prevent the reproduction of the weak when they are neither insane nor criminal, or destroy sickly or defective children as we do the weaklings in a litter of puppies. The only way to obviate the disastrous predominance of the weak is to develop them strong. Our efforts to render normal the unfit are evidently useless. We should, then turn our attention toward promoting in optimum growth of the fit. By making the strong still stronger, we could effectively help the weak. For the herd always profits by the ideas and inventions of the elite. Instead of levelling organic and mental inequalities we should amplify them and construct greater men. We must single out the children who are endowed with high potentialities and develop them as completely as possible. ...such children may be found in all classes of society, although distinguished men appear more frequently in distinguished families than in others ....ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ডেমোক্র্যাটিক আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকও অধিকারী-বিচারের পক্ষপাতী। প্রত্যেক কলেজে ভরতি হইবার সময় এখনও ছাত্রদের গুণা-গুণ বিচার করা হয়, কিন্তু সে বিচার সাধারণত হয় পরীক্ষার নম্বর হইতে। তাহার চরিত্র বা বৈশিষ্ট্যের উপর কিছুই জোর দেওয়া হয় না। তাই বোধ হয় এতদিনের সর্বজনীন শিক্ষাসত্ত্বেও আমরা সমাজে দেখিতেছি—

> কবি সে ডাক্তারি করে, ডাক্তার দোকানী
> দোকানী সেতার সাধে
> সেতারী লাঙল কাঁধে
> কৃষকের লয়েছে ভূমিকা
> প্রেমিকা সে হয়েছে লেখিকা।

তাই দেখি—

> আমাদের জীবনে প্রচুর
> একই ক্ষেতে চাষ হয় জুঁই ও কচুর।
> একটানে পান করি সুধা আর সাবু
> নানাবিধ বাবু
> আতরের ছিটা দিই ময়লা কাপড়ে
> শতকরা আশী জন গড়ে।

আর্য-সভ্যতার যখন পতন আরম্ভ হইয়াছিল তখনও হয়তো ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের আদর্শ ঠিকমতো অনুসৃত হইত না, মনু সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণদের দীর্ঘ তালিকা হইতেই তাহা অনুমিত হয়। এইবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক।

গুরুর সম্মতি পাইলে গুরু-সমীপে শিষ্যের গমনের নাম উপনয়ন—ইহা ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রথম সোপান। গর্ভের মধ্যে জননী যেমন শিশুকে গ্রহণ করেন, গুরুও তেমনি শিষ্যকে নিজের অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের অধ্যাত্ম সাধনা সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে দ্বিতীয় জন্ম দান করেন। তাই ব্রহ্মচারী মাত্রেই দ্বিজ এবং গুরু পিতৃস্থানীয়। শুধু পিতৃস্থানীয় নয়,

শিষ্যের জীবনে গুরুই সব। শঙ্করাচার্য তাঁহার গুরু-স্তোত্রে বলিতেছেন—

গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিষ্যের আদর্শ। তিনি তাঁহার চরিত্র দিয়া উপদেশ দিয়া শিষ্যের মনে যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতেন সেই পরিবেশে শিষ্য তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে বিকশিত হইত। সে যে হুবহু গুরুকে নকল করিত তাহা নয়, গুরু তাঁহার বৈশিষ্ট্যকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের ধর্মের এই আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার চিকাগো বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—The seed is put in the ground and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth or the air or the water? No. It becomes a plant, it develops after the law of its own growth, assimilates the air, the earth and the water and converts them into plant-substance and grows into a plant.

গুরুও তেমনি শিষ্যের অন্তরে একটা আদর্শ-অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতেন মাত্র। সে পরিবেশের মূল সুর ছিল সত্যান্বেষণ, সত্যের প্রতি, ব্রহ্মের প্রতি মনকে উন্মুখ করিয়া তোলা। শিষ্য নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে নিজের মতো করিয়া ব্রহ্মোপলব্ধি করিবে, গুরু তাহাকে সে উপলব্ধির পথে পাথেয় দিবেন মাত্র। ইহা ছাড়া পরিচ্ছন্ন সুসভ্য জীবন, সুগঠিত স্বাস্থ্য, নিঃস্বার্থ কর্ম, স্বাবলম্বন, অহঙ্কার ত্যাগ, বহুর মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকৃত সাম্য অর্জনের প্রচেষ্টা প্রভৃতিও সে পরিবেশের অঙ্গ ছিল। সে পরিবেশের আর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল প্রকৃতি। লোকালয় হইতে দূরে শান্ত প্রকৃতির কোলে গুরুগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইত। তাহার নাম ছিল তপোবন। রবীন্দ্রনাথ এই তপোবন-বিষয়ের একটি সুরম্য আলোচনা করিয়াছেন। কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

"ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল,—ঠেলাঠেলি ছিল না।·· তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয়, তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভ'রে তোলে তখনি শান্তরসের উদ্ভব হয়—"

উক্ত প্রবন্ধেই তিনি আর একটু পরে বলিতেছেন—"মানুষকে বেষ্টন ক'রে এই যে জগৎ প্রকৃতি আছে, এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা ক'রে মরে ··"

এই সব কারণে গুরুগৃহ লোকালয় হইতে দূরে প্রতিষ্ঠিত হইত। আর্যসন্তানগণ শৈশবে এই শান্ত

প্রাকৃতিক পরিবেশে আদর্শচরিত্র গুরুসন্নিধানে শিক্ষার জন্য উপনীত হইতেন। মনুসংহিতায় আছে *গর্ভাষ্টমে ব্রাহ্মণের, গর্ভ একাদশে ক্ষত্রিয়ের এবং* গর্ভ দ্বাদশে বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়া কর্তব্য। অতি শৈশবকালে নিজ নিজ গৃহে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে তাহারা থাকিবে। ডাক্তার Alexis Carrel এবং অন্যান্য অনেক আধুনিক শিক্ষাবিদ যে পারিবারিক শিক্ষাকে শিশুর মানসিক গঠনের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়াছেন, সে শিক্ষাকে আর্যগণও প্রাধান্য দিয়াছিলেন। শৈশবকালে নিজ নিজ পরিবারে অতিবাহিত করিয়া তবে তাঁহারা গুরুগৃহে গমন করিতেন। সে গুরুগৃহ আধুনিক স্কুল বা হস্টেলের মতো ছিল না। তাহাও ছিল তাহাদেরই গৃহের মতো গৃহ। সেখানে আদর্শচরিত্র গুরুদেব গৃহকর্তা, জননী-সদৃশা গুরুপত্নী গৃহকর্ত্রী, সেখানেও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, সন্তানসন্ততি, গৃহপালিত পশুপক্ষী যে পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা গৃহেরই পরিবেশ। মাতৃঅঙ্কচ্যুত হইয়া সে হস্টেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট বা বোর্ডিংয়ের ম্যানেজারের কবলে পড়িত না। আর একটি স্নেহকোমল মাতৃঅঙ্কে স্থানলাভ করিত। গার্হস্থ্য জীবনের সমষ্টি লইয়া সমাজ। সেইজন্য শিষ্যকে একটি আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া তাহাকে সেই পরিবারের আপনজন করিয়া লইয়া তবে শিক্ষা শুরু হইত। তাই অতি বাল্যকাল হইতেই সে পরকে আপন করিতে শিখিত। গুরু ও গুরুপত্নী নিঃস্বার্থভাবে পুত্রবৎ তাহাকে পালন করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার মনে এই সত্যটি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়া যাইত যে পরের জন্যই সংসার, অনাত্মীয় অতিথিই সংসারে পূজ্যতম ব্যক্তি, অনাত্মীয় শিষ্যেরাও গুরুগৃহে পরম স্নেহভাজন। গুরুর গৃহ তাহারই গৃহ। প্রতিদিন গুরুর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগের ফলে গুরু তাহার মানসিক প্রকৃতির সেই স্বরূপটি জানিতে পারিতেন, যাহা না জানিলে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। এক শিক্ষা সকলের পক্ষে উপযোগী নয়। কারণ *প্রত্যেকটি শিষ্যের মনের গঠন, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা,* চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। সেকালে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করিয়া সমাজের কল্যাণে তাহাকে নিয়োগ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতে সকলেই বুঝি জটাজূটধারী কমণ্ডলু-পাণি সন্ন্যাসী হইয়া ফিরিয়া আসিত। মোটেই তাহা নয়। সমাজের সর্বস্তরের লোকের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে ছিল। রাজা, প্রজা, বণিক্‌, ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা, সাধারণ গৃহস্থ সব রকম লোকই সমাবর্তন-শেষে সমাজে আসিয়া প্রবেশ করিত। সংসারবিমুখ সন্ন্যাসীর সংখ্যা বেশী ছিল না। যাহারা ছিল তাহারা প্রকৃতই আধ্যাত্মিক মার্গে বিচরণের যোগ্য; তাহাদের ব্যক্তিত্বই সন্ন্যাস-প্রবণ। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করাই ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হইত একটি বিশেষ পটভূমিকায়, সমস্ত আর্য সভ্যতাই এই পটভূমিকার উপর অঙ্কিত। সে পটভূমিকা ব্রহ্মজ্ঞান, ইংরেজি করিয়া বলিলে বলিতে হয়—The Ultimate Reality, The Eternal Truth. বাল্যকাল হইতেই এই জ্ঞান তাহার মনে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হইত যে, বাহিরের পৃথিবীতে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই, প্রত্যেকটি সৃষ্টি প্রত্যেকটি হইতে স্বতন্ত্র, এই স্বাতন্ত্র্যেই তাহার মহিমা, তাহার সার্থকতা, কিন্তু একথা ভুলিও না যে সমস্ত সৃষ্টির মূলে আছেন ব্রহ্ম, তিনিই নানারূপে নিখিল বিশ্বে নিজেকে বিকশিত করিয়াছেন, প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যেই তিনি আছেন, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র মনে হইলেও আমরা সকলেই সেই এক একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ব্রহ্মের প্রকাশ। সমস্ত বিশ্ব যেন বহু বিচিত্র শাখাপত্রবিশিষ্ট একটা বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষ, কিন্তু তাহার মূল ঊর্ধ্বে ব্রহ্মে।

সনাতন এ অশ্বত্থ নিয়ে শাখা প্রসারিয়া
উর্ধ্বমূল রহে
ইনি শুক্র, ইনি ব্রহ্ম, ইনিই অমৃত
সর্বশাস্ত্রে কহে
অতিক্রম কেহ এঁরে না করিতে পারে
সর্বভূত স্থিত এ আধারে।

শৈশব হইতে প্রকৃত সাম্যবাদের পটভূমিকায় প্রতিটি চরিত্র বিকশিত হইত বলিয়া, ধন জন জীবন যৌবন সমস্তই নশ্বর, ব্রহ্মই শুধু শাশ্বত, অহরহ এই সত্যকে সত্যদ্রষ্টা ঋষির সহায়তায় উপলব্ধি করিতে হইত বলিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সম্যক্ বিকাশ সত্ত্বেও বিরোধ বাধিত না, অশান্তির সম্ভাবনা কম থাকিত। অন্তরের সাম্যভাবই শান্তির মূল কথা। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অনেক দিন পূর্বে (কার্তিক, ১৩৩০) 'সাম্যদর্শন' সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন—"যিনি চিৎ—যিনি পুরুষ—তিনিই আত্মা। তাঁহার সাম্যই সার্বনীয়। কে সাধক আছ, সেই সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পার ? কে সাধক আছ, অন্তরের সহিত, কেবল কথায় নহে, কেবল বাহ্যিক আচারে নহে, অন্তরের সঙ্গে সেই সাম্যে আত্মসমর্পণ করিতে পার? আমি জানি বর্তমান সময়ে লক্ষ লক্ষ যুবক বলিবেন 'আমি আছি' 'আমি আছি'—কিন্তু তাহা কি প্রকৃত? যদি প্রকৃত হইত তাহা হইলে সংসার অনেকাংশে স্বর্গতুল্য হইত, আত্মদ্রোহ থাকিত না, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত। অতএব প্রকৃত নহে। সাম্য উত্তম। ধূর্ততায়, ভণ্ডতায়, বাকচাতুর্যে সে উত্তম বস্তু লাভ হয় না। যাহা উত্তম তাহা পাইতে হইলে উত্তম ভাব উত্তম সাধনা চাই। সকল জাতি মিশিয়া একত্র পান-ভোজন করা, আদান-প্রদান করা, মুখে 'ভাই' 'ভাই' বলিয়া আলিঙ্গন করা, ইহা তো বাহ্য আচরণ, অন্তরের ভাবের বিপরীত বাহ্য আচরণই ভণ্ডতা। অন্তর সাম্যের প্রতি ধাবিত হইলে বৈষম্য স্বয়ং হীনবল হয়, যেমন সাম্যের প্রতিষ্ঠা তেমনি বৈষম্যের বিসর্জন—যতটুকু সাম্যের বৃদ্ধি ততটুকুই বৈষম্যের ক্ষয়, এই অনুপাতে যদি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে প্রথমে অন্তর পরিষ্কার করিতে হইবে। প্রাকৃত বৈষম্যে যাহার মন পূর্ণ সে ব্যক্তি বাহ্য আচরণে যতই সাম্য-দর্শনের পরিচয় প্রদান করুক, তাহার তাহা ভণ্ডতা মাত্র, তাহা সাম্য-সাধনা নহে। সাম্যদর্শন বৈষম্যের ভিতর দিয়াই করিতে হয়, বৈষম্যসমূহকে একত্র করিয়া অন্তরে আবদ্ধ করিতে হয়, অন্তরেই তাহাকে বিলীন করিতে হয়। তাহাতে অন্তরেই সাম্যের নির্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যতদিন বৈষম্য অন্তরে বিলীন না হইতেছে ততদিন সাম্যের ছায়াদর্শনও ঘটে না। সাম্যের একটা নকল মাত্র লোককে দেখান হয়, যেমন বাঙ্গালার বারবণিতা সীতা সাবিত্রী সাজিয়া থাকে, সেইরূপ সাম্যদর্শনের একটা সাজ পৃথিবীতে চলিয়াছে। যে সাম্য মহৎ উচ্চ পবিত্র সে সাম্য এই নকল সাম্য নহে ·····"

অন্তর পরিষ্কার করিয়া প্রকৃত সাম্য-সাধনাই ছিল সেকালের শিক্ষার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ছিল বলিয়াই শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। আজকাল শিক্ষার লক্ষ্য আধিভৌতিক সুখ-সুবিধা—লেখাপড়া শেখে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। গাড়ি-ঘোড়া চড়িবার জন্য আমরা যেন-তেন-প্রকারেণ একটা ডিগ্রি লাভ করিতে যাই, ডিগ্রি লাভ করিয়া দেখি গাড়ি-ঘোড়া তো দূরের কথা অন্নবস্ত্রের সংস্থান পর্যন্ত করিতে পারিতেছি না। সকলেই চাকুরি চাই। বহুকাল পূর্বে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'সভ্যতার সোপানে, না জাহান্নমের পথে' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ ভাগে বাঙালী জাতির চারিত্রিক দোষ-বিশ্লেষণ করিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, "বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টায় অর্থার্জনের সকল রকম পথই বাঙ্গালী নিজের অকর্মণ্যতা ও নিশ্চেষ্টতায় রুদ্ধ করিতেছে। বাহির

হইতে দেশে ধনাগম হইতেছে না। অথচ অপব্যয় করিতে বাঙালীর কুণ্ঠা নাই ..."

দোষ বাঙালীর নয়, দোষ শিক্ষার। যে শিক্ষার বনিয়াদ জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার এই পরিণতি অনিবার্য। সেকালে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল কোনও বস্তু বা বিষয়সম্পত্তি লাভ নয়, ব্রহ্মলাভ। শৈশব হইতেই গুরু এই আকাঙ্ক্ষাটা শিষ্যের মনে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্মলাভের জন্য ডিগ্রির প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন চরিত্রের, পুঁথিগত বিদ্যাও অপ্রয়োজনীয়। উপনিষদের ঋষি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন—

অসংযমী, দুশ্চরিত্র, অস্থির, অসমাহিত
অধীর অশান্তচিত্ত যিনি
জ্ঞানী হইলেও এঁরে পাবেন না তিনি।

গুরু যখন দেখিতেন শিষ্য সংযমী চরিত্রবান হইয়াছেন তখনই তাঁহাকে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। এই অনুমতিই ছিল সমাবর্তন, ইহাই ছিল তখন সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র।

ধর্মের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ করিয়া সমাজের সহিত সেই ব্যক্তিটি যাহাতে খাপ খায় এ বিষয়েও তাঁহারা সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। সামাজিক অশান্তির মূলে থাকে অহঙ্কার, কামনা এবং তজ্জনিত অসাম্যবোধ। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, এমন কি ব্রহ্ম সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিলেও অহঙ্কার, কামনা, অসাম্যবোধ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া বা সে সম্বন্ধে আগ্রহ জাগরিত হওয়া সহজ-সাধ্য নয়, সারাজীবন সাধনা করিলেও অজ্ঞানতার তিমির দূর হয় না। তাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অহঙ্কার দূর করিবার একটা সহজ পন্থা তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকে প্রতিদিন ভিক্ষা করিতে হইত, গৃহস্থের নিকট ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করিয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্বীকার করিতে হইত যে অপরের দাক্ষিণ্য ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না। এই বিনয়, এই সকৃতজ্ঞ নম্র মনোভাব না থাকিলে সমাজসংহতি সুন্দর শান্তিপূর্ণ হইতে পারে না।

আজকাল ভিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজেও একটা কুসংস্কার প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজ যে ভিক্ষা পরাঙ্মুখ তাহা নহেন। আমরা বই চাহিয়া পড়ি, সুপারিশ ভিক্ষা করি, 'কনসেশন' ভিক্ষা করি, ধার লইবার ছুতায় টাকাও ভিক্ষা করি—একটু মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে জীবনের প্রতিপদেই "I have the honour to beg"—ইহাই আমাদের জপ-মন্ত্র, কিন্তু ভিখারীকে ভিক্ষা দিবার বেলায় আমাদের ইকনমিক্ তত্ত্বজ্ঞান জাগিয়া ওঠে, আমরা তখন idlenessকে প্রশ্রয় দিতে চাই না। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের যে সভ্যতাকে লইয়া আস্ফালন করিয়া বেড়াই সেই সভ্যতায় ভিক্ষা হীনবৃত্তি নহে, চরিত্রগঠনের এবং মুক্তিলাভের উপায়। আমাদের দেশের মহাপুরুষরা সকলেই ভিক্ষুক। একটা কথা আমরা ভুলিয়া যাই যে বর্তমান যুগে আমরা খুব কম লোকই মহাপুরুষ হইতে পারিয়াছি, কিন্তু যন্ত্রসভ্যতা আমাদের প্রায় সকলকেই হীনতম ভিক্ষুকের পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে, সেইজন্যই বোধ হয় একজন ভিক্ষুক আর একজন ভিক্ষুকের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

বর্ণাশ্রম ধর্মে ব্রহ্মচারীরা ভিক্ষা করিতেন বটে, কিন্তু নিজের জন্য নহে আশ্রমের জন্য। গৃহস্থগণও ব্রহ্মচারীদের ভিক্ষা দেওয়া গার্হস্থ্যজীবনের কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এখনও গৃহস্থেরা যে কর গভর্নমেণ্টকে দেন তাহারই একটা অংশ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হয়। সে নির্দেশের উপর দাতা বা গ্রহীতার কোন হাত থাকে না। দেশের শাসন-পরিষদ অনেক সময় নিজের খেয়ালখুশী-অনুসারে বাজেট করিয়া শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। এ ব্যবস্থায় সব সময় যে সুফল ফলে না, সব সময়

যে সুবিচার হয় না, তাহা আমরা প্রত্যহ অনুভব করিতেছি। সেকালে গৃহস্থেরা শিক্ষার জন্য যাহা দিতেন তাহার কিছুটা অংশ শিক্ষার্থীদের হাতেই দিতেন। ভিক্ষা দ্বারা আর একটা উপকারও হইত। যে গার্হস্থ্য-আশ্রমে ব্রহ্মচারীকে পরে প্রবেশ করিতে হইবে প্রতিদিন কয়েকটি গৃহস্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তাহার সুখ দুঃখ আদর্শ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থীর মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইত। সে সংসারের সহিত নির্লিপ্ত থাকিয়াও বুঝিতে পারিত সাংসারিক ব্যাপারে কত ধানে কত চাল হয়। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমেও এ ধারণা করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাহারা পাইত, কারণ আশ্রমের সমস্ত কাজই তাহাদের নিজের হাতে করিতে হইত। স্বাবলম্বন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রধান শিক্ষা ছিল।

বন হইতে কাঠ কাটিয়া যজ্ঞাগ্নির জন্য সমিধ সংগ্রহ হইতে শুরু করিয়া গো-সেবা, আশ্রমকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, কৃষিকর্মের সমস্ত কাজই ব্রহ্মচারীকে করিতে হইত। তাহার দিনচর্যাই ছিল কর্মময়। Dignity of Labour self-help প্রভৃতির উপকারিতা বক্তৃতা দিয়া তাহাদের বুঝাইবার প্রয়োজন হইত না। প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকিয়া, প্রকৃতির নানা রহস্যের আভাস পাইয়া প্রকৃতির রহস্য ভাণ্ডারে নিজেই নিত্য নব আবিষ্কার করিয়া সে সেই উপায়ে আনন্দময় জ্ঞান আহরণ করিত, যাহা আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ জ্ঞান-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। রুশো বলিয়াছেন—Don't hurt him by the various sciences, but give him a taste of them and the methods for learning them.........Let him not be taught science but discover it. If you ever substitute authority for reason in his mind he will no longer reason ; he will be nothing but the playing of other people's opinion.

আচার্য কৃপালনী মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন—From Bacon, Montaigue, John Locks the Eneyclopaedists up to the present day philosophers and educationists it has been one long protest against scholasticism and its divorce from Nature and Reality.

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে শিক্ষাবিধি প্রচলিত ছিল তাহার সবটাই ছিল Nature এবং Reality। প্রকৃতির ক্রোড়েই তাহার শিক্ষা হইত এবং যে Realityর সম্বন্ধে সে উপদেশ লাভ করিত তাহাই একমাত্র Reality, তাহার নাম ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইত বলিয়া যে মোহ সর্ব প্রকার অনর্থের মূল সে মোহ তাহার চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করিবার অবকাশ পাইত না। Alexis Carrel বলিয়াছেন বর্তমান জগতে সাধারণ মানুষ আত্মসম্মানহীন, অসহায় nameless grains of dust কিন্তু শিক্ষা যদি সত্য আত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে হয়, শিক্ষা যদি বারংবার আশ্বাস দেয়—তুমি ক্ষুদ্র নও, তুমি মহতো মহীয়ান্‌, তুমি অক্ষয় অমর, তুমিই ব্রহ্ম. সাধনা করিলেই তুমি তোমার স্বরূপকে উপলব্ধি করিবে, তোমার বিকশিত বৈশিষ্ট্য তোমাকে যে পথেই চালিত করুক না কেন, তুমি একদিন না একদিন নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিবে তোমার লক্ষ্য—"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনো খানে"। এই শিক্ষার আলোকে শিক্ষার্থী যদি বিনয়ী, কর্তব্যপরায়ণ, অহঙ্কারশূন্য হইতে পারে তাহা হইলে নিজেকে কিছুতেই সে আত্মসম্মানহীন অসহায় nameless grain of dust মনে করিবে

না। তাহার বরং মনে হইবে—আমি তুচ্ছ নই, সোঽহম্। মনে হইবে—

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্॥

অনেকে হয়তো প্রশ্ন করিবেন, আর্যদের শিক্ষাবিধি যদি এমনই চমৎকার ছিল, তাহা হইলে আর্যসভ্যতার পতন হইল কেন? ইহার ঐতিহাসিক একাধিক কারণ আছে, সে সব বিবৃত করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইব না। উত্তরে একটি কথাই শুধু বলিব আদর্শচরিত্র মানবের জীবনেও যেমন উত্থান-পতন আছে আদর্শ সভ্যতার জীবনেও তেমনি উত্থান-পতন আছে। ইহা অনিবার্য। আধি-ভৌতিক মানদণ্ডে বিচার করিলে মনে হইতে পারে আর্যসভ্যতার পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার আদর্শের মৃত্যু হয় নাই। চারি সহস্র বৎসরের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও এ সভ্যতা এখনও সজীব আছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—Sect after sect arose in India and seemed to shake the religion of the Vedas to its very foundation, but like the waters of the sea-shore in a tremendous earth-quake it receded only for a while, only to return in an all absorbing flood, a thousand times more vigourous and when the tumult of the rush was over, these sects were all sucked in, absorbed and assimilated into the immense body of the mother faith..."

এই Mother faith বহু বিচিত্ররূপে এখনও ভারতের সর্বত্র বিদ্যমান। বারট্রাণ্ড রাসেল, জোয়াড্, আলডুস্ হাক্স্লি, রম্যাঁ রলাঁ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের লেখা পড়িলে মনে হয় ভারতের বাহিরেও ইহার মহিমা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। এ দেশের মুষ্টিমেয় ট্যাস্-মার্কা কিছু লোকের মধ্যে এই faith-এর মহত্ব হয়তো কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অন্তরে আর্যধর্মের মহত্ব আর্যসভ্যতার আদর্শ আজও দেদীপ্যমান। মূর্খতম ভারতীয় হিন্দুর সহিতও আলাপ করিয়া দেখুন, দেখিবেন তাহার অন্তরের অন্তরতম তন্ত্রে এই সভ্যতার সুরটি ঠিক বাজিতেছে।

আমি অবশ্য একথা বলিতে চাহি না যে, এই আর্যধর্মের শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করিলে প্রত্যেকটি মানুষ মহাপুরুষ হইয়া উঠিবে। কোনও শিক্ষার আদর্শই সমস্ত মানুষকে একযোগে মহাপুরুষে পরিণত করিতে পারিবে না। মানুষ বড় জটিল জীব। প্রত্যেককে নিজের সাধনায় নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে ধীরে ধীরে জটিলতা-মুক্ত হইতে হয়। যে মহাভারতে আমরা আর্যসভ্যতার একটা চিত্র দেখিতে পাই, সেই মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র কি মহাপুরুষ-চরিত? হিংসা-জর্জরিত কৌরবদের সহিত ধর্মনিষ্ঠ পাণ্ডবদের যুদ্ধই তাহার বিষয়বস্তু। কিন্তু পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব-কীর্তনই মহাভারতের চরম বক্তব্য নহে। মহাভারতের চরম বক্তব্য শান্তিপর্বে, যেখানে রাজ্যলাভ করিয়াও যুধিষ্ঠির অনুতপ্ত চিত্তে আত্মীয়-নিধন-শোকে আকুল হইয়া সংসার-ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট লইয়া গিয়াছেন, যেখানে পিতামহ তাঁহাকে স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে নানা গল্প বলিয়া উপদেশ দিতেছেন—"রাজা প্রথমে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া আত্মজয়ী হইবেন, তাহার পর শত্রু জয় করিবেন। সর্বপ্রকার ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম," যেখানে তিনি বলিতেছেন—জীবের বিনাশ নাই, দেহ নষ্ট হইলে জীব দেহান্তরে গমন করে। কাষ্ঠ দগ্ধ হইবার পর অগ্নি যেমন

অদৃশ্যভাবে আকাশ আশ্রয় করে, শরীর ত্যাগের পর জীবও সেইরূপ আকাশের ন্যায় অবস্থান করে। শরীরব্যাপী অন্তরাত্মাই দর্শন, শ্রবণ, প্রভৃতি কার্য নির্বাহ করেন এবং সুখদুঃখ অনুভব করেন। সত্যই ব্রহ্ম ও তপস্যা, সত্যই প্রজাগণকে সৃষ্টি ও পালন করে।"

এই সত্য ধর্মই আর্যধর্ম, ইহারই উপর সেকালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য যে এ শিক্ষা সত্ত্বেও সেকালে দুষ্ট লোকের, বা অসুখী লোকের অভাব ছিল না। শিক্ষা বা ধর্ম একটা আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারে। সেকালে শিক্ষার আদর্শ কি ছিল তাহাই আমি এ প্রবন্ধে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

অনেকে বলেন এই বৈরাগ্যমূলক মনোবৃত্তিকেই আধুনিক যুগে escapism বলে। এই পলায়নী মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত?

আর্যশিক্ষা যে বৈরাগ্যকে মহিমান্বিত করিয়াছে, গীতায় উপনিষদে যে বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য কীর্তিত তাহা পলায়নী মনোবৃত্তি নহে, তাহা সুস্থ সবল কর্মীর মনোবৃত্তি, তাহা অপরাজেয় যোদ্ধার মনোবৃত্তি। শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার কর্মকথা পুস্তকে বৈরাগ্য সম্বন্ধে একটি চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। আর্য সভ্যতার মর্মবাণী সে আলোচনায় ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—"কর্মত্যাগে তোমার অধিকার নাই, আসক্তি ত্যাগ কর; অর্থাৎ কর্তব্যবোধে কর্মাচরণ কর, ফল কামনা করিও না, কর্মত্যাগে কিন্তু তোমার অধিকার নাই। ইহাই ছিল সেকালের বৈরাগ্য, সেকালের কর্মসন্ন্যাস। সে কালের, যে কালে মনুষ্যজীবনের মূল্য ছিল, মনুষ্য নির্ভীকচিত্তে বিশ্বজগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিত; জগতে যাহা কিছু আছে তাহা আত্মার ঈশিত দ্বারা আবৃত এই মহাবাক্য যখন উচ্চারিত হইয়াছিল। শুদ্ধজ্ঞান এই বৈরাগ্যের প্রসূতি, ভক্তি, তৃপ্তি ও মুক্তি এই বৈরাগ্যের ফল। ...সংসারের শোণিত-কর্দমময় পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সহস্রবার স্খলিতপদ হইয়া আততায়ীর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিয়া যে শিক্ষালাভ হয় তাহারই চরম ফল দুঃখমুক্তি..."

এই মনোভাব পলায়নী মনোভাব নহে।

শ্রদ্ধেয় অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয় কিছুকাল পূর্বে "বেদ-সংহিতায় নৈতিক আদর্শ" নামক চমৎকার একটি প্রবন্ধে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ প্রভৃতি হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, প্রাচীন আর্যগণের জীবনদর্শন কত সুস্থ, কত সবল, কত প্রাণ-দীপ্ত ছিল। পলায়নী মনোবৃত্তির আভাসমাত্র তাহাতে নাই। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল "পশ্যেম শরদঃ শতম্, জীবেম শরদঃ শতম্" আমরা যেন শত শরৎ দেখি, আমরা যেন শতবর্ষ বাঁচি; জীবনের বাধা-বিঘ্ন দেখিয়া তাঁহারা পলায়নপর হন নাই, নির্ভীককণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বং
বীরয়ধ্বং এ তরতা সখায়ঃ।

প্রস্তরসঙ্কুল জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে। বন্ধুগণ সংহত শক্তিতে অগ্রসর হও, বীরের মতো চল। এ নদী উত্তীর্ণ হও।

দেবতার নিকট তাঁহাদের প্রার্থনা ছিল—

তুমি তেজস্বরূপ, আমাকে তেজ দাও,
তুমি বীর্যস্বরূপ আমাকে বীর্য দাও,
তুমি বলস্বরূপ আমাকে বল দাও,
তুমি ওজঃস্বরূপ আমাকে ওজঃ দাও,
তুমি মন্যুস্বরূপ আমাকে মন্যু দাও,
তুমি সাহসস্বরূপ আমাকে সাহস দাও।

জীবন যুদ্ধে তাঁহারা বীরের মতো অগ্রসর হইয়া জয় কামনা করিতেন—

যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ
যুদ্ধন্তে যস্যামা ক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ
সা নো ভূমি এ মুদতাং সপন্তা ন সপত্নং
মা পৃথিবী কৃণোতু।

যাহাতে মানবেরা কলরবের সহিত গায়, নৃত্য করে, যাহাতে তাহারা যুদ্ধ করে, যাহাতে রণগর্জন হয়, দুন্দুভি বাজে, সে ভূমি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে সরাইয়া আমাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী করুক। বলা বাহুল্য ইহা পলায়নী মনোবৃত্তি নহে। কিন্তু তাঁহারা যে পাপপুণ্যবোধহীন বিষয়ী ছিলেন না তাহার প্রমাণও ওই ঋগ্বেদেই আছে। মানুষ পৃথিবী ভোগ করিবে সত্যের পথে, ধর্মের পথে থাকিয়া, ওই বৈদিক ঋষিগণই প্রার্থনা করিতেছেন—যাহা ভিন্ন কোন কর্ম করা যায় না আমার সেই মন মঙ্গলেচ্ছাযুক্ত হোক। হে পূজ্য দেবগণ, আমরা যেন কর্ণ দ্বারা যাহা কল্যাণময় তাহা শুনি, আমরা যেন চক্ষু দ্বারা যাহা কল্যাণময় তাহা দেখি।"

সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনকে প্রাচীন আর্যগণ যে জীবন-দর্শন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া শান্তি ও আনন্দের সন্ধান করিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু নমুনা দিতে গিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গেল। পরিশেষে একটি কথা শুধু বলিতে চাই। কেহ যেন মনে না করেন যে অতীতকে ফিরাইয়া আনিয়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপক্ষে আমি ওকালতি করিতেছি। সে প্রয়াস যে হাস্যকর তাহা আমি জানি। ইহাও আমি জানি বর্তমানই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। বর্তমানের সমস্যা, বর্তমানের জীবন-স্পন্দন, বর্তমানের সুখ-দুঃখ-জটিলতার একটা বিভিন্নতা আছে, অতীতের মহিমাকীর্তন করিয়া বর্তমানের সে বৈশিষ্ট্য আমি ভুলিয়া যাইতে চাহি না। কিন্তু এ কথা ভুলিলেও চলিবে না যে অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনভূমি বর্তমান। অতীতের অভিজ্ঞতাকে বর্তমান ত্যাগ করিতে পারে না, যে সব শাশ্বত সত্য অতীতকালে আবিষ্কৃত হইয়া মানবকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়াছিল তাহা অতীতকালে হইয়াছিল বলিয়াই বর্জনীয় নহে। বর্তমান যুগের সমস্যাগুলিকেও অতীত অভিজ্ঞতা দিয়াই সমাধান করিতে হইবে। অতীতকালে লব্ধ জ্ঞানকেই বর্তমান কালোপযোগী করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

আমাদের বারংবার এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যে কথা আমাদের দেশের জ্ঞানীরা বহুপূর্বে বহুবার বলিয়াছেন যে ধর্মই আমাদের জীবনপথের প্রধান পাথেয়। এ যুগের মনীষীরাও ঠিক ওই কথাই বলিতেছেন। Joad এর God and Evil পুস্তক হইতে দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি—Men, in short require to be comforted and re-assured and for this purpose they invoke forces of reassurance which are felt to be both eternal and unchanging. From this conflict of and combination between these various factors God emerges to satisfy our desires and fulfil our needs. আমাদের নিজেদের প্রয়োজনের জন্যই ধর্ম চাই, ভগবান চাই—এ তথ্য চিরপুরাতন, চিরনূতন।

কি করিয়া ধর্মবোধকে আমাদের শিক্ষায় ও জীবনে জাগ্রত করা সম্ভব, আদৌ তাহা সম্ভব কি না, তাহার বাধা কোথায়, পরবর্তী প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করিব। ক্রমশঃ

"আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জিজ্ঞাসা

শ্রীমতী দীপালি দেবী

কবে, তোমায় স্মরি আসবে প্রভু
আমার চোখে জল
শুনবো কবে তোমার বাণী,
তোমার রাতুল চরণধ্বনি
স্তব্ধ করি বিশ্ব কোলাহল।

প্রভু, আমার এমন দিন কি হবে—
তোমার সাথে কইব কথা যবে—
শান্ত হবে হৃদয় চঞ্চল।
কবে, তোমায় আমি শোনাব মোর গান,
ভুলে সকল গভীর ব্যথা সকল অভিমান,
তোমার প্রেমে উঠবে ফুটে
চিত্ত শতদল॥

করুণা

শ্রীমতী পুষ্পা বসু

সেদিন তোমায় চাইনি প্রভু
নিবিড় ক'রে।
সেদিন তোমায় বাসিনি ভালো
আবেগ ভরে॥
সেদিন তোমায় দেখিনি ফিরে
নয়ন মেলে।
সেদিন তোমায় করিনি পূজা
পরাণ ঢেলে॥
সেদিন তোমায় নিইনি খুঁজে
মানস-পুরে।
সেদিন তোমায় ডাকিনি কাছে
প্রেমের সুরে॥

তবুও আমায় রেখেছ প্রভু
তোমার ছায়ে।
তবুও আমায় নিয়েছ ডেকে
রাতুল পায়ে॥
তবুও আমায় বেসেছ ভালো
দুখের সাঁজে।
তবুও আমায় দিয়েছ দিশা
জীবন মাঝে॥
তবুও আমায় করেছ সুখী
প্রাণের গানে।
তবুও আমায় ভরেছ তুমি
অতুল দানে॥

শ্রমণ অহিংসক

শ্রীজয়দেব রায় এম্‌-এ, বি-কম্‌

ভগবান বুদ্ধের জীবনব্রত ছিল পাপীকে পাপমুক্ত করা, দুর্জনকে সাধু সজ্জনে পরিণত করা, লোভীকে নির্লোভ ত্যাগীতে রূপান্তরিত করা। তাঁহার কৃপায় দস্যু রত্নাকরের মতন, ডাকাত কেনারামের মতন হিংস্র অঙ্গুলিমালও সাধু শ্রমণ অহিংসকে রূপান্তরিত হইয়া ধর্মকার্যে আত্মোৎসর্গ করেন।

কাশীরাজ এবং কোশলরাজের রথ একবার এক সংকীর্ণ পথে বাধিয়া যায়। তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা বিচারকল্পে উভয়ের সারথি নিজ নিজ প্রভুর গুণকীর্তন করিতেছিল। কাশীরাজের সারথি বলিল, —"আমার প্রভু সাধুলোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন, কিন্তু দুরাত্মার কাছে তিনি বজ্রের মতো কঠোর।"

কোশলরাজের সারথি হাসিয়া বলিল—"তাইতো স্বাভাবিক; কিন্তু আমার প্রভু ক্রোধীকে অক্রোধে, লোভীকে নির্লোভতায় জয় করেন। অসতের সঙ্গে সৎ ব্যবহার ক'রে, দুরাত্মাকে নিজ পুণ্যের অংশ দান ক'রে তিনি বশীভূত করেন।"

ভগবান বুদ্ধ সেইভাবেই দেশজোড়া হিংসাকে দূর করেন, কত দুর্জন দুরাত্মা হিংস্রক তাঁহার পূত আশীর্বাদে সজ্জন, পুণ্যাত্মা, অহিংসকে পরিণত হইয়াছেন। ধনী শ্রেষ্ঠী এবং রাজারাই যে কেবল তাঁহাদের ধনরত্ন, রাজ্যসম্পদ, ঐহিকসুখ হেলায় পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন, তাহাই নয়; তাঁহাদের অপেক্ষা কঠোর ত্যাগ করিয়া দস্যু তাহার স্বভাব পরিত্যাগ করিয়াছে, নিষ্ঠুর হিংস্র নরহত্যাকারী মহাপাপী তাহার জিঘাংসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছে। অঙ্গুলিমালও ছিল এই ধরণের এক দুরাচার, দুর্বৃত্ত দস্যু।

তাহার অত্যাচারে সমগ্র জনপদ ভয়ে কম্পমান থাকিত, প্রজারা বিব্রত হইয়া ঘরবাড়ী ফেলিয়া ভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিত। ভগবান বুদ্ধ তাহাকে উদ্ধার করিলেন, তাঁহার প্রসাদে সেই দস্যুই সাধু অহিংসকরূপে জনপদবাসীর সেবায় পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

অঙ্গুলিমালের পিতা ভার্গব ছিলেন কোশল-রাজের প্রধান পুরোহিত; তিনি এবং তাহার স্ত্রী উভয়েই অতি সাধুপ্রকৃতির ছিলেন। অঙ্গুলিমালের আসল নাম ছিল অহিংসক—প্রথম জীবনে না হইলেও শেষ জীবনে তাহার নাম সার্থকতা লাভ করে। দুর্যোধন জন্মগ্রহণ করিলে চারিদিকে যেমন দুর্লক্ষণ দেখা যায়, অহিংসকের জন্মক্ষণেও সেইরকম অস্ত্রাগারের অস্ত্রশস্ত্র আপনা হইতেই সংঘর্ষিত হইয়া ভীষণ অগ্নি উৎপাদন করে। সাধু ভার্গব ভীত হইয়া নবজাতককে ত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন। রাজা কিন্তু এই কথা শুনিয়া বাধা দিলেন—

"আপনি রাজগুরু, আপনি যদি পুত্রত্যাগ করেন, প্রজারা কুদৃষ্টান্ত ব'লে ধরে নেবে। তাহ'লে শাসনকার্যে আপনার সুনামের, গৃহস্থের গার্হস্থ্য-প্রশান্তির এবং রাজশক্তির স্বাচ্ছন্দ্যের হানি হবে। আপনি দ্বিধাহীন ভাবেই পুত্রের লালনপালন করুন।"

অল্পদিন পরেই দেখা গেল অহিংসক যথার্থই বুদ্ধিমান, শান্ত, সুশীল বালক। ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র এবং শস্ত্র বিদ্যায় তাহার নিপুণতা প্রকাশ পাইল। সুযশে তাহার নাম ভরিয়া গেল, তাহার জন্মক্ষণের দুর্লক্ষণের কথা সকলেই ভুলিয়া গেল।

তক্ষশিলার এক বিখ্যাত অধ্যাপকের গৃহে

অহিংসক উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিত। তাহার মেধা এবং রূপগুণের কাছে সহপাঠীরা সকলেই পরাস্ত হইল। ঈর্ষ্যায় জর্জরিত হইয়া তাহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল।

অধ্যাপকের স্ত্রী অহিংসকের প্রতি স্নেহানুরক্ত ছিলেন। অহিংসকও তাঁহাকে নিজের মাতার মতনই ভক্তি করিত। সহপাঠীরা এই ব্যাপারকে কলুষিত রূপ দিয়া অধ্যাপকের কানে তুলিল।

অধ্যাপক সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া ছাত্রকে অভিশাপ দিলেন—"শাস্ত্রে তোমার বিন্দুমাত্র অধিকার থাকবে না, শস্ত্রবিদ্যায় তুমি নরহত্যা ক'রে জীবিকা নির্বাহ করবে। এক সহস্র নিরীহ পথিকের বৃদ্ধাঙ্গুল সংগ্রহ না করা পর্যন্ত তোমার মুক্তি নেই।"

নিরীহ নিরপরাধ অহিংসক মিথ্যা অপবাদ এবং গুরুর অভিশাপ মাথায় করিয়া জনপদ ত্যাগ করিয়া বনে আশ্রয় লইল। বনের এক অংশে বহু দেশ হইতে বহুপথ আসিয়া মিলিত হইয়াছে, দলে দলে পথিক কর্ম-ব্যপদেশে দিবারাত্রি বন অতিক্রম করিয়া যাতায়াত করিত। অহিংসক তাহাদের হত্যা করিতে লাগিল নির্বিচারে। গুরুর অভিশাপে বাধ্য হইয়াই সে নরহত্যা শুরু করে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার সাধুবৃত্তি সমস্তই সমূলে উৎপাটিত হইল। সমস্ত জনসমাজের উপর এক বিজাতীয় ক্রোধ, ঘৃণা এবং হিংসার ভাব তাহার মনকে অধিকার করিল, নিষ্ঠুরভাবে নিরীহ পথিককে হত্যা করিয়া সে পৈশাচিক আনন্দ পাইত।

সমগ্র দেশে ভয়ভীতির সঞ্চার হইল, পারতপক্ষে কেহই আর দেশে পথে বাহির হইতে চাহিল না। কিন্তু বাধ্য হইয়াই লোককে বন অতিক্রম করিতে হইত, দেশের আভ্যন্তরীণ চলাচল তো বন্ধ থাকিতে পারে না। অঙ্গুলি-সংগ্রাহক দস্যু তখন 'অঙ্গুলি-মাল' নামে পরিচিত হইয়াছে।

রাজা প্রসেনজিৎ নানাভাবেই দুর্বৃত্তকে দমন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হায় সবই বৃথা! অঙ্গুলিমালের পরাক্রমে রাজশক্তি পরাস্ত হইল।

রাজপুরোহিত বহু পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন—অদৃষ্টকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, তাঁহার সেই দুর্গ্রহে জাত পুত্রই আজ সমগ্র রাজ্যের শঙ্কাস্থল। পুরোহিত-পত্নী সংকল্প করিলেন তাঁহার গর্ভলজ্জার হাতে তিনি নিজেই প্রাণত্যাগ করিবেন। অঙ্গুলিমাল-জননী একাকী তাহার উদ্দেশ্যে চলিলেন।

ভগবান বুদ্ধ এইসময়ে জেতবনে বিহার করিতেছিলেন। অঙ্গুলিমালের জননী পুত্রের হাতে জীবনোৎসর্গ করিতে যাইতেছেন শুনিয়া তিনি ধ্যানে বসিলেন। তাহার পূর্ববৃত্তান্ত অনুধাবন করিয়া বুঝিলেন, এইবার তাহার সৎপথে আসিবার সময় হইয়াছে। পাপের পাত্র আজ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছে! তিনিও যাত্রা করিলেন পাপীকে উদ্ধার করিতে, পাপকে দূর করিতে।

তখনও পর্যন্ত অঙ্গুলিমাল ৯৯৯ জন নিরীহ পথিককে হত্যা করিয়াছে, আর একজনকে হত্যা করিলেই তাহার ব্রত সিদ্ধ হয়। কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া একটিও শিকার না পাইয়া সে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজচ্যুত, ধর্মহীন, নিঃসঙ্গ দস্যু তাহার নিজের পাপনেশাতেই মত্ত হইয়াছিল; স্বাভাবিক জীবন তাহার কাছে এখন সম্পূর্ণ নিরর্থক; নিশ্চিন্ততার অবকাশ তাহার ছিল না।

এমন সময় ভগবান বুদ্ধ তাহার সম্মুখ দিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে চলিয়া গেলেন, অঙ্গুলিমাল তখনই তাহার ভীষণ খড়্গ লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিল। পশ্চাৎ হইতে যতবারই দস্যু তাঁহাকে আঘাত করিতেছে—কিন্তু একি! তাঁহার দেহ তো স্পর্শ করা যাইতেছে না! অঙ্গুলিমাল বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—

"কে তুমি? দাঁড়াও, আমার ব্রত পূর্ণ করি।" ভগবান থামিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে আগাইয়া গিয়া তাহার মস্তকে কৃপাহস্ত রাখিলেন। বহুদিন

পর দস্যু মমতার স্পর্শ পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার অবশ হাত হইতে নরহত্যাকারী খড়্গ খসিয়া পড়িল, সে তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

করুণাবিগলিত করুণাঘন ধীরে ধীরে তাহাকে ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন—ধর্মহীন দুরাত্মার মনে তাহার গতজীবনের সুকৃতির কথা স্মরণ হইল। মন্ত্রমুগ্ধ অনুতাপী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া চলিতে লাগিল। প্রভু তাহাকে সত্যধর্মে দীক্ষা দিলেন। দস্যু অঙ্গুলিমাল বহুদিন পরে শ্রমণ অহিংসকে পরিণত হইলেন।

রাজা প্রসেনজিৎ দস্যুর বহুদিন খোঁজখবর না পাইয়া আশ্বস্তচিত্তে এইবার তাহাকে সমূলে বিনষ্ট করিবার আয়োজন করিলেন। যুদ্ধজয়ের পূর্বে ভগবানের আশীর্বাদ লইবার জন্য তিনি জেতবনে আসিলেন।

প্রভু প্রশ্ন করিলেন—"কি রাজা, বোধ হচ্ছে তুমি কোনো রাজ্যজয়ের অভিযানে যাত্রা করেছ!"

রাজা বিব্রত বোধ করিয়া বলিলেন—"না প্রভু, একজন দস্যুকে বন্দী করবার এই আয়োজন।"

প্রভু বলিলেন—"তা হ'লে আর তোমার যাবার প্রয়োজন নেই, সে দস্যুর মৃত্যু হয়েছে।"

এই বলিয়া তিনি যেখানে অহিংসক ধ্যান করিতেছিলেন, রাজাকে সেখানে লইয়া গেলেন। রাজা মহাবিস্ময়ে বলিলেন—"একি! এই তো সেই বর্বর দস্যু!"

ভগবান বলিলেন—"না, এ অন্য লোক। দস্যুর জীবন শেষ হয়েছে, সাধুর জীবনের শুরু হয়েছে। এঁর যোগ্য সম্মান দিতে তুমি কুণ্ঠিত হ'য়ো না।"

রাজা তাঁহার কণ্ঠহার দিয়া সম্মান করিতে গেলে অহিংসক সসঙ্কোচে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি তখন সকল পার্থিব কামনা বাসনার অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করিতেছেন।

বুদ্ধশিষ্য অহিংসক প্রভুর নাম জনপদবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহার পূর্বকৃত হিংস্রতার কথা তখনও লোক ভুলিতে পারে নাই, তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে ঘৃণায় লোকে দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল।

তখনও আর এক পরীক্ষা বাকি; সত্যসত্যই তিনি পূর্বজীবনকে অতিক্রান্ত করিয়া আসিয়াছেন কিনা! একদা নগর-উপকণ্ঠে এক কুৎসিতা রোগগ্রস্তা রমণী পথের উপর প্রসবযন্ত্রনায় অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহা দেখিয়া ব্যথিতহৃদয়ে বিহারে ফিরিয়া বুদ্ধদেবকে বলিলেন, "প্রভু, ওকে উদ্ধার করুন।"

শত শত নিরীহ পথিকের যন্ত্রণাদায়ক নৃশংস হত্যাকারী আজ একটি সামান্যা রমণীর স্বাভাবিক কষ্টদৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না!

অমিতাভ বলিলেন—"ওর যন্ত্রণার উপশম একমাত্র তুমিই করতে পারো। তুমি দ্বিধা-সংকোচ-হীন ভাবে ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে সত্যভাষণ করো—"আমি যদি কোন দিন পাপ ও হিংসা না করে থাকি, তবে আমার পুণ্যের সমগ্র অংশের কল্যাণে এ রমণীর যন্ত্রণার অবসান হোক্, এবং বিনাকষ্টে এ ইন্দ্রোপম সন্তানের জন্ম দিক্।"

অহিংসক ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—"কিন্তু প্রভু, সে কথা তো সত্য নয়! আমি যে কত শত শত নিরীহ প্রাণকে খেলার ছলে হত্যা করেছি; আমার যে পুণ্যের এক কণাও সম্বল নেই!"

তবু ভগবান যখন বলিয়াছেন অহিংসক নির্বিশঙ্ক-চিত্তে তাঁহার কথার পুনরুক্তি করিয়া আসিলেন। দেখিতে দেখিতে রমণীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইল, সে নির্বিঘ্নে প্রসব করিল।

শ্রমণ বিহারে ফিরিয়া ভগবানকে বলিলেন—"প্রভু, আমি তো মিথ্যাভাষণ করে এলাম?"

প্রভু বুদ্ধ সস্মিতবদনে বলিলেন—"না, তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার তো পুনর্জন্ম হয়েছে, গত জীবনের ক্লেদ-পাঙ্কল মুছে গিয়েছে, পরহিতে জীবনসেবায় তোমার এ জীবন এখন উৎসৃষ্ট।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম দর্শনে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমেতে—
ঘুরছে আমার মন,
লাগলো দুটি চক্ষে আমার
অমৃত অঞ্জন।

পেলাম আমি এমন শুভ দৃষ্টি,
সবই আমার লাগছে বড় মিষ্টি,
বুকের মাঝে হাজার ময়ূর
করছে রে নর্তন।

২

সত্য হলো 'ঠাকুর দেখা'
সফল হল যাওয়া,
কম লোকেরি ভাগ্যে ঘটে
এমন কৃপা পাওয়া।

দুর্লভেরে হঠাৎ পাওয়া এ যে,
আনন্দে বুক চক্ষু আমার ভেজে,
আপনাকে যাই যে ভুলে
আমি ক্ষণে ক্ষণ।

৩

কাঠ পাথর, কি চুণ বালি নয়—
ভাব দিয়ে এ গড়া,
ধরার মাঝে নূতন যে এক
কান্তিমতী ধরা।

অনুভবে মিলিয়ে আমি যাই।
সে সায়রের থই আমি না পাই
তৃণ কুসুম পারিজাতের
পাই যে আলিঙ্গন।

"সৎ আদর্শ ও ভাবগুলিকে এমনভাবে সুপরিণাম লাভ করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত চরিত্র ও জীবন গঠন করিতে পারে। পাঁচটি সৎভাবকে যদি তুমি পরিপাক করিয়া নিজের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিতে পার, তাহা হইলে যিনি কেবল একটি পুস্তকাগার কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার অপেক্ষা তোমার শিক্ষা অনেক বেশী।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রতীকোপাসনা মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ

(শ্রৌত ও স্মার্ত উপাসনার সামঞ্জস্য)

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

এক্ষণে আমরা একটু অবান্তর বিষয়ের বিচার করিয়া লইব—এই অধ্যাস ও সম্পদুপাসনার স্তর অতিক্রম করিবার পূর্বেই যদি সাধকের দেহত্যাগ হয়, তাহার কি গতি হইবে? সাধক মোক্ষকামী বা ভগবদ্দর্শনকামী হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভগবদ্দর্শনের পূর্বে শরীর ত্যাগ হইলে তাঁহার সমস্ত সাধনাই কি বিফল হইবে? তদুত্তরে "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" (গীতা ৬।৪০) ইত্যাদি ভগবদ্বচনের অনুসরণ করিয়া বলিব—দেবযানমার্গে তাঁহাদের দেবলোকে গতি ও তথায় দীর্ঘকাল বাস করিয়া মনুষ্যলোকে পুনরাবৃত্তি হয় এবং স্বকর্মোচিত কুলে জন্মগ্রহণ করেন (গীতা ৬।৪১-৪২), ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে "নাম ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপাসকেরও তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা কিন্তু সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। এইপ্রকার সন্দেহ হওয়া উচিত নহে, কারণ "নাম ব্রহ্ম" ইত্যাদি প্রতীকোপাসক মোক্ষকামী নহেন, ব্রহ্মক্রতুও নহেন, সাংসারিক কোন বিশেষ ফল-কামনা-বশেই তাঁহারা তাদৃশ উপাসনা সকলের অনুষ্ঠান করেন। আমাদের প্রস্তাবিত এই স্মার্ত উপাসক কিন্তু 'ব্রহ্মক্রতু'—ব্রহ্মের উপাসক, ব্রহ্মকে জানিবার জন্যই তিনি অধ্যবসায়শীল। সুতরাং 'নাম ব্রহ্মোপাসনা' ইত্যাদি প্রতীকোপাসনা হইতে এই স্মার্ত ব্রহ্ম-উপাসনার প্রভেদ আছে। আবার উপাসনাও ক্রিয়াবিশেষ, সুতরাং যজ্ঞাদি ক্রিয়ার ন্যায় তাহাও অদৃষ্টের উৎপাদক। আর এইজাতীয় কর্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা উপাসনা যে অদৃষ্টদ্বারে ফলপ্রদান করে, ইহা উত্তরমীমাংসার ৩।৩।৩৫ কাম্যাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আবার "বিদ্যয়া দেবলোকঃ" (বৃঃ ১।৫।১৬)—'উপাসনার দ্বারা দেবলোকে গমন হয়', এইপ্রকার শ্রুতিও আছে কিন্তু দেবযানমার্গে গমন ব্যতিরেকে দেবলোকে গমন সম্ভব নহে। আবার "জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে"—(গীতা-৬।৪৪) ['ব্রহ্মবিদ্যারূপ] যোগবিষয়ক জিজ্ঞাসুও বেদোক্ত কর্মফলকে অতিক্রম করে', ইত্যাদি স্মৃতিবচন-বলে এতাদৃশ সাধকের পক্ষে বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠানকারিগণের প্রাপ্য যে পিতৃযানমার্গে চন্দ্রলোকাদি প্রাপ্তি, তাহাও কল্পনা করা যায় না। আর কর্মানঙ্গভূত প্রতীকোপাসনার ফলে যে দেবলোক লাভ হয় না, ইহাও বলা যায় না, কারণ "আকাশ ব্রহ্মোপাসনা" (ছাঃ ৭।১২।২) ইত্যাদি কোন কোন তজ্জাতীয় উপাসনাতে জ্যোতির্ময় দেবলোকলাভাদি * ফলসকলও বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল যুক্তি ও শ্রুতিবাক্য-বলে প্রতীকাবলম্বনে এতাদৃশ

* ইদানীন্তনকালে কেহ কেহ বলেন—এই দেবলোক ও ব্রহ্মলোক ইত্যাদি ভ্রমমাত্র, ইহাদের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব—তোমাদের এই পৃথিবীলোক এবং তোমাদের এই সুখদুঃখাদি সত্য অথবা ভ্রম? ইহা যে সত্য ইহা তাহাদিগকে বলিতেই হইবে। এখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তবে স্বর্গাদিলোকই বা ভ্রম হইবে কেন? এই পৃথিবী তোমার নিকট যতটা সত্য, স্বর্গাদিলোকবাসিগণের নিকট স্বর্গাদিও ততটাই সত্য। এই পৃথিবী যদি তোমার নিকট সত্য হয়, স্বর্গাদিই বা স্বর্গবাসীর নিকট মিথ্যা হইবে কেন? আর পৃথিবীলোক যে ভ্রমাত্মক, নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান উৎপত্তির পূর্বে, ইহা তুমি বলিতেই পার না। বলিলে, তাহা কথার কথা বা মিথ্যাভাষণমাত্র হইবে। ব্রহ্মবস্তু ব্যতিরেকে সমস্তই মিথ্যা বলিয়া, নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তির পর ইহলোক ও সর্গাদিপরলোক সমস্তই মিথ্যা ও ভ্রমমাত্রে পর্যবসিত হয়, তাহার পূর্বে নহে।

ব্রহ্মোপাসকের দেবযানমার্গে উচ্চাবচ দেবলোকে গমন স্বীকার করিতে হইবে। কারণ অদৃষ্ট কখনও বিফল হইতে পারে না। তবে "অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি" (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১৫) এই সূত্রোক্ত ন্যায়বলে এতাদৃশ প্রতীকোপাসকের গম্য লোক যে বিদ্যুল্লোকের নিম্নবর্তী কোন দেবলোক, ইহাই নিশ্চিত হয়, কারণ বিদ্যুল্লোকের ঊর্ধ্বে যাইবার তাঁহার অধিকার নাই। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৮।১-৪, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৩।৩৩ এবং পাতঞ্জলদর্শনের ৩।২৬ ব্যাসভাষ্যে নানাপ্রকার দেবলোকের বর্ণনা দ্রষ্টব্য। পুরাণবিদ্গণ এই বিষয়ে আরও আলোকসম্পাত করিতে সমর্থ। অধ্যাসোপাসকাপেক্ষা সম্পদুপাসকের লভ্য দেবলোক যে আরও ঊর্ধ্ববর্তী এবং তাঁহার প্রাপ্য স্বর্গসুখও যে অধিকতর হয়, ইহাও এই উভয়প্রকার সাধকের সাধনার তারতম্যদৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক প্রতীকাবলম্বনা হইলেও এতাদৃশ ব্রহ্মোপাসনার ফলে সাধকের দেবলোকপ্রাপ্তি স্বীকৃত হইলে যে উত্তরমীমাংসা-ন্যায়ের বিরোধ হয় না, ইহা নিশ্চিত হইল।

[স্মার্ত প্রতীকাবলম্বনা উপাসনার অহংগ্রহোপাসনাতে পরিণতি]

ইহা গেল অবান্তর বিচার। এক্ষণে আমরা পুনরায় প্রস্তাবিতের অনুসরণ করিব। দেবতা-প্রতিমাদিরূপ প্রতীকালম্বনে উপাসনাতে প্রবৃত্ত যে সাধকের নিকট প্রতীকটি অপ্রধান এবং উপাস্য দেবতাই প্রধান হইয়া পড়িয়াছে, তাদৃশ সাধকের মন সাধনার প্রভাবে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম বিষয়ের ধারণা করিতে সমর্থ হয়। লৌহ যেমন চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এতাদৃশ সাধকও তদ্রূপ প্রতীকাদি সমস্ত আলম্বন ত্যাগ করিয়া একমাত্র স্বাভ্যন্তরবর্তী পরম প্রেমাস্পদের দিকে ধাবিত হয়। সেই বিষয়ে শাস্ত্র এই—

> "যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
> তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্॥
> বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
> মামনুস্মরতশ্চিত্তং মষ্যেব প্রবিলীয়তে॥" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।১৪।২৫-২৬)

> "আত্মভাবং নয়ত্যেনং তদ্ ব্রহ্ম ধ্যায়িনং মুনিম্।
> বিকার্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা॥" (বিষ্ণুপুঃ ৬।৭।৩০)

পুনঃ পুনঃ অঞ্জনযোগে চক্ষু যেমন [দোষ ত্যাগ করত] সূক্ষ্মবস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ মদীয় পবিত্র চরিত্রের কীর্তন ও শ্রবণাদি দ্বারা আত্মা (-অন্তঃকরণ) পরিশোধিত হয় এবং সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়। যিনি বিষয়ের চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত বিষয়সকলে আসক্ত হয়, আমাকে চিন্তা করিলে কিন্তু চিত্ত আমাতেই বিলীন হয়।" "সেই ব্রহ্ম, ধ্যানশীল মুনিকে আত্মভাবে গ্রহণ করেন (—নিজস্বরূপে লীন করিয়া লন), যেমন চুম্বক নিজের শক্তির দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লৌহকে নিজের সহিত যুক্ত করিয়া লয়।" সেই পরম প্রেমাস্পদের দিকে ধাবিতচিত্ত সাধক কোন কোন অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাঁহার সহিত একীভূত হন, শাস্ত্র তাহা বলিতেছেন—

> "তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
> ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ॥"

'সাধনাভ্যাস পরিপক হইলে ভগবানে শরণাগতি 'আমি তাঁহার', 'তিনি আমার' এবং 'তিনিই আমি'—এই তিনপ্রকার হইয়া থাকে।' ভক্তির অল্প উন্মেষে সাধক মনে করেন—'আমি ভগবানের।' ভক্তির প্রাবল্যে সাধক মনে করেন—'ভগবান আমারই।' আর প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হইলে 'তিনিই আমি', সাধক এই অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকেন। কিন্তু 'তিনিই আমি' এই যে সাধনের পরিপক্কাবস্থা, তাহা সহজলভ্য নহে। কি প্রকারে তাহা লব্ধ হয়, শাস্ত্র তাহা বলিতেছেন—

"ব্রজতস্তিষ্ঠতোঽন্যদ্বা স্বেচ্ছয়া কর্ম কুর্বতঃ।
নাপয়াতি যদা চিত্তাৎ সিদ্ধাং মন্যেত তাং তদা॥" (বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৮৭)

"তিনি গমন করিতেই থাকুন বা স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকুন, অথবা স্বেচ্ছায় কোন কর্মের অনুষ্ঠানই করুন, শ্রীভগবানের মূর্তি আর তাঁহার চিত্তমন্দির হইতে দূরে যাইতে পারে না। এই প্রকার যে অবস্থা ইহাকে সাধকের ধ্যানের সিদ্ধাবস্থা মনে করিতে হইবে।" এই অবস্থা প্রাপ্তির পর সাধককে আরও সূক্ষ্মাবস্থাতে লইয়া যাইবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—

"ততঃ শঙ্খগদাচক্রশার্ঙ্গাদিরহিতং বুধঃ।
চিন্তয়েদ্ভগবদ্রূপং প্রশান্তং সাক্ষসূত্রকম্॥
যদা চ ধারণা তস্মিন্ অবস্থানবতী ততঃ।
কিরীটকেয়ূরমুখৈর্ভূষণৈ রহিতং স্মরেৎ॥
তদেকাবয়বং দেবং সোঽহং চেতি পুনর্বুধঃ।
কুর্যাৎ ততো হ্যহমিতি প্রণিধানপরো ভবেৎ॥* (বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৮৮—৯০)

"অনন্তর বিজ্ঞ ব্যক্তি শঙ্খ, গদা, চক্র ও ধনুকাদিরহিত, কিন্তু অক্ষমালা ও যজ্ঞোপবীতযুক্ত শ্রীভগবানের প্রশান্ত রূপকে (ধ্যান) করিবেন। যখন সেইরূপে ধারণা (চিত্তের স্থিরীভাব) স্থায়ী হইবে, তখন শ্রীভগবানের মূর্তিকে কিরীট, কেয়ূর ইত্যাদি ভূষণরহিতভাবে স্মরণ (—ধ্যান) করিবেন। তদনন্তর [পদযুগল, গুল্ফ, হাস্যবিকসিত মুখমণ্ডল ইত্যাদি] এক একটি অবয়বযুক্ত দেবতাকে চিন্তা করিবেন (তাঁহার এক একটি অবয়বে চিত্তসমাধান করিবেন)। ধীমান্ ব্যক্তি অতঃপর "তিনিই আমি" এইপ্রকার ধ্যান করিবেন; তদনন্তর "আমি" ('আমিই তিনি')—এইপ্রকার ধ্যানশীল হইবেন।"

লক্ষ্য করিতে হইবে—সাধক এক্ষণে বাহ্য প্রতিমাদি প্রতীকসকলকে ত্যাগ করিয়া স্বীয় হৃদয়মন্দিরে মনোময়ী প্রতিমাতে 'অহংগ্রহোপাসনাতে' প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও অহংগ্রহোপাসনা' এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—

* এই পাঠ আমরা পাতঞ্জল দর্শনের ৩৬ সূত্রের ব্যাসভাষ্যের 'তত্ত্ববৈশারদীতে' প্রাপ্ত হইলাম। প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণসকলে কিন্তু উক্ত ৬।৭।৯০ সংখ্যক শ্লোকটিতে এই প্রকার পাঠ পরিদৃষ্ট হয় না। সেই সকল পুস্তকে "সোঽহং চেতি" এইস্থলে "চেতসাহি" এবং "হ্যহমিতি" এইস্থলে "অবয়বিনি"—এই প্রকার পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য; তাহাতে মূলশ্লোকের এইস্থলে প্রধান প্রতিপাদ্য যে 'অহংগ্রহোপাসনা' তাহাই ব্যাহত হইয়া পড়ে। তত্ত্ববৈশারদীকার পূজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্রের পরবর্তীকালে "অহংগ্রহোপাসনাতে আতঙ্কগ্রস্ত" কোন সাম্প্রদায়িক পণ্ডিত হয়তো মূলের পাঠ এই প্রকারে বিকৃত করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক আমরা অহংগ্রহোপাসনা প্রতিপাদক আরও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মূর্তিং সংপূজয়েদ্ধরেঃ।" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।৩।৫৫) অর্থ স্পষ্ট। টীকাকার পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অত্রস্থ 'তন্ময়ং' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'ভগবদাকারম্' ইতি অহংগ্রহোপাসনা উক্তা। শ্রীমদ্ভাগবতেই অন্যত্র এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"তৎসর্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্॥
তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥"
(শ্রীমদ্ভাঃ ১১।১৪।৪১—৪২)

"সেই সর্বব্যাপক (—শ্রীভগবানের মূর্তির সর্বাঙ্গে সঞ্চরণশীল) চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া একস্থানে (একটী অবয়বে) ধারণ করিবে। পুনরায় অন্য অঙ্গ সকলকে চিন্তা করিবে না, কেবল হাস্যবিকসিত মুখমণ্ডলকে ভাবনা করিবে। চিত্ত সেই স্থলে স্থির হইলে তাহাকে আকর্ষণ করত আকাশে (সর্বকারণাত্মক মৎস্বরূপে*) ধারণ করিবে। আবার তাহাকেও ত্যাগ করত আমাতে আরোহণ করিয়া (—আমার সহিত অভেদ চিন্তন করত 'আমিই ব্রহ্ম' এই প্রকার অনুভব করিয়া আর কিছু চিন্তা করিবে না (ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যান—এই প্রকার বিজ্ঞানকেও চিন্তা করিবে না)।" এই প্রকারে এখানে 'অহংগ্রহোপাসনাই' বর্ণিত হইল, বুঝিতে হইবে। ইহাই পরবর্তী শ্লোকে শ্রীভগবান্ আরও স্পষ্ট করিতেছেন—

"এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্॥" (ঐ ১১।১৪।৪৩)

"এই প্রকারে সংযতচিত্ত যোগী আত্মস্বরূপ আমাকে নিজের মধ্যে দর্শন করে এবং নিজেকে জ্যোতিরও জ্যোতিস্বরূপ সর্বাত্মক আমাতে সংযুক্তরূপে দর্শন করে।" (—শ্রীধর টীকা অবলম্বনে)। এইস্থলে 'আমাকে নিজের মধ্যে' এবং 'নিজেকে আমার মধ্যে'—এই প্রকারে শ্রীভগবান্ উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণে "সোঽহম্" এবং অহমিতি"—এইরূপে পঠিত অহংগ্রহোপাসনাই বিবৃত করিলেন। বিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্লোক বিকৃত হইলেও অহংগ্রহোপাসনা-প্রতিপাদক এইপ্রকার বহু শাস্ত্র-বাক্য তন্ত্র ও পুরাণবিদ্গণ উদ্ধৃত করিতে পারেন। অনুবাদ না দিয়া আরও দু একটি বাক্য আমরাও উদ্ধৃত করিতেছি—

"ভবেন্নিরন্তরং ধ্যানাদভেদ প্রতিপাদনম্।" (বৃঃ নারদীয় পুঃ ৩১।১৪২)

"নির্লেপং নির্গুণং শুদ্ধং আত্মানং তারিণীময়ম্।
অন্তরীক্ষে ততো ধ্যায়েৎ আকারাদ্রক্তপঙ্কজম্।*
* * এবম্ভূতং স্বমাত্মানং ধ্যায়েচ্চ তারিণীময়ম্॥" (নীলতন্ত্র, চতুর্থপটল)

"চৈতন্যং সর্বভূতানাং যদ্ব্রহ্মসোঽহমীশ্বরঃ।
সোঽহমিত্যস্য সততং চিন্তনাদ্দেবরূপতা।
আত্মনো জায়তে সম্যগ্‌ভাবনামাত্র সংশয়॥" (গন্ধর্বতন্ত্র ১২ পটল, ৫৫ পৃঃ)

'গুরুমন্ত্রা বিধানেন সোঽহমিতিপুরোধতঃ।
ঐক্যং সম্ভাবয়েদ্ধীমান্ জীবস্য ব্রহ্মণোঽপিচ॥ (ঐ ৯ম পটল ৫০ পৃঃ)

* শ্রীধরস্বামী। † বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

এইরূপে দেখালেন সাধক প্রতিমাদি প্রতীকালম্বনে ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেও ক্রমশঃ তিনি অহংগ্রহোপাসনার স্তরে আরোহণ করেন। প্রতীকে আর তাঁহার কোনও আবশ্যকতা থাকে না; "এই মাটিতে খোল হয়" ইত্যাদির ন্যায় প্রতীক তখন তাঁহার প্রেমাস্পদের উদ্দীপকমাত্র হইয়া পড়ে।

[মনোময়ী প্রতিমা প্রতীক নহে]

এইস্থলে দুই প্রকার সন্দেহ হয়—অপ্রতীকালম্বনা সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকে অহংগ্রহোপাসনা বলা হইয়াছে। এক্ষণে মনোময়ী প্রতিমাতে জীবের অভিন্নতা ধ্যানকে অহংগ্রহোপাসনা বলা হইল। কিন্তু মনোময়ী প্রতিমা তো প্রতীক। সুতরাং তাহার সহিত অভেদোপাসনাকে আর অহংগ্রহোপাসনা বলা যায় কি প্রকারে? এই প্রকার সন্দেহের নিরসনের জন্য, মনোময়ী প্রতিমা যে প্রতীক নহে, ইহাই এক্ষণে আমরা প্রতিপাদন করিতেছি—"দেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কার করিয়া যে অনাত্ম বস্তুসকল উপাসিত হয়, তাহাদিগকে বলে প্রতীক," ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রীভগবানের যে মনোময়ী প্রতিমা, তাহা কিন্তু প্রতীক নহে, কারণ এইস্থলে কোন অনাত্ম বস্তুকে দেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কার করিয়া উপাসনা করা হইতেছে না। সাক্ষাৎ পরমেশ্বরেরই এইস্থলে আমরা উপাসনা করিতেছি, তবে তাহাতে রূপ ও গুণের আরোপ করা হইয়াছে মাত্র। প্রতীক তাহাকেই বলে, 'যেখানে মৃত্তিকা ও কাষ্ঠাদি নির্মিত, সুতরাং অনাত্মভূত প্রতিমাদি বস্তুতে আত্মবস্তুর আরোপ হয়।' মনোময়ী প্রতিমাতে কিন্তু আত্মবস্তুতে রূপাদি অনাত্মবস্তু আরোপিত হইতেছে। সেইহেতু মনোময়ী প্রতিমাকে আর প্রতীক বলা যায় না। কিন্তু কিছু আরোপিত তো হইল? হাঁ, তাহা হইল, কিন্তু কিছু আরোপিত হইলেই তো তাহাকে প্রতীক বলা যায় না। কারণ শাস্ত্রকারগণ তো আরোপিত বস্তুমাত্রকেই প্রতীক বলেন নাই। তাঁহারা যে অর্থে যে শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাকে সেইরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। আর নির্গুণ ও নিরবয়ব পরমেশ্বরে কিছু আরোপিত না হইলে, তাঁহার উপাসনাই সম্ভব হয় না।*

এই বিষয়ে শাস্ত্রও বলেন—

"সত্যং হি নির্গুণা দেবী, সত্যং হি নির্গুণঃ শিবঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণো মতঃ॥"

(কাল্যার্চনচন্দ্রিকাতে উদ্ধৃত মুণ্ডমালা তন্ত্র)

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

(রাম পূঃ তাঃ উপঃ ৭, কুলার্ণবতন্ত্র ৫।৬)

"শিব ও শিবা নির্গুণ, ইহা সত্য, তথাপি উপাসকগণের সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁহারা গুণযুক্তরূপে চিন্তিত হন।" চৈতন্যমাত্রস্বরূপ, অদ্বিতীয়, সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগতভেদবিহীন, এবং শরীরবিহীন যে ব্রহ্ম, উপাসকগণের উপাসনাস্বরূপ কার্যের জন্য তাঁহার রূপ কল্পিত হইয়াছে (—তাঁহাতে গুণ ও অবয়ব আরোপিত হইয়াছে।)†

এইরূপে দেখা যাইতেছে—সম্পদুপাসনার স্তর অতিক্রম করিয়া সাধক যে 'মনোময়ী প্রতিমাতে' চিত্তসমাধান করিতেছেন, আত্মবস্তুতে অবয়বাদি অনাত্মবস্তু আরোপিত হওয়াতে তাহাকে আর প্রতীক

* 'আরোপিতরূপেণাপ্যুপাসনোপপত্তেঃ'—বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহঃ, ২।২১২ পৃঃ, বসুমতী।

বলা যায় না। পরন্তু তাহাকে নিরুপাধিক ব্রহ্মের সোপাধিক স্বরূপই বলিতে হইবে। ইহাই হইল মনোময়ী প্রতিমার প্রতীকত্বনিরাকরণে প্রথম যুক্তি। এই বিষয়ে অন্যান্য যুক্তি এই—শ্রীমদ্ভাগবতে আট প্রকার প্রতিমার বর্ণনা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

> "চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।
> উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চনে॥" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।২৭।১৩)

"প্রতিমা সচলা ও অচলা, দুই প্রকার, [তন্মধ্যে] জীবের হৃদয়মন্দিরে যে মনোময়ী প্রতিমা তাহা অচলা। শ্রীভগবান্ সেখানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।* হে উদ্ধব, সেই স্থিরা প্রতিমাতে আবাহন ও বিসর্জন নাই।" এই ভগবদ্বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই মনোময়ী প্রতিমা, অন্য সাত প্রকার প্রতিমা হইতে ভিন্ন। অন্যান্য প্রতিমার ন্যায় ইহাতে আবাহন ও বিসর্জন নাই। যাহা প্রতীকরূপ প্রতিমা, তাহাতে কিন্তু আবাহন ও বিসর্জন থাকে। মনোময়ী প্রতিমাতে তাহা না থাকায় এবং শ্রীভগবান্ তথায় নিত্যই প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাহা যে প্রতীক নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। ইহা হইল এই বিষয়ে দ্বিতীয় যুক্তি। তৃতীয় যুক্তি এই—ভগবান্ শারীরকভাষ্যকার উত্তরমীমাংসা-দর্শনের ৪।১।২ আত্মত্বোপাসনাধিকরণের ভাষ্যে বলিতেছেন—"যেখানে প্রতীকদৃষ্টি অভিপ্রেত, সেইস্থলে বচনটি একবারমাত্র পঠিত হয়, যথা—"মনো ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৮।১), "আদিত্যঃ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইত্যাদি। এখানে কিন্তু "তুমিই আমি" এবং "আমিই তুমি" শাস্ত্র এই প্রকার বলিতেছেন। সেইহেতু প্রতীকবোধক বাক্য হইতে ইহার অসাদৃশ্য আছে", ইত্যাদি। প্রস্তাবিত বিষ্ণুপুরাণ† এবং অন্যান্য স্মৃতিবাক্যেও দেখুন—'আমিই তুমি' এবং 'তুমিই আমি' এই প্রকারে উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং মনোময়ী প্রতিমাতে এই উপাসনা যে প্রতীকালম্বনা নহে, ইহাই নিশ্চিত হয়। এই বিষয়ে চতুর্থ যুক্তি এই—উত্তরমীমাংসা-দর্শনের ৪।১।৩ প্রতীকাধিকরণে প্রতীকে আত্মদৃষ্টি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এখানে শাস্ত্র কিন্তু মনোময়ী প্রতিমাতে আত্মদৃষ্টি করিতে বলিতেছেন। সুতরাং মনোময়ী প্রতিমা যে প্রতীক নহে, ইহাই নির্ণীত হয়। অতএব মনোময়ী প্রতিমাতে এই উপাসনা যে অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মোপাসনা অর্থাৎ অহংগ্রাহোপাসনা, ইহাই সিদ্ধ হইল।

[স্মার্ত অহংগ্রহোপাসনার অনুষ্ঠানপ্রকার ও ফল]

যাহা হউক, এইরূপে দেখা গেল—প্রতিমাদি প্রতীকাবলম্বনে আরব্ধ কর্মানঙ্গভূত প্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যা ক্রমশঃ অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যাতে (অহংগ্রহোপাসনাতে) পরিণত হয়। সুতরাং সিদ্ধিলাভ

† কেহ হয় তো বলিতে পারেন—নির্গুণ ও নিরবয়ব পরমেশ্বরে গুণ ও অবয়বের এই প্রকার আরোপ করিল কে? অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিগণই কি অস্মদাদির সুবিধার জন্য তাহা করিয়াছেন? অথবা সদা সুবিধাবাদী আমরাই তাহা করিয়া লইয়াছি? তদুত্তরে বলিব—এই উভয়ের মধ্যে কেহই নহেন। অল্পশক্তি জীবের উপর কৃপাপরবশ নির্গুণ নিরাকার ও মায়াধীশ পরমেশ্বরই স্বীয় অচিন্ত্য মায়াশক্তিকে অবলম্বন করত স্বয়ংই নিজেতে তাহা আরোপ করিয়াছেন, অর্থাৎ গুণ ও অবয়বাদিযোগে জীবের নিকট কৃপা করিয়া তিনি প্রকাশিত হন। শ্রুতিতে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"তেভ্যঃ হ প্রাদুর্বভূব" (কেন উঃ ৩।২)—'নিজেকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গোচর করিলেন।' "সঃ তস্মিন্ এব আকাশে স্ত্রিয়ম্ আজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্" (কেনউঃ ৩।১২)—তিনি (ইন্দ্র) সেই আকাশে নানা স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা বহুসৌন্দর্যময়ী উমার নিকট গমন করিলেন। ইত্যাদি। স্মৃতিও বলেন—"নির্গুণোঽপি নিরাহারো লোকানুগ্রহরূপধৃক্" (বৃঃ নারদীপুঃ ৩১।১৪), ইত্যাদি।

* "প্রতিতিষ্ঠতি অস্যাং ভগবান্ ইতি প্রতিষ্ঠা"—রাঘবাচার্যকৃতটীকা।

না হওয়া পর্যন্ত বৈদিক অহংগ্রহোপাসনাসকলের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করিয়া যেমন দীর্ঘকাল নিরন্তর অতি যত্ন ও আদরসহকারে তাহার অনুশীলন করিতে হয়; এই স্মার্ত অহংগ্রহোপাসনাসকলের বেলাতেও তাহাই করিতে হইবে। শ্রীশ্রীদুর্গা, কালী, শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি সগুণ ব্রহ্মমূর্তি সকলের মধ্যে যে কোন একটিকে, অথবা সগুণব্রহ্মের অবতারভূত শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যে কোনও একজনকে স্বীয় উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া উক্তরূপে দীর্ঘকাল নিরন্তর অতি যত্ন ও আদরসহকারে তাহাতে চিত্তসমাধান করিতে হইবে, যতকাল না সিদ্ধিলাভ হয়। সিদ্ধিলাভ হইলে সাধকের উপাস্যাকারা চিত্তবৃত্তি মৃত্যুকাল পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে এবং তাহাই দেহত্যাগকালে অন্ত্যবৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" (গীতা ৮।৬)

এই বাক্যোক্ত নিয়মানুযায়ী সাধকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির হেতু হয়, ইহা উত্তরমীমাংসাদর্শনের ৪।১।৮ আপ্রয়ণাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'সিদ্ধিলাভ' শব্দের অর্থ—'তদ্ভাবাপত্তি' অর্থাৎ ইষ্টস্বরূপতাপ্রাপ্তি। যেমন শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানকালে 'আমিই শ্রীবিষ্ণু' এবং 'শ্রীবিষ্ণুই আমি'—এই প্রকার ব্যতিহারধ্যান করিতে করিতে সাধক বিষ্ণুস্বরূপই হইয়া যান্। এই অবস্থাতেই সাধক "দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি" (বৃঃ ৪।১।২)—"দেবতা হইয়া দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন," এই বাক্যবর্ণিত অবস্থা প্রাপ্ত হন। আর সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই শ্রৌত অহংগ্রহোপাসনার দ্বারা প্রাপ্তব্য অবস্থা হইতে এই স্মার্ত অহংগ্রহোপাসনার দ্বারা প্রাপ্ত অবস্থার কোন প্রকার প্রভেদ না থাকায় শ্রৌত এই উপাসনার যাহা ফল, তাহাই স্মার্ত এই উপাসনার দ্বারাও লব্ধ হইয়া থাকে—ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। অতএব শ্রৌত অহংগ্রহোপাসনাতে সিদ্ধ সাধকের যেমন দেবযান-মার্গে বিদ্যুল্লোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গতি, তথায় অবস্থিতি, পুনরায় ইহলোকে অনাবৃত্তি এবং কল্পান্তে হিরণ্যগর্ভের সহিত বিদেহমুক্তি লব্ধ হয়, এই স্মার্ত অহংগ্রহোপাসকেরও তাহাই হয়, ইহা অসন্দিগ্ধরূপেই বলা যাইতে পারে। তবে নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিদ্‌গণের 'সদ্যোমুক্তি' একরূপা হইলেও, তাঁহাদের ব্রহ্মাকারাবৃত্তির স্থায়িত্বানুসারে যেমন তাঁহাদিগকেও 'ব্রহ্মবিদ্‌বর' 'ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্' ও 'ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ' ইত্যাদি অবস্থাবান্ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, অহংগ্রহোপাসকের বেলাতেও তদ্রূপ 'আমিই বিষ্ণু', এইপ্রকার ভাবাপন্ন অবস্থাতে সাধকের স্থিতির তারতম্যানুযায়ী তাঁহার লব্ধব্য ব্রহ্মলোকরূপ ফলও 'সালোক্য', 'সারূপ্য', 'সামীপ্য' ও 'সার্ষ্টি' ইত্যাদি ভেদে বিভিন্ন হইবে, কি না—তাহা চিন্তনীয়। এই বিষয়ে কোন শাস্ত্রপ্রমাণ আমরা এখনও প্রাপ্ত হই নাই। তবে 'সাধনাধিক্যে ফলাধিক্য'—এই ন্যায়ানুসারে উক্তপ্রকার বিভিন্ন ফলকল্পনা হয়তো অন্যায্য হইবে না। তবে দাস্য সখ্যাদি ভেদভাবাবলম্বী সাধকের উক্ত ব্রহ্মলোকরূপ ফল যে সালোক্যাদিভেদে বিভিন্ন, ইহা শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যিনি আমাদের প্রকৃত মাতা ছিলেন

(শ্রীমা সারদা দেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

শ্রীবীণাদেবী সেন, সাহিত্যসরস্বতী

মানুষের জীবনে সব চেয়ে মহৎ জিনিস হচ্ছে ধর্ম—যা মানুষকে ধারণ করে রাখতে পারে। পৃথিবীর মলিন, পঙ্কিল স্রোত থেকে নিজকে দূরে রাখতে হলে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত মানুষের জীবনে অন্য কোনো গতি নেই, অন্য কোনো পন্থাও নেই। যতদিন সুখ, ঐশ্বর্য, বা *ঈপ্সিত কাম্য যা কিছু মানুষকে আবৃত করে রাখে* ততদিন সে অহমিকার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তারই জীবনে এমন দিন আসে যখন পৃথিবী তার নিকট শূন্য, সংসার তার নিকট দুঃসহ ; তখন নশ্বর জগতে দাঁড়িয়ে ধর্মের বিরাট আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত তার আর কোনো উপায় থাকে না। যেদিন পৃথিবীর ছায়া তাকে আবৃত করে, সেদিন মানুষ কাকে অবলম্বন করে বাঁচবে ? তখন এই নিষ্প্রভ, আলোকহীন ভূমণ্ডলে যিনি আলো বিতরণ করেন তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। বহুদিন পূর্বে এক চিত্রে দেখেছিলুম—উত্তাল তরঙ্গান্বিত সমুদ্র, অকূল জলধি—সমুদ্রের উপরে ত্রাণকর্তা যিশু। একটি মেয়ে আলুলায়িত কেশে পরিত্রাতাকে স্পর্শ করতে উদ্যত। নীচে লিখিত আছে other refuge have I none—. ইহা প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য—আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ঈশ্বর। যিনি ধর্ম বিতরণ করেন তিনি পুণ্য সঞ্চয় করেন—কিন্তু যিনি সে ধর্মকে গ্রহণ করতে পারেন, নিজ অন্তরে উপলব্ধি করতে পারেন তিনি তদপেক্ষা পুণ্যবান। ধর্মের ভিত্তির উপর যিনি সমস্ত জীবনের অট্টালিকাকে নির্মাণ করেছিলেন সেই মহীয়সী পুণ্যবতী জননী শ্রীশ্রীসারদামণি পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী। তাঁর অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত আমাদিগকে বিস্মিত করে। শৈশবে ছিল তাঁর অতি সাধারণ ভাব, সরলতা ছিল তাঁর মূর্তি। তাঁর শৈশব থেকে ধর্মপ্রবণতা তাঁকে সমস্ত জীবনপথে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর সংস্পর্শে যারা আসতো তাদের তিনি অমায়িক ব্যবহার, সুমিষ্ট ভাষণ দিয়ে মোহিত করতেন। এমনই একজন সৌভাগ্যশালিনী *মহামানবীর সংস্পর্শে এসে বহু তৃষিত চিত্ত শীতল* হয়েছিল, বহু বিপথগামী জন পরম পথকে অবলম্বন করেছিল, বহু অশান্ত হৃদয়ের উপর তাঁর শান্তিবারি বর্ষিত হয়েছিল। চৈতন্যরূপিণী জগদম্বারূপে তিনি তাঁর মায়ের গৃহে প্রবেশ করলেন। শৈশব তাঁর অতিবাহিত হয়েছিলো কর্মব্যস্ততায়, নিতান্ত সাধারণ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে।

অতি শৈশবেই মায়ের বিবাহ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে এবং যদিও তাঁদের ভিতর কোন দৈহিক সম্পর্ক ছিল না তবুও পরস্পরের ভিতর যে মধুর দাম্পত্য-সম্পর্ক ছিল তা জগতের ইতিহাসে বিরল। মায়ের আশৈশব সহৃদয়তা, আজীবন কারুণ্য তাঁকে শৈশবে প্রস্ফুটিত করে তুলেছিল, যৌবনে তাঁকে দীপ্তিমতী করেছিল, পরবর্তী জীবনে তাঁকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করে তুলেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং শ্রীমায়ের অদর্শন থাকতো বহুদিন, ব্যবধান থাকতো প্রচুর, কিন্তু মায়ের প্রতি ঠাকুরের স্নেহ ছিল অনিন্দ্য, অপরিসীম, অপূর্ব সুন্দর। মায়ের ধৈর্য ছিল অদ্ভুত, সহনশক্তি ছিল অসীম। কামারপুকুরে থাকাকালীন তাঁকে আহারাদি বিষয়ে কত যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল তা অবর্ণনীয়, তবুও তিনি ভ্রমক্রমেও বাক্য-উচ্চারণে সে অভাবের জন্য দায়ী করেননি একটি প্রাণীকেও। ঠাকুর

রামকৃষ্ণ সাধারণ সন্ন্যাসীর মত পত্নীর সহিত যাহা কিছু মধুর সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি। একদিকে সংযম, অন্যদিকে স্নেহ—একাধারে পবিত্র ব্রহ্মচারী, অন্যদিকে স্নেহশীল আত্মীয় এই দুয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ, কিন্তু ইহার মূলে কি মা সারদামণি নাই? অবশ্যই আছে। স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় রাত্রিতে শয়ন করে যিনি আত্মসংবরণ করতে পারেন তিনি ঋষি কিন্তু যে সহধর্মিণী সে পুণ্যদানে পতিকে সহায়তা করেন তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সহধর্মিণী অর্থাৎ পতির সহিত যিনি ধর্ম সম্পাদন করেন। শ্রীমা হয়তো শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধর্মপথ হতে বিচ্যুত করতে পারতেন নারীর স্বাভাবিক আসক্তি এবং মোহের প্ররোচনায়। প্রেম বিতরণ ক'রে, সারল্য দিয়ে, অতি সারারণ নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধি দিয়ে কিরূপে দুর্বৃত্তের হৃদয় জয় করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পেয়েছি আমরা—যেদিন কিশোরী বয়সে একাকিনী নিশীথ রজনীতে পথ হারিয়ে ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। ডাকাতকে পিতৃসম্বোধন করে, ডাকাতের স্ত্রীকে মাতা সম্বোধন করে বিপদ হতে রক্ষা পেয়েছিলেন, এবং অবশেষে তাদের স্নেহ প্রচুর লাভ করেছিলেন। সর্ব ধর্মের সারাংশ হচ্ছে কোন জীবকে তুচ্ছ না করা। সমচক্ষুতে সবজীবকে নিরীক্ষণ করাই সর্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠাংশ। একটি তুঁতে মুসলমানকে বারান্দায় খেতে দেওয়াতে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিবাদ করাতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাকে সমাদর করে খাইয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে যে কথা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তা মহত্ত্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে 'আমার শরৎ যেমন ছেলে, আমজাদও তেমনি' উচ্ছিষ্ট স্থানটি নিজ হাতে ধুইয়ে দিলেন জননী যে ভাবে সন্তানের জন্য করে। জাতিকুল ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে প্রীতির চক্ষে তিনিই দেখতে পারেন যিনি পরমপিতার সহিত একত্র হতে পেরেছেন। যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন প্রতি মানুষের ভিতরে পরমপুরুষ ঈশ্বরের আবির্ভাব। তাঁর অন্তরে তিনি সাড়া পেয়েছেন।

"জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" Abu Ben Adam শুধু মাত্র মানুষকে ভাল বেসেছিলেন তাই স্বর্গদূত জানিয়ে গেলেন তিনিই যথার্থ ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং তাঁর নাম তালিকার সর্ব উপরে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়ে মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়, আমরা শ্রীশ্রীমায়ের পরিচয় পাই তাঁর অপরিসীম ঔদার্য, করুণা এবং ভক্তির দ্বারা। তিনি তপস্বিনী, সন্ন্যাসিনী ছিলেন সত্য, কিন্তু সংসারের তুচ্ছতম কথা তাঁর দৃষ্টিপথ এড়ায় নাই। সংসারের আবিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে তিনি প্রতিটি কার্যে লিপ্ত ছিলেন, তাই তিনি আমাদের পরমমাতারূপে অভিহিত।

তাঁর আদর্শ, তাঁর জীবন আমাদের প্রতি নারীচরিত্রে প্রতিফলিত হোক, তাঁর জীবনে জন্ম লাভ করিয়া সমস্ত নারীজাতি জাগ্রত হোক।

সমালোচনা

ভাগীরথী—শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি—প্রণীত। ৯, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা—২৯ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—১০১; মূল্য—আড়াই টাকা।

গল্প ও প্রবন্ধরচনায় সিদ্ধহস্ত বাঙলা সাহিত্যের 'ভাস্কর'-প্রণীত ভাগীরথী একখানি কাব্যগ্রন্থ। লেখক ইহাতে প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্ঘ্য, অনুবাদ, বাস্তবিক, অটোগ্রাফ, কাল্পনিক—এই কয়েকটি

বিভাগে ভাগ করিয়া তাঁহার কবিতাগুলি পরিবেশন করিয়াছেন। প্রাচীন পন্থায় রচিত হইলেও কবিতাগুলির মধ্যে এমন একটি সহজ আন্তরিকতা রহিয়াছে যাহা কবিতামোদীদিগের আনন্দবর্ধন করিবে। কয়েকটি উন্নত ধরনের হাস্যরসের কবিতাও বইখানিতে স্থান পাইয়াছে।

শিক্ষার কথা—শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, এম্ এ পি-এইচ্ ডি (এডিন)—এফ্ এন্ আই প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম্-এ, জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১২২ ; মূল্য দুই টাকা।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ভূয়োদর্শী গ্রন্থকার 'শিক্ষার কথা' প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের অশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন হইলেন। বর্তমানে শিক্ষাসমস্যা ভারতের অন্যতম বৃহৎ সমস্যা। লেখক শিক্ষার গলদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত তাহার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁহার সুচিন্তিত ও রসোত্তীর্ণ প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়াছেন। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলে অভিভাবকদেরও যে সহযোগিতা প্রয়োজন তাহা 'অভিভাবকদের জন্য' প্রবন্ধটিতে যৌক্তিকতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক শিক্ষক ও প্রত্যেক অভিভাবকেরই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত।

ভজহরি—শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ ('ভাস্কর')—প্রণীত ; গ্রন্থকার কর্তৃক ৯, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা—২৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৮৮ ; মূল্য—আড়াই টাকা।

ভজহরি নামে এক বেকার যুবক কিভাবে দুনিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতে সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ হইল তাহার সরস কাহিনী পান, উপায়, পাইলট, বিচালীভবন, কুটীরশিল্প, গণক, কলহ, গলো গলো গল্পগুলির মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি গল্পেই বর্তমান সমাজের বিভিন্ন ছবি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। আধুনিকতম ঘটনা ও চিন্তার স্রোতে লোকে কেমন ভাসিয়া চলিয়াছে লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িয়াছে! জুয়াচুরিতে ও গণকগিরিতে টাকা রোজগার, পাইলটের চন্দ্রলোকে গমন, গলিতে গলিতে অবতার, সব কিছুই আজ যেন অতি স্বাভাবিক! স্বচ্ছন্দ গতিতে গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে না হাসিয়া পারা যায় না। মাঝে মাঝে সমাজ ও লোক-চরিত্রের উপর কটাক্ষপাতগুলি বেশ উপভোগ্য। বইখানি গল্প-রসিকদের প্রিয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

ভারতসন্তান—শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীদীপ্তিময় বন্দ্যো-পাধ্যায়, জামতারা, এস্, পি। প্রাপ্তিস্থান ২০১, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা—৭ ; পৃষ্ঠা—৯৫ ; মূল্য—১॥০ টাকা মাত্র।

যুগ যুগান্তরের ঘাতপ্রতিঘাত সত্ত্বেও ভারতের যে নিজস্ব ভাবধারাটি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো আজও প্রবাহিত তাহাকে অবলম্বন করিয়া রচিত এই তিন অঙ্কের নাটকখানি বেশ আনন্দদায়ক। প্রচলিত নাটক সমূহের গতানুগতিকতা-বর্জিত বলিয়া ইহার আবেদন হৃদয়স্পর্শী, কিন্তু মাঝে মাঝে কথোপকথনগুলি অযথা দীর্ঘ হওয়ায় নাটকের সাবলীল গতি ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল।

নির্মাল্য—(পত্রসঙ্কলন)—ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার লিখিত। প্রকাশক—শ্রীরবি কর, দি স্কুপ্ট্, ৭৫নং যতীনদাস রোড, কলিকাতা—২৯, পৃষ্ঠা—৫৬ ; মূল্য দেড় টাকা।

প্রখ্যাতনামা দার্শনিক ও অধ্যাপক স্বর্গত ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকারের ৩৩ খানি পত্রের সঙ্কলন। পত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা লীলাবতী দেবীকে লিখিত। একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সংযমী, উন্নতিকামী যুবক কিভাবে তাঁহার সহধর্মিণীকে তাঁহার কর্ম ও ধর্মজীবনের চলার পথে সহগামিনী ও সর্বতোভাবে তাঁহারই যোগ্য করিয়া

তুলিবেন তাহার একটি সুন্দর নির্দেশ প্রথম দিককার পত্রগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ডক্টর সরকারের বিদেশভ্রমণকালে লিখিত শেষের দিককার পত্রগুলির মধ্যে তাঁহার জীবনের সুপরিণত ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট। পাঠক-পাঠিকা বহুশ্রদ্ধেয় জ্ঞানতাপসের এই পত্রগুলি পড়িয়া প্রভূত আনন্দ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সবার মা সারদা—শ্রীঅতুলানন্দ রায়, বিদ্যা-বিনোদ, সাহিত্যভারতী—প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যরতন সাহা, নবগ্রন্থ নিকেতন, ৩৭-১, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ; পৃষ্ঠা—২১২; মূল্য তিন টাকা।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী আবির্ভাব হইতে লীলাসংবরণ পর্যন্ত বাংলা সাল অনুযায়ী সাজাইয়া শ্রীমায়ের জীবন-কথার মনোজ্ঞ বর্ণনা। ভাষার স্বচ্ছতা থাকায় বইখানি পাঠকপাঠিকাগণের বেশ মনোরম লাগিবে।

রামকৃষ্ণায়ন—শ্রীতুলানন্দ রায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যভারতী। প্রকাশক—শ্রীমুকুন্দলাল দে, দি সারস্বত লাইব্রেরী, ৬১।১, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ; পৃষ্ঠা ৫৮; দাম এক টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া রচিত 'গৃহী শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ', 'মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ', 'শিল্পী শ্রীরাম-কৃষ্ণ' প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য। প্রথমোক্ত তিনটি প্রবন্ধ ইতঃপূর্বে উদ্বোধন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকারের 'সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 'শ্রীরামকৃষ্ণ-নামরহস্য' নামক প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য কার্তিক মাসের উদ্বোধনে বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

Education And Reconstruction: শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ; বিনয়-ভবন, বিশ্বভারতী, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। পৃষ্ঠা ৫৮, মূল্য—৮০ আনা।

শিক্ষা ও পুনর্গঠন বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি পূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধকার শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ চিন্তাশীল গ্রন্থকার ও শিক্ষাব্রতীরূপে সুপরিচিত। ইঁহার পিতা শ্রীবাণেশ্বর সিংহ, কৃষি ও কুটিরশিল্প বিষয়ে শুধু সুপণ্ডিতই ছিলেন না, ছিলেন নিষ্ঠাবান গবেষকও। পুত্রকেও তিনি মামুলী শিক্ষার জন্য না পাঠাইয়া নানাবিধ শিল্পকাজ ও তাহার মাধ্যমে কার্যকরী এবং গঠনমূলক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন। বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনে গ্রন্থকার দীর্ঘ দিন শিক্ষা-লাভ করেন ও পরে শিক্ষকরূপে কার্যে ব্রতী থাকেন। অতঃপর গান্ধীজীর আহ্বানে ওয়ার্ধা বিদ্যামন্দির পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একাধিকবার ইনি ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং শিল্পভিত্তিক শিক্ষার ধারাসম্বন্ধে প্রকৃত প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভের সুযোগ পাইয়াছেন। বস্তুতঃ শিক্ষাকে জীবনোপযোগী নূতন খাতে প্রবাহিত করার দুর্নিবার আবেগই তাঁহাকে ভারতে ও বহির্ভারতের বরণীয় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্যে বারবার টানিয়া লইয়াছে। পরিবার, বিদ্যায়তন ও সমাজকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সাধারণ শিক্ষার স্নিগ্ধ ধারায় সূত্রবদ্ধ করার আগ্রহ তাঁহাকে বরাবর পরিচালিত করিয়াছে এবং কবিগুরুর শ্রীনিকেতন ও গান্ধীজীর ওয়ার্ধায় দায়িত্বপূর্ণ শিক্ষা পরিচালনায় ব্রতী থাকায় তিনি তাঁহার যোগ্যতাও সপ্রমাণ করিয়াছেন। সমালোচ্য গ্রন্থখানির প্রতিটি পৃষ্ঠায় তাঁহার এই বহুমূল্য অভিজ্ঞতাও শিল্প-ভিত্তিক, জীবনোপযোগী, যথার্থ শিক্ষার জন্য ঐকান্তিক আবেগের দ্বারা চিহ্নিত। শুধু তত্ত্বকথা নহে, তথ্য ও অভিজ্ঞতামূলক কার্যোপযোগী নির্দেশও গ্রন্থটিতে বিস্তর রহিয়াছে। বুনিয়াদী বা

শিল্পভিত্তিক শিক্ষায় অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির গ্রন্থখানি পাঠ করা উচিত, সাধারণ শিক্ষিত সমাজও উহা পাঠে সবিশেষ উপকৃত হইবেন।

Eastern Socialistic State : শ্রীবসন্ত কুমার চ্যাটার্জি। ৩-বি সাগর ধর লেন, কলিকাতা—৬ হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৫৪, মূল্য—৸৹ আনা।

প্রাচ্যের দেশগুলিকে একটি সাধারণ অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক পরিকল্পনাভুক্ত করিয়া শক্তিশালী, সমৃদ্ধ অখণ্ড অঞ্চলরূপে গড়িয়া তোলার আদর্শ ও তদুপযোগী কর্মসূত্রের প্রস্তাব এই পুস্তকটিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এশিয়ার দেশগুলির অনগ্রসরতা ও তাহার কারণসমুদয় এবং এই মহাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মহনীয়তা বর্ণনা করিয়াছেন। বৈষয়িক ক্ষেত্রে এশিয়াবাসীদের আত্মনির্ভর করা এবং শুধু অনিবার্যতার ক্ষেত্রেই এশিয়া বহির্ভূত অঞ্চল হইতে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করা প্রভৃতি মূলনীতির আলোচনায় চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে,—পাঠকের চিন্তাকেও উহা নাড়া দিবে। এশিয়ার সমৃদ্ধি ও সংহতি শুধু এশিয়ার নহে সমগ্র বিশ্বের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্যই অপরিহার্য। বর্তমানে এই চিন্তা সক্রিয় আন্দোলনেরও সৃষ্টি করিয়াছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যেও লেখক এই জটিল ও ব্যাপক বিষয়টির সার্থক আলোচনা করিয়াছেন। কার্যকরী পরিকল্পনার ভূমিকারূপে নিঃসন্দেহে বইটি সমাদর পাইবার যোগ্য।

শ্রীমনকুমার সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আগামী জন্মতিথি (দ্ব্যধিকশততম) পড়িয়াছে ৩০শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার (১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪)। শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের পরিসমাপ্তি উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে ও কলিকাতায় ঐ শুভতিথি হইতে একাদশদিবসব্যাপী নানা অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপিত হইবে, এই সংবাদ আমরা গতমাসের উদ্বোধনে দিয়াছি। প্রতিদিনকার বিস্তারিত কর্মসূচী যথাসময়ে সংবাদপত্রে দ্রষ্টব্য।

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৫৩ সালের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠে স্বামী আত্মবোধানন্দজীর সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের পঞ্চচত্বারিংশত্তম বার্ষিক সাধারণ-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মিশনের কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কেন্দ্র ঃ সর্বসমেত ৬৯টি মিশন-কেন্দ্র (প্রায় সমসংখ্যক মঠকেন্দ্র ছাড়া) জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের সেবা ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মের মূলতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

বন্যা ও দুর্ভিক্ষসেবা ঃ মিশনের বোম্বাই শাখাকেন্দ্র বোম্বাই রাজ্যের কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটির সহায়তায় আহ্‌মদনগর জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে মার্চ হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার লক্ষ ক্ষুধিতের আহার্যোপযোগী ৮৩২/০ -মণ ও ১০২৬ পাউণ্ড খাদ্যদ্রব্য এবং ২৯৮০ খানি বস্ত্র বিতরণ করেন। দ্বারভাঙ্গায় বন্যার্তদিগকে সাহায্যের জন্য মিশন আগষ্ট মাসে সেবাকার্য করিয়াছেন। ২৫০০ জন লোককে সাত সপ্তাহের অধিককাল যাবৎ খাদ্য দেওয়া হয়; এতদ্ব্যতীত ১০৮২ খানি নূতন বস্ত্র ও রোগীদিগকে ঔষধাদিও দেওয়া হয়।

রাজমাহেন্দ্রীতে প্রধান রিলিফ-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া আগষ্ট হইতে নভেম্বর পর্যন্ত গোদাবরীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরস্থ জেলাগুলিতে সেবাকার্য পরিচালিত হইয়াছে। ইহা আলোচ্য বর্ষে ১৮০০০ খানি বস্ত্রাদি, ৩৫০০০৲ টাকা মূল্যের অন্যান্য পরিচ্ছদ, ২২০০ খানি কম্বল এবং ৬০,০০০৲ টাকা মূল্যের গৃহনির্মাণোপযোগী দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়াছেন। পুনর্বসতিকার্যও চালানো হয়।

চিকিৎসা-বিভাগঃ মিশনপরিচালিত ৬৯৫ সংখ্যক রোগিশয্যা-সমন্বিত ৮টি অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে মোট ১৬১৩৬ এবং ৪৩টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে মোট ১৯,৫৬,১২৭ (পুরাতন সহ) জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। রাঁচির সন্নিকটে ডুঙ্গরি যক্ষ্মা-আরোগ্যভবনের অন্তর্বিভাগে ৬০ জন যক্ষ্মারোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন।

শিক্ষা-বিভাগঃ এই বিভাগে একটি প্রথম, একটি দ্বিতীয় ও একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬১৫। ভারত ও পাকিস্তানের মিশন-পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে ৭১১০ জন বালক ও ৩১৮০ জন বালিকা শিক্ষা লাভ করিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭১৭৩ এবং ২৪৮০। শিল্প ও কারীগরী বিদ্যালয়গুলিতে ৩৪৬ জন ছাত্র ছিল। ৩৬টি ছাত্রাবাস কর্তৃক ২৩৫৬ জন বিদ্যার্থী ও ২০৫ জন বিদ্যার্থীনীর তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে।

সাহায্যদানঃ কয়েকটি শাখাকেন্দ্র কতকগুলি দুঃস্থ লোকের সাহায্যার্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং টাকা ২০৯১।/০ আনা দান করিয়াছেন। প্রধান কেন্দ্র নিয়মিতভাবে ৭৩টি পরিবার ও ১৪৫ জন ছাত্র (তন্মধ্যে ৬২ জন সিন্ধু প্রদেশের বাস্তহারা ছাত্র) এবং সাময়িকভাবে ২৫৯টি পরিবার ও ৯৬ জন ছাত্রকে সাহায্য বাবদ প্রায় ১৮০০০৲ টাকা ব্যয় করেন।

ভারতের বাহিরে কার্যাবলীঃ সিংহল, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, মরিশাস, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ এবং ফ্রান্সে মিশন সাফল্যের সহিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক কার্যাবলী পরিচালিত করিয়াছেন। সিংহল শাখাকেন্দ্র-পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের ২৪টি বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করে। ফিজি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২০২। পাকিস্তানে মিশনের কার্য কিছু কষ্টের সহিতই চালাইয়া যাওয়া হইয়াছে। আমেরিকা ও ইউরোপের প্রচারকার্য এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর্থিক অবস্থাঃ আলোচ্য বর্ষে মিশনের মোট আয় টাকা ৪৩,১১,১৮৩৸৫ পাই এবং মোট ব্যয় টাকা ৩৮,৫৪,৯৯৯।/৯ পাই।

কালাডিতে শ্রীশঙ্কর কলেজ—শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কালাডিতে (ত্রিবাঙ্কুর) তাঁহারই পুণ্যনামে মহাবিদ্যালয়ের (শ্রীশঙ্কর কলেজ) শুভ উদ্বোধন-উৎসব বিগত ১২ই জুলাই, ১৯৫৪ একটি আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই দিনটি প্রাচ্য সংস্কৃতির ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় দিবসরূপে পরিগণিত হইবে। প্রত্যূষে স্বামী মেধসানন্দের পরিচালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের বিদ্যার্থিগণ ও কলেজ ছাত্রাবাসের নবাগত ছাত্রবৃন্দ ভজনসহকারে আশ্রম হইতে কলেজ পর্যন্ত প্রায় দুই মাইল ব্যাপী শোভাযাত্রা করে। বেদান্ত-শিরোমণি শঙ্করশর্মা কর্তৃক কলেজভবনে পূজাদি কার্য অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা ও বক্তৃতাদিতে অংশ গ্রহণ করেন সাহিত্যশিরোমণি শ্রীশঙ্কর সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, স্বামী আগমানন্দ, বিচারপতি শ্রী পি, কে সুব্রহ্মণ্য আয়ার, শ্রী পি. আর মেনন এবং অধ্যক্ষ কে. ভি কৃষ্ণ আয়ার। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে কার্যসূচীর সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী সংবাদ—পুরী শ্রীরামকৃষ্ণমিশন লাইব্রেরীতে গত ১৮ই ও ১৯শে আষাঢ় শ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী

জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন সকাল ৮টায় স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের মধ্যে শ্রীশ্রী-মায়ের যে জীবনী-বিষয়ক রচনা-প্রতিযোগিতা হয়, উহাতে ৩০ জন ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। অপরাহ্ণ ৫টায় গ্রন্থাগার-প্রাঙ্গণোত্থিত সুসজ্জিত মণ্ডপে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতির সম্মুখে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজুর সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ওড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীকুমারস্বামী রাজা। সভায় ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী, ডক্টর হরেকৃষ্ণ মহতাব, শ্রীকিশোরী মোহন দ্বিবেদী, শ্রীচিন্তামণি আচার্য প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ প্রায় দুই সহস্র নরনারী যোগদান করেন। বিভিন্ন বক্তা আবেগময়ী ভাষায় শ্রীমায়ের পুণ্যজীবনী আলোচনা করায় সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে পবিত্র মাতৃভাব জাগিয়া উঠে। সভাপতির অভিভাষণে ডক্টর কাটজু বলেন, কিভাবে আদর্শ নারী-চরিত্র গঠন করিতে হয় তাহা শ্রীসারদাদেবী দেখাইয়া গিয়াছেন, আজ সকলেরই তাঁর জীবন অনুধ্যান করা উচিত। স্বামী মাধবানন্দজী বলেন, তিনি ছিলেন সকলের মা—সর্ব দেশের, সর্ব কালের, সকল জাতির। দ্বিতীয়দিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার বিশেষ পূজা, কুমারীপূজা, কুমারীসম্মেলন, সঙ্গীত ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, প্রসাদ ও পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় গত ৩০শে জুন, ১৯৫৪ শ্রীমা সারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী বিপুল উদ্দীপনা সহকারে ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ইহাতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে জগতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নারীজাতির অবদানসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। সভার পরিচালনা করেন মিসেস্ মৌড. অমর। বিশিষ্ট বক্তা হিন্দু, খ্রীষ্ট, ইসলাম, ইহুদী ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। লণ্ডনস্থ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দজীর সভাপতিত্বে গঠিত শ্রীসারদাদেবী-শতবার্ষিকীজয়ন্তী-পরিষদ্ কর্তৃক ইংলণ্ডে শ্রীমায়ের জয়ন্তী উৎসবগুলি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে জয়ন্তী উৎসব ১৯শে অক্টোবর হইতে ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী এবং সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী তাঁহাদের উপস্থিতি এবং ভাষণাদি দ্বারা সকলকে প্রভূত উদ্দীপনা দান করিয়াছিলেন। বিশেষ পূজা হোমাদি ব্যতীত শোভাযাত্রা, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী-অবলম্বনে প্রদর্শনী (জয়রামবাটীতে প্রদর্শিত কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীগণের নির্মিত মৃত্তিকা-মূর্তির) দরিদ্রনারায়ণ সেবা, কাশীর বিভিন্ন মঠের সাধুভোজন, বালকবালিকাগণের মধ্যে মিষ্টান্নবিতরণ, রচন-প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণ, হাওড়া সমাজের বিখ্যাত 'নদের নিমাই' কীর্তনাভিনয় প্রভৃতি উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল। থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির কর্মসচিব শ্রীরোহিত মেটা, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের কর্মসচিব ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এবং কলিকাতা লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী এবং শ্রীমতী চন্দ্রকুমারী হাণ্ডু জনসভায় তাঁহাদের মনোজ্ঞ ভাষণ দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন।

গত ৭ই নভেম্বর মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব সুসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ১০টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে জননীর প্রতিকৃতি মনোরমভাবে সজ্জিত করিয়া বিশেষ পূজা, ভজন বক্তৃতাদি এবং ৭০০০ বালকবালিকা ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা

হয়। ছেলেদের প্রধান বিদ্যালয়ে প্রায় দুই সহস্র দরিদ্রনারায়ণের সেবা অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা-বিদ্যালয়ের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আহূত একটি জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দ, পুলিশ কমিশনার শ্রীপার্থসারথি আয়েঙ্গার এবং ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রী ইউ কৃষ্ণরাও। সভান্তে উপস্থিত প্রায় ৮০০০ নরনারী ও বালকবালিকা শ্রীশ্রীমায়ের সুসজ্জিত তৈলচিত্র লইয়া ত্যাগরাজনগর অঞ্চলের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা করেন। এই অঞ্চলে এত বড় ও সুন্দর এবং সুনিয়ন্ত্রিত শোভাযাত্রা ইহাই প্রথম।

গত ২০শে কার্তিক (৬ই নভেম্বর, ১৯৫৪) করিমগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জননী সারদাদেবীর জীবনের আলেখ্যমালার প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য চিত্রে মনোজ্ঞভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জননী সারদাদেবীর পূতস্মৃতিজড়িত 'কাশীপুর উদ্যানবাটী'-শাখাকেন্দ্রে জয়ন্তীউৎসব ১০ই কার্তিক (২৭শে অক্টোবর, ৫৪) হইতে ১৪ই কার্তিক (৩১শে অক্টোবর, ৫৪) পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর কয়েকটি :—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী কর্তৃক 'মহাভারতে নারী' সম্বন্ধে আলোচনা, কলিকাতার বিশিষ্ট গায়কবৃন্দ কর্তৃক সঙ্গীত-আসর, হাওড়ার অভয়সঙ্গীতপরিষদ্ কর্তৃক শ্রীশ্রীমা'র লীলাকীর্তন, বাঁকুড়া-সোনামুখীর শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী কর্তৃক রামায়ণগান (বিষয়—শবরীর প্রতীক্ষা) চোরবাগান রাধারমণ কীর্তনসমাজ কর্তৃক মাথুর পালা কীর্তন, বৌবাজার সুহৃদ্‌ক্লাব কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-সঙ্গীত ও কালীকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজীর নেতৃত্বে জনসভা (বিষয়—শ্রীশ্রীমা) এবং স্বামী ওঁকারানন্দজী কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ব্যাখ্যা।

পরলোকে বিশিষ্ট আমেরিকান ভক্ত—আমেরিকাস্থ নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির প্রাচীনা সভ্যা ও সম্পাদিকা মিস্ রে বার্বার কয়েক মাস অসুস্থ থাকার পর গত ৩রা জুন, বৃহস্পতিবার দেহত্যাগ করিয়াছেন। সুদীর্ঘ ৩১ বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের অকুণ্ঠ সেবা করিয়া তিনি ইহার প্রাণ-স্বরূপ হইয়াছিলেন। কী দারুণ গ্রীষ্মে, কী প্রচণ্ড শীতে সোসাইটির বেদান্ত-ক্লাসে তাঁহার উপস্থিতির কোনদিন ব্যতিক্রম হয় নাই। সোসাইটির দুর্দিনে অর্থসাহায্য দিয়া ইহাকে স্থায়িত্বদানে তাঁহার অসামান্য ত্যাগ সোসাইটির ইতিহাসে চির-উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। প্রতিটি কর্মের মধ্যে তাঁহার যে বিনয় শ্রদ্ধা ও সারল্য ফুটিয়া উঠিত, তাহা সোসাইটির কর্মিগণের আদর্শ হইয়া আছে। এই মহীয়সী মহিলার চির-অন্তর্ধানে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

স্বামী বিমলানন্দের দেহত্যাগ—আমরা বিশেষ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অক্লান্ত সেবক স্বামী বিমলানন্দের বেলুড়মঠে গত ২১শে কার্তিক (৭ই নভেম্বর, ১৯৫৪) ৫৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগের সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গত তিন বৎসর যাবৎ তিনি যকৃৎ ও হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ছিলেন তাঁহার মন্ত্রদীক্ষা এবং সন্ন্যাসের গুরু। বিভিন্নসময়ে তিনি জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও মৈমনসিং আশ্রমের কর্মভার অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন। দৃঢ় অমায়িক চরিত্র এবং সেবানিষ্ঠা তাঁহাকে বহুজনের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাসেবাকার্য্য

গত ৮।৮।৫৪ তারিখ হইতে বিহার, বাংলা, আসাম ও পূর্বপাকিস্তানের বন্যাপীড়িত অংশে রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাসেবাকার্য্য করিতেছেন। নিম্নে দ্রব্যাদি বিতরণের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল ঃ

দ্বারভাঙ্গা জেলার রসেরা থানার অন্তর্গত মঙ্গলগড় ও দেওধাতে (গত ১৯।১০।৫৪ পর্য্যন্ত) ২৯০১ মন চাউল, ২৬ মন ৭ সের ডাল, ৭৫ মন লবণ এবং ৭১৭৪ খানি বস্ত্রাদি ৪১,২৯৬ জনের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। ৩২০৯ জনকে চিকিৎসাও করা হইয়াছে।

পূর্ণিয়া জেলায় লাভা ষ্টেশনের নিকট পরাণপুরে (গত ৩০।৯।৫৪ পর্য্যন্ত) ৩০৭ মন ৩৬ সের চাউল, কিছু ডাল ও লবণ, ১০৯৯ খানি বস্ত্রাদি এবং ২,০০০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ ৪,৬২৫ জনকে এবং বহুলোককে ঔষধাদি দেওয়া হইয়াছে। উপরি-উক্ত তারিখের পর হইতে কেবল বস্ত্রাদি বিতরণ ও চিকিৎসাদির কাজ চলিতেছে।

জলপাইগুড়ি জেলার রামসাই, আমগুড়ি ও বার্ণেস ইউনিয়নত্রয়ে (গত ২৭।১০।৫৪ পর্যন্ত) ২৯৩ মন ১২ সের চাউল, ৮ মন ৬ সের ডাল, ১৬ মন ১৯ সের লবণ এবং ২৩২৭ খণ্ড বস্ত্রাদি ১৩,১৭১ জনকে এবং ৩৪০ জনকে ঔষধাদি দেওয়া হইয়াছে।

কুচবিহারে (গত ২৯।১০।৫৪ পর্য্যন্ত) ৬২২৫ খানি বস্ত্রাদি ৬০২০ জনের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। নলকূপ বসান হইতেছে।

লখিমপুর (আসাম) জেলার ধোলাতে (গত ১১।৯।৫৪ পর্য্যন্ত) ২৭২ মন ৩৫ সের চাউল, ১৪ মন ১৬ সের গুঁড়া দুধ ৪৫১০ জনের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। দারিদ্রগণকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিয়া তাহাদিগকে বেত ও বাঁশের কাজে এবং বয়ন প্রভৃতি কুটিরশিল্পাদির কাজে সহায়তা করা হইতেছে।

গৌহাটির নিকট পলাশবাড়িতে একটি নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানের, ঢাকা, কলমা ও নারায়ণগঞ্জে (গত ২৩।৯।৫৪ পর্যান্ত) ১২০ মন ১৪ সের চাউল, ৩৪ মন ৩৮ সের ডাল, ৯ মন ২ সের লবণ, ৮ মন ৫ সের সরিষার তৈল, ৭ মন ৩৬ সের মসলা এবং ২৯৯ মন ১২ সের জ্বালানি কাঠ ২০,৯৭৫ জনকে দেওয়া হইয়াছে। ৩৭৫ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ এবং ৩৬ খানি বস্ত্রখণ্ড ২৯২২ জনের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

স্বামী মাধবানন্দ
সাধারণ সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন।
পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া) ৩।১১।৫৪

—নিবেদন—

আগামী মাঘমাসে উদ্বোধনের নূতন (৫৭ তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম ও ঠিকানা সহ বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি. তে কাগজ পাঠাইবার অযথা বিলম্ব এবং অতিরিক্ত ডাকব্যয় ॥০ আনা বাঁচিয়া যায়। কুপনে গ্রাহক-সংখ্যা অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। পাকিস্তানের চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ উয়ারী, ঢাকা। ইতি—

কার্যাধ্যক্ষ,—১, উদ্বোধন লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা—৩

শ্রীশ্রীসারদাষ্টকম্

অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, এম্‌-এ, সাহিত্যশাস্ত্রী

পাদাম্ভোজরজঃকণৈর্বসুমতীং কৃৎস্নাং পুনন্তী স্বকৈ
র্জাতা যা শুভলক্ষণা জনগণক্ষেমায় সৌম্যাকৃতিঃ।
বঙ্গান্তর্জয়রামবাটাভিহিতে গ্রামে দ্বিজস্যান্বয়ে
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ১

যামার্তাং পথি দস্যুরপাবনতঃ ক্রৌর্যং নিরস্যাদরাদ্
দ্রাগঙ্গীকৃতবাংশ্চিরায় দুহিতেত্যাখ্যায় মোহাত্যয়াৎ।
সেবাদ্যৈরচিরাৎ প্রসাদ্য দয়িতস্থানং তথা নীতবান্
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ২

পূর্বং কল্পিতয়া বিবাহবিধয়ে দৈবেন সদ্বৃত্তয়া
বধ্বা শিক্ষিতয়াত্মনা স্বমনসো বাঞ্ছানুরূপং শনৈঃ।
শুদ্ধাত্মাপি পতির্যয়া শুচিতরো জাতঃ কৃতার্থোঽপ্যহো
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ৩

চিত্রং ভোঃ! ফলহারিণীতিথিবজন্যর্ধে স্বসিদ্ধেঃ ফলং
পূজান্তে পুরুষোত্তমেন গুরুণা যস্যৈ রহস্যপির্তম্।
ষোড়শ্যৈ বিধিবৎ ত্রিলোকজননীবুদ্ধ্যা জপাক্ষস্রজা
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ৪

যস্যা নোদ্বিজতে স্ম জীবনিবহঃ শিষ্যা নরেন্দ্রাদয়ঃ
প্রাপ্যাজ্ঞামপি সম্ভ্রমাদপি ভয়াৎ প্রীত্যান্বতিষ্ঠন্নপি।
লীয়ন্তে রিপবঃ প্রণশ্যতি ভবঃ শান্তিশ্চ সঞ্জায়তে
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ৫

সেবাপ্রেমদয়াত্রপামতিকথা যস্যাঃ পরং গীয়তে
শ্রদ্ধাভক্তিভরাজ্জনৈরহরহঃ পারেঽব্ধি রাষ্ট্রেষপি।
কারুণ্যং নয়নেঽভয়ং করতলে মুক্তিশ্চ পাদাম্বুজে
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ৬

যস্যাং স্নেহনিধৌ প্রকামবিনতাঃ সৌজন্যমুগ্ধান্তরাঃ
সাধ্বীসংঘশিরোমণৌ পৃথুতপোনিষ্ঠাম্বুধৌ সজ্জনাঃ।
স্বেষামাদধতি প্রসন্নবদনাঃ সর্বস্বমপ্যার্তিতো
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ৭

মাতর্মাতরয়ে! কৃপাময়ি! ধরোদ্ধার্থমভ্যাগতে!
ত্রায়স্বেহ সুতাননাথপতিতাং স্বৎপাদপদ্মাশ্রিতান্।
সংপ্রার্থ্যেতি বরং ক্রমাদুপগতাঃ প্রাচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ যাং
বন্দে তাং খলু সারদামণিমহং শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়াম্॥ ৮

শ্রীসারদাফুল্লপদারবিন্দে
লগ্নো যথালির্মকরন্দমত্তঃ।
অত্যল্পধী-মাতৃকৃপার্থি-দুর্গা-
দাসাস্তুতোঽস্তু স্তব এষ শস্তঃ॥ ৯

অনুবাদ

আপন পাদপদ্মের পরাগরেণুদ্বারা সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিয়া জনগণের কল্যাণের নিমিত্ত যে সুলক্ষণা সৌম্যদর্শনা নারী বঙ্গদেশের জয়রামবাটী নামক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ১

মোহ দূরীভূত হওয়ায় নিজ নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিয়া দস্যুও পথে পীড়িতাবস্থায় যাঁহাকে অবিলম্বে সাদরে কন্যাসম্ভাষণপূর্বক চিরতরে আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেবাশুশ্রূষার দ্বারা প্রসন্ন করিয়া স্বামিসন্নিধানে সত্বর পাঠাইয়াছিল, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ২

যাঁহার বিবাহব্যবস্থা পূর্ব হইতেই দৈবকর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছিল, যাঁহাকে তাঁহার স্বামী নিজের মনের মতো করিয়া ধীরে ধীরে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং যে সুশীলা সুচরিতাকে বধূরূপে পাইয়া শুদ্ধচিত্ত পতিও অধিকতর শুদ্ধচিত্ত ও কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৩

ফলহারিণী পূজাতিথিতে নিশীথ রাত্রিতে যে ষোড়শী নারীকে জগজ্জননীজ্ঞানে যথাশাস্ত্র পূজা করিয়া তাঁহার গুরু পুরুষোত্তম পতি আপন জপমালিকার সহিত সিদ্ধির ফল নিভৃতে অভূতপূর্বভাবে অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৪

যাঁহার নিকট হইতে প্রাণীসকল কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রাপ্ত হইত না, যাঁহার নিকট হইতে আজ্ঞা লাভ করিয়া নরেন্দ্রপ্রমুখ শিষ্যগণ সসম্ভ্রমে সভয়ে ও সানন্দে তাহা প্রতিপালন করিতেন এবং যাঁহার কৃপা হইতে রিপুগণ বিনষ্ট, সংসার-চক্রে আবর্তনরহিত ও শান্তির উদ্ভব হয়, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৫

সমুদ্রের পরপারে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহেও যাঁহার সেবা, প্রেম, দয়া, লজ্জা ও বুদ্ধির কথা নরনারীগণকর্তৃক পরমভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে প্রত্যহ কীর্তিত হইতেছে এবং যাঁহার নয়নে করুণা, করতলে অভয় ও পাদপদ্মে মুক্তি বিরাজিত, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৬

যে স্নেহপরায়ণা, সাধ্বীকুলশিরোমণি, প্রভূততপোনিষ্ঠাবতা মহিলাকে তাঁহার সৌজন্যমুগ্ধ, বিনয়াবনত সজ্জনগণ আর্তিবশতঃ আপন আপন সর্বস্বও প্রসন্নমুখে অর্পণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৭

"জগতের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা দয়াময়ী জননী, তোমার চরণপদ্মে শরণাগত অনাথ ও পতিত সন্তানগণকে উদ্ধার কর"—এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নরনারীগণ যাঁহার নিকটে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইতেছেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী সারদামণিদেবীকে প্রণাম করি। ৮

অতীব মন্দমতি ও মাতৃকৃপাপ্রার্থী দুর্গাদাসকর্তৃক বিকীর্ণ এই প্রশস্ত স্তব শ্রীশ্রীসারদামণিদেবীর প্রফুল্ল পাদপদ্মে মধুমত্ত মধুকরের মতো লীন হইয়া বিরাজ করুক। ৯

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণের অতি-ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা করা ভাল, কিন্তু অতি-ব্যাখ্যা—ব্যাখ্যাকে মনের খেয়াল ও খুশিমতো টানিয়া উহার অনাবশ্যক পরিধি-বিস্তার শুধু যে ভাল নয় তাহা নয়, অনেক সময়ে ক্ষতিকর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও শিক্ষা লইয়া অনেক পুস্তক এবং প্রবন্ধাদি লেখা হইতেছে, অনেক সভায় অনেক বক্তৃতা শোনা যাইতেছে। লেখক বা বক্তার উৎসাহের প্রাবল্যে অথবা বোধ করি, মৌলিকত্ব-প্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় কোন কোন লেখা বা ভাষণে মাঝে মাঝে আমরা এমন কথা পাই যাহাকে বলিতে ইচ্ছা হয় 'শ্রীরামকৃষ্ণের অতি-ব্যাখ্যা'। এগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের গৌরব খ্যাপন করে না, তাঁহার উপর অবিচার প্রকাশ করে।

কাহারও কাহারও অভিমতে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ এত সহজ ও সরল যে উহাদের ব্যাখ্যা করা বাতুলতা মাত্র, ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্তিগুলির গাম্ভীর্য ও মাধুর্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা। এই মতে প্রচুর যুক্তি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি কথাও ভুলিতে পারা যায় না। স্বামীজী তখনও আমেরিকায় যান নাই।

তিনি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত শ্রীহরমোহন মিত্রকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শনগ্রন্থ লেখা যেতে পারে।" হরমোহন বাবু ইহাতে বিস্ময়প্রকাশ করিলে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের 'হাতি নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ' গল্পটির গভীর দার্শনিক তাৎপর্য তাঁহাকে তিনদিন ধরিয়া বুঝাইয়াছিলেন। (শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, প্রথম অধ্যায়)। ইহার পূর্বেকার আরও একটি ঘটনার কথাও মনে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে। বৈষ্ণবধর্মের কথা উঠিয়াছে। নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন এই তিনটি পালনীয় সাধন ঠাকুর সমবেত সকলকে বুঝাইয়া বলিতে বলিতে হঠাৎ ভাবমুখে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।"

"ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐকথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন! * * * ভগবান যদি কখন দিন দেন তো আজ যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।'" (শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব, ৯ম অধ্যায়)

ভগবান যে দিন দিয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষার 'অদ্ভুত সত্য' স্বামীজীর মাধ্যমে দূর দূরান্তরে প্রচারিত হইয়া সহস্র সহস্র নরনারীর ধর্মচেতনা সঞ্জীবিত করিয়াছিল তাহা আজ আমরা সকলেই জানি। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের 'ব্যাখ্যা'র প্রয়োজন ছিল—সত্যসন্ধানী তত্ত্বদর্শী স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ব্যাখ্যার। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপরাপর সন্ন্যাসি-শিষ্যগণও সেই 'ব্যাখ্যা' শুনিয়া চমৎকৃত হইতেন। 'স্বামি-শিষ্যসংবাদ' গ্রন্থে (পূর্বকাণ্ড, ৭ম বল্লী) লিপিবদ্ধ একটি ঘটনার কথা মনে আসে। স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ১৮৯৭ সালের ১লা মে, বাগবাজারে বলরাম বসুর গৃহে সন্ন্যাসি-গুরুভ্রাতা এবং ঠাকুরের গৃহস্থভক্তগণকে সমবেত করিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণমিশনে'র সূত্রপাত করিলেন। সভার পর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীর নিকট সংশয় প্রকাশ করিতেছেন, "তোমার এসব বিদেশীভাবে কার্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?" স্বামীজী উত্তরে গভীর আবেগভরে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ উভয়েরই জীবনকে বুঝিবার পক্ষে একটি মূল্যবান দিগ্‌দর্শন-স্বরূপ। মূলগ্রন্থের ঐ অধ্যায়টি অভিনিবেশ সহকারে প্রত্যেকের পড়া উচিত। আমরা স্বামীজীর উক্তির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? * * * সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয়তো, প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নেই।"

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা এবং লেখাগুলি যদি না থাকিত তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের মর্ম আমরা কতটুকু বুঝিতাম? স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজ) সত্যই বলিয়াছিলেন,—'শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন সূত্র, স্বামীজী তার ভাষ্য।'

কিন্তু ভাষ্য বা ব্যাখ্যানের ভার সকলের উপর দেওয়া চলে না, সকলের লওয়াও উচিত নয়। সকলের উহা সাজে না। স্বয়ং বাসুদেব সার্বভৌমকে শ্রীচৈতন্যদেব সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন ব্যাখ্যা করিতে যাওয়ার দায়িত্ব কত।

"প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥

সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'। স্বামী বিবেকানন্দ এই উক্তির মধ্যে কর্মপরিণত বেদান্তের (Practical Vedanta) সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করিয়াই তৎপ্রতিষ্ঠিত সেবাধর্ম প্রসারলাভ করিয়াছে। রোগীর সেবা, আর্তের সেবা, অজ্ঞ-দরিদ্র অসহায়ের সেবা—সবই শ্রীরামকৃষ্ণশিক্ষার স্বামীজীনির্ণীত ব্যাখ্যানুসারে ভগবদারাধনা। পরিষ্কার কথা। কিন্তু এই পরিষ্কার কথাটিই অতি-ব্যখ্যার কবলে পড়িয়া আমাদিগের বুদ্ধিভ্রান্তি ঘটাইতে পারে। যেমন, যদি বলি—'জীবের সেবাই পরম ধর্ম—অতএব দেব-দেবীর পূজার্চনাদিতে কোন প্রয়োজন নাই, মন্দিরের বিগ্রহগুলি ছুঁড়িয়া ফেল, ঘণ্টা চামর কোশাকুশিগুলা ভাঙিয়া দাও, গঙ্গাস্নান-ব্রত-উপবাস প্রভৃতি কুসংস্কার, জপধ্যান প্রার্থনা প্রভৃতি অলসতা মাত্র, কর্মই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, ইত্যাদি তাহা হইলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে 'পপুলার' হয়তো করি, কিন্তু তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়া নয় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণের বহু-পরিচিত উক্তি—'যত মত, তত পথ'। ব্যাখ্যা—প্রত্যেক ধর্মই বিশ্বসংসারের এবং মানুষের জীবনের পরমসত্যকে অনুভব করিবার এক একটি প্রণালী—প্রত্যেক ধর্মকেই সহানুভূতির সহিত দেখা, মর্যাদা দেওয়া উচিত—ধর্মে ধর্মে বিবাদ সর্বথা পরিবর্জনীয়। এই ব্যাখ্যা 'অতি-ব্যাখ্যা'র পর্যায়ে কতকটা এইরূপ আকার ধারণ করে:—সমন্বয়, মতে মতে পথে পথে সমন্বয়, সব কিছুর সহিত সব কিছুর সমন্বয়, জড়ে চেতনে সমন্বয়, আলোকে আঁধারে সমন্বয়, সত্যে মিথ্যায় সমন্বয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিলে কানে আঙুল দিতেন না কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নির্দেশমত বেদান্ত-সাধনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের অন্যতম সন্ন্যাসি-পার্ষদ স্বামী (সারদানন্দজী শরৎমহারাজ) লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসদীক্ষার বিশদ বর্ণনা আছে। সন্ন্যাস লইয়াও ঠাকুর কেন গৈরিক পরিতেন না তাহার ব্যাখ্যা ঐ গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অতি-ব্যাখ্যাতৃগণ তাহাতে সন্তুষ্ট নন। স্থূল সূক্ষ্ম বহু যুক্তি বিস্তার করিয়া, কাব্য-সাহিত্য-অলঙ্কারের বহুতর প্রয়োগ হানিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন—ঠাকুর আদপে সন্ন্যাসীই ছিলেন না! বেদান্তসাধন করিয়াছিলেন কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। ধর্মপত্নীকে কখনো পরিত্যাগ করেন নাই, অতএব তিনি বরাবর গৃহস্থ।

বৃথাই স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিকের গানে লিখিয়া গেলেন—'ত্যাগীশ্বর হে নরবর'!

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, সকলকে নয়—গিরিশচন্দ্রকেই—'আমায় বকলমা দে'। বকলমা দেওয়ার তাৎপর্য কি, উহা দিবার অধিকারী কে, কাহারই বা বকলমা দেওয়া সার্থক ইত্যাদি বিশ্লেষণ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে দেখিতে পাই (গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়)। কিন্তু সেই বিশ্লেষণকে অতিব্যাখ্যাতারা টানিয়া লইয়া গিয়া যখন একটি 'সহজ' সাধনে পরিণত করেন, যখন বলেন, "সাধনভজন করবার ক্ষমতা কি আর আমাদের আছে? আমরা 'জয়রামকৃষ্ণ' বলে ভবপারে যাব"—তখন প্রশ্ন জাগে, তবে এত ব্যাকুলতার কথা, এত ত্যাগবৈরাগ্যের কথা, এত একান্তে ঈশ্বরকে ডাকিবার কথা তিনি দিনের পর দিন কাহাদের জন্য বলিয়া গেলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'এখানকার অনুভূতি বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।' কিন্তু ইহার অর্থ নিশ্চিতই ইহা নয় যে, উহা দশমুণ্ড-ও বিংশবাহু-সমন্বিত এমন এক অপূর্ব অদ্ভুত অনুভূতি বেদ-বেদান্তের সিদ্ধান্তের সহিত যাহার কোনই মিল নাই।

'তোমরা বুঝিবে না, ইহা বেদবেদান্তের পারের কথা'—ইহা বলিয়া লোককে হয়তো প্রতারণা করা যায়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে নিশ্চিতই মহিমান্বিত করা যায় না। ভুলিয়া গেলে চলিবে না স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'বেদমূর্তি'। বলিয়াছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণজীবন বেদবেদান্তেরই জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণের অতি-ব্যাখ্যা কিরূপ আকার ধারণ করিতে পারে তাহারই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ, কিন্তু গভীর। যদি গভীরকে ধরিতে না পার সহজ লইয়া পরিতৃপ্ত থাক—কিন্তু গভীরে পৌছিতে গিয়া যেন ঘূর্ণাবর্তে পড়িও না এ বিষয়ে হুঁশ রাখিয়ো।

"গতিশীল সংস্কৃতি"

কিছুদিনপূর্বে যক্ষ্মাপীড়িতগণের জন্য একটি আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ স্থাপনের সাহায্যার্থে কলিকাতায় যে চিত্রতারকাদের (পুরুষ এবং স্ত্রী) ক্রিকেট ম্যাচ হইয়া গেল উহা লইয়া সংবাদপত্রে অনেক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। লোক-হিতকর কাজের জন্য আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা দ্বারা অর্থসংগ্রহ এদেশে বহুদিন হইতেই চালু আছে কিন্তু সেই আমোদপ্রমোদের ধারা সম্বন্ধে সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বনীয়। আনন্দবাজার পত্রিকা 'নিতান্ত বিসদৃশ'-নামীয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন —

> "চিত্রতারকাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেলা যেমন অনুষ্ঠান-হিসাবেই স্ববিরোধী ব্যাপার, তেমনি নৈতিকবিচারেও সৌষ্ঠবহীন ও অশোভন। * * জনসমাজের একশ্রেণীর মনে চিত্রতারকাদিগকে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য যে প্রবল কৌতূহল আছে, তাহা উচ্চশ্রেণীর এবং সুস্থ ও সঙ্গত কৌতূহল * * নহে বলিয়াই আমরা মনে করি।"

'দৈনিক বসুমতী' মনে করেন (সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'তারকার নাচ' এবং অপর একটি মন্তব্য 'ভাবিবার বিষয়') এই অনুষ্ঠানের দ্বারা বাঙ্গালী সভ্যতা ও কৃষ্টির অসম্মান করা এবং একটি নৈতিক কুদৃষ্টান্ত দেশের সামনে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। একাধিক ভদ্রলোক বিভিন্ন কাগজে প্রতিবাদাত্মক পত্রও প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু সমর্থকেরও অভাব নাই। জনৈক পত্র-লেখক 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় বলিতেছেন (২৬।১১।৫৪):—

> "কিছুকাল পূর্বে নূতন দিল্লীতে বয়োবৃদ্ধ এবং গম্ভীরাত্মা লোকসভার সদস্যগণ যখন একটি দাতব্য ক্রিকেট ম্যাচে নামিয়াছিলেন তখন তো আপনাদের বিবেক আহত হয় নাই। * * তরুণ এবং চাকচিক্যময় চিত্রতারকাদিগকে যদি তাঁহাদের পেশাদারী নৃত্যগীতাদি বন্ধ রাখিয়া একদিন কলিকাতায় তাঁহাদের অগণিত অনুরাগীগণকে আনন্দ দিবার জন্য খেলার মাঠে নামিতে অনুরোধ করা হয় তাহাতে দোষ কি? * * * নারীতারকারা খেলায় যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া যদি আপত্তি উঠে তাহা হইলে আমি বলিব স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এত কুণ্ঠা অনুচিত। আমরা যে স্ত্রীজাতিরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং আমাদের গৃহ যদি নারীর উপস্থিতি দ্বারা সঞ্জীবিত না হইত তাহা হইলে গৃহ আর গৃহ থাকিত না। * * সংস্কৃতি ভাল জিনিস—কিন্তু সংস্কৃতি স্থিতিশীল বস্তু নয় উহা গতিশীল—কালের সহিত উহাও বাড়িয়া চলে।" (ইংরেজীর অনুবাদ)

এই পত্রলেখকের মন্তব্যের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। লোকসভায় সদস্যদের ম্যাচ আর চিত্রতারকাদের (নারী ও পুরুষ) ম্যাচ—এই দুইটি অনুষ্ঠানের পটভূমি ও আবেদন যে এক নয় তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা স্ত্রীজাতির গর্ভে জন্মিয়াছি এবং স্ত্রীজাতি আমাদিগের গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলিয়াই তো তাঁহাদিগকে আমরা সম্মানের চোখে দেখিব, হাল্কা কৌতূহলের দৃষ্টিতে নয়। নারীর মর্যাদা হৃদয়ের গভীরে তুলিয়া রাখিব বলিয়াই তো খেলার মাঠে তাঁহার রূপ যৌবন লাস্য উপভোগ করিতে যাইব না। 'গতিশীল সংস্কৃতি'র নামে সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বনিয়াদই যদি ধসিয়া পড়ে তো অহো দুর্ভাগ্য!

বাঙ্গালী শ্রমিক

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার আনন্দবাজার পত্রিকায় (৯ই আশ্বিন, রবিবার) 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' নামক নিবন্ধে

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কয়েকটি স্মৃতিকথা প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালী যুবকগণকে স্বাবলম্বী এবং শ্রমানুরাগী দেখিবার জন্য এই মহাপ্রাণ দেশসেবকের গভীর আগ্রহ ও প্রাণপাতী চেষ্টার কথা সর্বজন-বিদিত। নলিনীবাবুর সহিত আচার্যের একটি কথোপকথনের অংশবিশেষ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

তিনি বললেন, "তুই বুঝি বাসেই যাতায়াত করিস?"

"বাসেও চলি, ট্রামেও চলি।"

"আচ্ছা বল্ দেখি, যতগুলি বাসে চড়েছিস তার মধ্যে কখানা বাঙালীর আর কখানা অ-বাঙালীর? আর সে সব বাস যারা চালায়, যারা টিকিট বিক্রি করে, তাদেরই বা বাঙালী অবাঙালীর হার কত?"

আমি বললাম, "তা আমি কি করে বলব? তবে, এটা ঠিক যে বাঙালীর হার খুবই কম। অধিকাংশ বাস অ-বাঙালীর। বাসের ভিতরেই মালিকের নাম লেখা থাকে। আর সেসব চালক ও টিকিট-বিক্রেতারা প্রায় শতকরা একশ অবাঙালী।"

আচার্যদেব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, "বাংলা ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে অবাঙালীর হাতে। আর এদিকে তোরা ভারত স্বাধীন করবার জন্যে অন্ধের মত বোমা রিভলবার ছুড়ছিস্।"

এই কথোপকথন যখন হইয়াছিল তখন ভারত পরাধীন। আজ স্বতন্ত্র ভারতে বাঙ্গালী যুবকদের অবশ্যই স্বাধীনতালাভের জন্য বোমা রিভলবার ছুড়িবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আচার্য বাঁচিয়া থাকিলে দেখিতেন স্বাতন্ত্র্য-সংগ্রাম হইতে অবসর পাইলেও বাঙ্গালী অর্থনৈতিক ও শ্রমনৈতিক স্বাধীনতার দিকে বিশেষ কিছু চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারে নাই। নিষ্ফল রাজনৈতিক দলাদলিতে তাহার সমস্ত গঠন-শক্তি নষ্ট হইতেছে। মানভূমের বা পূর্ণিয়ার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে সংযোজিত হইলেই বাঙ্গালীর জীবনসমস্যার সমাধান হইবে না। বাঙ্গলার যে ভূমিভাগ এখনও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ম্যাপে পশ্চিমবঙ্গ বলিয়া পরিচিত তাহা নিছক ভূমিভাগই মাত্র। উহার ব্যবসাবাণিজ্য, শ্রমিক সংস্থা, সামাজিক লেনদেন এমনকি সাংস্কৃতিক কাঠামোও যে উত্তরোত্তরই বাঙ্গালীত্বের ছাপমুক্ত হইতেছে ইহা অতি নির্মম সত্য। শ্রীভূপেশচন্দ্র লাহিড়ী 'কলিকাতায় বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে কলিকাতায় অবাঙ্গালী শ্রমিকের পরিসংখ্যান দিয়াছেন। কলিকাতা ও হাওড়া ষ্টেশনে ও পোর্টকমিশনারের জেঠিগুলিতে প্রায় ২৫ হাজার লোক মাল বহনের কাজ করে, তাহাদের মধ্যে একটিও বাঙ্গালী নাই। বন্দরে মাল খালাস করিবার ৩ হাজার গাধাবোটের ১০ হাজার মাঝি—তাহারা সকলেই প্রায় অবাঙ্গালী (কিছু পাকিস্তানী বাঙ্গালী মুসলমান আছে)। কলিকাতায় প্রায় ৬০০০ রিক্সাচালক ও ৫শত ঘোড়ারগাড়ী-চালক সকলেই অবাঙ্গালী। ঠেলা ও গরুমহিষের গাড়ীর চালক—৩০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নাই। কলিকাতার রাস্তায় ৫ হাজার ঝাঁকামুটে সকলেই অবাঙ্গালী। কর্পোরেশনের জলের কল, রাস্তা মেরামত, রাস্তা পরিষ্কার প্রভৃতি কাজে ১৫ হাজার শ্রমিকের মধ্যে অবাঙ্গালীরই বিপুল সংখ্যাধিক্য। মাটি কাটা, ইট তৈরী প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত ৫০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে বাঙ্গালী খুঁজিয়া পাওয়া দায়। ধুপী, ক্ষৌরকার, মুদি, মিঠাইওয়ালা, গোয়ালা, দারোয়ান ইত্যাদির বহু কাজেও অবাঙ্গালীর প্রাধান্য। পানের দোকান, বিড়ি সিগারেট ও শরবতের দোকান প্রভৃতিতেও বাঙ্গালী কোণঠাসা। জুতা সেলাই, মেরামত প্রভৃতি চামড়াসংক্রান্ত কাজ সম্পূর্ণভাবে অবাঙ্গালীর করায়ত্ত। পাটশিল্পে মোট লোকের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩ হাজার। তাহার মধ্যে পরিচালনা, তত্ত্বাবধান এবং কেরানীগিরি কাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যা মোটামুটি ১৫ হাজার, বাকি ২লক্ষ ৮৭ হাজার শ্রমিকের মধ্যে অবাঙ্গালীদেরই বিপুল সংখ্যাধিক্য।

সত্য বটে, বাঙ্গালীর দৈহিক দুর্বলতা গুরুতর শ্রমসাধ্য কাজের উপযোগী নয়—কিন্তু উপরোক্ত তালিকায় এমন বহু কাজ নাই কি যাহা বাঙ্গালী একটু অভ্যাস করিলেই করিতে পারে ? যে উৎসাহ লইয়া বাঙ্গালী যুবক পাড়ায় পাড়ায় হাতেলেখা মাসিকপত্র, 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' প্রভৃতির আয়োজন করে সেইরূপ বা ততোঽধিক আগ্রহ লইয়া যাহাতে বেকার যুবকদের মধ্যে কায়িক পরিশ্রম করিবার রুচি ও ইচ্ছা জাগ্রত হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। ইহা শুধু বাঙ্গালী বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যই প্রয়োজন তাহা নয়, বাঙ্গালীর সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টির জন্যও উহা অপরিহার্য। বাঙ্গালী 'আরামজনক' কাজের দিকে চাহিয়া থাকে বলিয়াই অবাঙ্গালীরা আসিয়া জীবন-সংগ্রামের সব ক্ষেত্রে তাহাকে হটাইয়া দিতেছে। বাঙ্গালী যদি এদিকে আত্মসচেতন হয় এবং যে সকল শ্রমসাধ্য জীবিকা তাহার দেহে কুলায় বৃথা আভিজাত্যবোধ ত্যাগ করিয়া সুসংহতভাবে তাহা গ্রহণ করে তাহা হইলে উহা একটি সঙ্গত মহান আদর্শেরই বাস্তব রূপায়ণ হইবে, 'প্রাদেশিকতা' হইবে না। 'ছোটকাজ' বলিয়া কোন জিনিস আজকাল আর সমাজজীবনে বর্তমান নাই—কিন্তু তবুও বাঙ্গালীর মনে এই কুসংস্কার যেন এখনও চাপিয়া আছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অবস্থা অনেক ভাল। বাঙ্গালী তাহার বাঙ্গালীত্বের জন্য গর্ব অনুভব করে। কিন্তু এই বাঙ্গালীত্বের সংজ্ঞা কি ? শুধু মিহি গলায় করুণ টানা সুরে গান, কবিতালেখা, 'সাংস্কৃতিক বক্তৃতা' আর নৃত্যানুষ্ঠান ? তাহা দ্বারাই কি বাঙ্গালী বাঁচিবে ? বাঙ্গালীত্বের সংজ্ঞা যাহাই হউক ছোটবড় কাজের নিষ্ফল বিচার ত্যাগ করিয়া সকলপ্রকার শ্রম-জীবিকায় ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যের ন্যায় দলে দলে লাগিয়া না গেলে বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক ও শ্রমনৈতিক কাঠামো দাঁড় করানো যাইবে না—ঐ কাঠামো দৃঢ় না হইলে 'সংস্কৃতি'র মনোরম সৌধও ভাঙ্গিয়া পড়িবে। গত ৭ই আগষ্ট ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং এসোসিয়শনের একাদশ বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাঙ্গলার শিল্পপতিগণকে (যাঁহারা অধিকাংশই অবাঙ্গালী) তাঁহাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে বাঙ্গালী শ্রমিক নিয়োগের আবেদন জানাইয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন—এই সমস্ত বাঙ্গালী শ্রমিক অন্যান্য রাজ্যের শ্রমিকদের ন্যায় দক্ষতাসম্পন্ন।' কথা এই যে, শুধু কারিগরী শিল্প নয়, সকল প্রকার শ্রমের কাজেই বাঙ্গালী কর্মীর অভাব না হয় এবং বাঙ্গালীর শিল্প বাণিজ্য সংসার সমাজ দিনের পর দিন প্রধানতঃ বাঙ্গালীর শ্রমেই পরিনিষ্পন্ন হয় এমন শুভদিন বাঙ্গলায় কবে আসিবে ?

অভিনন্দন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু এ বৎসর ৬৫ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বয়সও গত ১৭ই অগ্রহায়ণ (৩ রা ডিসেম্বর, ১৯৫৪) সত্তর পূর্ণ হইল। সমগ্র দেশের সহিত আমরাও আমাদের হৃদয়ের অকুণ্ঠিত অভিনন্দন ভারতমাতার এই আদর্শ সেবকদ্বয়ের উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করেতেছি। স্বামী বিবেকানন্দ এই শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশমাতৃকার সেবাকেই শ্রেষ্ঠ উপাসনা জ্ঞান করিবার আহ্বান ভারতের যুবকগণকে মর্মস্পর্শী আবেগে জানাইয়াছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী—দুইজনেই তাঁহাদের জীবন ও কর্মে এই আদর্শকে বিশিষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং স্বার্থবুদ্ধি, লোকমান্য, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতিকে দূরে রাখিয়া অতন্দ্রিত পরিশ্রমে দেশকে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এখনও বহুবর্ষ এই মহাব্রত পরিপালন করিবার শক্তি ভগবান তাঁহাদিগকে দান করুন ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

অতীন্দ্রিয়তা ও মরমী অনুভূতি

স্বামী প্রভবানন্দ

পৃথিবীর সকল ধর্মেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উহা এই যে, ধর্মসমূহের প্রত্যেকটিই মূলতঃ অতিপ্রাকৃতিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐশ্বরিক সত্য লাভ করা যায় না, বিচার দ্বারাও নহে। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ঋষি ও প্রত্যাদেশ-প্রাপ্ত মহাপুরুষগণের নিকট প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া দাবি করা হয়। এইগুলি আমরা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই জগতের বিবিধ ধর্মগ্রন্থে। খ্রীষ্টধর্ম যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই বাইবেল হইতেছে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের প্রত্যাদিষ্ট সাধক বর্গ (prophets) এবং খ্রীষ্ট কর্তৃক প্রাপ্ত ঈশ্বরাদেশের সমষ্টি। এইরূপ কোরাণ মহম্মদের ও ত্রিপিটক বুদ্ধের পাওয়া অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের লিপিবদ্ধ সংগ্রহ। প্রত্যেক ধর্মের এক একটি নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ আছে, আর উহাকে বলা হইয়া থাকে ঈশ্বরের বাণী।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জগতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ বলেন এই আদেশ একমাত্র তাঁহাদেরই স্ব স্ব ধর্মশাস্ত্রে সংরক্ষিত আছে। হিন্দুগণ কিন্তু এইরূপ কোন দাবি করেন না। তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বেদকে যখন তাঁহারা বলেন 'অনাদি' ও 'অনন্ত' তখন ইহাই সুস্পষ্ট যে, ঈশ্বরাদেশকে তাঁহারা কোন একটি নির্দিষ্ট পুস্তকের কতিপয় পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করিতেছেন না। গ্রন্থের আদি ও অন্ত আছে কিন্তু আপ্তবাণী হইতেছে সনাতন।

প্রত্যাদিষ্ট সত্যকে যখন কোন বিশেষ ধর্ম-শাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ বলিয়া স্বীকার করি, তখন স্বভাবতই ঐ সত্যের ব্যক্তিগত অনুভূতির উপর কোন জোর দেওয়া হয় না। আমরা বিশ্বাসের বলে ঐ সত্যসমূহকে স্বীকার করিয়া লই। ধর্মকে যদি শুধু 'বিশ্বাস' করা হয় এবং তাহা যদি আমাদিগকে সাধনা ও অনুভূতির দ্বারা অতীন্দ্রিয় সত্যসমূহকে নিজস্ব করিয়া লইতে প্রেরণা না দেয়, তাহা হইলে ধর্ম হইয়া পড়ে নিষ্ফল। সে ক্ষেত্রে পার্থিব জীবনই হয় মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। শাস্ত্রপুস্তকে আমরা কতকগুলি নৈতিক সূত্র ও বিধি নিয়মাদি দেখিতে পাই। মানুষের সমাজকে পরি-চালিত করিবার জন্য এগুলি খুব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি ভগবানকে প্রত্যক্ষ অনুভবের চেষ্টা না করিয়া শুধু নৈতিক আচার ও বিধিনিষেধ-সমূহ অনুসরণ করিয়াই যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকি তাহা হইলে সংসারে আমরা 'ভাল লোক' বলিয়া পরিচিত হই সত্য, কিন্তু উহাই কি সব? একমাত্র ভগবৎ-দর্শন দ্বারাই জীবনে রূপান্তর আসিতে পারে। অতএব কোন ধর্মকে যথাযথ অনুসরণ করা মানে নিজেদের জীবনে ঐ ধর্মের প্রত্যাদিষ্ট সত্যসমূহের অনুভব। ঈশ্বর আছেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় কিন্তু যতক্ষণ না তাঁহাকে জানা যাইতেছে, তাঁহার দেখা পাইতেছি, ততক্ষণ তো তিনি কল্পনামাত্র। নিছক কল্পনায় জীবনের রূপান্তর হয় না। মহাজ্ঞানী দার্শনিক আচার্য শংকর বলেন,—'ঐশ্বরিক সত্য লাভ করিবার পক্ষে শাস্ত্রসমূহেরই একমাত্র প্রামাণ্য নহে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই উহার প্রকৃত প্রমাণ।' সত্য হইতেছে চিরন্তন। সেই সত্য যদি অতীতের ঋষি ও প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে তাহা হইলে আধ্যাত্মিক পথের যে কোন পথিকের নিকটই উহা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

ধর্মীয় মতবাদসমূহের কথা ছাড়িয়া দিয়া ধর্মের মূল উৎসকে অনুসন্ধান করিলেও দেখি যে, সেই একই বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে—

প্রত্যক্ষানুভূতি। উপনিষদের জনৈক ঋষি ঘোষণা করিয়াছেন,—"হে অমৃতের সন্তানগণ, শুন, আমি সেই সত্যকে জানিয়াছি যাহা অন্ধকারের অতীত। তোমরাও উহা জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম কর।" বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে,—"যে ব্যক্তি কথা অনুযায়ী কাজ করে না তাহার বাক্য যেন গন্ধহীন সুন্দর পুষ্প—মনোরম কিন্তু ব্যর্থ।" হয় তো কাহারও ধর্মশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রীয় সত্যগুলি জীবনে কার্যকরী করিতে না পারিলে তাহার সুন্দর কথাগুলি নিরর্থক হইয়া যায়। "যে কথা অনুযায়ী কাজ করে, বর্ণে ও গন্ধে পরিপূর্ণ সুন্দর পুষ্পের মতো তাহার কথাগুলি পবিত্র ও ফলপ্রসূ হয়।"

খ্রীষ্ট বলিয়াছেন,—"সত্য কি তাহা জানিতে হইবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে মুক্ত করিবে।"

কাহাকেও ধর্ম প্রচার করিতে দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন,—"তুমি কি আদেশ পাইয়াছ?" অর্থাৎ তুমি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছ? তাঁহাকে জানিয়াছ ও অনুভব করিয়াছ? অপরে আহার করিলে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না। ধর্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ধর্ম তখনই সার্থক যখন উহা জীবনে পরিবর্তন আনে এবং মানুষকে আধ্যাত্মিকতার এমন এক স্তরে লইয়া যায় যেখানে রহিয়াছে বিশুদ্ধ আনন্দ এবং জ্ঞানের অনুভব। উহাই ধর্মের সার্থকতা। উপনিষদে আছে—"আনন্দেই এই বিশ্বের জন্ম, আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই লয়।" এই সত্যের অনুভবই ধর্মের সার কথা। অতএব ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়তা অভিন্ন। ইহা কোন বিশেষ মতবাদ বা অন্ধবিশ্বাসের উপর স্থাপিত নয়। ইহার অর্থ এই যে, মানুষ ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারে, তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারে, ঈশ্বরসত্তার সহিত নিজের যোগস্থাপন করিতে পারে। মরমীরা (Mystics) সব যুগেই ছিলেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন। তাঁহারাই নিজেদের অন্তরে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ প্রত্যক্ষ করিয়া শাস্ত্রে নিহিত সত্যকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখেন।

মানুষ ধর্ম চায় কেন? গভীর মনোবিজ্ঞার দিক হইতে বুদ্ধ ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি কোন মতবাদ বা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয় লন নাই। তাঁহার দৃষ্টি যেন প্রত্যেক মানুষের অন্তরের গভীরতায় পৌঁছাইয়াছিল। বুদ্ধ বলিলেন—জগতের সকলেই দুঃখকষ্ট ভোগ করে। প্রত্যেক প্রাণীই দুঃখকে জয় করিবার ও অসীমের সন্ধান পাইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। ইহাই ধর্মের সূত্রপাত। মানুষ যতদিন মনে করে ঈশ্বরানুভূতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে দুঃখকষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে ততদিন তাহাকে সুখ দুঃখের রাজ্যে থাকিতে হয়। দ্বন্দ্বাতীত না হইলে, দ্বৈতবোধের পারে না যাইতে পারিলে, অবিমিশ্র আনন্দ লাভ হয় না। সাংখ্যদর্শনকার কপিলের ভাষায় দুঃখকষ্টের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি—ব্যাধি, বার্ধক্য ও মৃত্যুর কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিই হইতেছে মানুষের চরম লক্ষ্য।

সাংসারিক সুখ বিসর্জন দিয়া বুদ্ধদেব সত্যের সন্ধানে বাহির হইলেন। তিনি দেখিলেন, প্রত্যেকের তিনটি দুঃখ—ব্যাধি, বার্ধক্য ও মৃত্যু। শুধু নিজের জন্য নয়, মানব-সাধারণের জন্য বুদ্ধ এই দুঃখত্রয়ের হাত হইতে পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়াছিলেন। নির্বাণ অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ সকল প্রকার দুঃখকষ্টের হাত হইতে মুক্তি পায়। কিন্তু বুদ্ধই একমাত্র এই সত্য প্রচার করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ, খ্রীষ্ট এবং জগতের বড় বড় অবতারগণের প্রত্যেকেরই শিক্ষার মর্ম ইহাই।

মানুষ নিজের মাপ দিয়াই সকল জিনিস ওজন করে। তাহার প্রকৃতিতে জড় হইতে ঈশ্বর পর্যন্ত সর্বস্তরের সত্য প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বুধজনেরা বলেন, দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয়ে এই মানুষ। সে নিজেকে দৈহিক বা মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক সত্তা বলিয়া চিন্তা করিতে পারে। নিজেকে স্থূলদেহ মাত্র মনে করিলে বিশ্বের সব

কিছুর স্থূল, পাঞ্চভৌতিক দিকটাই মনে পড়ে। আবার মানুষ যখন নিজের মানস সত্তার সহিত তাদাত্ম্যবোধ করে তখন তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে বুদ্ধিবৃত্তির স্তরে। আর নিজেকে আধ্যাত্মিক জীব বলিয়া ভাবিলে তাহার আত্মদৃষ্টি খুলিয়া যায়, তখন সব কিছুকেই সে আত্মারূপে, ভগবানরূপে দেখে। যতদিন আমরা নিজেদের দেহ বা মন বলিয়া মনে করি, ততদিন দ্বৈতবুদ্ধি যায় না। মনের সহিত নিজের একাত্মতা বোধ যতদিন থাকিবে ততদিন সুখ ও দুঃখ উভয় বোধই থাকিতে বাধ্য। মানুষ মূলতঃ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। দেহ ও মনের সার্থকতা উহারা মানুষের এই আত্মিক সত্তা অনুভব করিতে সহায়ক হইবে বলিয়াই। আত্মচৈতন্যের অনুভূতি হইলেই মানুষ সর্বপ্রকার বন্ধনের পারে চলিয়া যাইতে পারে।

এখন ধর্ম বা মরমীবাদের বিপক্ষীয় কয়েকটি আপত্তির বিচার করা যাক। একটি প্রধান আপত্তি এই যে, অতীন্দ্রিয়তা হইল পলায়নবাদ। কিন্তু বাস্তবিক উহা কি অন্যায়? বাড়ীতে আগুন লাগিলে জ্বলন্ত গৃহ হইতে কি লোক পলায়ন করিবে না? সত্য বটে অতীন্দ্রিয়তা জীবনের দুঃখ ও বন্ধন হইতে পলায়নের পথ বলিয়া দেয়, কিন্তু কাহার না তাহা কাম্য? অধিকন্তু মরমী কেবল নিজের মুক্তি অনুসন্ধানের জন্যই দুঃখকষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহেন না। বোধি লাভ করিয়া তিনি অপর সকলকে অজ্ঞতার বন্ধন হইতে মুক্ত করেন। তিনিই যথার্থ নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। বৈদান্তিক আদর্শ হইল—"মুক্তি, নিজের ও মানব জাতির কল্যাণার্থে।"

অমনি আর একটি আপত্তি উঠে—জীবন কি দুঃখময়? এ কথা সত্য যে বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট এই জীবনকে দুঃখময় বলিয়াছেন; "যে আত্মরক্ষা করিবে সে জীবন হারাইবে।" কিন্তু তাঁহাদের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য কি ছিল? উক্ত কথার তাৎপর্য এই যে, পার্থিব জীবন স্বতই দুঃখের নহে, কিন্তু উহাকে যখন চরম ও পরম লক্ষ্য মনে করি তখনই উহা দুঃখময় হইয়া দাঁড়ায়। পৃথিবীর এই জীবনকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্যই জীবনের প্রয়োজনীতা। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন,—"নবজন্ম না হইলে মানুষ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।" কিন্তু সেই নূতনজন্ম লাভ করিতে হইলে দেহ ধ্বংসের প্রয়োজন নাই। নূতন করিয়া জন্মাইতে হইবে আমাদিগকে চেতনার দিক দিয়া—এই জীবনেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

আর একটি আপত্তি—অতীন্দ্রিয়তাবাদ যুক্তিবাদের বিরোধী। ইহা কিন্তু সত্য কথা নয়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হইল যুক্তির সীমার উর্ধ্বে। মানুষকে ইহা 'বুদ্ধির অতীত শান্তি'তে লইয়া যায়। জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিবেই ইহা কেহ বলিতে পারে না। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু নিরীক্ষণের জন্য বৈজ্ঞানিককে নূতন নূতন যন্ত্রসমূহ আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। আমরা যাহাকে 'যুক্তি' বলি উহাকে একটা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে কাজ করিতে হয়, আর উহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতেই আপন তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলিও অভ্রান্ত জ্ঞান। সেগুলি কতিপয় ব্যক্তির নিকটেই সীমাবদ্ধ নহে, যে কেহ ইন্দ্রিয়-সংবেদনকে অতিক্রম করিতে পারিবেন তিনিই উহা লাভ করিবেন।

মনগড়া কল্পনা এবং যথার্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতির পার্থক্য কি? ধরুন, কাহারও হয়তো মতিভ্রম হইয়াছে অথচ সে উহাকেই অতিচেতন জ্ঞান বলিয়া দাবি করে। বুঝিব কিভাবে? প্রথমতঃ প্রত্যাদিষ্ট সত্যের লক্ষণ এই যে, উহা অন্য কোন প্রণালী বা উপায়ে জানা যায় না। উহাতে অনেক তথাকথিত "যৌগিক বিভূতি" বাদ পড়িয়া যায়। যেমন, 'দূরদর্শন' বা 'দূরশ্রবণ'—এগুলি তো টেলিভিশন বা বেতারের সাহায্যেও জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ

আপ্তবাণী অন্য কোন প্রমাণের প্রতিকূল হইবে না। যদি আমার প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ অপরের অভিজ্ঞতার বিরোধী হয় তাহা হইলে উহা অখণ্ডনীয় নহে। অন্য কথায়, যুক্তিকে প্রমাণরূপে ধরিতেই হইবে।

ঈশ্বরাদেশ প্রাপ্তির তিনটি স্তর আছে। প্রথম, শাস্ত্র হইতে বা যাঁহার নিকট সত্য প্রকাশিত হইয়াছে এরূপ কোন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে সত্য শুনিতে হইবে। কিন্তু উহার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করা উচিত নয়। বহুলোক শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করে অথচ উহার অর্থ কি জানে না। অতএব দ্বিতীয় স্তর হইল সত্যকে বিচার করিয়া দেখা। বিচারদ্বারা বোধশক্তি লাভ হয়। তৃতীয় স্তর হইতেছে সত্যের ধ্যান করা। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব একটি পন্থা আছে। রসায়ন শাস্ত্র পড়িতে হইলে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে উহার প্রয়োগ শিখিতেই হইবে। সেইরূপ, ঐশ্বরিক সত্যের প্রয়োগ শিক্ষা করাই ধর্ম। কিন্তু এই প্রয়োগ শিখিতে গেলে কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্ত ও নিয়ম মানার প্রয়োজন হয়। একজন মহাপুরুষকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—"পথ কি?" তিনি উত্তর দিলেন "প্রাচীন ঋষিগণ যে পথে গিয়াছেন উহাই পথ।" যেমন ধরুন, আমি পদার্থবিদ্যা শিখিতে চাই। পদার্থ-বিদ্যাবিদের নিকট গিয়া বলিলাম, আমি শুধু ধ্যান করিয়া ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিব। এইরূপ মনোভাব হইলে আমি কখনও পদার্থ বিদ্যাবিদ্ হইতে পারি কি? উহা শিখিতে হইলে ঐ বিজ্ঞানানুশীলনের নির্দিষ্ট নিয়মগুলি অনুসরণ করিতেই হইবে। ধর্মের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। প্রাচীন ঋষিরা যে পথে গিয়াছেন উহাই পথ। উহা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

সেই পথটি কি? সংক্ষেপতঃ উহা হইল আত্মসংযম এবং ভগবদ্‌ভক্তি। চঞ্চল মনকে বশ করিতেই হইবে ও সেই মন ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। প্রার্থনা, একাগ্রতা ও ধ্যানই উহার উপায়। এইগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা গড়িয়া উঠে।

এই নিয়মগুলি অনুশীলন করিলে সাধকের ধর্ম-চেতনা বর্ধিত হয় এবং সে মানুষের ও বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে উত্তরোত্তর জ্ঞান লাভ করে। বাহিরের স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ, তাহার পর সূক্ষ্ম দেহ বা মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি। ইহার পর কারণ শরীর বা জীব-সংস্কারের আশ্রয়। এই সব কিছুকে ছাড়াইয়া আত্মা বিরাজ করিতেছেন। আত্মাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। আত্মা এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই আবরণত্রয়ে আবৃত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—চেতনার এই তিনটি স্তরে মানুষ যথাক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে বাস করে। এই সকল আবরণকে অতিক্রম করিলেই সে চতুর্থ অর্থাৎ তুরীয়ে পৌছায়। তখনই হয় বিশুদ্ধ চৈতন্যের সাক্ষাৎকার।

অনুরূপভাবে এই ভৌতিক বিশ্ব যেন ব্রহ্মের বা আত্মার স্থূল শরীর। আর স্থূল বিশ্বের অন্তরে রহিয়াছে সূক্ষ্ম বা মানসজগৎ। উহা যেন ব্রহ্মের সূক্ষ্মদেহ। এই মানসস্তর অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের কারণ শরীর। কারণ শরীর অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্ম বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা। তাঁহারই নাম ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম। ঈশ্বরের এই কারণ শরীরের পরে নৈর্ব্যক্তিক সত্তা বা নির্গুণ ব্রহ্ম।

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহা সমর্থন করেন। উদাহরণস্বরূপ এক বিন্দু জল লওয়া যাক্। উহার মধ্যে সমগ্র সৌর জগতের প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হইবে। সেইরূপ বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা বর্তমান, মানুষের মধ্যেও তাহা বর্তমান। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সাধকের নূতন দৃষ্টি খুলিয়া যায়। পাঞ্চ-ভৌতিক দৃষ্টি দিয়া আমরা স্থূল বিশ্বকে দেখি। যতই অন্তরের গভীরে প্রবেশ করি ততই সত্যের অন্য স্তর উন্মুক্ত হয়। সূক্ষ্ম স্তরে লোকের হয়তো অলৌকিক

কিছু দেখিবার ও শুনিবার শক্তি হইতে পারে। স্থূল বিশ্বে স্থূল প্রলোভন আছে। মানসিক বিশ্বে তেমনি মানসিক প্রলোভন আছে। 'সিদ্ধাই' লাভ করিয়া যদি কেহ সেগুলি ব্যবহার করে তবে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হয়। যাহা হউক, প্রত্যেককেই এই স্তর দিয়া যাইতে হয় না। উহার পর কারণ স্তর। এই স্তরে মানুষ দেখে ব্রহ্মের 'ব্যক্তি'-স্বরূপ বা ঈশ্বর-রূপ। তখন কাহারও মূর্তি-দর্শন বা মন্ত্র-দর্শন ঘটে। আবার সেইসব ঈশ্বরীয় রূপ মিলাইয়া শুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে পারে। 'কারণ' স্তর পার হইল ব্রহ্মের নির্গুণ সত্তা বা নিরুপাধিক সত্তা। এখানে আসিলে ঈশ্বরের সহিত ভেদবোধ থাকে না, থাকে নিবিড় তাদাত্ম্যানুভূতি।

হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান প্রত্যেকেই এই অবস্থা লাভ করিতে পারে। সেইজন্যই যথার্থ ধর্ম সার্বজনীন। উহা বলে না, আমার পথই একমাত্র সত্য। সব পথকেই উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে। খ্রীষ্ট বা কৃষ্ণ যাঁহাকেই অনুসরণ করা যাক না কেন অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ উভয়েরই এক সত্তা। পথ যাহাই হউক সর্বদা স্মরণ রাখা চাই যে, খ্রীষ্টান, হিন্দু বা বৌদ্ধ হওয়া আমাদের লক্ষ্য নহে। আমাদের আদর্শ হইল 'শ্রীভগবানের মানুষ' হওয়া।

এস

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ক্ষণিকের এই স্বপন-মায়ায় হারায়ে তোমারে আজ
কত না দহন সহি নিশিদিন, হে মোর হৃদয়-রাজ।

ভাবি যারা প্রিয় অতি আপনার আমি নহি তাহাদের
বেদনার মাঝে ভুলিব কেমনে—তারা শুধু বিলাসের।
যেদিন হিসাব হয়ে যাবে শেষ নাহি রবে পরিচয়
বারে বারে হেরি বেদনাবিধুর জীবনের অভিনয়।
তাই রহে যারা নহে তারা মোর, হারায়ে ফেলেছি যারে
সেই হবে চির পথের বন্ধু—সাথী হবে পরপারে।

ব্যথা-কণ্টকে ছিন্ন যখন আমার হৃদয়খানি
অন্তরে আমি শুনেছি তখন তোমার অভয়-বাণী।
তুমি ভুলিবে না জানি ওগো আমি—তোমারে ভুলেছি তাই
স্বপনের ভুল ভেঙ্গে দিয়ে আজ তাই হে তোমারে চাই।
ধূলায় মলিন আলোকবিহীন জীর্ণকুটীরে মম
বারেকের তরে এস সুন্দর, এস এস প্রিয়তম!

শিক্ষার ভিত্তি

(পূর্বানুবৃত্তি)

(তিন)

'বনফুল'

[বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি' বক্তৃতা]

বর্তমানে কি করিয়া ধর্মকে আমাদের শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করা যাইতে পারে, আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি তাহার অনুকূল কি না, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে যে সব মনীষী আমাদের নব্যভারতের নির্মাতা ধর্মসম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রাজা রামমোহন রায় যে প্রাচীন বেদান্ত ও উপনিষদ্‌কেই আমাদের জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন একথা সুবিদিত।

বঙ্কিমচন্দ্রও বহুকাল পূর্বে তাঁহার ধর্মতত্ত্ব নামক পুস্তকে বলিয়াছেন – ধর্ম বলিতে ভারতবাসীর মনে যে ভাবের উদয় হয় ইংরেজী 'রিলিজন' শব্দটি সে ভাবের বাহক নয়। তিনি বলিয়াছেন সংক্ষেপে ধর্মের অর্থ পূর্ণ-বিকশিত মনুষ্যত্ব। উক্ত পুস্তকেই তিনি গুরুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"আমিও সেই আর্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন, 'না, তাহা চলিবে না। আমাদের বিধিগুলির সর্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া যদি এখন চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্মের মর্মের বিপরীতাচরণ হইবে।' হিন্দুধর্মের সেই মর্মভাগ অমর; চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিতসাধন করিবে, কেন না মানব-প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি।···কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে। ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্য-জীবনের সর্বাংশই ধর্মকর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্যজাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ, সকল লইয়াই ধর্ম। এমন সবব্যাপী সর্বসুখময় ধর্ম কি আছে?"

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, সাহিত্য ও সাধনা এই ধর্মেরই মহিমা প্রচার করিয়া জগতের শিক্ষিত সমাজে ভারতের বৈশিষ্ট্যকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতে ও ভারতের বাহিরে তিনি এই ধর্মের মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ নানা দৃষ্টিকোণ হইতে করিয়াছেন। কিন্তু চিকাগো বক্তৃতায় হিন্দু-ধর্মের সারমর্মটি তিনি বলিয়াছিলেন। "Unity in Variety is the plan of nature and the Hindu has recognised it. Every other religion lays down certain fixed dogmas and tries to force the society to adopt them ..The Hindus have discovered that the absolute can only be realised or thought of or stated through the relative and the images, crosses and crescents are simply so many symbols, so many pegs to hang the spiritual ideas on.

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাশতদল বিকশিত হইয়াছে

এই ভারতীয় ধর্মের মৃণালশীর্ষে। ভারতীয় ধর্মই যেন আধুনিক যুগে রবীন্দ্রসাহিত্যরূপে নূতন মূর্তিতে, নূতন বর্ণে, নূতন ছন্দে, নূতন দ্যোতনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই ধর্মই তাঁহার কবিতায় গানে গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে প্রার্থনায় ওতপ্রোত হইয়া আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার সম্মুখে সনাতন অথচ অভিনব বিস্ময়লোকের সন্ধান দিয়াছে। বস্তুত, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যে শাশ্বত দেবতাকে তিনি ধ্যান-যোগে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারই আরতি তিনি সারাজীবন করিয়া গিয়াছেন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি গাহিয়াছিলেন—

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসীক মুসলমান খৃষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসনপাশে
প্রেম-হার হয় গাঁথা
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয়হে, ভারতভাগ্য-বিধাতা।

এই ভারতীয় ধর্মের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে তিনি যে ক্ষুদ্র কবিতাটিতে রূপায়িত করিয়াছেন তাহা আপনারা সকলেই পড়িয়াছেন, তবু এই প্রসঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি
ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে,
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার ,
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে ;
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ-ত্যজি' সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

এই ব্রহ্মময় সনাতন ধর্ম মহাত্মা গান্ধীরও জীবনের প্রেরণা। ইহার মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, আত্মশক্তিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি, একমাত্র শক্তি। এই সনাতন ধর্মই তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিল যে, প্রেমই সভ্য-মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। গীতার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "I learnt Sanskrit to enable me to read the Gita. To-day the Gita is not only my Bible or my Koran - it is my mother. I lost my earthly mother who gave me birth long ago, but this eternal mother has completely filled her place by my side ever since. She has never changed, she has never failed. When I am in difficulty or distress I seek refuge in her bosom.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহাত্মা হইয়াছেন এই ধর্মেরই প্রভাবে। তাঁহার সমস্ত জীবন এই জননীর নির্দেশেই পরিচালিত হইয়া বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে।

আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রের যাঁহারা কর্ণধার তাঁহাদেরও জীবনাদর্শ ভারতীয় সনাতন ধর্মের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার কিছু কিছু আমেজ হয়তো কাহারও কাহারও চরিত্রে লাগিয়াছে, কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলেই তাঁহাদেরও চরিত্রের মূল সুরটা যে ভারতীয় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু যদিও তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন—I am an exotic plant : neither of the East nor of the West, কিন্তু তাঁহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত প্রেরণা সমস্ত চিন্তার উৎস ভারতীয় ধর্মেরই মর্মবাণী। তাঁহার Discovery of India গ্রন্থে লক্ষ্য করি

উপনিষদের মহিমা তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনকে বারংবার বিচলিত করিয়াছে। উপনিষদ্ সম্বন্ধে ইউরোপীয় দার্শনিকদের অভিমত তিনি সাগ্রহে এবং সগর্বে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শোপেন-হাওয়ার যেখানে বলিতেছেন—"From every sentence of the Upanishads deep, original and sublime thoughts arise and the whole is pervaded by a high and holy and earnest spirit. In the whole world there is no study so beneficial and elevating as that of the Upanishads. They are products of the highest wisdom. It is destined sooner or later to become the faith of the people. The study of the Upanishads has been the solace of my life, it will be the solace of my death."

যেখানে তিনি Max Muller এর মত উদ্ধৃত করিতেছেন, "The Upanishads are to me like the light of the morning, like the pure air of the mountains, so simple, so true, if once understood..."

যেখানে তিনি আইরিশ কবি A. E.র অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন—"The Bhagavat Gita and the Upanishads contain such godlike fullness of Wisdom on all things that I feel the authors must have looked with calm remembrance back through a thousand passionate lives, full of feverish strife for and with shadows, ere they could have written with such certainty of things which the soul feels to be sure....

সেখানে তাঁহার মনও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঋষির সহিত সুর মিলাইয়া গাহিয়া উঠিয়াছে চরৈবেতি, চরৈবেতি। পথিক চল, চল।

যেখানে তিনি বলিতেছেন—I have loved life and it attracts me still and in my own way, I seek to experience it, though many invisible barriers have grown up which surround me. But that very desire leads me to play with life, to peep over its edges, not to be a slave to it, so that we may value each other all the more. Perhaps I ought to have been an aviator, so that when the slowness and dullness of life overcame me I could have rushed into the tumult of the clouds and said to myself—

'I balanced all, brought all to mind,
The years to come seemed waste of breath
A waste of breath the years behind,
In balance with this life, this death'

সেখানে তিনি সত্য-সন্ধী ভূমা-উন্মুখ ভারতীয় সাধকেরই সমগোত্র। কারণ ভারতীয় ধর্ম Negation of life নহে, তাহা নিজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে জীবনকে অবলম্বন করিয়াই সত্যান্বেষণ।

আমাদের প্রধান মন্ত্রীর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা সত্য আমাদের বর্তমান যুগের অন্য নেতাদের সম্বন্ধেও তাহা সত্য। পণ্ডিত নেহেরুই তাঁহার Discovery of India পুস্তকে শ্রদ্ধেয় সি. রাজগোপালাচারীর উপনিষদ্‌সম্বন্ধে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজ-গোপালাচারী বলিতেছেন—"The spacious imagination, the majestic sweep of thought and the almost reckless spirit

of exploration with which, urged by the compelling thirst for truth, the Upanishad teachers and pupils dig into the 'open secret' of the universe, make this most ancient world's holy books still the most modern and most satisfying.

আমাদের উপ-রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বর্তমানে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সারাজীবন তিনি ভারতীয় ধর্মেরই মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম মানব-ধর্ম, জীবন-ধর্ম। তাহা কোন doctrine বা Dogma র কারাগারে আবদ্ধ শুষ্ক নিয়মাবলীমাত্র নহে।

আমাদের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদও বিশুদ্ধ ভারতীয় ধর্মেরই সাধক। শুধু তিনি কেন মধ্য-প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ, বিহারের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল প্রবীণ পণ্ডিত আণে, আচার্য নরেন্দ্র দেব, এমন কি ভিন্নধর্মাবলম্বী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান আবদুল গফ্ফর খাঁ, মহম্মদ আসফ আলী, বাংলার বর্তমান রাজ্যপাল শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের জীবনাদর্শ ও রচনাবলী হইতে প্রমাণ করা খুবই সহজ যে ভারতের সনাতন ধর্ম—যাহাকে রবীন্দ্রনাথ মানবধর্ম বলিয়াছেন—যাহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—It is the same light coming through glasses of different colours—সেই ধর্ম ইঁহাদেরও প্রত্যেকেরই জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছে। সে ধর্ম সুস্থ সবল অনাসক্ত স্বাধীন মনুষ্যত্বের উদ্বোধক। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যখন এইসব মনীষীদের প্রাণপণ প্রয়াসে ভারতে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকরাজ প্রতিষ্ঠিত হইল তখন যে ধর্ম ভারতীয় সভ্যতার মেরুদণ্ড সেই ধর্মটাই শিক্ষা হইতে বাদ পড়িয়া গেল।

আমাদের কন্‌ষ্টিটিউশনের ২২নং আর্টিকেলে বলা হইয়াছে

(১) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds.

(২) No person attending any educational institution recognised by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person, or if such person is a minor, his guardian has given a consent thereto.

ইহাই বর্তমান আইন। Religion সম্বন্ধে এ আইন অন্যায় নহে, কিন্তু যে ধর্মের স্বরূপ আমি পূর্ববর্তী প্রবন্ধে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি তাহা Religion নহে, তাহা জীবনকে অবলম্বন করিয়া সত্য-সন্ধান, তাহা সুস্থ মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা। এক হিসাবে এই এক-পেশে শিক্ষার মাধ্যমেও আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই ধর্মই অনুসরণ করিতেছি। রসায়নে, পদার্থবিদ্যায়, জীব-বিজ্ঞানে, গণিতে, সাহিত্যে, দর্শনে আমরা সত্যকেই অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু সেই সত্য জীবনের চরম সত্যের সহিত অসংলগ্ন বলিয়া আমাদের জীবনে তাহা অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে আমরা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য মুখস্থ করিয়া ডিগিলাভের কাজে তাহাকে নিয়োগ করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইতেছি। যাহার মূল্য

অন্তরের আনন্দিত উপলব্ধিতে, যে উপলব্ধি ব্যতীত সুস্থ সুন্দর জীবন অসম্ভব, তাহার মূল্য বাহিরের বাজারে খুঁজিতে গিয়া হতাশ হইতেছি। এই ধর্মহীন শিক্ষাই আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রায় সবাপেক্ষা মর্মান্তিক ট্র্যাজিডি।

একথা মিথ্যা নয় যে রিলিজনের নামে পৃথিবীর সর্বত্র বহু রক্তপাত হইয়াছে, ইহাও সত্য যে এই রিলিজনের ওজুহাতেই মাত্র কিছুদিন পূর্বে হিন্দু মুসলমানের পাশবিকতা ঘৃণ্যতমরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু আমি যে ধর্মের কথা বলিতেছি তাহা এ ধরনের Religionএর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ।

আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর যে University Education commission গঠিত হইয়াছিল (১৯৪৮-৪৯), অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ যে কমিশনের নেতা ছিলেন সে কমিশনও এবিষয়ে সচেতন।

কমিশন বলিতেছেন—What is responsible for the communal excesses is not religion as such but the ignorance, bigotry and selfishness with which religion gets mixed up Selfish people in an attitude of cynical opportunism use religion for their own sinister ends. In his thirtysecond year Napoleon professed himself ready to adopt any religion which might serve his purpose.

তাঁহারা বলিতেছেন যে রিলিজনের এই দ্বন্দ্ব-প্রবণতার জন্যই অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের মতো আমাদের রাষ্ট্রও ধর্ম-নিরপেক্ষ secular হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের পার্লামেন্টে যখন বিতর্ক হইতেছিল তখন ডাক্তার আম্বেদকার বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত রিলিজনের সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিবার সামর্থ্য রাষ্ট্রের নাই। একটি রিলিজনকে রাষ্ট্রধর্মের প্রাধান্য দিয়া অন্যান্য রিলিজনকে ক্ষুণ্ণ করিবার ইচ্ছাও রাষ্ট্রের হওয়া উচিত নয়, তাই তাঁহারা ধর্ম-নিরপেক্ষ হইয়াছেন। নিরপেক্ষতা যে রাষ্ট্রের প্রধান গুণ হওয়া উচিত তাহাতে সন্দেহ কি। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে ধর্মের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইলেও ভাষার ক্ষেত্রে তাঁহারা নিরপেক্ষ হইতে পারেন নাই, একটি ভাষাকেই তাঁহারা রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা দান করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধেই করিয়াছেন এবং হিন্দীকে নির্বাচন করিয়া তাঁহারা যে অন্যায় করিয়াছেন তাহাও আমি বলিতেছি না, আমার বক্তব্য যে, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাঁহারা যেমন একটা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিলেন তেমনি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যই উদারতম ভারত ধর্মের অনুশীলনকেও শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তত স্থান দিতে পারিতেন। Religion ও Secular state সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া University commission অবশ্য ভারতের উদার ধর্মের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন যে আমাদের রাষ্ট্র যদিও ধর্ম-নিরপেক্ষ, কিন্তু "It does not mean that nothing is sacred or worthy of reverence. It does not say that all our activities are profane and devoted to the sordid ideals of selfish advancement. We donot accept a purely scientific materialism as the philosophy of the state. That would be to violate our nature, our 'Svabhava', our characteristic genius, our 'Svadharma'. Though we have no state religion, we cannot forget that a deeply religious strain has run throughout our history like a golden thread. Besides, in the preamble to our constitution we have

the makings of a national faith, a national way of life which is essentially democratic and religious.

অর্থাৎ তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ধর্মের উদার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

একথাও তাঁহারা বলিয়াছেন—"The adoption of the Indian outlook on religion is not inconsistent with the principles of our constitution.

ইহার পর তাঁহারা Indian outlook on Religion সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা অতিশয় চমৎকার। তাহাতে একথাও স্বীকৃত হইয়াছে যে—"If religion is a mother of realisation it cannot be reached through a mere knowledge of dogmas. It is attained through discipline, training, Sadhana. What we need is not formal religious education but spiritual training ...

কিন্তু এই spiritual training কি করিয়া লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। কেবল নিজের চেষ্টায়—যাহাকে তাঁহারা Self-effort বলিয়াছেন—আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া শক্ত। কোনও শিক্ষার পথেই self-effort দ্বারা অগ্রসর হওয়া যায় না। এমন কি চুরি-বিদ্যা, পকেটকাটা-বিদ্যার জন্যও গুরু চাই। দুই একজন অসাধারণ ছাত্র হয়তো self-effort দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ ছাত্রেরা তাহা পারিবে না। University commission যে শৃঙ্খলা, যে সংযম, যে সাধনার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, যে স্বাধীন জিজ্ঞাসু সত্তার উদ্ভব তাঁহারা ছাত্রদের মধ্যে মূর্ত দেখিতে চাহিয়াছেন, অন্য ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধান্বিত মনোভাব তাঁহারা প্রতি ভারতবাসীর নিকট প্রত্যাশা করেন তাহা কিছুতেই সম্ভব হইবে না যদি ছাত্রদের বাল্যকাল হইতে একটা আদর্শ-অনুকূল পরিবেশে মানুষ না করা হয়। সেকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এই পরিবেশ ছিল। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে তাহার কোনও ব্যবস্থা নাই। University commission অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের আলোচনায় ভারতবর্ষের আদর্শকে তাঁহারা মুখ্য স্থান দিয়াছেন এ কথা সত্য, কিন্তু শিক্ষার যেটা আসল ভিত্তি—সুস্থসবলচরিত্র-নির্মাণ সেইখানেই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ রহিয়া গিয়াছে। University commission Dogma এবং competitive indoctrination এর নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু এই dogma এবং competitive indoctrination কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ বিভিন্ন রূপে মূর্ত হইয়া আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করিতেছে না? আমরা প্রত্যেকেই আজ এক বা একাধিক ইজ্‌মের কবলে পড়িয়া বা স্কন্ধে চড়িয়া আত্মভ্রষ্ট হইয়াছি। শুধু কমিউনিজ্‌ম্ নয় গান্ধী-ইজ্‌মও আজ আমাদিগকে কম বিব্রত করিতেছে না। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ কেহ অনুসরণ করে না, কিন্তু তাঁহার নামে দল পাকাইতে অনেকেই উৎসুক। সত্য শিক্ষার ভিত্তিতে চরিত্রগঠনের ব্যাপক ব্যবস্থা যতক্ষণ না হইতেছে ততক্ষণ যে কোনও মহৎ আদর্শকে লোকে dogma ও doctrine এ পরিণত করিবে। University commission truly religious man এর স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—The truly religious man is the enemy of the established order, not its spokesman. He is the man of alien vision. He throws existing things into confusion. He is a revolutionary

who is opposed to every kind of stagnation and hardening. He is the advocate of the voice which society seeks to stifle, of the ideal to which the world is deaf.

ভারতবর্ষের ধর্মজগতের ইতিহাসে এরূপ truly religious man এর বারংবার আবিভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র বক্তৃতা দিয়া এরূপ truly religious man সৃষ্টি করা যায় না, প্রত্যেক বালককে বাল্যকাল হইতেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-অনুসারে বিকশিত হইবার সুযোগ দিতে হয়। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রে সে সুযোগ আপাতত নাই।

ভারতবর্ষের ধর্ম চিরকাল প্রগতিশীল। তাহা কোনও কালে stagnation কে প্রশ্রয় দেয় নাই। বৈদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড যখন সমস্ত জাতির প্রাণসত্তাকে আবিল করিয়াছিল তখন আমরা পাইয়াছিলাম উপনিষদের ঋষিদের, গৌতম বুদ্ধকে। বৌদ্ধ ধর্মের যখন অধঃপতন ঘটিল, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায় যখন "বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া উঠিল" তখন আবির্ভূত হইলেন কুমারিল ভট্ট, তাহার পর শঙ্করাচার্য, তাহার পর রামানুজ। মুসলমানের আমলে আমাদের নৈতিক জীবন যখন পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমরা পাইয়াছিলাম শ্রীচৈতন্যকে। যে কয়জনের নাম করিলাম ইঁহারা প্রত্যেকেই শৈশবকালে আর্য ধর্মের আদর্শ-অনুসারে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে ইংরেজের আমলে জড়বাদের কবলে আবার যখন আমাদের দেশের ধর্ম বিপন্ন, তখন যে সব বিদ্রোহী সমাজ-সংস্কারকদের আমরা পাই তাঁহারা যদিও বাল্যকাল ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অতিবাহিত করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদেরও জীবনের আদর্শ ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমেরই আদর্শ। রাজা রামমোহন, দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ইঁহারা প্রত্যেকেই ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিকশিত করিয়াছেন।

এই ব্রহ্ম, এই সত্য সকল ধর্মেরই মূল। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই সকল ধর্মের চরম লক্ষ্য, প্রতি ধর্মের ক্ষেত্রে নামটা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীর সুধী ও সাধক সমাজ বারংবার সমস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে সুখ-শান্তির আশা নাই। কিন্তু কেবল মাত্র self-effort দ্বারা এই ব্রহ্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, তাহার জন্য সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য Self-effort প্রয়োজন, সাধনার ক্ষেত্র পাইলেও সকলে ব্রহ্মজ্ঞানী হয় না, কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্র না থাকিলে তাহার সম্ভাবনা পর্যন্ত লোপ পায়। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে সেরূপ ক্ষেত্রের কোনও ব্যবস্থা নাই।

আমি অবশ্য ইহা দাবি করিতেছি না যে আমাদের রাষ্ট্র গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম করিয়া দিন এবং সেখানে ছাত্রেরা দলে দলে গিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করুক। এরূপ ব্যবস্থা করিলে যে রাতারাতি আমরা সকলে ধার্মিক হইয়া উঠিব এ অসম্ভব কল্পনা আমার নাই। কিন্তু এ ক্ষোভ আমার আছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রে ভারতের কোন ছাপ নাই, ভারতীয় রাষ্ট্রও পৃথিবীর অন্যান্য জড়বাদী রাষ্ট্রের অনুকরণমাত্র। আজ যখন পাশ্চাত্ত্য দেশের চিন্তা-নায়কগণ জড়বাদের ভীষণ ভবিষ্যৎ দিব্য-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া আশা করিতেছেন যে ভারত-ধর্মই পৃথিবীতে একদিন হয়তো শান্তির পথ প্রদর্শন করিবে তখন ভারত-রাষ্ট্র কিন্তু নকল করিতেছে জড়বাদী পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদের, তাহার সমস্ত উৎসাহ ও ঝোঁক গিয়া পড়িয়াছে কেবলমাত্র আধিভৌতিক উন্নতির উপর। পৃথিবীতে শান্তির পথ দেখাইতে হইলে জাতির চরিত্রে যে অধ্যাত্মবোধ জাগরূক করা দরকার সে সম্বন্ধে আমাদের রাষ্ট্র উদাসীন। আজ

একমাত্র বিনোবাজীর কর্মে ও বাণীতে ভারতের শাশ্বত আহ্বান শোনা যাইতেছে, কিন্তু তিনি শাসন-পরিষদের কেহ নহেন। তিনিও দেশের আধিভৌতিক দুঃখমোচনের জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার পদ্ধতিতে ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ সুরটি লাগিয়াছে বলিয়া পৃথিবীর সভ্যসমাজ আজ মুগ্ধ বিস্মিত হইয়াছেন। আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রে সে সুর নাই। পরাধীনতার ফলে আমরা অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি তাহা সত্য, আমাদের ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করা যে সর্বাগ্রে দরকার এ কথাও সত্য, কিন্তু স্বদেশে সেই অন্নবস্ত্র উৎপাদন করিবার জন্য যে চারিত্রশক্তি প্রয়োজন তাহার দিকে মন না দিলে সমস্তই বৃথা হইবে। হইতেছেও। আমাদের রাষ্ট্র আমাদের দুঃখমোচনের বিবিধ ব্যবস্থা করিয়াছেন; চাষ, জমি, ট্রাক্টার, সার, জল-সেচনের ব্যবস্থা, গরু ছাগল মুরগী মৎস্যের উন্নতি, বড় বড় নদীকে বাঁধিয়া বিদ্যুৎউৎপাদন; এ সমস্তের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে, কিন্তু যে পরিমাণ সুফল আমরা আশা করিয়াছিলাম সে পরিমাণ সুফল হয় নাই। তাহার কারণ যে সুস্থ, সমর্থ চরিত্রবান্ মানুষ সমস্ত কর্মের প্রথম ও প্রধান উপাদান সেরকম মানুষই আমাদের দেশে বেশী নাই। যে ইংরেজী শিক্ষা আমরা স্কুলে কলেজে এতদিন লাভ করিয়াছিলাম তাহাতে গলদ ছিল, তাহা ধর্মহীন ছিল, ইংরেজেরা আমাদের শক্ত সমর্থ চরিত্রবান্ মানুষ করিতে চান নাই, মেরুদণ্ড-হীন কেরানী করিতে চাহিয়াছিলেন। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের শিক্ষাপদ্ধতিতেও সে গলদ বর্তমান। আধিভৌতিক উন্নতির জন্য হয়তো আমাদের বাধ্য হইয়া এই সব অপটু অসাধু লোকদের লইয়াই কাজ চালাইতে হইবে, কি যদি ভবিষ্যতের জন্য আমরা সাধু সচ্চরিত্র কর্মী-সৃষ্টির আয়োজন না করি আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আমাদের সমস্যার সমাধান হইবে না, সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য জাতিরা যে আজ আধিভৌতিক জগতে এত উন্নত তাহার কারণ তাহাদের চরিত্র। তাহাদের শিক্ষাবিধিও চরিত্র-নির্মাণকেই প্রাধান্য দিয়াছে। কেবল নোট মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ করাই সে দেশের চরম লক্ষ্য নয়। তাহাদের লক্ষ্য জীবনকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করিবার শক্তি অর্জন করা। তাঁহাদের দেশের একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ Mr. whitehead বলিয়াছেন—I lay it down as an educational axion that in teaching you will come to grief as soon as you forget that your pupils have bodies. তাঁহাদের শিক্ষাটা ভোগমুখী তাই তাঁহারা আজ ভোগের শিখরে সমাসীন। প্রাচীনকালে যে ক্ষত্রিয় রাজারা রাজসিকতার আধার ছিলেন তাঁহারাও বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষা লাভ করিতেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহাদের চরিত্রে সেই শক্তি সঞ্চার করিত যাহা না থাকিলে ভোগও করা যায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণও যদি আমরা করিতে চাই তাহা হইলেও চরিত্র-নির্মাণ করিতে হইবে। ভোগের শিখরে চড়িয়া আজ পাশ্চাত্য দেশবাসীরা অবশ্য বুঝিতেছেন যে ধর্মহীন ভোগসর্বস্ব শিক্ষার পরিণাম আণবিক বোমা, বহুকাল পূর্বে তাঁহাদেরই কবি Coleridge যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"If a man is not rising upward to be an angel, depend upon it, he is sinking downward to be a devil. He cannot stop at the beast. The most savage of men are not beasts, they are worse, a great deal worse"—সেই বাণীর মর্ম তাঁহারা এখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের দার্শনিক পণ্ডিতগণ এখন ভারতবর্ষের বেদে উপনিষদে গীতায় তন্ত্রে angel হইবার সত্য পথ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন। অর্থাৎ আজ

তাঁহারাও বুঝিতেছেন শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র বিষয় নয়, বস্তু নয়, bodies নয়, ব্রহ্মজ্ঞান, মুক্তি।

আমরাও যদি আমাদের ভবিষ্যৎ দেশবাসীদের চরিত্রবান্ কর্মনিষ্ঠ করিতে চাই তাহা হইলে ধর্মকেই শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া পূর্বে একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে, সত্যই কি আমরা চাই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করুক? আমাদের সত্যই যদি সে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে তাহা হইলে উপায়ের অভাব হইবে না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—এ বাক্য মিথ্যা নহে। ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ হোক ইহা আমরা অন্তরের সহিত কামনা করিয়াছিলাম ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কোন বাধাই আমাদের নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। আমাদের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস আমাদের ভাবনা-অনুযায়ী সিদ্ধির ইতিহাস। প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে অনুশীলন-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, সেখানে নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া গীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যুবক যুবতীরা মৃত্যুবরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। পুলিসের লাঠির সম্মুখে তাহাদের উন্নত শির অবনত হয় নাই, কামান বন্দুক, নির্বাসন বা মৃত্যুদণ্ড তাহাদের ভীত করিতে পারে নাই। শুনিয়াছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু রাত্রে ঘরের খালি মেজেতে শুইয়া জেল খাটিবার মহড়া দিতেন। নির্যাতনের জন্য অনেক পূর্ব হইতেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেশের অগণ্য আবালবৃদ্ধবনিতা স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রাণদান করিয়াছে, অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতালাভ না করা পর্যন্ত আমরা নানাভাবে যুদ্ধ করিয়াছি। আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল বলিয়া সে স্বাধীনতা আজ আসিয়াছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা চরিত্রে মনে স্বাস্থ্যে শক্তিতে প্রকৃত ভারতবাসী হোক এ আকাঙ্ক্ষা সত্যই যদি আমাদের মনে জাগে তাহা হইলে তাহাও সফল হইবে।

কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে সত্য-ধর্মের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে এখনও জাগে নাই। আমরা যে নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছি তাহা নয়, বহুকাল পরাধীনতার ফলে, আমাদের ধর্ম এক বিকৃত তামসিক রূপ ধারণ করিয়াছে। ধর্ম আজকাল আমাদের হেঁসেলে ঢুকিয়াছে, তাবিজে মাদুলিতে আশ্রয় লইয়াছে, তাহা কতকগুলি লোককে অতি সাবধানী ভীতু, কতকগুলি লোককে অতি ভণ্ড ধাপ্পাবাজে পরিণত করিয়াছে, আবার কতকগুলিকে করিয়াছে পলাতক। এই ধর্মের এভাবে কোষ্ঠি এবং পাঁজি আমাদের জীবনে কায়েমী আসন দখল করিয়াছে, ইহাদের ব্যঙ্গ করিয়াই শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় একদিন লিখিয়াছিলেন—

বুঝেছি আত্মা অবিনশ্বর, বুঝেছি মিথ্যা দুনিয়া
তাই আমাদের নাই ভয় কানা কৌড়ি
তাই পথ চলি দিনখন দেখে খনার বচন শুনিয়া
সাহেব এড়াই সেলাম করি বা দৌড়ি
কারণ আমরা অধ্যাত্মিক জাতি
ইহলোকে যারা মজা লুটিবার লুটে নিক
আমরা রহিনু পরকালে হাতপাতি।

আর একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

হারু সন্ন্যাসী বেশ তো—বাঃ
কামনা না যাক কামানো ঘুচেছে
বেড়ে চলে দাড়ি বেশ তোফা
কিছুই না ক'রে বছর ভর খেতে চান
বাণী না খসায়ে জ্ঞানীর আসন পেতে চান
বিনা খরচায় গাঁজাচর্চায় মেতে যান
অহো, নমো তায়,
পলাতক ইনি ছাড়ি সুত-জায়া
ছাড়ি যত মায়ামমতায়।
অহো, নমো তায়।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে ও রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কৌতুকে এ জাতীয় ব্যঙ্গ রচনা অনেক আছে। বস্তুত যে ধর্ম মানুষকে নিষ্কাম নির্ভীক, শান্ত ও উদার করে সেই ধর্মই তামসিকরূপে আজ অনেককে বিষয়ী, কামুক, অশান্ত ও নীচ করিয়া তুলিয়াছে। গুরু-করা আজকাল শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা ফ্যাশান হইয়া উঠিয়াছে, বিবিক্তিবাবা জাতীয় গুরুরও অভাব নাই, কিন্তু ধর্মে প্রকৃত আগ্রহ জাগিলে রাত্রি শেষে সূর্যালোকবৎ যে আনন্দচ্ছটা জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়া দেয় সেরকম আনন্দিত জীবন তো বড় একটা দেখিতে পাই না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি ধর্মও পণ্য, বা সামাজিক সুখ-সুবিধা পাইবার যন্ত্রমাত্র। আমি যাহা বলিলাম সর্বক্ষেত্রে তাহা হয়তো সত্য নয়, প্রকৃত সাধু ও সাধক নিশ্চয়ই আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের দেশের শাশ্বত ধর্মকে সেবায়, শিক্ষায়, কর্মে, সংস্কৃতিতে রূপদান করিবার জন্য যে সন্ন্যাসীর দল গৃহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারও ইহার নিদর্শন। ব্যক্তিগতভাবে ইহাদের ভিতরের খবর আমি বেশী জানি না, কিন্তু বাহির হইতে যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি তাহাতে ইহাদের সম্বন্ধে মনে শ্রদ্ধাই জাগিয়াছে। দেশে প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই আছেন, তাহা না হইলে দেশ রসাতলে যাইত।

কিন্তু একথাও সত্য যে সত্য ধর্মের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা জাতির মনে ব্যাপকভাবে এখনও জাগে নাই। আমরা এখনও আন্তরিক ভাবে কামনা করিতে পারিতেছি না যে আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রকৃত মানুষ হোক। লেখা পড়া শেখে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই—এ মোহ এখনও আমাদের মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিদ্যালয়ের আদর্শ আমাদের দেশবাসী তেমন উৎসাহের সহিত গ্রহণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন—"দেশের যারা ভাল ছেলে, তারা আমার ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে খুব কম এসেছে। যেসব ছেলের কোথাও কিছু হল না তারাই এসে আমার বিদ্যালয়ে ভিড় বাড়াতে লাগল।"

এইজন্যই ক্রমশ তাহা সাধারণ বিদ্যালয়ে পরিণত হইল এবং এখন যাহা বিশ্বভারতী নামে পরিচিত তাহা পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণমাত্র।

আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধী প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শকে বর্তমান যুগের উপযোগী করিয়া যে বনিয়াদী শিক্ষা-বিধি প্রবর্তিত করিয়াছেন তাহাও আমাদের দেশে তেমন সমাদর লাভ করিতেছে না। আমাদের যে রাষ্ট্রে মহাত্মা গান্ধী father of the Nation বলিয়া কীর্তিত সেই রাষ্ট্রও বনিয়াদী শিক্ষাকে যথোচিত মর্যাদা দিতেছেন না। মুখ্যত যে চারিটি প্রস্তাবের উপর বনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত তাহা এই -

(১) এই শিক্ষা প্রাথমিক, সর্বজনীন, অবৈতনিক, আবশ্যিক (Compulsory) এবং সাতবৎসরব্যাপী হইবে।

(২) শিক্ষার বাহন হইবে কর্ম। সমাজ ও পরিবেশের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে।

(৩) এই শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে।

(৪) শিক্ষার ভিত্তি হইবে সত্য ও অহিংসা। প্রাচীন ভারতবর্ষের মূল শিক্ষাদর্শের সহিত ইহার কোনও তফাৎ নাই। মহাত্মা গান্ধীকে বনিয়াদী শিক্ষায় ধর্মের স্থান কি হইবে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—We have left out the teaching of religions from the Wardha Scheme of education, because we are afraid that religions as they are taught and practised to-day lead to conflict rather

than unity. But on the other hand, I hold that the truths that are common to all religions can and should be taught to all children.

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। এই আদর্শের কথাই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার চিকাগো বক্তৃতায় পৃথিবীর সজ্জন-সমাজকে শুনাইয়াছিলেন :—

"As the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea, so O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee..."

আমাদের বর্তমান কনষ্টিটিউশনের সহিতও ইহার বিরোধ নাই—কিন্তু তবু বনিয়াদী শিক্ষা দেশবাসীর বা স্বদেশী রাষ্ট্রের আন্তরিক সমর্থন লাভ করে নাই।

শুনিয়াছি যে সব ছাত্রের শহরের স্কুলে আসিয়া পড়িবার সুবিধা বা সামর্থ্য নাই তাহারাই বনিয়াদী বিদ্যালয়ে গিয়া ভরতি হয়, শুনিয়াছি গান্ধীভক্ত মন্ত্রীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ-পরিচালিত স্কুলে গিয়াই ভরতি হইয়াছে, কিংবা ভরতি হইতে চায়। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ছেলেমেয়েদের বনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাঠাইতে চান না। ভাল শিক্ষকও সেখানে কম আছেন। শুনিয়াছি যে সব শিক্ষকদের অন্য কোথাও ভালো চাকরি জোটে না তাঁহারাই অগত্যা গিয়া এইসব বনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন।

অর্থাৎ দেশের লোকদের এ বিষয়ে সত্য আগ্রহ জাগে নাই। যদি জাগিত তাহা হইলে রাষ্ট্রের সাহায্যভিক্ষা করারও প্রয়োজন আমরা অনুভব করিতাম না। গৃহেই আমরা এ ব্যবস্থা করিতাম। আমরা আমাদের ছেলেদের বিলাসী, অকর্মণ্য, পরনির্ভরশীল করিয়া ফেলিয়াছি কারণ আমরা নিজেরাই বিলাসী, অকর্মণ্য পরনির্ভরশীল। ছেলেদের সেই আদর্শে গড়িতে চাই, বুঝি না যে ইহাতে কি সর্বনাশ হইতেছে। পূর্বে আমাদের দেশে স্কুলকলেজ ছিল না, কিন্তু সেজন্য জ্ঞানের ধারা অবরুদ্ধ হইয়া যায় নাই, শিক্ষকেরা নিজ নিজ গৃহেই ছাত্রদের গ্রহণ করিতেন। ছাত্রেরা তাঁহাদের গৃহে গিয়া তাঁহাদের পরিবারভুক্ত হইতেন। আমরা ইচ্ছা করিলে এ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। এ ব্যবস্থায় আর কিছু না হউক আর্থিক সুবিধা যে হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ সেকালে যাহার যেমন সামর্থ্য সে তেমনই গুরু-দক্ষিণা দিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিত, এ বিষয়ে বাঁধা-ধরা কোন কড়া নিয়ম ছিল না। একালের শিক্ষকরাও এ ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই রাজী হইবেন যদি তাঁহারা ছাত্রের মধ্যে প্রকৃতজিজ্ঞাসু এবং ভক্ত সেবককে দেখিতে পান। কিন্তু তাহাই তাঁহারা পাইবেন না। একালে ছাত্রের পিতামাতারা ছেলেদের গুরু-গৃহে ভৃত্যের মতো কাজ করিতে দিতে সম্মত হইবেন কি? সেকালে গুরু-দক্ষিণা সম্বন্ধে বাঁধ-ধরা নিয়ম ছিল না বটে, কিন্তু এ নিয়মটা আবশ্যিক ছিল—শিষ্যকে গুরু-গৃহে গৃহকর্ম করিতে হইবে। ব্যক্তিগতভাবে কায়েন মনসা বাচা গুরুকে সেবা করা প্রত্যেক ছাত্রের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল। অধ্যাপক আল্‌টেকার মনু হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে ছাত্র গুরুকে সেবা করিবে অগ্নির মতো, দেবতার মতো, রাজার মতো, পিতার মতো, ভর্তার মতো। তিনি দেখাইয়াছেন যে বৌদ্ধ-বিহার এবং হিন্দু গুরুকুলে—"The student was expected to do personal service to the teacher like a son, suppliant or slave. He was to give him water and

toothstick, carry his seat and supply him bath-water. If necessary he was to cleanse his utensils and wash his clothes. He was further to do all sundry work in his monastary or his teacher's house like cleansing the rooms, bringing fuel etc....Tradition asserts that even great personages like Srikrishna had deemed it an honour to do all kind of menial work in their preceptor's house during their student days.

অভিজাত মুসলমান সমাজেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট আলমগীরের পুত্র মহম্মদ নিজহস্তে তাঁহার গুরুর কর্দমাক্ত পদ-প্রক্ষালন করিয়া দেন নাই বলিয়া আলমগীর বিরক্ত হইয়াছিলেন শুনিতে পাই।

যে Dignity of Labour লইয়া আজকাল আমরা মুখে আস্ফালন করি কিন্তু যাহার আভাস পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নাই, তাহারই পরিপূর্ণ রূপ কর্মযোগ। সেকালে গুরু-গৃহে এই কর্মযোগেরই ভিত্তি স্থাপিত হইত। অনেকে হয় তো বলিবেন, "মশায় সবই তো বুঝলাম কিন্তু সেরকম গুরু কোথায় ?"

এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে ১৩১৩ সালে তাঁহার 'শিক্ষাসমস্যা' নামক প্রবন্ধে দিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—"শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে, কিন্তু গুরু তো ফরমাশ দিলেই পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে আমাদের সংগতি যাহা আছে তাহার চেয়ে বেশী আমরা দাবি করিতে পারি না এ কথা সত্য। অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও সহসা আমাদের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের আসনে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আমদানি করা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু একথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে আমাদের যে সংগতি আছে অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। ডাকের টিকিট লেফাফায় আঁটিবার জন্য যদি জলের ঘড়া ব্যবহার করি তবে তাহার অধিকাংশ জলই অনাবশ্যক হয়, আবার স্নান করিতে হইলে সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায়, একই ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে বাড়ে। আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয়-মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে—ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মস্তিষ্ক জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয় মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশী তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়েও কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। একপক্ষ হইতে যথার্থভাবে দাবি উত্থাপিত না হইলে অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি খাটিতে থাকিবে ..."

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের অন্তর হইতে এ প্রার্থনা এখনও উত্থিত হয় নাই। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাই নাই, গান্ধীজীর বনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধেও তেমন উৎসাহী নহি। তাহার কারণ শিক্ষাকে এখনও আমরা অর্থের মানদণ্ডেই বিচার করিতে উৎসুক, সত্য-শিক্ষার মানদণ্ডে নয়। আমরা একথা এখনও অন্তর দিয়া উপলব্ধি করি নাই যে অর্থ উপার্জন

করিতে হইলেও ডিগ্রি অপেক্ষা সত্যের ভিত্তিতে নির্মিত চরিত্রই বেশী কার্যকরী।

আমাদের এই বোধ জাগরিত না হইলে রাষ্ট্রের বা সমাজের মঙ্গল নাই। আমাদের আপাত-উন্নতির বুদ্বুদ সামান্যতম আঘাতেই ফাটিয়া যাইবে। ধর্মহীন শিক্ষা আমাদের দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে, অন্নবস্ত্রের জন্যও তাই আমরা পরমুখাপেক্ষী। শক্তির একমাত্র উৎস যে সত্য-শিব-সুন্দর তাহার প্রতি আগ্রহবান্ না হইলে আধিভৌতিক সুখ সুবিধাও আমরা লাভ করিতে পারিব না। পিতা মাতাদের মনে যদি এ আগ্রহ জাগে তবেই আমরা ধর্মকে—সত্য-মানবধর্মকে, শিক্ষার ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভারতবাসী নামের যোগ্যতা দান করিতে পারিব।

এ আগ্রহ জাগাইবার কোনও উপায় আছে কি? একটি উপায় আছে। কিন্তু সে উপায়ের পথও ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। সে উপায় সাহিত্য। সৎসাহিত্য মানুষকে তাহার অজ্ঞাতসারেই সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে, মহৎমানবত্বের দিকে আকর্ষণ করে। আমাদের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক লোকরাজ ইচ্ছা করিলে ব্যাপকভাবে সৎসাহিত্য প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সাহিত্যের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্ধ করিয়া বা সাহিত্যকে উৎসাহ দিবার নামে নিজেদের পেটোয়া লোকেদের কিছু বখশিস বা মেডেল দিলে তাহা সম্পন্ন হইবে না। আন্তরিকভাবে সেজন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। দেশের জ্ঞানী ও গুণীদের আহ্বান করিয়া যাহাতে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সহজে সুলভমূল্যে কথকতা, অভিনয়, সিনেমা, লাইব্রেরি প্রভৃতির মাধ্যমে সৎসাহিত্য প্রচারিত হয়, জনসাধারণের অন্তরে যাহাতে তাহা প্রবেশ করে এ ব্যবস্থা করিতে হইবে। করা কিছু অসম্ভব নয়। ইউনিভার্সিটি কমিশনও ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা যে ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের জন্য করিতে বলিয়াছেন তাহা ব্যাপকভাবে সমস্ত দেশের জন্য করা কি অসম্ভব? দেশের উন্নতির জন্য ছাগ-পরিদর্শক, মুরগী-পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছে দেশের প্রকৃত উন্নতি যে সাহিত্যের মাধ্যমে হয় সে সাহিত্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতা দাবি করিলে তাহা কি খুব অন্যায় দাবি হইবে?

প্রশ্ন উঠিবে সাহিত্য বলিতে কি বোঝায়? যাহাই ছাপার অক্ষরে বাজারে বাহির হয় তাহাই আজকাল সাহিত্য-পদবাচ্য। কিন্তু মানুষের মনকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত করে সৃষ্টিধর্মী কাব্য-সাহিত্য। পুরাকালে তপোবন সমাজের যে স্থান অধিকার করিয়াছিল বর্তমান যুগে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যও ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এখন সৎসাহিত্যের উপবনেই আমরা সত্য-শিব-সুন্দরের সাক্ষাৎ পাই।

আধুনিক জগৎ যখন বস্তুবাদের স্থূল চাপে ম্রিয়মাণ হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়ে তখন আমরা বিবেকানন্দের সাহিত্য হইতে আশ্বাস পাই—Man has never lost his empire. The soul was never been bound. Believe that you are free and you will be.

রমা রল্যাঁ তখন উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন—উত্তিষ্ঠত! চিত্তকে সকল আপস, সকল হীন মৈত্রীবন্ধন, সকল ছদ্মবেশী দাসত্ব হইতে মুক্ত কর। চিত্ত কাহারও দাস হইতে পারে না। আমরাই চিত্তের দাস। আমাদের আর কোন প্রভু নাই। এই স্বাধীন চিত্তের আলো বহন করা, তাহাকে রক্ষা করা এবং পথভ্রান্ত মানুষকে ইহার আশ্রয়ছায়ায় ডাকিয়া আনাই আমাদের কাজ—

বঙ্কিমচন্দ্র তখন আমাদের দেখাইয়া দেন—মা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন, কি হইবেন। তিনিই বলিয়া দেন মাতৃপূজায় শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য ধন নয়, ঐশ্বর্য নয়, এমন কি প্রাণও নয়, ভক্তি।

রবীন্দ্রনাথ তখন বলেন—

তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে' কেমন করে' সইব
বাতাস আলো গেল মরে' এ কীরে দুর্দৈব
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে—
গান আছে যার ওঠনা গেয়ে—
চলবি যারা চলরে ধেয়ে—
আয়নারে নিঃশঙ্ক
ধূলায় পড়ে' রইল চেয়ে ওই যে অভয় শঙ্খ।

বস্তুত, সৎসাহিত্যই এই যুগে অশান্ত হৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। এই আণবিক বোমা-ভীত, ইজ্‌ম্‌-কণ্টকিত স্বার্থপরতার যুগও কবির বাণীকে স্তব্ধ করিতে পারে নাই। আজও আমরা সাগ্রহে বিশ্বাস করিতে চাই সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আর্ত অসহায় মানব আজও উৎকর্ণ হইয়া প্রাচীন কবি ঋষির উচ্ছ্বসিত বাণী শুনিতেছে—হে অমৃতের পুত্রগণ তোমরা শ্রবণ কর, তমসার পরপারে আমি আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছি।

সাহিত্যই আমাদের একমাত্র পথ, একমাত্র পথপ্রদর্শক। আধুনিক ভারতের নব জাগরণের মূলে ছিল এই সাহিত্য। রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের এবং আরও অনেকের সাহিত্যসাধনাই আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। মহত্তর সংগ্রামে আমাদের যদি আবার অবতীর্ণ হইতে হয় এই সাহিত্যই আমাদের প্রেরণা জোগাইবে। জড়বাদের কোলাহলে পৃথিবী আজ পরিপূর্ণ, কিন্তু সে কোলাহলের উর্ধ্বে এখনও উৎকৃষ্ট কাব্য বর্তমান এবং তাহা সত্য-শিব-সুন্দরের চিরন্তন মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কি করিয়া রাখিয়াছে তাহার রহস্য ব্রহ্মের রহস্যের মতোই অতি জটিল অথচ অতি সহজ। যাঁহারা জড়বাদ-লব্ধ ধোঁয়াটে বুদ্ধি দিয়া ইহা বিশ্লেষণ করিতে যান তাঁহারা জটিলতার সৃষ্টি করেন মাত্র, যাঁহাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ, অন্তর রসগ্রাহী তাঁহারা সহজেই ইহার মর্মে প্রবেশ করেন। উৎকৃষ্ট সৃষ্টিধর্মী কাব্য সূর্যের মতোই স্বয়ম্প্রভ, স্বয়ম্প্রকাশ। তাহা তর্ক করে না, সুপারিশ সংগ্রহ করে না একেবারে মর্মে গিয়া প্রবেশ করে, সমস্ত সত্তাকে অভিভূত করিয়া দেয়।

একথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে যাঁহারা উচ্চ-কোটীর বিজ্ঞানী তাঁহারাও সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধানী। তাঁহারা সে সন্ধান ভিন্নপথে করেন। কবিদের উপলব্ধি ও ইঁহাদের উপলব্ধিতে বিশেষ তফাত নাই। ইঁহাদেরও মনে হয় তিলের মধ্যে তৈলের মতো, দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের মতো, ভূগর্ভস্থ নদীর মধ্যে জলের মতো, কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে অগ্নির মতো ক্ষুদ্র সত্যের অন্তরালে বৃহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন আছে। এই হিসাবে উচ্চকোটীর বিজ্ঞানীরাও সত্যসন্ধী, সত্যদ্রষ্টা কবি। আইনষ্টাইন তাই মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত, সুলিভান তাই Limitations of Science লিখিয়াছেন, Julian Huxley তাই ভগবানের স্বরূপসন্ধানে ব্যস্ত, James Jeans তাই সৃষ্টির বিস্ময়ে আপ্লুত, অলিভার লজ তাই পরলোকের রহস্যে নিমগ্ন, H. G Wells তাই বিজ্ঞানকে কাব্যে এবং কাব্যকে বিজ্ঞানে রূপ দিয়াছেন, জগদীশচন্দ্র তাই 'অব্যক্ত' নামক অনুপম গ্রন্থের গ্রন্থকার।

বস্তুত যেখানেই প্রতিভা সৃষ্টিধর্মী সেখানেই তাহার ধর্ম এক—সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাই তাই সমাজকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবান্বিত করে। সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাবানদের দায়িত্বও তাই অনেক বেশী।

কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এ যুগের সৃষ্টিধর্মী কবি বা বিজ্ঞানীরা সকলে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন নহেন। পূর্বেই বলিয়াছি এ যুগে সৎ-সাহিত্যের ক্ষেত্র ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। যে যন্ত্রসভ্যতা মানবের শাশ্বত সভ্যতাকে আজ গ্রাস করিতে উদ্যত তাহাই ইহার জন্য মুখ্যত দায়ী।

যন্ত্রসভ্যতা অনেক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-স্রষ্টাকেও আত্মভ্রষ্ট করিয়াছে। তাঁহারা উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির দিকে তত মনোযোগী নহেন যত মনোযোগী Best seller রচনার দিকে। Best seller যে ভাল বই হইতে পারে না তাহা আমি বলিতেছি না। কিন্তু সাধারণত Best seller সেই সব পুস্তকই হয় যাহা অধিকাংশ লোকের সাময়িক উত্তেজনাকে তৃপ্ত করে, শাশ্বত সত্যের খবর যাহাতে বড় একটা পাওয়া যায় না। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করিয়া এখন আমাদের দেশের কোনও শক্তিশালী লেখক যদি কাব্য রচনা করেন তাহা হু হু করিয়া বিক্রয় হইবে। পৃথিবীর যে কোনও রাষ্ট্রকে ব্যঙ্গ করা সহজ, কারণ সাধারণ মানবের সুখশান্তির দিক হইতে বিচার করিলে কোন রাষ্ট্রই এখনও পর্যন্ত নিখুঁত হইতে পারে নাই। G. B. S একরূপ অনেক রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। Swift এর গালিভার্স ট্রাভল্‌স্‌ও ব্যঙ্গ রচনা। ব্যঙ্গ রচনা বা যে কোনও রচনা সৃষ্টি হিসাবে তখনই সার্থক হয় যখন তাহা শাশ্বত রস-বোধকে তৃপ্ত করে, যখন তাহাতে সত্য শিব ও সুন্দর মূর্ত হয়।

আজকাল বাস্তববাদী এই ছাপ লইয়া যে সব সাহিত্য বাজারে বাহির হয় তাহাতে দেখি সত্যের সহিত শিব ও সুন্দরের যোগ নাই। সমাজের কতকগুলি কুৎসিত চিত্র বা মানবের কতকগুলি কুৎসিত প্রবৃত্তিই সে সব লেখার প্রধান উপাদান। তাহা সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু শিব ও সুন্দরের সহিত বিচ্ছিন্ন যে সত্য তাহা পূর্ণ সত্য নহে। যেমন ধরুন, Lady Chatterly's Lover নামক বিখ্যাত পুস্তকে যাহা চিত্রিত হইয়াছে তাহা আংশিক সত্য। কাম মানুষের একটা স্বাভাবিক ক্ষুধা সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাই যে মানবের একমাত্র ক্ষুধা নহে তাহাতেও সন্দেহ নাই। মানুষের ক্ষুধা একরূপ নহে সহস্ররূপ। এই সহস্ররূপী ক্ষুধা কেবল কাম বা লোভের পথে নহে নানাপথে যে সুধা সন্ধান করিতেছে তাহার পরিচয় যদি কাব্যে না পাইলাম তবে কাব্যের সার্থকতা কি? কামের কবলে তো সকলেই আমরা অল্পবিস্তর পড়িয়া আছি কেবল তাহারই স্বরূপ জানিবার জন্য কাব্য পড়িবার প্রয়োজন নাই। আর একটা উদাহরণও মনে পড়িতেছে—মমের Rains নামক বিখ্যাত গল্পটি। এ গল্পের মূল কথাটি এই যে একজন মিশনারি একটি পতিতাকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেই শেষে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। এরকম ঘটনা প্রায়ই সমাজে ঘটে, ইহারই পুনরাবৃত্তি, এমনকি শিল্পায়িত পুনরাবৃত্তিও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টি নহে, কারণ ইহাতে শিব ও সুন্দরের রূপ নাই। ঠিক এই একই উপাদান লইয়া আনাতোল ফ্রাঁস্, 'থেয়া' (Thais) লিখিয়াছেন এবং তাহা উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ তাহাতে পূর্ণ সত্য বিচিত্ররূপে রূপায়িত হইয়াছে। রমা রল্যাঁর জাঁ ক্রিসতফ গ্রন্থের প্রথম ভাগেও কামনার চিত্র আছে, কিন্তু কেবলমাত্র ওই চিত্রটি আঁকিয়াই গ্রন্থকার তাঁহার কাব্য শেষ করেন নাই। নানা সুখদুঃখের মধ্য দিয়া তিনি নায়কের চিত্তকে বৃহতের দিকে বিরাটের দিকে উন্মুখ করিয়াছেন, সত্যের সহিত শিব ও সুন্দরের শিল্প-সঙ্গত মিলন ঘটাইয়াছেন তাই জাঁ ক্রিসডফ্ আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যে অমর কাব্য। ঠিক ওই কারণেই মমের Of human bondage সার্থক সৃষ্টি। আমাদের দেশে বৈষ্ণব সাহিত্যে এমন অনেক চিত্র আছে যাহা আধুনিক শ্লীলতার মানদণ্ডে অশ্লীল। কিন্তু কাম-লীলাই যে বৈষ্ণব কাব্যের একমাত্র বক্তব্য নহে তাহার প্রমাণ বৈষ্ণব কাব্য আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পর মনে যে সুর বাজিতে থাকে তাহা কামের সুর নয়, প্রেমের সুর, ভক্তির সুর, অনন্তের সুর।

কবির সৃষ্টিতে বাস্তব অবাস্তব গৌণ ব্যাপার।

সার্থক সৃষ্টিতে ফুল অভিমান করে, পাখী উপদেশ দেয়, পশুরাও মানুষের ভাষা ব্যবহার করে, ঘড়ার ভিতর হইতে দৈত্য বাহির হয়, রাবণের দশ মুণ্ড থাকে, রাজকন্যা সোনার কাঠির স্পর্শে জাগেন, রূপার কাঠির স্পর্শে ঘুমান। শাশ্বত রস যেখানে জমিয়াছে সেখানে কিছুই বেমানান মনে হয় না। বাস্তবকে অবলম্বন করিযাও যে সার্থক সৃষ্টি হইবে তাহা কেবল বাস্তব হইবে না তাহা সৃষ্টিও হওয়া চাই। বাস্তবকে কবি ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ করিবেন চিত্রকর যে ভাবে তাঁহার চিত্র-পট ব্যবহার করেন। তাহা কাগজ, কাপড়, কাঠ, পাথর, লোহা, সোনা, তামা, পিতল, কাচ, যে কোনও জিনিস হইতে পারে, কিন্তু সেই জিনিসটার আস্ফালনই চিত্র হইবে না। চিত্রকরকে তাহার উপর ছবি আঁকিতে হইবে। সে ছবিতে কেবল অনন্যতা বা প্রতিভার রূপ থাকিলেই তাহা প্রথম শ্রেণীর শিল্প-সৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইবে না, তাহা সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে মনকে যদি উন্মুখ না করে। বাস্তবের পটভূমিকায় কবিও যাহা সৃষ্টি করিবেন তাহা এই জাতীয় সৃষ্টি তাহা বাস্তবের নকলমাত্র নয়। কবি চিত্রকর, ফোটাগ্রাফার বা সাংবাদিক নহেন। প্রথম শ্রেণীর কবিরা যে কোনও পটভূমিকার উপরই সত্য-শিব-সুন্দরের সম্পূর্ণ সত্যের বাণীকে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারেন। তাই শাশ্বত সাহিত্যের বাণীও উপনিষদের বাণীর মতো ভিত্ততে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ। তাই শাশ্বত সাহিত্যই শাশ্বত ধর্মের বাহক। যে সব সাহিত্যিক বাস্তবতার অজুহাতে সমাজের মধ্যে যাহা কুৎসিত, যাহা অক্ষম, যাহা পঙ্গু, যাহা কর্দমাক্ত, যাহা কলঙ্কিত তাহাই বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করেন তাঁহারা জীবনের পূর্ণ সত্যকে প্রকাশ করেন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান আলোকে ফুটাইবার জন্য কালো পটভূমিকা প্রয়োজন, আলো যদি না ফোটে কালো পটভূমিকা অর্থহীন। সমাজে কুৎসিত চিত্র অনেক আছে, তাহারা সাহিত্যের বিষয়ও হইতে পারে, কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া কেহ যদি সেইগুলিকে কাব্যে স্থান দিয়া উগ্রবর্ণে কেবল সেইগুলিকে চিত্রিত করিতে থাকেন তখন সন্দেহ হয় লেখকের শিল্প-প্রচেষ্টার পিছনে অন্য মতলব আছে, সম্ভবত তিনি সাহিত্যিক-বেশী মিস মেয়ো, ভালো কিছু তাঁহার চোখে পড়ে না, কেবল ড্রেনগুলিই তিনি দেখিতে পান।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি বর্তমান যুগের যন্ত্র-পতিরাই বর্তমান যুগের প্রভু। তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষকে তো বটেই শাশ্বত সত্যকেও ছাঁচে ঢালিয়া নিজেদের সুবিধামতো standardise করিতে চান। অনেক সাহিত্যিক ক্ষণস্থায়ী খ্যাতির মোহে অর্থের লোভে অথবা কোন মিথ্যা আদর্শে মুগ্ধ হইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হস্তে ক্রীড়নক মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছেন। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য তাই অনেকস্থলে আজ হীন প্রোপ্যাগাণ্ডা মাত্র। অনেক বিজ্ঞানীরও ঠিক এই দশা। বিজ্ঞানের আবিষ্কার তাই আজ মানবসমাজের হিতকর না হইয়া অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। যাহা সঞ্জীবনী সুধা হইতে পারিত তাহা বিষে পরিণত হইযাছে। পুরাণের গল্পে শুনিয়াছি দৈত্যদানবদের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া সৃষ্টিকর্তারা তাহাদের বর দিতেন এবং সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া দানবেরা মানবসমাজকে পীড়ন করিত। বর্তমান যুগের যাঁহারা স্রষ্টা তাঁহারাও অনেকে আজ দৈত্যদানবদেরই বরদান করিয়াছেন।

একটি মাত্র আশার কথা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত সাধক পৃথিবীর সর্বত্র এখনও কিছু কিছু আছেন। পৃথিবী যখন জলপ্লাবিত হইয়াছিল তখন নোয়া তাঁহার নৌকায় ভাল ভাল জিনিসের নমুনাগুলি তুলিয়া লইয়া সৃষ্টিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোনও অজ্ঞাত নোয়া হয়তো এই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের রক্ষা

করিয়া মানবজাতিকে একদিন মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিবেন।

বর্তমান যুগে রাষ্ট্র আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিতে অপারগ, নানা কারণে সে সামর্থ্য তাহার নাই। অথচ ইহাও সুনিশ্চিত যে একমাত্র সত্যধর্মই আমাদিগকে প্রকৃত সুখশান্তির সন্ধান দিতে পারে, আত্মভ্রষ্টকে আত্মস্থ করিতে পারে, পরাধীন মনুষ্যত্বকে স্বাধীনতার আলোকে বিকশিত করিতে পারে। পৃথিবীর প্রতিদেশেই আজ সাধুরা লাঞ্ছিত, মনুষ্যত্বের কণ্ঠরোধ করিয়া দিবার জন্য নানা মুখোশ পরিয়া যন্ত্রশক্তি আজ উদ্যত। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কবিরাই এখন মানবজাতির আশা। তাঁহারাই আজ মানবজাতির সেই বিবেককে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন যে বিবেক অবিচলিতকণ্ঠে বলিবে 'যন্ত্র বড় নয়, মানুষ বড়। মানুষ যন্ত্রের দাস নয়, যন্ত্রই মানুষের দাস।' শুদ্ধচিত্ত নির্ভীক বিজ্ঞানীদের আজ বলিবার সময় আসিয়াছে —মাদাম কুরীর প্রতিভাশালী কন্যা যেমন এক সভায় বলিয়াছিলেন—বিজ্ঞানের শক্তিকে আমরা বণিকদের হস্তে তুলিয়া দিব না, মানবের কল্যাণে নিয়োগ করিব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যন্ত্রসভ্যতা আমাদের মনুষ্যত্বকে যে নূতন কারাগারে বন্দী করিয়াছে সেই কারাগারের মধ্যেই নূতন যুগের শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আবির্ভূত হইয়া ধর্ম সংস্থাপন করিবেন যদি আধুনিক যুগের সত্যদ্রষ্টা কবি ও বিজ্ঞানীরা তাঁহাকে তেমন করিয়া আহ্বান করিতে পারেন।

বর্তমান যুগের নিপীড়িত মানব সত্যদ্রষ্টাদের কণ্ঠে সেই উদাত্ত আহ্বানবাণী শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-এ

(দুই)

বেলুড় মঠে স্বামী ধীরানন্দজী (কৃষ্ণলাল মহারাজ) আমাকে পূজনীয় প্রেমানন্দ মহারাজের নিকট দেখেছেন। এই সময়ে তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতে লাগলেন। আমার জীবনের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য তিনি সর্বদাই আমার দিকে নজর রাখতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে শ্রীশ্রীমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন। কতদিন যে আমাকে এসম্বন্ধে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন তা এখন ভাবলে আমি বিস্মিত হই। যাই হোক ১৯১৮তে একদিন বলরাম মন্দিরে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ আমাকে আবার বল্লেন "তুই মার কাছে যেয়ে দীক্ষা নে।" আমি তাঁকে বল্লাম, "না, আমি দীক্ষা নেব না।" কারণ তখন আমার মনের ভাব ছিল দীক্ষার সময় গুরু যা উপদেশ করবেন তা ঠিক ঠিক পালন না করতে পারলে প্রত্যবায় হয় আর মহা অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা। কৃষ্ণলাল মহারাজও সেদিন আমাকে যেন রাজী না হলে ছাড়বেন না মনে হলো। তিনি সমস্ত শুনে বল্লেন, —"তোর সাধ্য কি যে গুরুর উপদেশ পালন করতে পারিস তিনি যদি তোকে দিয়ে তার উপদেশ পালন না করান, সাঁতার শিখতে হলে জলে নামতেই হবে। কোথায় শুনেছিস্ মানুষ

সাঁতার শিখেছে জলে না নেমে” ইত্যাদি। কথাগুলো আমার মনের মধ্যে খুব গভীর রেখাপাত করলো আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হলো, কিন্তু মা দীক্ষা দেবেন কি করে? আমি পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজকে বল্লাম—“মা ত মেয়ে-মানুষ, মা দীক্ষা দেবেন কি করে?” আমার মনের ভিতর আরও একটা সংশয় ছিল। পূর্বেই বলেছি আমি যেদিন প্রথম বেলুড়ে যাই সেই দিন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ আমার মাথার উপর ব্রহ্ম-তালুতে আঙ্গুল দিয়ে কি যেন একটা লিখেছিলেন আর তখন থেকে আমার অন্তরে স্বাভাবিকভাবে সর্বদাই একটা নাম চলতো। কাজেই আমি পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজের কথায় সেদিন যখন দীক্ষার কথা ভাবছিলাম তখন মনে হলো, আমার দীক্ষা কি হয়ে যায় নি? আমি কিন্তু কৃষ্ণলাল মহারাজকে এ সম্বন্ধে কিছু বল্লাম না। যা হোক্ কৃষ্ণলাল মহারাজকে যখন বল্লাম মা মেয়েমানুষ, মা কি দীক্ষা দেবেন, তখন কৃষ্ণলাল মহারাজ হো হো করে হাসতে লাগলেন এবং আমাকে বল্লেন, “বলিস্ কিরে, এসব কথা আবার কোথায় শিখেছিস্?” আমি তাঁকে জানালাম কোন সাধুর লেখা বইএ আমি একথাটা পড়েছি। কৃষ্ণলাল মহারাজ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং আমাকে বল্লেন—“আচ্ছা চল্ নীচে যাই, নীচে পূজনীয় হরি মহারাজ আছেন তাঁকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা যাবে।” নীচে পূজনীয় হরি মহারাজ একটি ছোট জলচৌকির উপর আসন করে বসেছিলেন। তাঁকে যে কি ভালই লাগলো তা আমি আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ আমার পরিচয় তাঁকে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বল্লেন যে—“আমি অনেকদিন থেকে একে বলছি শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা নিতে, কিন্তু এ ত কিছুতেই রাজী হচ্ছে না, উল্টো আজ বলছে মা ত মেয়েমানুষ, মা আবার দীক্ষা দেবেন কি? পূজনীয় হরি মহারাজ এই শেষের কথাটি শুনে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে আমাকে বল্লেন, “এদিকে দেখছি ছেলেমানুষ কিন্তু এর ভিতরেই দেখছি শাস্ত্র টাস্ত্র সব পড়া হয়ে গেছে।” আমি বল্লাম—“না মহারাজ, আমি শাস্ত্র কিছুই পড়ি নি, তবে এক সাধুর লেখা বইএ এ কথাটা পড়েছিলাম।” পূজনীয় হরি মহারাজ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি পূজনীয় মহারাজের সৌম্য এবং প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি দর্শনে অত্যন্ত আকৃষ্ট হচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন প্রাচীন ভারতের কোন মহর্ষি স্বেচ্ছায় শ্রীশ্রীভগবানের কার্যে সহায়তা করবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি আস্তে আস্তে বল্লেন—“তোমাকে কে বলেছে মেয়েমানুষ দীক্ষা দিতে পারে না?” এই বলে একটু চুপ করে থেকে অত্যন্ত তেজের সহিত বল্লেন,—“মা জগদম্বা, আদ্যাশক্তি মহামায়া স্বয়ং, তাতে কখনও সন্দেহ করো না। যিনি বন্ধন দিয়েছিলেন তিনিই বন্ধন মুক্ত করতে সমর্থ। যদি মা স্বয়ং তোমাকে দীক্ষা দিতে রাজী হন তা হলে তুমি ধন্য, তোমার পিতৃকুল ধন্য। জন্মে জন্মে যে মহাশক্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তিনি বন্ধন মুক্ত করবার জন্য উদ্বোধন-বাড়িতে বসে আছেন। কৃষ্ণলাল তোমার পরম সুহৃৎ যে—যে মহামায়াকে মুনিঋষিরা ধ্যানে পায় না—সেই মহামায়ার শ্রীচরণে এত আগ্রহের সঙ্গে পৌঁছে দিচ্ছে।” এই কথাগুলো অনেকক্ষণ ধরে বল্লেন এবং চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো উত্তেজনায়। আবার বলে উঠলেন—“কোথায় লোক সব। মহামায়া বন্ধন খুলবার জন্য উদ্বোধনে বসে আছেন কটা লোক তাঁর কাছে গেল। হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক যায় না কেন?” পূজনীয় হরি মহারাজ যখন এসব কথা বলে একটু থামলেন, আমি দুহাত জোড় করে বল্লাম, “মহারাজ, তাহলে আপনিও বলছেন যে আমি শ্রীশ্রীমার কাছে যেয়ে দীক্ষা গ্রহণ করি?” মহারাজ

বল্লেন—"একেবারে নিশ্চয় বল্‌ছি। তুমি যাও কৃষ্ণলালের সঙ্গে মার কাছে মার বাড়িতে।" মহাপুরুষদের কথার কত শক্তি! এইযে এতদিন আমি দীক্ষানেওয়া ব্যাপারটা ইচ্ছা করে এড়িয়ে এসেছি শ্রীশ্রীহরি মহারাজের কথা শোনার পর আর স্থির থাকতে পারলাম না। আগে যেন দায় ছিল কৃষ্ণলাল মহারাজের; এবার দায় আমার। আমি ওখানেই ভূমিষ্ঠ হয়ে পূজনীয় হরি মহারাজকে প্রণাম করে কৃষ্ণলাল মহারাজকে বল্লাম—"চলুন মহারাজ এখনই মার কাছে—মার বাড়িতে।" এই বলে আমি কৃষ্ণলাল মহারাজের হাত ধরে টানতে টানতে বলরাম মন্দির থেকে বাইরে এলাম। *পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজের এত স্নেহভালবাসা* আমি পেয়েছি যে কোনকথা বলতে ওঁর কাছে সঙ্কোচ হতো না। আমি মহারাজের হাত ধরে টানতে টানতে রাস্তা দিয়ে চল্লাম। মহারাজ বল্লেন,—"ওরে হাত ছেড়ে দে, লোকে কি বলবে?" লোকে কি বলবে সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপই নেই। যাক এভাবে আমরা উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে পৌঁছুলাম। পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজের সঙ্গেই উপরে গেলাম। কৃষ্ণলাল মহারাজ দীক্ষার কথা মাকে নিবেদন করতে মা বল্লেন—"কালই তোমার দীক্ষা হবে।" পরদিন স্নানযাত্রা। আমার ছোট ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে গেলাম। আমাদের উভয়েরই দীক্ষা হয়ে গেল। দীক্ষাকালে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরের খাটটির উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন, আমি নীচে তাঁর সামনে একটি কুশাসনে বসেছিলাম। মা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা শাক্ত না বৈষ্ণব?" আমি খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে বল্লাম—আমাদের বাড়িতে আমার বাবা ত এক সময়ে খুবই কালীপূজা করতেন। অবশ্য একথা বলার আগেই মা বল্লেন—"বুঝেছি তোমরা শাক্ত।" তারপর পতিতপাবনী শ্রীশ্রীমা এই দীন সন্তানকে মহামন্ত্র দান করিলেন। কিন্তু ঠিক দীক্ষার একটু আগেই মাকে আমার জেলের অনুভূতির কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম। মা বল্লেন—"আমি সব জানি।" এই কথা বলে বল্লেন—"ঠাকুর ত তোমাকে দিয়েছেন আমিও ত দেব আমার কাছ থেকেও নাও।" তারপর বল্লেন—"ঠাকুর তোমার গুরু।" আর দেয়ালে একটি ছবি দেখিয়ে বল্লেন—"ইনিই তোমার ইষ্ট।" "ঠাকুর ত তোমাকে দিয়েছেন" শ্রীশ্রীমার একথার অর্থ কিন্তু আমি এখনও উপলব্ধি করতে পারিনি কারণ আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট থেকে কোন অবস্থায় তখন ত কোন দীক্ষামন্ত্র পাইনি। তবে কি শ্রীমহারাজ যে অঙ্গুলি সঞ্চালনে—বেলুড় মঠে যেদিন প্রথম *গিয়েছিলাম—মাথায় কি লিখেছিলেন এটা শ্রীশ্রী*-ঠাকুরের দেওয়া কোন মন্ত্র—এ সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথিবীতে হয়ত আর কেউ নেই। যাই হোক্ দীক্ষা হয়ে গেলে আমি মাকে বল্লাম, "মা আমাকে কি তুমি নিরামিষ খেতে বলবে?" "মা বল্লেন—সে কি তুমি নিরামিষ খাবে কেন?" "আমার ছেলেরা নিরামিষ খাবে কেন? তুমি খাবে দাবে আর ফূর্তি করবে।" "যা প্রাণে চায় তাই পরবে আর যা প্রাণে চায় তাই খাবে বাকীটা আমি দেখবো।" এতক্ষণে সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা হৃদয়ে অনুভূত হয়ে গেছে। আমি যে আদ্যাশক্তি জগন্মাতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছি অথবা জ্ঞান ভক্তি এবং মোক্ষদায়িনী শ্রীগুরুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সে সব ভুলে গেছি। সামনে মা শুধুই মা—তবে সমস্ত ভার গ্রহণ করেছেন সেই মা। আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম, "যদি ইষ্টমন্ত্র জপ না করতে পারি তাহলে কি হবে?" মা বেশ উত্তেজিত ভাব দেখিয়ে বল্লেন—"সে কি ইষ্টমন্ত্র জপ করবে না—ইষ্টমন্ত্র জপ না কর তোমারই যাবে আমার কি হবে?" এই মা'র অন্য রূপ কিন্তু এর পেছনেও মার মনে করুণা ও কৃপা পূর্ণভাবে বিরাজ করছিল। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বাহিরে এলাম।

ছোট ভাই ভিতরে গেল। তারও দীক্ষা হলো। আমরা উভয়ে নীচে নেমে এলাম। নীচে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ছিলেন। তাঁকে প্রণাম করে বল্লাম—"মহারাজ আজ আমাদের দীক্ষা হলো।" মহারাজ বল্লেন—"বা বেশ।" বিস্ময়মিশ্রিত হর্ষ নিয়ে হোষ্টেলে ফিরলাম। কোন মানুষ হঠাৎ যদি কোন বিরাট ঐশ্বর্য লাভ করে অথচ তার গতানুগতিক পরিচিত দৈনন্দিন জীবনটাকেও সঙ্গে করে চলে তার যেমন অবস্থা হয় আমারও তদ্রূপ হয়েছিল। একদিকে বি-এ পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হওয়া। পিতামাতার সঙ্গে সম্বন্ধ একপ্রকার অন্তরের দিক থেকে ছিন্ন। অথচ হোষ্টেলে থাকার খরচা ইত্যাদির জন্য পিতার দিকেই তাকাতে হয়। মনে ভয়ানক বৈরাগ্য এবং উদাসীন ভাব। বন্ধুবান্ধব যে দুএকজন ছিল তাদের সঙ্গেও প্রাণ খুলে সব কথা বলা যায় না। অন্তরে মঠে যোগদান করার প্রবল ইচ্ছা। এতগুলো বিসদৃশ ভাবের চাপে পড়ে আমি একপ্রকার মুহ্যমান হয়ে গেলাম। সকাল এবং সন্ধ্যাবেলা এলেই শ্রীশ্রীমার কথা মনে পড়তো বিশেষ করে ইষ্টমন্ত্র জপ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ নির্দেশ। দুবেলাই বসতাম। খুব যে বেশী সময় দিতে পারতাম অথবা জপ খুব যে বেশী জমতো তা নয়, তবু না বসে যেন থাকতে পারতাম না। এই প্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে একটা ব্যাপার এই হলো যে বি-এ পরীক্ষা সেবারে দেওয়া হলো না। আমি নানাপ্রকারে বাধ্য হয়ে কিছুকালের জন্য দেশে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

লীলাময়ী সারদা

(পাঁচালি)

শ্রীমতী নাহারবালা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশের শ্যামলা পল্লী, তাহারি সরলা মেয়ে
এমন কিছুই ছিল না সে দেখে দেখিবার মত চেয়ে।
শিক্ষা—'বর্ণ পরিচয়' শুধু, তাও হ'য়েছিল ভুল
সাদাসিধে শাড়ী, শাঁখা দুটি হাতে, যত্নবিহীন চুল।
সরলা নারীর গুপ্ত এ বেশে, সুপ্ত ছিল যে শ্যামা
যখন ছিলেগো নহবত ঘরে, কেহ তো চেনেনি মা।
পাগল স্বামীর সন্ধানে যবে চলিলে সুদূর পথে
ব্যাকুল নয়নধারা যে তোমার রুধিল না কোন মতে।
ধরা নাহি দিলে অরূপা তোমারে
কেমনে চিনিব মাগো!
কভু পথে কাঁদো, কভু মন্দিরে
দেবী-রূপে তুমি জাগো।
কখনো বরদা ভক্ত যখন চরণে পড়িয়া কাঁদে
আপনারে মাতা বিলাইয়া দাও পড়ি করুণার ফাঁদে।
যখন শরীর বলহীন রোগে, বাতের বেদনা পা'য়
নানা দেহক্লেশে শয্যায় শুয়ে কোনরূপে দিন যায়।
জননীর স্নেহে শরৎ তাঁহারে সদা আগুলিয়া থাকে
দরশন আশে দূরদেশী এলে তাদেরও রুখিয়া রাখে।
বরিশালবাসী একটি ভক্ত সে কথা না শুনি কানে
পাগলের মত 'মা, মা,' বলে ডাকে,
কোথা মা তাহা না জানে।
গোলমাল শুনি জগৎ-জননী দেহবোধ গেলা ভুলে
আলু থালু বেশে, আসি দ্বার দেশে,
ডাকেন দরজা খুলে।
কহিলেন, 'কেন আসনি?' সে কহে,
'শরৎ করেন মানা,
রুগ্ন দেহেতে দীক্ষা দানিলে ক্লেশ
বেড়ে যাবে নানা।'

রুষ্টা জননী বলিছেন তারে, 'শরৎ আর কি কবে ?
জানে না সে কি যে, কি কারণে তবে,
আমরা এসেছি ভবে।'
কভু বলিতেন, 'আমার ছেলেরা, পথে পথে দ্বারে দ্বারে
আহার লাগিয়া ফিরিছে এ দুঃখ
পারি না যে সহিবারে।
কখনই নয়, বলেছি ঠাকুরে, হে প্রভু! তোমার ছেলে
কেমনে তোমারে ভজিবে এমন দেহের কষ্ট পেলে ?'
কোন সন্তান কহে, 'মাগো তুমি
ঠাকুরে কি ভাবে দেখ ?'
ক'ন্ গম্ভীরে, 'সন্তানভাবে' এইকথা জেনে রেখো।
শিবের সহিত সতীর মিলন দেহাতীত চিন্ময়
তাইতো জননী ঘোষিলেন এই অভিনব পরিচয়।
কোন বা ভক্ত শূলবেদনায় পাইয়া বিষম ক্লেশ।
তন্দ্রার ঘোরে স্পষ্ট শুনিল নাহি সন্দেহ লেশ।
'গুরুপাদোদক পান কর ত্বরা হয়ে যাবে নিরাময়।'
মায়ের চরণসলিল গ্রহণে, কাটিল তাহার ভয়।
কেহ বলে, মাগো! পূজিব তোমারে,
চরণ বাড়ায়ে দাও
কেহ বলে 'আম' চাখিয়া এনেছি,
এখুনি মা তুমি খাও।
কোন বা ভক্ত যোগীজনধন চরণকমল 'পরে
অমল কমলদল জল দিয়া প্রাণ ভবি পূজা করে।
স্নেহের মূরতি জননী আমার ভক্তবাসনা জানি
সকরুণ দিঠি অভয়া বরদা হাসিমাখা মুখখানি।
ধ্যানের মূরতি সম্মুখে পেয়ে কোন যোগা করে ন্যাস
স্বেদজলে ক্রমে তিতে ওঠে মার সবখানি দেহবাস।
ওপাশ হইতে আসিয়া সেবিকা 'গোলাপ' রুখিয়া ওঠে
'ওমা একি পূজা ? মাটির প্রতিমা
ইহারে পেয়েছ বটে!'
আবার কখনো কোন বা ভক্ত দীক্ষা লইতে আসি
ধূলায় রৌদ্রে লুটাইছে তাঁর করুণার প্রত্যাশী।
অন্তর্যামিনী জানিয়া সে কথা, কহেন, 'যাইতে বল'!
হবে না দীক্ষা, মিথ্যা এমন কাঁদিয়া কি আছে ফল।

ভক্ত নীরব, অশ্রুর স্রোত ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়
পুন আসি মাতা, দ্বার হ'তে হেরে, সুনিবিড় মমতায়—
বলেন, 'উহারে হেথা লয়ে এস, এখুনি দীক্ষা হবে।'
এত দয়া তোর না হ'লে কেন গো
জগৎজননী ক'বে ?
এমন কত কি, কত ইতিহাস কে তার সংখ্যা রাখে
সাধারণ চোখে শুধু দেখি মোরা সেই সাধারণ মাকে।
কেহ ভাবে মাকে শুধাইয়া লব সাধন ভজন কথা
নিকটে আসিয়া ভার নাও বলি কাঁদিয়া লুটায় মাথা।
বদনে ফুটে না বলিবার কিছু, শুধু দেখে চেয়ে চেয়ে
কোন্ বড় ঘর হইতে এসেছে,
কে জানে কাহার মেয়ে।
জননী মোদের আশ্বাসি তারে, ক'ন্ ভার লইয়াছি
বহুদিন হতে রহিয়াছ মোর অতিশয় কাছাকাছি।
ভাবনা কি তার ? ঠাকুরে যে জন নিয়ত স্মরণ লয়
এপথ হইতে বিপথে লইতে কাহারও সাধ্য নয়।
বলিতেন,—'সাধো কলিতে এবার সত্য পরম ধন
সত্যে রহিলে ভগবানে পাবে, ঠাকুর ইহাই কন্।'
নিরাশা-আকুল সন্ন্যাসী দেন অনুযোগ-ভরা লেখা
'বৃথা এ জীবন বহিতে পারিনা মিলিল না তাঁর দেখা।
নামিলে যদিগো দেবতা কেন এ দেউলের প্রয়োজন
গেরুয়া পরিয়া মিছামিছি যেন পথে পথে বিচরণ।'
শুনিয়া জননী গম্ভীরাননে, দীপ্ত তেজেতে কন্
"একি তার কথা ? ভগবৎপদে যদি কেহ সঁপে মন—
ধন্য সেজন এসেছে এখানে, হইবে ইষ্টলাভ;
জীবনেও যদি না হয় মরণে হবেই আবির্ভাব।"
ভক্ত মায়ের নানান প্রকার আসিছে বিবিধ পথে
যার যেই ভাব, সে তাহা লইয়া, চলে যায় তার মতে।
কার কিবা ভাব, কিরূপ আধার জননী জানিতে পারে
স্বভাব দেখিয়া সাধনার পথ বলে দেন একেবারে।
জয়া বিজয়ার মতো মার কাছে, যোগেন গোলাপ রহে
অনাবিল স্নেহস্রোত সম মার দুজন দুধারে বহে।
একদা যোগেন, নারী-প্রকৃতির বশীভূতা হ'য়ে কয়—
'ভাইঝি ভাইপো লয়ে অস্থির, এ কেমন দেবী হয় ?'

জাহ্নবী তীরে ধ্যানেতে বসিয়া একদা দেখিছে চেয়ে
ঠাকুর দাঁড়ায়ে, জ্যোতিতরঙ্গ ঝরিছে অঙ্গ বেয়ে।
জলের উপরে মরাশিশু ভাসে, দেখান আঙ্গুল তুলি
'উনিও অমনি পতিতপাবনী, একথা যেওনা ভুলি।
উঁহারে আমারে জানিবে অভেদ, যবতি কেবল দুটি
ঘন সংশয়-আঁধারে জ্ঞানের আলোক উঠিল ফুটি
ত্বরিতে আসিয়া নমি জননীরে,

কয়, 'মাগো, ক্ষমা কর।

বিশ্বাসহীনা হ'য়ে তোর পদে দোষ করিয়াছি বড়।'
আমূল ঘটনা শুনিলেন দেবি, পরে কহিলেন হেসে,
'অবিশ্বাস তো আসিবেই, পাকা বিশ্বাস হবে শেষে।'
যখন ছিলেন বৃন্দাবনেতে প্রার্থনা ছিল তাঁর
হে রাধারমণ! কারো কোন দোষ

না দেখি যেন গো আর।

এই কর মোর, দোষ দৃষ্টিটি চিরতরে মুছে লও
সবই তো তোমার বিরাট মূরতি,

কোনটিবা তুমি নও?

দোষ কেহ কারো দেখোনা দৃষ্টি দূষিত হইয়া যাবে
সে আঁধার মনে ঈশ্বরালোক

কেমনে প্রকাশ পাবে?

প্রসঙ্গ ক্রমে কহেন,—'নারীরও সন্ন্যাস হ'তে পারে
হোক না সে নারী', গৌরদাসীরে

দেখাইযা বারে বারে

কন্, 'একি নারী? কত কি করেছে,

স্কুল, গাড়ি, ঘোড়া কত

যে নারী এমন সে ঠিক্ পুরুষ ত্যাগী সন্ন্যাসী মত।'
আরো কত কথা মনে পড়ে নানা পুস্তকে ধরা আছে
বাতুলের মত বলিবারে চাই, আপনা সবার কাছে।
মনে হয় শুধু বার বার আজ

'মা' 'মা' বলিয়া ডাকি

মনের কক্ষে রাখিয়া সে ছবি অনিমেষে চেয়ে থাকি।
আর কেঁদে বলি, আয় মাগো তুই,

আর বার ফিরে আয়

সাধনবিহীন স্বেচ্ছাচারে যে, জীবন বিফলে যায়।

কে আর চরণ বাড়ায়ে জীবের পাপতাপ নিজে লবে।
কে বলিবে 'ওরা ধূলিমাখা ছেলে

মোরে কোলে নিতে হবে।'

কখন যোগিনী, কখন বালিকা, নির্ভরতার বাণী
কহেন, 'যা কর তোমরা সকলে,

আমি কিছু নাহি জানি।'

কভু বা জ্ঞানের মণি মন্দিরে মন্দারমালা গ'লে
বরাভয় করে সারদা জননী, হাসিছেন কুতূহলে।
'ভয় নাই' আমি আছি যতদিন, সবে নিরাপদে রবে
যারা না পারিবে সাধন ভজন, ঠাকুর-শরণ লবে।
অসহ রোগের যাতনা, তবুও রাত্রে নিদ্রা নাহি
জপের মালাটি হাতে লয়ে র'ন শূন্য দৃষ্টি চাহি।
শুধালে তাঁহারে কহেন,—'আমার শিষ্য সে বহুতর
কেহ বা জপেন, কাহারো বা নাহি একতিল অবসর।
তাহাদের সব অক্ষমতা যে বহি আমি নিজ শিরে
না দিই বিরতি জপে সে কারণে,'

কন্ অতি ধীরে ধীরে।

অন্তিমে মার ভক্ত সে সেরা, কাঁদিলা চরণে পড়ি
কহিল, 'মোদের উপায় কি হবে,

যদি চলে যাও ছাড়ি?'

ক্ষীণস্বর তবু থামিয়া থামিয়া জননী কহিলা তারে
'দরশন তুমি করেছ ঠাকুরে, নরদেহী দেবতারে
আর নাহি ভয়, তথাপি তোমায় শেষ এক কথা বলি,
শান্তি মিলিবে, কখন কাহারও

দোষ দেখিও না ভুলি।

যদি দেখ দোষ, দেখিবে নিজের, বিশ্বে আপন দেখো,
কেহ নহে পর, জগৎ তোমার,

এই কথা মনে রেখো।'

যাদের দুঃখে কাতরা জননী, তাদের কলুষ বহি
দুঃসহ রোগ যাতনার জ্বালা নীরবে লইয়া সহি
সকলের তরে এই শেষ বাণী, রাখিয়া জননী মোর
হাসিয়া একদা চলি গেলা করি লীলার রজনী ভোর।
সহিষ্ণুতার মধুর মূরতি, ক্ষমাময়ী তুমি মাগো।
মোদের আঁধার বক্ষ উজলি চিরদিন তুমি জাগো॥

পরমভাগবত শ্রীউদ্ধব

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

যুগ যুগ ধরে কতো সাধক, কতো ভক্ত, ভগবানের আরাধনা ক'রে তাঁকে লাভ করেছেন অনন্যাভক্তি দিয়ে; কিন্তু শ্রীভগবান্ নিজমুখে যাঁর পরিচয় দিযেছেন ভক্তশ্রেষ্ঠ বলে সেই চিহ্নিত প্রিয়তম ভক্ত হলেন শ্রীউদ্ধব।

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতম্—১১।১৪।১৫

—(*'হে উদ্ধব) তুমি যেরূপ আমার প্রিয় সেরূপ আর* কেহই নয়। ব্রহ্মা যদিও পুত্র, শঙ্কর যদিও আমারই স্বরূপ, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা এবং লক্ষ্মী পত্নী তথাপি কেহই প্রিয় নয় তোমার মতো। এমনকি আমার নিজের আত্মাও তোমার মতো প্রিয় নয়।' ভগবানের এই উক্তি থেকেই ধারণা হয় ভক্তিজগতে উদ্ধবের স্থান কতো উচ্চে। এই উক্তির মধ্যে যে একটুও অতিরঞ্জন নেই তার প্রমাণ তাঁরাই পেয়েছেন যাঁরা সমুদ্রের মতো বিশাল গম্ভীর উদ্ধবচরিত্রের অনুধ্যান করেছেন।

ভক্তমালিকার মধ্যমণি উদ্ধব ছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য। যে সাধকপ্রবরকে পিতৃত্বে স্বীকার করে লোকসংগ্রহের জন্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সেই যদুকুলতিলক বসুদেবের ভ্রাতা মহাত্মা দেবভাগের পুত্র ছিলেন শ্রীউদ্ধব। তাঁর দেহকান্তি ছিল শ্রীকৃষ্ণের মতোই নবজলধরতুল্য, মুখশ্রী ফুল্লকমলসদৃশ, নয়নযুগল আকর্ণবিস্তৃত। নীতি ও তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎমূর্তি ছিলেন তিনি নিজের গুরুদেবের তুল্যই। যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য!

যখন উদ্ধব মথুরায় এলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমদর্শনেই তাঁকে আপন-অন্তরঙ্গ বলে চিহ্নিত করে নিলেন অন্তরের অন্তস্তলে। তাইতো উদ্ধব হয়েছিলেন মথুরারাজের বিশ্বস্ততম সচিব, অনুরাগী মিত্র, হিতকারী বন্ধু।

ব্রজধাম থেকে মথুরা যাত্রার সময় ভগবান্ গোপীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, শীঘ্রই ব্রজে ফিরবেন বলে। তিনি জানতেন তাঁর অদর্শনে তদ্গতচিত্ত গোপীদের কিরূপ অবস্থা হয়েছে, তাই বিরহোৎকণ্ঠা-বিহ্বল গোপাঙ্গনাদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে পরমপ্রিয় উদ্ধবকে *নির্জনে বললেন, 'হে সৌম্য, একবার* ব্রজপুরে যাও। মা বাবা আমার অদর্শনে কতো ব্যাকুল! গোপীরা হয়তো মৃতকল্প। আমার সন্দেশ তাঁদের কাছে পৌছে দিয়ে তাঁদের শান্ত করে এস।' বস্তুতঃ করুণাময় ভক্তবৎসল প্রভু নিজের প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে ব্রজবাসীদের লোকোত্তর প্রেমের পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যেই যেন প্রেরণ করলেন সুদূর ব্রজপুরে।

উদ্ধব ভগবানের সন্দেশবাহক দূতরূপে গোকুলের অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যদর্শনে মনঃপ্রাণ পূর্ণ হল। দিনমণি পশ্চিমগগনে অস্তমিত হতে চলেছেন, সন্ধ্যার সেই গোধূলিলগ্নে দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে তাঁর রথ প্রবেশ করল গোকুলে। গোধূলিধূসরিত রথ সন্ধ্যার অন্ধকারে গোকুলবাসীর দৃষ্টিগোচর হল না। ধীর গতিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর উপস্থিত হলেন নন্দালয়ে।

নন্দরাজ তাঁকে বাসুদেবজ্ঞানেই স্বাগত ও যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন। এতদিনের অদর্শনে পিতা নন্দ মাতা যশোদা কতো উৎকণ্ঠিত, কতো কাতর! তাঁরা কৃষ্ণবলরামের কুশল প্রশ্ন করতে থাকেন ব্যস্তসমস্তভাবে। একটার পর একটা

প্রসঙ্গ চলতে লাগল মধুর লীলামৃতকথার। আলোচনার আর শেষ হয় না। প্রশ্নের সমাপ্তি নেই! মাধুর্যঘন ভগবানের অমিয়চরিতকথা যতই পান করা যাক আশ মেটে না—আরো চাই, আরও। উদ্ধব বাৎসল্যভাবে আত্মহারা নন্দ-যশোদার শ্রীভগবানে পরম অনুরাগ দেখে প্রীত হলেন। একটি জিনিস কিন্তু তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি এড়াল না, তিনি উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করলেন অনুরাগের আতিশয্যহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের সাধারণ মানুষের মতোই আত্মীয় বুদ্ধি। তাই বললেন—

'ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ॥
ন চাস্য কর্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু।
ক্রীড়ার্থঃ সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে॥"
ভাঃ ১০।৪৬।৩৮,৩৯

'তাঁর মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, আপন, পর কেউ নেই, তাঁর দেহ, জন্ম, কর্ম, কিছুই নেই, তবে লীলা ও সাধুদের রক্ষার জন্যে কখনো কখনো বিভিন্ন শরীরে (মৎস্যকূর্ম-নৃসিংহাদি) স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হন। আরও বললেন,—

"যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা চ ঈশ্বরঃ॥"
ভাঃ ১০।৪৬।৪২

'ভগবান্ হরি কেবল আপনাদেরই পুত্র নন্, তিনি সকলের পুত্র, সকলের আত্মা, পিতা, মাতা ও প্রভু।'

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের জগৎকারণত্ব ও অন্তর্যামিত্বের আশ্চর্য মহিমা ও তাঁদের অপূর্ব লীলাকথা-বর্ণনায় কিভাবে যে নিশা অতিবাহিত হল কেউ বুঝল না। আনন্দের মুহূর্তগুলি আনন্দেই দ্রুত এগিয়ে চলে অনন্তের পথে। রাত্রিশেষে ব্রাহ্মমুহূর্তে ভেসে আসে প্রভাতীসুরের মধুরসঙ্গীত। সমস্ত অশুভ নাশকারী সেই শ্রবণমঙ্গল সুরতান উদ্ধবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করল। তিনি মুগ্ধ হলেন. তাঁর হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হল। ধীরে ধীরে পূর্বগগন লালিমায় মণ্ডিত করে জবাকুসুমসঙ্কাশ দিবাকর দেখা দিলেন। ব্রজগোপীরা দেখলেন নন্দরাজের দ্বারে সুবর্ণরথ। 'কে এসেছেন, কার এই মোহন রথ?' পরস্পর জিজ্ঞাসা চলে।··

তারপর আজানুলম্বিতবাহু, আয়তলোচন, ভাস্বর, কৃষ্ণের মতোই পীতাম্বরধারী উদ্ধবকে দেখে তাঁরা বুঝলেন, নিশ্চয়ই ইনি কৃষ্ণের অনুচর, অন্তরঙ্গ তদ্ভাবভাবিত সখা। গোপীরা তাই লজ্জা বিসর্জন দিয়ে আবেগভরে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর লীলা বর্ণনা করতে লাগলেন। প্রতিটি কথায় ব্যাকুলতা, বিরহজনিত তীব্র দুঃখ ও প্রেমজ্বালা বিচ্ছুরিত হয়ে আসে! ব্রজাঙ্গনাদের সান্ত্বনা দিয়ে উদ্ধব বোঝাতে থাকেন—'শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী, তিনি যেমন আপনাদের হৃদয়পুরে সেইরকম সমস্ত বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কখনো আপনাদের বিয়োগ হতে পারে না। যিনি অন্তরে, বাহিরে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তাঁর সঙ্গে কি বিচ্যুতি সম্ভব?' এই কথা শুনে গোপাঙ্গনাদের নয়নবারি উথলে ওঠে, অঝোর ঝরে ঝরতে থাকে আর বুক ভেসে যায়। তাঁরা বলতে থাকেন, 'হে উদ্ধব, আপনার কথা সবই ঠিক। একটুও মিথ্যে নয়। কি যমুনা-পুলিনে, কি বৃক্ষলতায়, কি কুঞ্জবনে সর্বত্রই সেই শিখিপুচ্ছধারী কমললোচনকে দেখি, তাঁর হৃদয়হারী শ্যামমূর্তি তিলেকের জন্যেও আমাদের হৃদয় থেকে অন্তর্হিত হয় না। ক্ষণমাত্রও তাঁর চিন্তা ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এযে একেবারে দুঃসাধ্য।' উদ্ধব ভাবলেন, গোপীরা মহাভাগ্যবতী। দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, জপ, স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা যে ভক্তি লাভ হয়, মুনিগণেরও দুর্লভ সেই ভক্তি সৌভাগ্যবশতঃ এঁদের লাভ হয়েছে। উদ্ধবের ধারণা ছিল, ভগবান্ বৃথাই গোপীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, এঁদের উপর অনুরাগের আধিক্য-বশতঃই তিনি এত উচ্চ প্রশংসা করে থাকেন। গোপীদের

উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই প্রেমভক্তি হয়তো নেই। উদ্ধবের নিজের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা আজ সব চুরমার হয়ে গেল। গোপীদের ভাব-বিহ্বল অবস্থা দেখে তাঁর চোখ ফুটল। ব্রজপুরীর অলৌকিক প্রেমে অভিভূত হয়ে, কাঁদতে কাঁদতে তিনি গোপীদের প্রণাম করে প্রার্থনা করলেন, গোপীদের চরণরেণুসেবী, বৃন্দাবনের তৃণগুল্মলতার মতোও যেন একটা কিছু হতে পারেন।

ভগবদ্ভাবে বিভোর হয়ে চোখে প্রেমের অঞ্জন মেখে উদ্ধব প্রত্যাবর্তন করলেন মথুরায়। সেখান থেকে ভগবানের সঙ্গে দ্বারকায় গেলেন। দ্বারকাপুরে সর্বদা ছায়ার মতো শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকেন, রাজ-কার্যে মন্ত্রণা দেন, সর্ববিষয়ে সহায়তা করেন। এমনইভাবে মহানন্দে দিন কেটে যায়। কিন্তু বৈচিত্র্যময় জগতে একটানা একটি ভাবে তো দিনের পর দিন কাটে না। তাই বুঝি বিরহের দিন ঘনিয়ে আসে। মিলন আর বিরহ এই নিয়েই যে সংসার! আলোকের পশ্চাতেই অন্ধকার! অনধিগম্য ভক্তভগবানের অপার লীলা!

নিয়তির গতি কেউ রোধ করতে পারে না। দুর্নিবার তার গতি। কালচক্রের নিষ্পেষণে সবাই পিষে যাচ্ছে। তাই যদুকুলও রেহাই পেল না। অদৃষ্টের অমোঘ লিখনে, যদুগণ শাপগ্রস্ত হলেন। এইবার চাই শাপমুক্তি। শাপবিমোচনের জন্যে তাঁরা প্রভাসতীর্থে যাত্রা করতে মনস্থ করলেন। ভগবানের প্রভাসযাত্রার সঙ্কল্প জেনে উদ্ধব বুঝলেন এইবার তাঁর অন্তর্ধানের সময় নিকটবর্তী, মানবলীলা সমাপ্তপ্রায়। একান্তে তিনি সকাতর প্রার্থনা জানালেন, 'হে কেশব, ক্ষণার্ধও আপনার পাদপদ্ম ছেড়ে থাকতে পারবো না, আমাকে আপনার সঙ্গে স্বধামে নিয়ে চলুন।

"নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি॥"

ভাঃ ১১।৬।৪৩

ভগবান্ তখন প্রিয়তম সুহৃৎকে জানালেন তাঁর অন্তর্ধানের কথা, আর বললেন তিনি অন্তর্হিত হলেই পৃথিবীতে হবে কলির আধিপত্য। তাই স্বজন-বান্ধবে স্নেহমমতা ত্যাগ করে তাঁতে মনঃসন্নিবেশ করে সমদৃষ্টি হয়ে জগতে বিচরণ করতে উপদেশ দিলেন।

"ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্বিচরস্ব গাম্॥"

ভাঃ ১১।৭।৬

উদ্ধব বুঝলেন ভগবান তাঁকে সংসার ত্যাগ করতে আদেশ করছেন। সেই জন্যে 'অনুশাধি ভৃত্যম' বলে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ চাইলেন।

এই সময়ে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে তত্ত্বজ্ঞানের বহু উপদেশ দেন। এগুলি ভাগবতে হীরকখণ্ডের মতো শোভা পাচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করলেন শ্রীশ্রীদত্তাত্রেয়ের অপূর্ব কাহিনী ও তাঁর চব্বিশ গুরুর কথা। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, সমুদ্র, অজগর, পতঙ্গ, মধুকর, হস্তী, মৌমাছি, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলা, চিল, বালক, কুমারী, শরনির্মাতা, সর্প, মাকড়সা, কুমুরে পোকা—এই চব্বিশ গুরুর কাছে দত্তাত্রেয় কিভাবে শিক্ষালাভ করেছিলেন সরলভাবে বুঝিয়ে দিলেন সে কথা। তারপর একে একে আত্মার স্বরূপ, বদ্ধ ও মুক্তের লক্ষণ, সাধু ও ভক্তের স্বরূপ, সৎসঙ্গ, ভক্তিলাভের উপায়, ধ্যানযোগ, সাধনা ও সিদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপদেশ দিলেন। যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা এমনকি সন্ন্যাসও ভগবানকে উর্জিতা ভক্তির মতো বশীভূত করতে পারে না—তাই তিনি বললেন,

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥"

ভাঃ ১১।১৪।২০

ভগবানের কাছে এইরূপ জ্ঞান ভক্তি ও যোগমার্গের উপদেশ লাভ করে পুলকিত উদ্ধব বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে

আনন্দাশ্রু মোচন করতে লাগলেন। চরণারবিন্দে প্রণত ভক্তকে সস্নেহে উঠিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে উদ্ধব, আমার অন্তর্ধানের পর তুমিই হবে আমার তত্ত্বজ্ঞানের রক্ষাকর্তা, তুমি সিদ্ধের সিদ্ধ. তোমার সাধনার কোনও প্রয়োজন নেই। তথাপি লোক-শিক্ষার জন্যে তুমি আমার বদরিকাশ্রমে যাও।'-গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্যাখ্যং মমাশ্রমম্।' 'আসন্ন ভগবদ্‌বিয়োগকাতর ভক্ত কিছুতেই তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারছেন না—অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তাঁর আজ্ঞাপালনের জন্যে কৃপাপ্রদত্ত পাদুকা মস্তকে ধারণ করে বার বার প্রণাম করতে লাগলেন। বিদায়ের এ দৃশ্যটি কী করুণ! এই দৃশ্য চিত্রপটে রামচন্দ্র ও ভরতের চিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্তরতম ভক্তের অন্তরে ভগবান্ চিরজাগরূক থাকলেও বাহিরেও তাঁর বিরহ যে অসহনীয়! উদ্ধব গোপীদের যে বিয়োগবিধুর অবস্থা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন আজ তাঁরই সেই অবস্থা!

এরপর বদরিকাশ্রমে গিয়ে ভগবানের আদেশ পালনে রত হলেন। সুকঠিন কার্যের ভার সমর্পিত হয়েছে তাঁর উপর। তত্ত্বজ্ঞানের সংরক্ষণের ভার। দূর দূরান্তর থেকে সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মারা এসে মধুর তত্ত্বকথা শুনে ধন্য হয়ে যাচ্ছেন। একদিন নয় দুদিন নয় দিনের পর দিন ধরে লোককল্যাণ ব্রত উদ্‌যাপিত হয়ে চলেছে। জ্ঞানপিপাসুর জ্ঞানপিপাসা শান্ত করতে করতে প্রেমিককে ভগবৎপ্রেম বিলাতে বিলাতে উদ্ধব এইবার বেরুলেন তীর্থপর্যটনে। এদিকে মহামতি বিদুরও সারা ভারতের একটির পর একটি করে সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। পবিত্র যমুনাপুলিনে দুই মহাপুরুষের পরম মিলন হল অতর্কিতে দৈবযোগে। যেন আকাশের সঙ্গে সমুদ্রের মিলন! পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ। কিছুক্ষণ পরে বিদুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবানের নাম শ্রবণমাত্রই পাঁচবছর থেকে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত কিভাবে তাঁর অকুণ্ঠ সেবা করেছেন সব একে একে স্মৃতিপটে উদিত হতে লাগল। তাঁর সর্বাঙ্গে পুলক, নয়নে প্রেমাশ্রু, মুখে মৃদু হাস। উদ্ধব সমাধিস্থ হলেন। কী অপূর্ব ভাব! ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে এলে বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণভাস্কর অস্তমিত, আমাদের গৃহ কালসর্পগ্রস্ত। ভাগ্যহীনা এই পৃথিবী। যদুগণ সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য, এতকাল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাস করেও তাঁর ভগবৎস্বরূপত্ব তাঁদের কাছে অজ্ঞাতই রইল।'

* * * *

উদ্ধব-চরিত্রের মতো জ্ঞান ও ভক্তির এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য সত্যই দুর্লভ। একদিকে ভক্তির পরাকাষ্ঠা, অপরদিকে জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ। সমুদ্র-দর্শনের মতোই এই চরিত্র যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করে। যতই গভীরে প্রবেশ করি, তন্ময় হয়ে যাই। কে পরিমাপ করবে অতলস্পর্শ প্রসন্ন গম্ভীর চরিত্রের গভীরতা! হে পরমভাগবত তাই উদ্দেশে জানাই শুধু শত প্রণতি!

"পূর্ণজ্ঞান আর পূর্ণ ভক্তি একই। 'নেতি' 'নেতি' করে বিচারের শেষ হলে, ব্রহ্মজ্ঞান। তারপর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠতে হয়। তারপর দেখে যে, ছাদও যে জিনিসে—ইট চুন সুরকি—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী!"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রতীকোপাসনা, মুক্তি ও আচার্য বাদরায়ণ

(শ্রৌত ও স্মার্ত উপাসনার সামঞ্জস্য)

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

[স্মার্ত উপাসনার বলে নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান ও সদ্যোমুক্তি]

এই স্মার্ত উপাসনাসকলের বলে কেবল যে স্বর্গ ও ক্রমমুক্তিরূপ ফল লব্ধ হয়, তাহা নহে। 'সগুণ দহরবিদ্যা' (ছাঃ ৮।১) অবলম্বনে উপাসনাতে প্রবৃত্ত সাধকের যেমন নির্গুণ ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানের উদয় হয়*, তদ্রূপ গুণ ও অবয়বরূপ উপাধিযুক্ত পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত সাধকের ভগবৎকৃপায় নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইয়া সদ্যোমুক্তিও লব্ধ হইয়া থাকে, ইহা অবগত হওয়া যায়। সেই বিষয়ে শাস্ত্র এই—

"ভবেন্নিরন্তরধ্যানাদভেদপ্রতিপাদনম্ ॥
সুষুপ্তিবৎ পরানন্দযুক্তশ্চোপরতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্বাতদীপবৎ সংস্থঃ সমাধিরভিধীয়তে ॥
সর্বোপাধিবিনির্মুক্তঃ সদানন্দৈকবিগ্রহঃ।
নিশ্চলপরিপূর্ণশ্চ সমাধিরভিধীয়তে ॥

* * *

আত্মা তু নির্মলঃ শুদ্ধঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
সর্বোপাধিবিনির্মুক্তো যোগিনাং ভাত্যচঞ্চলঃ ॥
নির্গুণোঽপি পরো দেবোঽজ্ঞানাদ্‌গুণবানিব।
বিভাত্যজ্ঞাননাশে তু যথা পূর্বং ব্যবস্থিতঃ ॥
পরজ্যোতিরমেয়াত্মা মায়াবানিব মায়িনাম্।
তন্নাশে নির্মলং ব্রহ্ম প্রকাশয়তি পণ্ডিতাঃ ॥ ইত্যাদি

(বৃঃ নারদীঃ পুঃ ৩১।১৪২—১৪৮)

'নিরন্তর ধ্যান-প্রভাবে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নতা জ্ঞান হয়। ইহাই অহংগ্রহোপাসনার পরিপক্কাবস্থা। এক্ষণে সেই অবস্থা হইতে সাধক কি প্রকারে নির্গুণ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাহা বর্ণনা করিতেছেন—] অনন্তর সুষুপ্তি অবস্থাতে যে প্রকার হয়, সেইপ্রকারে উপরতেন্দ্রিয় ও পরমানন্দযুক্ত সাধকের বায়ুহীন প্রদেশে দীপশিখার ন্যায় যে নিশ্চলভাবে অবস্থান, তাহাকে সমাধি বলা হয়। সেই অবস্থাতে সাধক সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইয়া একমাত্র সৎ ও আনন্দাত্মক বিগ্রহ হইয়া পড়েন। (—সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়া পড়েন)। তাদৃশ যে নিশ্চল পরিপূর্ণ অবস্থা, তাহাই সমাধি নামে অভিহিত। তখন আত্মার সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত শুদ্ধ ও নির্মল যে সচ্চিদানন্দস্বরূপতা, তাহা যোগিগণের নিকট অচঞ্চলভাবে

* সগুণ ব্রহ্মোপাস্ত্যা নির্গুণধীঃ"—ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৪, ভাষ্যরত্নপ্রভা। "পরোপাস্তিদ্বারা প্রতিপত্তিঃ" (ঐ) —ন্যায়নির্ণয়।

প্রকাশিত হয়। তখন নিগুর্ণ হইলেও যে পরম দেবতা অজ্ঞানবশতঃ গুণবানের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছিলেন, অজ্ঞানের নাশ হইলে তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন, সেইরূপেই প্রকাশিত হইতে থাকেন, (—অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদজ্ঞানের নাশ হওয়ায় জীব ব্রহ্মাভিন্নস্বস্বরূপেই প্রকাশিত হইতে থাকেন)। পরমজ্যোতিঃস্বরূপ অমেয় আত্মা মায়াধীন জনগণের নিকট মায়াবানের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিলেন, সেই মায়ার নাশ হইলে, হে পণ্ডিতগণ, নির্মল ব্রহ্ম প্রকাশিত হইতে থাকেন,' ইত্যাদি। এই বিষয়টিই অন্যত্র আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই—

"তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে॥

*　　*　　*

তদ্ভাবভাবনাপন্নস্ততোঽসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদী ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ॥
বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥" ইত্যাদি

(বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৯২, ৯৫—৯৬)

["অহংগ্রহোপাসনাশীল] সেই সাধকের মনের দ্বারা যে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা—এই প্রকার কল্পনাবিহীন স্বরূপের গ্রহণ, যাহা ধ্যাননিষ্পাদ্য, তাহাকে সমাধি বলে। [ইহাই নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা]। তখন সেই সাধক পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া পড়েন, যেহেতু পরমাত্মাব সহিত যে বিভিন্নতা, তাহা তাঁহার (—পরমাত্মার অর্থাৎ পরমাত্মাকেই আশ্রয় ও বিষয়কারী] অজ্ঞানের কার্য। [পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে] ভেদজ্ঞানের জনক যে অজ্ঞান, তাহার আত্যন্তিক নাশ হইলে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে [পরমার্থতঃ] অবিদ্যমান বিভিন্নতা, তাহা আর কে সম্পাদন করিবে? (—উক্ত প্রকার নির্বিকল্প সমাধির প্রভাবে অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান সম্পাদক কিছুই না থাকায় জীব ব্রহ্মরূপ স্বস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হন")।

[প্রসঙ্গের উপসংহার—স্মার্ত উপাসনাসকল বেদের বিরুদ্ধ নহে]

এইরূপে দেখা গেল প্রতীকাবলম্বনে যে উপাসনা আরব্ধ হইয়াছিল, এইভাবে নিগুর্ণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানেই হয়, তাহার পরিসমাপ্তি। অহং গ্রহোপাসনা দ্বারা ক্রমমুক্তিদ্বারেই হউক, অথবা সাক্ষাৎ ভাবেই হউক এই ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় না হইলে জীবের সর্বদুঃখের আত্যন্তিক উপশম সম্ভব হয় না। এইরূপে প্রতীকাবলম্বনা বিদ্যাদ্বারাও ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তি লব্ধ হয়, ইহা নির্ণীত হওয়ায় পূর্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন 'প্রতিমাদি প্রতীকালম্বনা উপাসনা ক্রমমুক্তিপ্রদও নহে এবং সদ্যোমুক্তিপ্রদও নহে,' তাহা নিরাকৃত হইল। আর "অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি" (ব্রঃ পুঃ ৪।৩।১৫) ইত্যাদি সূত্রের সহিত যে বিরোধ প্রতিভাত হইতেছিল, তাহাও নিরাকৃত হইল। অতএব উত্তরমীমাংসার অবিরোধী হওয়ায় এই স্মার্ত উপাসনাসকল যে বেদবিরুদ্ধ নহে, ইহাই সিদ্ধ হইল।

[সিদ্ধিলাভের পূর্বে দেহপাত হইলে অহংগ্রহোপাসকের ও ভেদভাবালম্বী সাধকের গতি]

আরব্ধ বিচার সমাপ্ত হইল। কিন্তু প্রসঙ্গগত আরও দুই-একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে বিচারটি অংশতঃ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং আরও কিঞ্চিৎ আলোচনার আবশ্যকতা আছে। তাহা এই—অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যাতে সিদ্ধিলাভ করিলে সাধকের ক্রমমুক্তি হয় এবং কোন কোন সাধক সেই অবস্থাকেও অতিক্রম করিয়া "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬) —'তাঁহার প্রাণসকল (—লিঙ্গশরীর) উৎক্রমণ করে না, স্বরূপতঃ ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যান', এই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য সদ্যোমুক্তি লাভ করেন, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অপ্রতীকালম্বনা ব্রহ্মবিদ্যাতে সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্বেই দেহপাত হইলে তাদৃশ সাধকের কি গতি হইবে? আর যাঁহারা অপ্রতীকভূত মনোময়ী প্রতিমাতে সখ্য, দাস্য ও বাৎসল্যাদি ভেদ-ভাবালম্বনে উপাসনা করেন, 'তুমিই আমি' এবং 'আমিই তুমি'—এইপ্রকার ভাবালম্বনে অহংগ্রহো-পাসনা করেন না, অপ্রতীকালম্বনা হইলেও ভগবদ্দর্শনের পূর্বে শরীরত্যাগ হইলে, তাঁহাদেরই বা কি গতি হইবে? এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে গীতা ৬।৪১-৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তদনুসরণে বলা যায়—মৃত্যুকালে তাদৃশ সাধকের মনে যদি ভোগবাসনার উদয় হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর তিনি দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। নানাস্তরভেদে বিভক্ত* ব্রহ্মলোকে স্ব-সাধনোচিত কোন উচ্চাবচ স্তরে বহু বৎসর নানা দেবোচিত সুখভোগে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় মনুষ্যলোকে আগমন করত রাজচক্রবর্তিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং পুনরায় ভগবৎকৃপালাভে যত্নশীল হন। আর মৃত্যুকালে তাদৃশ সাধকের মনে যদি ভোগবাসনার উদয় না হইযা শ্রদ্ধা ও বিবেকবৈরাগ্যাদি কল্যাণগুণসকলেরই প্রাবল্য থাকে, তাহা হইলে "তীব্র সংবেগানাম্ আসন্নঃ" (যোঃ সূঃ ১।২১)—"তীব্র বৈরাগ্যযুক্তগণের শীঘ্রই হয়", এই পাতঞ্জলোক্ত ন্যায়ানুসারে তাঁহার আর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া দেবোচিত ভোগাদিতে সময় নষ্ট হয় না। পরন্তু অচিরাৎ তাঁহার যোগিগণের কুলে জন্ম লাভ হয এবং পূর্বসংস্কারবশে পুনরায় তিনি সাধনাতে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধিলাভে যত্নশীল হইয়া থাকেন।

[ভেদভাবাবলম্বী সিদ্ধ সাধকের পুনরাবৃত্তি]

এক্ষণে আর একটি প্রশ্ন স্বতঃই আসিয়া পড়িতেছে—যাঁহারা সখ্য, দাস্য ও বাৎসল্যাদি ভেদভাবালম্বনে উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি গতি হইবে? 'আমিই তুমি' এবং 'তুমিই আমি'—এই প্রকার অভেদভাবালম্বনা না হওয়ায় তাঁহাদের উপাসনা তো ক্রমমুক্তিপ্রদ হইবে না। তদুত্তরে বলা যায়—ভেদভাবালম্বনে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও যখন তাঁহাদের পরম-প্রেমাস্পদের দর্শনলাভ হয়, তখন উক্ত ভেদভাব কতক্ষণ থাকে, তাহা চিন্তনীয়। জারভাবরূপ† অতি মলিনভাবালম্বনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপাগত গোপীগণেরও যখন 'আমিই শ্রীকৃষ্ণ'‡ —এই

* ব্রহ্মলোক যে উচ্চাবচ নানাস্তরভেদে বিভক্ত, ইহা পাতঞ্জল দর্শনের ৩।২৬ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে এবং গীতা ৬।৪১ শ্লোকে মধুসূদনী টীকাতে বর্ণিত হইয়াছে।

† শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২।১২,১০।২৯।১১।

‡ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩০।৩।

প্রকার অভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন ভেদভাবালম্বনে উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলেও শান্ত, দান্ত, তিতিক্ষু, শুদ্ধচিত্ত ও শুদ্ধভাবাবলম্বী সাধকগণের যে অভিন্নতাবুদ্ধি ঝটিতি উৎপন্ন হইবে, এই বিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। * তবে এতাদৃশ সাধক যদি শ্রীভগবানের সহিত লীলা-বিলাসেই অভিলাষী হন এবং শ্রীভগবানের তাহাই অভিপ্রেত হয়, ‡ কারণ ক্রীড়া আর একের ইচ্ছায় হয় না; তাহা হইলে তাঁহারা কখনও স্ব-সাধনোচিত ব্রহ্মলোকের কোন স্তরে, আবার কখনও বা ইহলোকে আগমন করিয়া তাহা করিতে পারেন, ইহাতে কোন প্রকার বিরোধ তো পরিদৃষ্ট হইতেছে না। তবে তাঁহাদের ব্রহ্মলোক হইতে যে পুনরাবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যেমন পুরাণোক্ত জয় ও বিজয় প্রভৃতির হইয়াছিল। আর শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের এই লীলাবিলাস যে ভেদভাবাবলম্বী সাধকের একচেটিয়া অধিকার, তাহা নহে। আত্মারাম ও সমস্ত বন্ধনহীন সুতরাং মুক্ত মুনিগণও যে তাদৃশ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন শাস্ত্রে তাহা পরিদৃষ্ট হয়, যথা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্র্ন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৭।১০)

"সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত আত্মরূপ স্বস্বরূপে অবস্থিত মুনিগণও ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে নিষ্কাম ভক্তি করিয়া থাকেন, শ্রীহরির এমনই মহিমা।" আর সগুণ এবং নির্গুণ—এই উভয়প্রকার ব্রহ্মাত্মবিদ্ই যে শ্রীভগবানের কৃপায় আধিকারিক পুরুষরূপে ইহলোকে আগমন করত তাঁহার সহিত লীলাবিলাস করেন এবং তাঁহার অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করেন, ইহা উত্তরমীমাংসা-দর্শনে ৩।৩।১১ 'যাবদধিকারাধিকরণে' ও ব্রহ্মবিত্তাভরণে বর্ণিত হইয়াছে।

[শ্রীভগবানের কৃপাই তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়]

আচ্ছা, শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে সাধনের এত বিভিন্ন ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, এই সকলের মধ্যে সাধনের ঠিক কোন অবস্থাতে শ্রীভগবানের দর্শনলাভ হয়? এতদুত্তরে মহাজনগণ বলেন—যখন যে অবস্থায় শ্রীভগবান কৃপা করিয়া দর্শন দেন, তখনই তাঁহার দর্শন লাভ হয়। তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার কোন উপায়ই নাই। সেইহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূংস্বাম্" (কঠ উঃ ১।২।২৩)

"যে সাধককে ইনি অনুগ্রহ করেন, সেই অনুগৃহীত সাধকের দ্বারাই তিনি লব্ধ হন; তাঁহারই নিকট এই আত্মা স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন।" তিনি কোন প্রকার সাধনার বা অন্য কোন কিছুরই বশ নহেন।

"একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরাচারী যথাসুখম্।" (মহাভাঃ শাঃ ৩৫।১৫)

'স্বাধীন-আচরণশীল সেই এক ঈশ্বর প্রাণীসকলের মধ্যে যথাসুখে বিচরণ করেন।" সুতরাং কে কোন্ বস্তু দিয়া তাঁহাকে বশ করিবে। 'তিনি ভক্তির বশ,' কিন্তু তাহাও তো তিনি না দিলে পাওয়া যায়

* শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১।২৯-৩০ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। তাহাতে ক্রোধ, ভয় ও দ্বেষ ইত্যাদি কলুষিত ভাবাবলম্বনেও মোক্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

‡ "আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, ভক্তি দিতে কাতর হই" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

না। ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল, এই ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র ঈশ্বরপ্রসাদলভ্য 'শাক্ ও মাছের ন্যায়' কোন মূল্যে তাঁহাকে ক্রয় করা যায় না। তবে শ্রুতি ও স্মৃতিতে সাধন-বর্ণনার এত আড়ম্বর কেন? এতদুত্তরে জ্ঞানী বলিবেন—'হৃদয়মন্দিরকে অর্থাৎ অন্তঃকরণকে পরিষ্কার করিয়া তাহার যোগ্যতা সম্পাদনের জন্য,' আর নিষ্কিঞ্চন ভক্ত বলিলেন—কাঁদিতে শিখিবার জন্য'। রাজরাজেশ্বর যখন দীনদুঃখীর পর্ণকুটীরে আসেন, তখন পূর্বেই স্বীয় অনুচরগণকে পাঠাইয়া পরিষ্কার ও সংস্কার করাইয়া সেই কুটীরের যোগ্যতা সম্পাদন করান, তাহার পরেই হয় তাঁহার আগমন। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ সাধনরূপ অনুচর প্রেরণ করত তিনি কাম ও ক্লেশাদি দোষসমূহের নিরাকরণ দ্বারা অন্তঃকরণকে স্বপ্রকাশের উপযুক্তভাবে পরিষ্কৃত করিয়া লন। অন্যথা সেই মহাভাবের বেগ ধারণ করিবার যোগ্যতা সাধারণ জীবের কোথা হইতে আসিবে? ভিক্ষুককে হঠাৎ লাখ টাকা দিলে তাহা তাহার শরীর ত্যাগেরই হেতু হয়। ভক্ত বলেন—মা সন্তানের নিকট ঠিক সময়মত আসেন বটে, তবে বেটীর সময় যে কখন হইবে, তাহার ঠিক কি? পাগলী বেটী কোটি কোটি বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিসংহারে ব্যস্ত, তাঁহার কি একটা কাজ? সুতরাং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেটীকে একবারে বিব্রত করিয়া ফেল, দেখিবে বেটী ঠিক আসিয়া গিয়াছেন। এই সাধন-সকল সেই ক্রন্দন। ইহার অভ্যাস কর, বেটীর কৃপা হইবেই। তাই ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাঃ উঃ ৬।২৩)

"পরমেশ্বরে যাঁহার অচলা ভক্তি, পরমেশ্বরে যে প্রকার ভক্তি গুরুর প্রতিও যাঁহার সেই প্রকার ভক্তি, এইপ্রকার যে সাধক, তাঁহার নিকটই শ্রুতিতে উপদিষ্ট এই বিষয়সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।" ইতি। হরি ওঁ। (সমাপ্ত)

স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীর দেহত্যাগ

গত ১০ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার (২৬শে নভেম্বর, ১৯৫৪) বিকাল ৫-২৪ মিনিটে বেলুড় মঠের বহুশ্রদ্ধাভাজন প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীর (প্রিয়নাথ মহারাজ) ৬৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগের সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত এবং বন্ধুগণের নিকট বিশেষ মর্মবেদনাদায়ক। কিছুকাল যাবৎ তিনি মূত্রকৃচ্ছ্রতা রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন এবং গত বৎসর (১৯৫৩) অক্টোবর হইতে কয়েকমাস তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য বেলগাছিয়া আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে থাকিতে হইয়াছিল। কিছুটা সুস্থ হইয়াও উঠিয়াছিলেন। ১লা অগ্রহায়ণ (১৭ই নভেম্বর) চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে তাঁহার 'প্রস্টেট্ গ্ল্যাণ্ড্' অপারেশন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, কিন্তু দুইদিন পরে হঠাৎ আংশিক পক্ষাঘাতের আক্রমণে বাক্‌শক্তি ও শরীরের দক্ষিণ দিক অবশ হইয়া যায়। ইহার পরে অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন আকার ধারণ করে নিউমোনিয়ার আক্রমণে এবং পরিশেষে পূর্বোল্লিখিত সময়ে উপনিষদের মন্ত্র এবং শ্রীভগবানের সর্বমঙ্গলকর নাম শুনিতে শুনিতে নির্মায়িক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার নশ্বরদেহ বেলুড়মঠে নীত হইয়া গঙ্গাতীরে সন্ন্যাসীদের জন্য নির্দিষ্ট সৎকারস্থানে বহুসংখ্যক সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে অগ্নিসাৎ করা হয়।

প্রিয়নাথ মহারাজ খ্রীঃ ১৯১২ সালে বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে (উদ্বোধন কার্যালয়) যোগদান করেন। স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবাত্মক কার্যপ্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে সকল কর্মী পরে গঠনমূলক সেবাকার্যে ব্রতী হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার বলিষ্ঠ নিঃস্বার্থ চরিত্র, অসাধারণ কর্মদক্ষতা এবং পরদুঃখকাতর উদারহৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহুতর কর্মক্ষেত্রে বিপুল সার্থকতা আনয়ন করিয়াছিল। তিনি বেলুড় মঠের একজন অন্যতম ট্রাষ্টি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের "গভর্ণিং বডি"রও অনেক সদস্য ছিলেন। উদ্বোধনের শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী সংখ্যায় স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীর 'মাতৃস্মরণে'-সংজ্ঞক একটি হৃদয়স্পর্শী ক্ষুদ্র স্মৃতিকথা প্রকাশিত হইয়াছে। জগদম্বার অভয়চরণে মাতৃগতপ্রাণ সন্তান চিরবিশ্রাম লাভ করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

জন্মতিথি—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েক-জন সন্ন্যাসি-শিষ্যের জন্মতিথির তারিখ এই বৎসর যেরূপ পড়িয়াছে নিম্নে প্রদত্ত হইল—

স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ)—অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী, ৪ঠা পৌষ (২০শে ডিসেম্বর), সোমবার।

স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ)—পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী, ১৫ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর), শুক্রবার।

স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ)—পৌষ শুক্লা চতুর্দশী, ২২শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী, ১৯৫৫), শুক্রবার।

স্বামী বিবেকানন্দ—পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী, ১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী, ৫৫), শনিবার।

শাখাকেন্দ্র-সংবাদ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ গত ১৯শে কার্তিক (৫ই নভেম্বর) দিল্লী আশ্রমে একটি পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। ৬ই অগ্রহায়ণ (২২শে নভেম্বর) কনখল সেবাশ্রমে একটি রঞ্জনরশ্মি (X-ray) গৃহের ভিত্তিস্থাপনও পূজ্যপাদ মহারাজজী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ গত ১০ই কার্তিক (২৭শে অক্টোবর) লক্ষ্ণৌ সেবাশ্রমে পদার্পণ করেন। যে সাতদিন তিনি তথায় ছিলেন প্রত্যহ বিকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত নানাবিধ ভগবৎ-প্রসঙ্গ দ্বারা সমাগত ভক্তগণকে পরিতৃপ্তি দান করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজজী ৮ই অগ্রহায়ণ আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শুভাগমন করেন এবং প্রায় সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া ১৪ই বেলুড় মঠে রওনা হইয়া যান। ১০ই অগ্রহায়ণ প্রাতে তিনি আশ্রমের বিদ্যার্থি-বাস-ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন। প্রতিদিনই আশ্রমে বার্ণপুর, কুলটি, চিত্তরঞ্জন, মাইথন, রানীগঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার হৃদয়স্পর্শী ভগবৎ-প্রসঙ্গ সাগ্রহে শ্রবণ করিয়া বিমল শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

পরলোকে মিস্ হেলেন রুবেল—বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট মন্দির প্রধানতঃ যাঁহার আর্থিক দানে সম্ভবপর হইয়াছিল সেই মহীয়সী আমেরিকান মহিলা চিরকুমারী মিস্ হেলেন

ফ্র্যান্সিস্ রুবেল (ভগিনী ভক্তি) গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ সুইজারল্যাণ্ডের জুরিক শহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে মিস্ রুবেল আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রভিডেন্স কেন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থে ব্যাখ্যাত বেদান্তের সার্বভৌম বাণীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। শীঘ্রই বেদান্তের শিক্ষা তাঁহার জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টায় অদ্ভুত পরিবর্তন আনয়ন করিল এবং ভগিনী নিবেদিতার মতোই তিনি ভারতবর্ষকে তাঁহার ধ্যানলোকের জন্মভূমি বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শিবানন্দ মহারাজের সহিত তিনি কয়েকখানি পত্রব্যবহার করিয়াছিলেন, পরে ১৯৩৫ সালে তিনি যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসিলেন তখন পরবর্তী মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে দর্শন এবং তাঁহার বিশেষ স্নেহলাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মিত হইলে ১৯৩৭ সালে উহার উদ্বোধন-উপলক্ষ্যে তিনি দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন এবং তখন হইতে ভারতবর্ষেই থাকিয়া যান। তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মিস্ রুবেল শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের একাধিক শিক্ষা ও পীড়িত সেবার কাজেও বহু আর্থিক সহায়তা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহাই তাঁহার জীবনের বড় কথা নয়—বড় কথা তাঁহার একান্ত আধ্যাত্মিক সাধন-নিয়োজিত বৈরাগ্য-ভাস্বর সরল অনাড়ম্বর নির্মল নিরভিমান চরিত্র। পীড়িত রুগ্ন দেহেও বৎসরের পর বৎসর তিনি যেরূপ কঠোর ধ্যানধারণায় ডুবিয়া থাকিতেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। মাঝে স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে কিছু দিনের জন্য আমেরিকায় গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ফিরিয়া পুনরায় কিয়ৎকাল পূর্বে সুইজারল্যাণ্ডে যান। ওখানেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটিল। সত্যসাধিকার বিদেহ আত্মা পরমপদে চিরন্তন আশ্রয় ও শান্তিলাভ করুক ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমা শতবর্ষজয়ন্তী সংবাদ—গত ২৬শে অক্টোবর (১৯৫৪), সন্ধ্যাকালে নিউইয়র্কের ৩৪ ওয়েষ্ট ৭১তম স্ট্রীটস্থিত বেদান্ত সোসাইটিতে সোসাইটির সদস্যগণকে এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ও জনসাধারণকে শ্রীমা'র স্মৃতির প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধানিবেদন-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগদানের উদ্দেশ্যে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র গাম্ভীর্যময় ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মন্দিরটি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয় এবং পত্রপুষ্পে সুশোভিত শ্রীমার একখানি মনোজ্ঞ প্রতিকৃতি বেদীর নিকট স্থাপন করা হয়। এই বেদীর উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি স্থাপিত আছে। মন্দিরে এত বিপুলসংখ্যক নর-নারীর সমাবেশ হয় যে, মন্দিরের মধ্যে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। উপরতলায় বাসের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষগুলিতে অবশিষ্ট শ্রোতৃবর্গের বসিবার এবং বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তাঁহাদের শ্রবণের ব্যবস্থা করা হয়। স্বামী পবিত্রানন্দ সংস্কৃতে ও ইংরেজীতে প্রার্থনা করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। অতঃপর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী শঙ্করানন্দের প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। স্বামী পবিত্রানন্দ তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন যে, পাশ্চাত্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন এরূপ পরিবেশের মধ্যে শ্রীমা জীবন যাপন করিয়াছেন যে, তাহা পাশ্চাত্ত্যের নিকট বোধগম্য হইবে কিনা, তাহা এক প্রশ্ন এবং এমন কি, তাঁহার জীবনের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্যের আভাস কিরূপ দেওয়া যাইতে পারে, তাহাও এক সমস্যা। আমেরিকায় বেদান্ত-আন্দোলন আরম্ভের ব্যাপারে তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার

সিদ্ধান্ত-অনুসারেই বেদান্তের বাণী প্রচারের জন্য বিবেকানন্দের আমেরিকা আগমন চূড়ান্তরূপে স্থির হয়। যে কয়েকজন দুর্লভ শ্রেষ্ঠ ভগবৎসাধকের নীরব অনাড়ম্বর জীবন রহস্যময় কারণে এতদূর শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহা সমগ্র বিশ্বে তাঁহাদের পরিমণ্ডলসমূহের ক্রমাগত প্রসারে প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রভাবের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, শ্রীমা তাঁহাদের অন্যতমা। এই দিনের সান্ধ্য সভায় আমন্ত্রিত বক্তা, বেদান্ত-মন্ত্রে দীক্ষিতা মার্কিণ শিষ্যা মিসেস শারলোটি বোস ভারতে এক বৎসর যাবৎ তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া সদ্য প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে তিনি প্রথমে বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় কথার সাহায্যে যে বাস্তব চিত্র আঁকিয়া যান, তাহা এই দিনের সমগ্র সান্ধ্য অনুষ্ঠানে আদর্শ-পরিবেশ সৃষ্টি করে। দক্ষিণেশ্বর, বৃন্দাবন, বাঙ্গালোর, কামারপুকুর, ও জয়রামবাটীর যে বিবরণ দেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হন।

ভারতীয় সংসদের সদস্যা, রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি ও ভারতস্থিত শ্রীমা'র জন্ম শতবার্ষিকী কমিটির সদস্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন শ্রীমা'র জীবনের শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ভারতীয় নারীদের জীবনাদর্শ যে সমস্ত নারীর পক্ষেই শিক্ষামূলক এবং বিশেষভাবে পাশ্চাত্যের নারীরা শ্রীমা'র জীবন হইতে যে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, শ্রীমতী মেনন তাহা বলেন।

বোষ্টন ও অন্যান্য বেদান্ত কেন্দ্রসমূহের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখিলানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় শ্রীমার জীবনের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, যাঁহারা শ্রীমা'র করুণার নিকট আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের সকলেরই আধ্যাত্মিক জীবনের ভার তিনি বহন করেন। পরিশেষে স্বামী পবিত্রানন্দ বলেন যে, শ্রীমা'র জীবনের সমস্ত ঘটনা সর্বজনের গোচরীভূত করা আবশ্যক। তাহা হইলে লোকে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, নরদেহধারী যে কেহ নিজেকে আধ্যাত্মিক জীবনের কত উচ্চ স্তরে উন্নীত করিতে পারে। তাঁহার জীবনকথা গল্প-গাথা ও প্রাচীন যুগের পৌরাণিক কাহিনীর মতো। তিনি যে আমাদের সময়ের এত নিকটবর্তী কালে জীবিত ছিলেন, তাহা মনে করিতেও বিস্ময়বোধ হয়।

গত ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমা সারদামণির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু ১৬৩ নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ ভবনে চারু ও কারু-শিল্প এবং সাংস্কৃতিক নিদর্শনসমূহের এক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের সম্মেলনে শিক্ষা-মন্ত্রী বলেন যে সারদামাতার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ চতুর্দিকে নারীজাতির মধ্যে যে জাগরণ দেখা দিয়াছে তাহাতে ভারতের নারীসমাজের উন্নতিই সূচিত হইতেছে। নারী সমাজের এই উন্নতিকে শুধু শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। সারদামাতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সুদূর পল্লী অঞ্চলে নারীজাতির মধ্যে সামাজিক অবিচার দূরীকরণে ব্রতী হইবার জন্য তিনি কর্মীদের উদ্যোগী হইবার আহ্বান জানান।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে, শ্রীশ্রীসারদামাতা দাম্পত্য-জীবনে নারীত্বের এক মহিমময় আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা যে কাল্পনিক নয় তাহা আজ সর্বত্র প্রমাণিত হইতেছে।

৮ই ডিসেম্বর কলিকাতার সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের প্রদর্শনীটি ঘুরাইয়া দেখানো হয়। শিল্পকলা ও সংস্কৃতিমূলক বহু দ্রব্যাদিতে প্রদর্শনীটি সজ্জিত করা হইয়াছে বিশেষ করিয়া ভারতীয় ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে নারীসমাজ যে গৌরবময় কীর্তি

রাখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণ ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ চরিত্র ও জীবন উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং ভবিষ্যৎ নারীসমাজ-গঠনে প্রভূত সাহায্য করিবেন। প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বারেই একখানি গরুর গাড়ীর মধ্যে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে তাঁহার এক সঙ্গিনীর সহিত দেখা যাইবে। শিল্পী শ্রীনিতাই পাল উহা নির্মাণ করিয়াছেন। উক্ত স্থানের অনতিদূরে সারদা ভবনে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের, মাতা সারদাদেবীর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। উক্ত সারদা ভবনের দ্বিতলে ঐগুলি রাখা হইয়াছে। মাতা সারদা দেবীর ব্যবহৃত বালা, হার, বাটি, থালা, কাপড়, এবং তাঁহার অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাঠের যে আসনে উপবেশন করাইয়া মাতা সারদাদেবীকে ষোড়শী পূজা করিয়াছিলেন সেই কাষ্ঠাসনখানাও উক্ত স্থানে রাখা হইয়াছে। যে বালা জোড়াটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাতা সারদাদেবীকে উপহার দিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের মৃত্যুর পর মাতা সারদাদেবী উহা অপসারিত করিতে চাহিলে উহা পরিত্যাগ না করিবার জন্য ঠাকুর স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন উহা প্রদর্শনীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহৃত একটি পাগড়ী এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত লেপটিও প্রদর্শনীতে জনসাধারণের দেখার জন্য রাখা হইয়াছে। আমেরিকা ও ভারতের শিল্পীদের তৈয়ারী মাতা সারদাদেবী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছে। সারদা-ভবনের দ্বিতলে ভারতে ও ভারতের বাহিরে রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখা-কার্যালয়ের কার্যাদি সম্পর্কিত আলোকচিত্র, মানচিত্র ও অন্যান্য প্রচারপত্র রাখা হইয়াছে। এইস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি স্থাপন করা হইয়াছে।

সারদা-ভবনের নীচতলায় রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শিক্ষাবিভাগ ও প্রসূতিসদনের ব্যবস্থাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। নিবেদিতা স্কুলের কার্যকলাপও প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগ্নী নিবেদিতা যে প্রকারের শিক্ষা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাই দেখান হইয়াছে। উহাতে শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ছোট ছোট বালক-বালিকাদের পূজা, স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ এবং সীতা, সাবিত্রী, গার্গী প্রমুখ মহিয়সী মহিলাদের আদর্শে শিক্ষা দেওয়া হয়।

সারদা-ভবনের পশ্চিমে সংস্কৃতি-ভবনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, সুনয়না দেবী, যামিনী রায়, মণীন্দ্র গুপ্ত, রমেন চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীদের অঙ্কিত বহু চিত্র সজ্জিত করা হইয়াছে।

সংস্কৃতি-ভবনের দক্ষিণে শিক্ষাভবন অবস্থিত। এই স্থানে নানাপ্রকার শিল্পের একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে। এইস্থানে কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের অঙ্কিত মাতা সারদাদেবীর বিভিন্ন সময়ের মূর্তি তৈয়ারী করিয়া রাখা হইয়াছে।

এই প্রতিমূর্তিগুলি মাতা সারদাদেবীর জীবনী অবলম্বনে তৈয়ার করা হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে নানাপ্রকার কুটিরশিল্পের মধ্যে চামড়ার কাজ, বেতের ও বাঁশের কাজ, সূচী-কর্ম প্রভৃতি নানা শিল্পের ষ্টল খোলা হইয়াছে। কাশ্মীরের কারুশিল্পও এই প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছে। শিল্প-ভবনের নিকটে রামকৃষ্ণ সারদাপীঠ কর্তৃক একটি আদর্শ গ্রাম্যভবন দেখান হইয়াছে। ইহাতে গোবর হইতে জ্বালানী গ্যাস উৎপাদন দেখানো হইয়াছে।

গত ১৩ই ও ১৪ই নভেম্বর দেবদেউলবহুল প্রাচীন তীর্থনগরী ও ভাস্করশিল্পের পীঠস্থান ভুবনেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

উৎসবের কার্যসূচী অনুযায়ী প্রথম দিন অপরাহ্নে নূতন রাজধানীতে ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। উহাতে বেলুড় মঠের স্বামী জপানন্দ মহারাজজী প্রধান অতিথির ভাষণে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবনীর বহু তথ্যবহুল ঘটনার উল্লেখ করিয়া এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর ওড়িষ্যার জনসংযোগ-বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীচিন্তামণি মিশ্র এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। সভাপতির অভিভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত চৌধুরী এক আবেগময়ী ভাষায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবী জীবনী আলোচনাপূর্বক বলেন—আজ দেশ স্বাধীন। এখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিলেই আমরা দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইব। তিনি আরও বলেন—বর্তমান যুগ শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ।

দ্বিতীয় দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ভোরে মঙ্গলারতির পর শ্রীশ্রীমায়ের একখানি বৃহৎ সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ প্রভাতফেরীদল রাজধানী ও শহরের বিভিন্ন এলাকায় পরিভ্রমণ করে। তৎপর পূজা হোম চণ্ডীপাঠ ভজন কীর্তন প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৬০০০ ছাত্র ছাত্রী ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অতঃপর স্কুলপ্রাঙ্গণে সকাল ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা পর্যন্ত এক বিরাট ছাত্র-সম্মেলনে শিশুমেলা ও শিশুপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে নানাবিধ খেলাধূলা নৃত্য দাসকাঠিয়া ও পাসা প্রতিযোগিতা হয়, এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করেন বেলুড়মঠের স্বামী জপানন্দ মহারাজ।

উৎসব প্রাঙ্গণে প্রথমরাত্রে স্থানীয় কপিলেশ্বর কালিকা ক্লাব কর্তৃক 'সাবিত্রী ও সত্যবান' যাত্রা ও পরদিন পরী শ্রীক্লাব কর্তৃক 'কুরুক্ষেত্র' নাটক বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ওড়িয়া ভাষায় অভিনীত হয়। এইভাবে ভুবনেশ্বরে দুইদিনব্যাপী উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শ্যামলাতাল (আলমোড়া) বিবেকানন্দ আশ্রম জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন করেন গত ২২শে অক্টোবর। বিশেষপূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক, রামনাম সঙ্কীর্তনাদি ব্যতীত একটি জনসভারও অনুষ্ঠান হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচনা করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দ। পার্শ্ববর্তী ৪।৬টি পাহাড়ী গ্রামের বহু নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। দরিদ্রগণের মধ্যে ১০১ টি নূতন শাড়ী বিতরিত হয়। সমবেত সকলকে মিঠাই ও হালুয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমে বিগত ৪ঠা নভেম্বর হইতে ৭ই নভেম্বর দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী বিপুল সমারোহে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ শিলচরে শুভাগমন করিয়া সভাগুলির পরিচালনা করেন। ৪ঠা নভেম্বর পূর্বাহ্নে স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দজী বেদ ও উপনিষদ্ পাঠ করেন। অপরাহ্নে বিদ্যার্থি-সম্মেলনে চেরাপুঞ্জি কেন্দ্রের স্বামী শুদ্ধবোধানন্দ, শিলংকেন্দ্রের স্বামী চণ্ডিকানন্দ, শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না চন্দ, অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়তোষ মৈত্র বক্তৃতা করেন। প্রধান অতিথি লোকসভার সদস্য শ্রীযুক্তা পুষ্পলতা দাসও একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে পূজনীয় মাধবানন্দজী একটি উপদেশমূলক ভাষণ দেন এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরে তিনি ছাত্রগণকর্তৃক অঙ্কিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালেখ্যের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

৫ই নভেম্বর, শুক্রবার শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচার

পূজা, চণ্ডীপাঠ, কুমারীপূজার অনুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ এবং এক বিরাট মহিলা-সম্মেলনে হয়। পরে বালকগণকর্তৃক ব্রতচারী নৃত্য, ব্যায়ামকৌশল-প্রদর্শন এবং 'চণ্ডালিকা' অভিনীত হয়।

৬ই নভেম্বর অপরাহ্ণে বিভিন্ন ধর্মের প্রতীক, পতাকা এবং শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ এক মহতী শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে। সন্ধ্যায় একটি বিরাট জনসভায় স্বামী শুদ্ধবোধানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ, শ্রীমতী পুষ্পলতা দাস, কাছাড়ের ডিপুটি কমিশনার শ্রীআর, ভি, সুব্রহ্মণ্যন্, অধ্যক্ষ শ্রীজে কে চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি পূজনীয় মাধবানন্দজী মহারাজের মনোজ্ঞ ভাষণ সকলকে অপূর্ব প্রেরণা দেয়। ৭ই নভেম্বর ভজন-কীর্তনসহ সমস্তদিন ব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। প্রায় ১২ হাজার নরনারী ঐদিন বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিগত ২৭শে নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত জামসেদপুর শহরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শহরের বিভিন্নস্থানে সভা-সমিতি ও আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতা, বেলুড়মঠ, রাঁচী এবং আরা হইতে আগত বিশিষ্ট বক্তাগণ হিন্দী, বাংলা, ও ইংরেজী ভাষায় অতি মনোমুগ্ধকর ভাবে মায়ের জীবনালোচনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ উক্ত উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া সর্বসাধারণের আনন্দ-বর্ধন করিয়াছিলেন। উৎসবের অন্যতম উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা শ্রীশ্রীমায়ের বৃহৎ প্রতিকৃতিসহ প্রায় এক মাইল ব্যাপী শোভাযাত্রা। ভজননিরত এবং স্কুলের বিশেষপোষাক-পরিহিত প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রী-সঙ্ঘকে (স্থানীয় বিবেকানন্দ সোসাইটি-পরিচালিত) অতি সুশৃঙ্খলভাবে ভক্তিবিনম্রচিত্তে 'জয় সারদাদেবীকী জয়' উচ্চারণ করিতে করিতে পথ অতিক্রমকালে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উৎসবের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা—(১) কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সুহৃদক্লাব কর্তৃক দুই দিন উচ্চাঙ্গের কালীকীর্তন (২) সোসাইটিপ্রাঙ্গণে মহিলাসভা ও বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, গুজরাটী মেয়েদের বিচিত্রানুষ্ঠান (৩) মেয়েদের হস্তশিল্পপ্রদর্শনী (৪) প্রধান উৎসবের দিনে (২৮শে নভেম্বর) প্রায় সাত হাজার ভক্ত নরনারী ও ছাত্রছাত্রীগণের পরিতোষসহকারে প্রসাদ-গ্রহণ (৫) সর্বশেষ দিনে প্রায় দুই হাজার দরিদ্র-নারায়ণসেবা।

'সারদা মঠ' প্রতিষ্ঠা—ভারতীয় নারীজাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য আত্মনিবেদিতা ব্রতধারিণীগণের প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে গত ১৩ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর, ১৯৫৪) 'সারদামঠ' নামে স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পিত স্ত্রী-মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ঐদিন সকাল ৯টার সময় মঠের অনেক সন্ন্যাসী এবং ভক্ত নরনারীর উপস্থিতিতে ঠাকুরঘরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, জননী সারদাদেবী এবং আচার্য স্বামী বিবেকানন্দজীর পট স্থাপন করেন। সন্ন্যাসিগণ এবং অপরাপর পুরুষ দর্শকবৃন্দ ৯½ টায় চলিয়া আসেন। মহিলাগণ সারাদিন ভজন, পূজাপাঠ, হোমাদি উৎসবানুষ্ঠান-সমূহে যোগদানে প্রভূত আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার মহিলা বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই নব-প্রতিষ্ঠিত স্ত্রী-মঠ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে ½ মাইল উত্তরে 'সুরধুনী কানন' নামক উদ্যানবাটীতে অবস্থিত। এখন কয়েকবৎসর ইহা বেলুড় মঠের পরিচালনাধীন থাকিবে—পরে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নব প্রকাশিত পুস্তক

স্বামিজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতার 'The Master as I saw him' গ্রন্থের অনুবাদ।

অনুবাদক—স্বামী মাধবানন্দ

পৃষ্ঠা—৪২০ ; মূল্য—৪৲ টাকা

(২) **রাজা মহারাজ**—স্বামী নরোত্তমানন্দ-প্রণীত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'মানসপুত্র' রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। পৃষ্ঠা—১২২ ; মূল্য—১৷৷০ আনা

বিবিধ সংবাদ

শৃঙ্গেরী মঠাধিপতির দেহত্যাগ—ভারতবর্ষের চারপ্রান্তে আচার্য শঙ্কর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠের অন্যতম শৃঙ্গেরীর (মহীশূর রাজ্যে) মঠাধিপতি বহুজনশ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী চন্দ্রশেখর ভারতী গত ১০ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর) প্রাতে তুঙ্গানদীতে স্নানকালে দুর্ঘটনায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। সুপ্রাচীন শৃঙ্গেরী মঠের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তিনি দীর্ঘকাল বিশেষ গৌরবের সহিত রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর বিদেহ আত্মা পরমপদে চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

প্রশংসনীয় উদ্যম—সিন্দ্রি কারখানার সংলগ্ন শহরপুরা, রোরাবাঁধ, সিন্দ্রি ও সিলভার টাউনের প্রতিটি ঘরের দ্বারে দ্বারে সংগীতসহ শোভাযাত্রা বাহির করিয়া স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (শহরপুরায় অবস্থিত) নগদ মোট ৬২০৲ টাকা, ১০০৲ টাকা মূল্যের চাউল, ডাল, আটা প্রভৃতি এবং ৯৮ খানি পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সংগৃহীত সাতশতকুড়ি টাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকের নিকট পাঠানো হইয়াছিল।

স্থানীয় বাসিন্দাদের এইরূপ অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং অকৃপণ বদান্যতা থাকিলে এই সেবাশ্রম ভবিষ্যতে মানবসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ থাকিয়া বরাবর সৎকার্যে ব্রতী থাকিতে পারিবে সেবকদের ইহাই বিশ্বাস।

দরিদ্রবান্ধবভাণ্ডারের সেবাকার্য—কলিকাতার ৫৬।২-বি বিডন স্ট্রীটে অবস্থিত দরিদ্রবান্ধবভাণ্ডারের ত্রিংশৎ এবং একত্রিংশৎ বার্ষিকী (১৯৫২ ও ১৯৫৩) *কার্যবিবরণী পাঠে আমরা আনন্দলাভ* করিয়াছি। এই জনসেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানের চারটি প্রধান বিভাগ :—

(১) শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন (১০৫।২, দীনেন্দ্র স্ট্রীট, হালসিবাগান, কলিকাতা)

১২টি রোগি-শয্যা-যুক্ত এই বিভাগটিতে ১৯৫২ সালে (৬ই অক্টোবর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত) ১৪টি এবং ১৯৫৩ সালে ৩৮জন যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

(২) চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয়

এই বিভাগে আলোচ্যবর্ষদ্বয়ে যথাক্রমে অ্যালোপ্যাথি মতে ৫০,৭৮৪ ও ৫১,৩৪৩ এবং হোমিওপ্যাথি অনুসারে ৪৬,৫০৩ ও ৪৫,০৯১—মোট যথাক্রমে ৯৭,২৮৭ ও ৯৬৪৩৪ সংখ্যক রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা—২৯,১২৫ ও ২৮,১৬১

(৩) চেষ্ট ক্লিনিক—রবি, বুধ এবং শুক্রবার বেলা ১১টা হইতে ১½টা পর্যন্ত এই বিভাগে সাধারণভাবে হৃদ্‌রোগী এবং বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগীদের ব্যাধিনির্ণয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। আলোচ্যবর্ষদ্বয়ে রোগীর সংখ্যা ছিল ৯৪২২ (নূতন রোগী—১০৬২) এবং ১১,০২৯ (নূতন ও পুরাতন)

(৪) সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাগার—এই গ্রন্থাগারে (বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬৷৹টা হইতে ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে) নানাবিষয়ক পুস্তকাদি নামমাত্র (ছেলেমেয়েদের পক্ষে ৴৹ আনা; প্রাপ্তবয়স্কদিগের জন্য ।৹ আনা) মাসিক চাঁদায় জনসাধারণকে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হয়। একটি অবৈতনিক পাঠাগারও লাইব্রেরীর সহিত সংযুক্ত আছে। ১৯৫৩ সালের শেষে পুস্তকসংখ্যা ছিল ৩৮১৫; সভ্যসংখ্যা ১০৪; গড়ে প্রত্যহ ২৫ খানি বই বাহিরে দেওয়া হইয়াছে।

উপরোক্ত কার্যগুলি ছাড়া দরিদ্র পরিবারে বস্ত্র ও দুগ্ধ বিতরণও প্রতিষ্ঠান করিয়া থাকেন।

সারদাদেবীর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন—শ্রীশ্রীসারদামাতার শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর, ৫৪) বাগবাজার পল্লীর স্বর্গত পশুপতি ও নন্দলাল বসুর ভবনে এক মহতী সভায় নেত্রীত্ব করেন শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী। ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রীর মঙ্গলাচরণের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। আচার্য মন্মথমোহন বসু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীমতী বেলা দে, শ্রীমতী রাধা মিত্র এবং শ্রীমতী গৌরী সিংহ শ্রীশ্রী-মাতার পুণ্য জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীমাতার পাদপদ্মে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া সভানেত্রী মহোদয়া শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বহু ঘটনা সুললিত ও ভাবগম্ভীর ভাষায় বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের অপার দয়া, ক্ষমা ও সন্তানের প্রতি তাঁহার ভালবাসার কথা বলেন। শ্রীমতী কান্তি মিত্র ও শ্রীবিমানভূষণ পাল দুইখানি গান করেন। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের বালিকাগণ কর্তৃক আরতি ও বন্দনার পর সভার পরিসমাপ্তি হয়।

বাঁকুড়া জেলার মণিপুর গ্রামে গত ২১শে ও ২২শে কার্তিক শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ-পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, শ্রীরামনামসংকীর্তন, সভা ও প্রসাদ বিতরণাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বক্তা ছিলেন বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মহেশ্বরানন্দজী, মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুশান্তানন্দ এবং স্বামী বিশ্বদেবানন্দ। এই উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার মণিপুর গ্রামনিবাসী শ্রীপ্রভাকর মণ্ডল মহাশয় বহন করিয়াছিলেন।

গাজিপুর (হাওড়া) গ্রামে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১১ই অগ্রহায়ণ সকালে শ্রীশ্রীমার পূজা, সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু কর্তৃক জীবনী-আলোচনা এবং পরে কালীকীর্তন হয়। পরদিন পূজা, হোম, কালী-কীর্তন ব্যতীত অপরাহ্নে একটি আলোচনা-সভার আয়োজন হইয়াছিল। উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, অধ্যাপক শ্রীকিরীটিভূষণ দত্ত, অধ্যাপক শ্রীশঙ্কর-প্রসাদ বসু এবং আরও কয়েকজন বক্তা ভাষণ দেন। গাজিপুর ও গ্রামান্তরের বহু নর-নারী ও বালক-বালিকা যোগদান করিয়াছিলেন। পরবর্তী কয়েক-দিন শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও নামসঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

'গল্পভারতী'র উদ্যোগ—'গল্পভারতী' মাসিক পত্রিকা স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম জীবনীগ্রন্থ-লেখক ৺সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করিয়াছেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু—'বিশ্ব-মৈত্রী ও স্বামী বিবেকানন্দ'। ১৬ পেজী ফর্মার ২৪ পৃষ্ঠার ভিতর সীমাবদ্ধ লেখাটি ৭ই পৌষের মধ্যে গল্পভারতীর ঠিকানায় (২৭৭বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-৬) প্রেরিতব্য। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের লেখক একটি সুবর্ণপদক উপহার পাইবেন এবং রচনাটি গল্পভারতীর আগামী বিবেকানন্দ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৫৬ম বর্ষ

(১৩৬০ মাঘ হইতে ১৩৬১ পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

াষিক মূল্য ৫৲

প্রতি সংখ্যা ॥০

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(বর্ণানুক্রমিক)

(মাঘ, ১৩৬০ হইতে পৌষ, ১৩৬১)

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
যে ঈশ্বরের জন্য পাগল সেই ধন্য	শ্রীআশুতোষ দাস	২৫৬
যোগসিদ্ধা ভারতীয় নারী	অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ	১৭৮
রামকৃষ্ণ (কবিতা)	'ভাস্কর' ...	২৭৪
রামকৃষ্ণমিশন বন্যাসেবাকার্য্য	... ..	৬২৪
রামপ্রসাদ-প্রসঙ্গে	শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় ...	১৪৬
রামায়ণে সংকার, প্রেতকৃত্য এবং শ্রাদ্ধ ..	ডক্টর শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী, এম্-এ, ডি-লিট্, শাস্ত্রী ..	৪৯৮
রোহিণী	শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা ..	১২৬
লালন ফকির ও তাঁহার সঙ্গীত	শ্রীমতী মিনতী দেবী ...	৪১১
লীলাময়ী সারদা (পাঁচালি)	শ্রীমতী নীহারবালা বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৫৭
শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্	স্বামী আদিনাথানন্দ ..	১৩
শিক্ষার ভিত্তি	'বনফুল'	৫২৫, ৫৮৫, ৬৩৮
শ্রমণ অহিংসক	শ্রীজয়দেব রায়, এম্-এ, বি-কম্ ...	৬০৫
শ্রীকৃষ্ণপ্রাতঃস্মরণস্তোত্রম	শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, সপ্ততীর্থ ...	৪৪৯
শ্রীম-প্রসঙ্গে	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ..	২৭৭
শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিতা)	শ্রীসুধীর চৌধুরী ...	৬৫
শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভোগবাদ	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ...	৮৬
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর নারীভক্তদের সম্মেলন ...	ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী ...	৩৩৪
শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপমা	শ্রীঅরুণকুমার বিশ্বাস ..	৮৮
শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শ ...	শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, অধ্যাপক এস্ বেঙ্কটরমণ ও শ্রীচণ্ডুলাল ত্রিবেদী ...	২৪০
শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শ	(১) ডক্টর সুদর্শন (২) ডি, সেনানায়ক (৩) শ্রী এম্ পতঞ্জলি শাস্ত্রী ...	৩৫৪
শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনায়নের এক অধ্যায় ..	ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য ...	৬৫
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী	শ্রী বি, জি, খের, অনুবাদক : শ্রীমণীকুমার দত্তগুপ্ত ...	৯৯
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ		৫০, ১০৬, ১৬০, ২২১, ২৮৪, ৩৩৭, ৩৯৩, ৪৫৩, ৫৬৬, ৬২০, ৬৬৯
শ্রীশ্রীনারদমুনি	স্বামী ধর্মেশানন্দ ...	৩৭১
শ্রীশ্রীবিঠ্ঠলদেবজী	স্বামী দিব্যাত্মানন্দ ...	৪২৩
শ্রীশ্রীমা	শ্রীমতী মীরা সিংহ, এম্-এ ...	২৪৩